একমেবাদ্বিতীয়ং

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৫ সংখ্যা।

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

বর্ষ বিদায়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এ)

জানতে আমি পারিনি তো
বরষ কখন চলে গেল
শুধু বুকের মাঝে সুরে বাজে
বরষ গেল বরষ গেল !
ওরে অবোধ, বরষ গেল !
কখন গেল, কবে গেল
এই তো আকাশ এই তো ধরা—
তবুও সুর প্রাণে বাজে
বরষ গেল বরষ গেল
শেষ বিদায়বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে
ঐ মিলালো রে মিলালো !
এমনি করেই যেতেছে দিন
ওরেরে ও অবোধ মন
এমনি করেই বাজিয়ে বাঁশী
চলেছে দিন চলেছে ক্ষণ।
আছিস্ কেবল ঘুমের ঘোরে—
ভাঙ্গবে কবে ভাঙ্গবে কবে
আর কতদিন চেতনবিহীন
এমনিতর কাটবে ভবে ?
ওরে ঐ সুরই ফুল গেয়ে গেল
পাখীও গান বাজিয়ে গেল
দিনের আলো নিলীন হ'ল
ঐ সুরই যে শুনিয়ে গেল।
ওরে আরও কত যাবে যে দিন
ঐ গানটাই গেয়ে গেয়ে—
ওরে মন, আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
আর কতদিন র'বি রে লীন !
ওরে মন জীবনে যে সন্ধ্যে হবে
এমনি তো দিন নাহি র'বে
কেউ জানবে নাকো কখন গেলি
তবু সন্ধ্যে হবে সন্ধ্যে হবে !
ওরে এমনিতরই রবে আকাশ
এমনিতরই ব'বে বাতাস
সূর্য্যতারায় এমনিতরই
হবে সোণার আলো বিকাশ।
তবু তুই তো সেদিন লুপ্ত হ'বি
কোন সাগরে মিলিয়ে যাবি
একটি তারাও বল্‌বে নাকো
কোথায় গাবি কোথায় র'বি।
ওরে বরষকে তোর প্রণাম দে
বাধা বাঁধন খুলে দিক্ সে
হাসিকান্না ফুটিয়ে তুলুক
আবার নবীন সাজে এসে।
বরষ গেল, বরষ গেল
বিদায় প্রণাম করে নে ভাই
কত যে দান দিয়ে গেল
প্রাণে যেন সেইটুকু পাই॥

নববর্ষ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

নূতন দিনে নূতন কথা
নূতন ব্যথা জানা'ব
নূতন দিনে নূতন করে
মনকে তোমায় মানা'ব।
নূতন গানে নূতন তানে
নূতন প্রাণে দাঁড়াব
নূতন করে নেব তোমায়
নূতন গীতি শুনাব।
এমনি করে নূতন করে
নেব তোমায় বারে বারে
পুরাতনের মাঝে কেবল
নূতনেরেই আনাব॥

নববর্ষে স্বাগত।

নববধূ যেমন নিত্য নব নব সাজে সজ্জিত হইয়া, নিত্য নূতন ভূষণে ভূষিত হইয়া সকলের হৃদয়ে আনন্দধারা ঢালিয়া দেন, হে নববর্ষ তুমিও তেমনি নিত্য নূতন শ্রীতে সুশোভিত হইয়া, নিত্য নবতর ভাবসমূহের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আনন্দ বিধান কর। নবজাত শিশু যেমন পিতামাতার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব স্নেহপ্রীতি উৎপাদন করে, তুমিও, হে নববর্ষ, সেইরূপ আমাদের সকলকে তোমার প্রতি স্নেহপ্রীতির সুদৃঢ় আকর্ষণে টানিয়া লও। তোমাকে আমরা স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। গত বর্ষের গর্ভে তুমি যখন বাস করিতেছিলে, সেই সময়েই তোমার সুলক্ষণের পূর্ব্বাভাস সকল স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই সকল পূর্ব্বাভাস হইতেই আমরা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতেছি যে তুমি কি প্রকারে ভাবগরিষ্ঠ ও প্রেমদ্রাঢ়িষ্ঠ হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। বীর নেপোলিয়নের মাতা নানা বিপদ আপদের মধ্যে, নানা দুর্দিন দুর্যোগের মধ্যে যে সন্তানের জন্মদান করিয়াছিলেন, আজ সেই সন্তান জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, অদ্বিতীয় কর্ম্মী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সেইরূপ হে নববর্ষ, তোমার জননী যে দুঃখদুর্দিনের মধ্যে যে লোকক্ষয়কর মহাসমরের মধ্যে তোমাকে জন্মদান করিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে তুমি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল বিষয়ে ভারতে নবযুগ আনয়ন করিবে না? গত বর্ষের প্রথমাবধি নবযুগ আবির্ভাবের প্রবল আশ্বাস লাভ করিয়াছিলাম। কে জানে যে জ্ঞানের ধর্ম্মের কর্ম্মের ও সত্যের সেই নবযুগ এই বৎসরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না? পূর্ব্বাভাসের দ্বারা যদি কোন ঘটনার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়, তবে আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের ভিতরেই নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা কিছুতেই নিষ্ফল হইবে না, ইহা আমরা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে প্রকার অবিশ্রামে চলিয়াছে, তাহাই তো নববর্ষকে দ্রাঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার অন্যতর উপায়। একথা সত্য যে ভারতের বিলাতবাসী মূল গবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশে সুরা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সুরা-বিরোধের বাতাস যে আমাদের দেশকেও নিঃসন্দেহ স্পর্শ করিবে সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আর, তার পর, আজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু পরে, এই লোকক্ষয়কর মহাসমরের পরে এদেশ রক্ষার জন্য যখন এদেশ হইতেই সেনা সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে, তখন সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে অনুপযোগিতার কারণে লোকের অভাব অনুভূত হইলেই গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখি যে ইংলণ্ডে স্বয়ং সম্রাট সুরা বর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেও সেখানে সুরাসেবন সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তথাকার নেতৃবর্গ দুঃখিত ও ভীত হইয়া উঠিতেছেন।

গত বৎসর দেশে ও বিদেশে সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের প্রতি প্রবল আস্থার স্রোত অন্তঃসলিলভাবে কিন্তু অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত দেখিতে পাই। এক সময়ে ভারতে অশোক প্রভৃতি রাজাগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যদি আমাদের রাজার জাতি সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইয়া উঠে, তাহা হইলে

এদেশেও যে সত্যধর্ম্মের একটা প্রবল বন্যা আসিয়া এদেশকে ভাসাইয়া দিবে না, তাহা তো বিশ্বাস হয় না। এদেশ যে সেই অতি পুরাকাল হইতেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। ভারতের পুণ্য কথাসকল দেশ হইতে দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া, সমুন্নত জাতিগণের স্বীকৃত হইয়া আবার এদেশে ফিরিয়া আসিতেছে, আবার এদেশবাসীদিগের অন্ধ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় ভাস্বর জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত জগত জানিত যে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের নামে যোগের নামে ধর্ম্মাভাসের একটা মোহমদিরায় ডুবিয়া আছে। কেহই আশা করিতে সাহস করে নাই যে ভারতবাসী বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে। নবযুগে প্রকৃতি ভারতবর্ষকে এক আশ্চর্য্য উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে বলিয়াই ভারতবাসীকে সকল বিষয়ে সত্যসমূহ সঞ্চয় করিবার অবসর দিতেছে। সম্মুখের উন্নতিশিখরে উঠিতে হইবে জানিয়া আমাদিগকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে। বৃথা কোলাহল বৃথা মানমর্য্যাদার আশা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অন্বেষণে ধর্ম্মের অন্বেষণে, জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পরিশ্রম করিতে থাক, নিজেও প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারিবে এবং দেশকে ও সমগ্র জগতকে শান্তিপ্রদানে সমর্থ হইবে।

গতবর্ষে একটী মহান কার্য্য সাধিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে—শাসন বিষয়ে স্ত্রীলোকের মতামত গ্রহণ। যখন ইংলণ্ডে কয়েকটী স্ত্রীলোক আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভোটের দ্বারা পার্লামেণ্টে নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শাসনবিষয়ে নিজেদের মতামত জানাইবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে পাগল প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের অধ্যবসায় অদম্য—তাঁহারা সেই অধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা হইতে কিছুতেই বিরত হয়েন নাই। কেবল যুদ্ধের কারণে তাহা স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই যুদ্ধের ফলেই গবর্ণমেণ্ট হইতেই স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দিবার অধিকার দানের কথা উপস্থিত করা হইয়াছে এবং উপস্থিত করিবার সময়ে জানানো হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই এই অধিকার দিবার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া হইলে জগতে মঙ্গলপ্রসূ নবযুগের যে সূচনা হইবে সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদিকে ইংলণ্ড, অপরদিকে রষিয়া, ইউরোপের দুইপ্রান্ত হইতে এই শুভ প্রস্তাব দেখা দিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে এবারে এই অধিকার হইতে স্ত্রীলোকদিগকে আর কিছুতেই বঞ্চিত করা যাইবে না।

রষিয়ার কথা বলিলেই আজকাল রুষসম্রাটের পদত্যাগের কথাই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আলোচনা করিলে এক্ষেত্রেও ধর্ম্মের ইঙ্গিত দেখা যাইবে। একদিকে সমগ্র দেশ সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে রুষসম্রাট ও তাঁহার পরিবার প্রাচীন কুসংস্কারের মধ্যে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিকে রুষিয়ার জনসঙ্ঘ জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নতির অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে সম্রাটপরিবার অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়িয়া বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বনে যুবরাজের চিকিৎসা করাইতে গিয়া এক দুর্নীতিপরায়ণ পাদরি র‍্যাসপুটিনের কবলে গিয়া পড়িলেন। সম্রাটতনয় অসুস্থ,—র‍্যাসপুটিন সম্রাট পরিবারকে বুঝাইলেন যে তাঁহার নিজের জীর্ণ ও মলিন কন্থা দ্বারা সম্রাটতনয়কে একবার আচ্ছাদন করিলেই তাঁহার সকল রোগ দূর হইবে। এদিকে র‍্যাসপুটিন জর্ম্মনির জয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্রাটের সকল কার্য্য পরিচালনের উপদেশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হইতে লাগিল, কোটী কোটী অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, অথচ রষিয়া পদে পদে পরাজয় সহ্য করিতে লাগিল। কাজেই তখন বর্ত্তমান যুগের যুগধর্ম্ম জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই ধর্ম্মবিরহিত র‍্যাসপুটিন নিহত হইলেন, রষিয়ার সম্রাট পদত্যাগপূর্ব্বক প্রজাগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং রষিয়াতে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সাধারণতন্ত্রের যে আকার দিবার কথা হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকেও পুরুষের সহিত ভোট দিবার সমান অধিকার দেওয়া হইতেছে।

গতবর্ষে এই ভারতে একটী যুগধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্বেত ও কৃষ্ণ চর্ম্মের মধ্যে ভেদজ্ঞানটী বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। অনেক লোকক্ষয়ের ফলে এই ভেদজ্ঞান দূর হইবার মাত্র উপক্রম হইয়াছে। এখনও যদি পাশ্চাত্য জগত উদ্ধত গর্ব্বের মধ্যে বাস করিয়া যুগধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করে এবং শ্বেতকৃষ্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞান বিদূরিত করিয়া না দেয়, তবে তাহাকে আরও কত ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে ?

আমাদের দেশে যদি নবযুগকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মঙ্গলপ্রসূ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে যুগধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে প্রত্যেক অনুষ্ঠানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আমরা যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি কি না। একটী যুগধর্ম্ম দেখিতেছি—সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থা। আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে দেখিতে হইবে যে আমরা ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতেছি, অথবা অর্থ মানমর্য্যাদাকেই আমাদের কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া তুলিতেছি। আমাদের দেশে সত্যধর্ম্মের প্রতি আস্থার একটা বাতাস উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আমাদের দেশ সত্যধর্ম্মকে, যে ধর্ম্মের বলে মানবাত্মা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সিংহাসনতলে ছুটিয়া যাইতে পারে, সেই সত্যধর্ম্মকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এক সময়ে ইহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু আশঙ্কা হয়, পাছে ভবিষ্যতে দেশকে পুনরায় বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের মহাসংগ্রামের ভিতর দিয়া গিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে পাইতে হয়।

আমরা যে প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন করি নাই তাহার একটী প্রধান পরিচয় হইতেছে এই যে এখনও আমরা পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আমরা শ্বেতকৃষ্ণের প্রভেদ উঠাইয়া দিবার জন্যই কেবল চীৎকার করিলে হইবে কি, আমাদের নিজেদেরও মধ্যে উচ্চনীচভেদ উঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা মনে করি যে উচ্চনীচের ভেদ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিব। কিন্তু ভগবানের তেজঃকণা লইয়া যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে মানুষ কখনও চিরকাল সেই ভেদমূলক অবজ্ঞা নীরবে সহ্য করিতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে সেই অবজ্ঞা সমগ্র সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। একটী প্রবাদ আছে যে মেষকে কোন পশু আক্রমণ করিতে গেলে মেষ চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে করে যে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সেইরূপ আমরা যদি চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের বিপদ দেখিতে পাইব কি প্রকারে ? কিন্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে উন্মুক্ত নয়নে পরিভ্রমণ করিয়া আইস, দেখিবে যে সমাজ কিরূপ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতেছে। তোমরা সমাজের উচ্চাসনে বসিয়া নিম্নশ্রেণীর স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণে অসম্মত। তোমাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই নিম্নশ্রেণীরদিগেরও মধ্যে, এমন সকল সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে ও হইতেছে, যাহারা উচ্চবর্ণের স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ অধর্ম্ম মনে করিতে শিক্ষিত হইতেছে।

আমাদের মধ্যে বর্ণভেদ ছাড়িয়া দিলেও, আমরা কি এখনও পরস্পরকে স্নেহপ্রীতি করিতে শিক্ষা করিয়াছি ? এই সেদিন দেখি যে একটী সংবাদপত্র অপর এক সংবাদপত্রকে "আস্তাকুঁড়ের কুকুর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এরূপ তীব্র গালি দিবার কোনই কারণ ছিল বলিয়া দেখিতে পাইলাম না। পরস্পরে মিলিতভাবে কোথায় দেশের হিতসাধনে অগ্রসর হইব—না, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা পরস্পরে বৃথা কলহ করিয়া মরিব ? এই সেদিন দেখি যে পথের ধারে ফেরীওয়ালারা একটী সংবাদপত্র বিক্রয়ের ধুয়া ধরিয়াছে যে তাহাতে গালাগালি আছে। তোমরা সহস্র উপায়ে স্বদেশী প্রচার কর, কোনই ফল হইবে না, যদি এই সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে গালাগালি দিবার বিষময় বিদেশী প্রথা বর্জ্জন করিতে না পার। তোমরা বলিবে যে পেটের দায়ে এরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছ। যে পেটের দায় সমগ্র দেশের অহিত উৎপাদন করিয়া নিজের স্বার্থসাধনের চেষ্টা করে সে পেটের দায়কে ধিক।

এই নববর্ষের উন্মেষে আমরা আর একটী বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। যেমন পেটের দায়ে গালাগালির খরতর স্রোত নামিয়াছে, সেইরূপ আর্টের নামে অশ্লীলতার স্রোত দেশকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। যে আর্ট অশ্লীলতাকে

উলঙ্গ আকারে ব্যক্ত করিয়া নিজেকে আর্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চাহে সে আর্টকে ধিক। তোমরা স্বদেশহিতৈষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে চাও, অথচ এই উলঙ্গ অশ্লীলতার সমর্থনে দেশকে কিরূপ ভীষণ পাপের স্রোতে ডুবাইবার চেষ্টায় আছ, সেটা তোমাদের একবার মনে আসিল না? ইতিহাসে উলঙ্গ অশ্লীলতা প্রচারের ফলে দেশবিদেশের ছারখার হইবার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও আজ তুমি কেমন করিয়া আর্টের দোহাই দিয়া উহার প্রশ্রয় দিতেছ? উলঙ্গ অশ্লীলতাই যদি আর্ট হয়, তবে তোমরা কাম ক্রোধ প্রভৃতি বিষয়ে মানবের পাশবিক আচরণে চমকাইয়া উঠ কেন? কামের উত্তেজনায় পশুধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া মানুষ ব্যভিচারে রত হইলে ব্যভিচারীর প্রতি তোমাদের ঘৃণাদৃষ্টি ও রুদ্রদণ্ড উত্তোলিত হয় কেন?

প্রকৃতিকে বিকৃতির চক্ষে এবং বিকৃতিকে প্রকৃতির চক্ষে দেখিলেই তো ধ্বংস নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা দেশকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের নববর্ষকে সাধুভাবের অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, স্নেহ প্রেম ও ভগবৎপ্রীতির সুশোভন সজ্জায় সজ্জিত করিয়া স্বাগত সম্ভাষণে আহ্বান করিয়া লইতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে নববর্ষে অন্যায় অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিব না, এবং ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিরত থাকিব। আমরা আর কিছু চাহি না—একটী বৎসর এই প্রণালীতে কার্য্য করিয়া তোমরা দেখ যে কি ফল হয়। মিষ্ট যে একেবারেই আস্বাদ করে নাই তাহাকে মিষ্ট আস্বাদ কিরূপ বুঝানো যেরূপ কঠিন, সৎপথে না চলিলে সৎপথে চলার ফলও বুঝানো সেইরূপ কঠিন।

নববর্ষে ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ব্রহ্মসাধনা।

ভগবৎ-সাধনা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবানের জন্য জীবমাত্রেই ব্যাকুল। জীব স্বভাবত ভগবানকেই চাহে। সেই ভগবানকে পাইবার জন্য সকলেই সজ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক চেষ্টা করিতেছে। যিনি তাঁহার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন তিনি সেই পথে অগ্রসর হইয়া ভগবানকে লাভ করিতেছেন, আর যিনি বিপথে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি পথভ্রান্ত হইয়া দিশাহারা হইতেছেন, বিপদসঙ্কুল স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন, কণ্টকাদিপূর্ণ গভীর গর্ত্তে নিপতিত হইতেছেন।

জীব সর্ব্বদা কি খুঁজে? তাহার প্রাণের বস্তু খুঁজে—যে বস্তুটাকে পাইয়া সে চির আনন্দ লাভ করিবে তাহাকেই খুঁজে। বর্ত্তমান অবস্থায় সে সুখী নহে। সে আপনাকে অসম্পূর্ণ মনে করিতেছে—কি যেন একটা অভাব মনে করিতেছে। কি যেন একটা হারাইয়া ফেলিয়াছে—সেই হারাণ জিনিষটার জন্য তাহার মন সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত—সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিতেছে, ফাঁকা ফাঁকা বোধ করিতেছে। সেই জিনিষটীকে পাইলেই সে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে এই মনে করিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে খুঁজিতেছে। ছাই পাঁশ যাহা সম্মুখে পড়িতেছে তাহাই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছে তাহার মধ্যে সেই জিনিষটী আছে কি না।

সাধারণ ভাষায় সেই জিনিষটীর নাম সুখ বা আনন্দ। কিন্তু এই সুখ বা আনন্দ কি পদার্থ? কোন বস্তু পাইলে আমরা সুখী হই—কেন হই? ঐ উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমটী দেখিয়া আমরা তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই, তাহার পানে ধাবিত হই, তাহাকে নিকটস্থ করিবার ইচ্ছা করি। কেন করি? কুসুমে কি শক্তি আছে যে সে আমার মনকে চুম্বকশলাকা যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ আকর্ষণ করে? কুসুম সুন্দর ও সুগন্ধ একথা বলিলেও ঐ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হয় না। সুন্দর ও সুগন্ধ বস্তু কেন আমার মনকে আকর্ষণ করে? জগতে নানা প্রকারের আকর্ষণ আছে। আকর্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইলেও তাহারা মূলত এক। আসলে পৃথক নহে। সেই আকর্ষণের বলে সরূপ বস্তু সকল পরস্পরে মিলিয়া একীভূত হইতে চায়। আপাত প্রতীয়মান জগতে পরস্পর-ভিন্নতা অভিব্যক্ত হইলেও এই ভিন্নতার ভিতরে যে একটা বিরাট একতা

আছে তাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের কারণ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াই তাঁহা হইতে ঐ একতার ভাব নামিয়াছে। ব্রহ্মেরই শক্তির অভিব্যক্তি বা বিকাশে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মরূপ অনন্তপ্রেমজলধির অনন্ত তরঙ্গমালা। তরঙ্গগুলি পরস্পর ভিন্ন বোধ হইলেও তাহারা মূলে সেই অনন্তপ্রেমজলধি হইতে ভিন্ন নহে। তরঙ্গগুলি পরস্পর মিলিত হইতে চাহে—এইটী তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম, কারণ তাহাদের মধ্যে একই প্রেম, এক শক্তিই কার্য্য করিতেছে। তাই তুমি আমার সঙ্গে মিলিতে চাও আর আমি তোমার সঙ্গে মিলিতে চাই এবং মিলিয়া সুখী হই। তাই ঐ উদ্যানস্থ বিকশিত কুসুম, গগনতলে পূর্ণ শশধর, গিরি নদী বন প্রান্তরের কমনীয় কান্তি, শিশুর হাসি আমাদের প্রাণ রজ্জুকে আকর্ষণ করে। আমরা পরস্পর এক জাতীয় বস্তু। আমরা সেই অনন্তপ্রেম মহানিধির এক এক বিন্দু বারি বা এক একটী তরঙ্গ। আমরা পরস্পর মিলিতে চাই, আমরা সকলে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চাই, আমরা একা একা থাকিতে ভাল বাসি না। আমাদের পৃথক থাকার অবস্থাটা আমাদের সুখের অবস্থা নহে। উহা একটা অভাবের অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। আমরা সম্পূর্ণ হইতে চাই, এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে মিলিত হইতে চাই। তাহা হইতে পারিলে আর কোন অভাব থাকিবে না, কোন স্পৃহা থাকিবে না—তখন অনন্ত আনন্দ অনন্ত সুখ!

আমরা সকলে সেই অনন্ত আনন্দই খুঁজিতেছি এবং যতক্ষণ তাহা না পাইতেছি ততক্ষণ আমাদের অভাব মোচন হইতেছে না। সেই অনন্ত আনন্দের অংশ তোমাতে আছে, আমাতে আছে, চন্দ্রে আছে, সূর্য্যে আছে, অনন্ত জগতে বিন্দু বিন্দু ভাবে ছড়ান আছে। সেই ভূমা আনন্দের অংশ পাইয়া আমাদের অভাব দূর হয় না, পক্ষান্তরে উত্তরোত্তর আনন্দতৃষ্ণা বৃদ্ধিই হইতে থাকে। যতক্ষণ না সেই পূর্ণ আনন্দকে পাইব ততক্ষণ এই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। এই অনন্ত আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টাই ব্রহ্মসাধনা। আমরা সকলে সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানে হউক যদিও সেই পথে ধাবিত, কিন্তু অনেক সময় প্রকৃত পথ খুঁজিয়া না পাইয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। আমরা সকলে সুখ খুঁজিতেছি—ইহা ভগবৎসাধনার ইচ্ছা সন্দেহ নাই, কারণ যাহা খুঁজিতেছি তাহা সেই নিত্য আনন্দেরই আভাস। কিন্তু আভাসে ত অভাব মোচন হইবে না। আমরা চাই অসীম আনন্দ অসীম ও অনন্তকাল স্থায়ী আনন্দ। সসীম আনন্দ প্রকৃত আনন্দ নহে। ফুল ত কাল শুকাইয়া যাইবে। বসন্তকাল চলিয়া গেলে ত মলয় হিল্লোল আর বহিবে না, পুত্র কলত্রের ভালবাসা ত চিরকাল পাইবার আশা নাই। যে প্রেমের আদি নাই অন্ত নাই—সেই প্রেম যতক্ষণে না পাইব ততক্ষণ ত মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, খোঁজা শেষ হইবে না। সেই অমৃত সলিল যতক্ষণ না পান করিব ততক্ষণ কি পিপাসা মিটিবে? মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের কি সর্ব্বনাশ হয় না?

ব্রহ্মসাধনা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমরা সকলে সুখ অন্বেষণ করিতেছি এবং অনন্ত সুখে সুখী হইতেও চাহিতেছি। কিন্তু অনন্ত সুখ কিসে পাওয়া যায় সে বিষয়ে মনোযোগ দিইনা। যে অনন্তপ্রেমমহানিধি হইতে আমরা বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, যতক্ষণ না সেই অনন্ত সাগরে আবার মিলিয়া যাইতে পারিব ততক্ষণ অনন্ত সুখ কোথায়? তুমি সেই সমুদ্রের একবিন্দু বারি হইয়াও আপনাকে তাহার অংশ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছ না। আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতেছ। সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকুর উপর সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নির্ভয়ে বাস করিতে চাহিতেছ, একবারও ভাবিতেছ না যে সে দুর্গ যে ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইবে সে ভূমি একমুহূর্ত্তে প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারে। যতক্ষণ তুমি আপনাকে সেই মহাপ্রেম হইতে পৃথক রাখিবে ততক্ষণ তুমি সেই প্রেমপয়োনিধির অমৃত পানে সমর্থ হইবে না। আপনাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, ঐ প্রেমপয়োনিধিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে, উহারই সঙ্গে এক হইয়া আনন্দে ভাসিয়া যাইতে হইবে। তবেই সুখ তবেই শান্তি।

তোমার আপনার বলিবার তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। তুমি যেগুলিকে আপন বলিয়া মনে করিতেছ সেগুলি তোমার আপন নহে। সেগুলি তাঁহার। তুমি সেগুলির জিম্মাদার মাত্র। সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করাই তোমার কার্য্য, কিন্তু সেগুলিকে তোমার আপনার বলিবার অধিকার নাই। যে দিন হইতে তুমি অহংজ্ঞানে ভুলিবে সে দিন হইতে তোমার দুঃখনিশা আরম্ভ হইবে। তুমি সেই অনন্ত হইতে পৃথক হইয়া অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িবে; শত শত অভাব দেখিতে পাইবে, নানাপ্রকারের শোক তাপ দুঃখ আসিয়া তোমাকে জর্জ্জরিত করিবে; তুমি আজীবন সেই দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু খাইবে। যতক্ষণ না খেলিতে বস ততক্ষণ তোমার চিন্তা ভাবনা দুঃখ আক্ষেপ কিছুই থাকে না; যেই খেলিতে বস অমনি কতকগুলি ঘুঁটিকে তুমি তোমার আপন বলিয়া মনে কর, তাহাদের রক্ষার জন্য নানাপ্রকার চিন্তায় পতিত হও, তাহাদিগকে হারাইয়া ঘোর দুঃখ ও আক্ষেপ করিতে থাক। ভাবিয়া দেখিলে ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন কিছুকেই আপন বলাই ভুল।

তোমার যিনি আপন তিনি সর্ব্বদাই ডাকিতেছেন। তিনি তোমায় প্রেমরজ্জু দ্বারা নিয়তই আকর্ষণ করিতেছেন। সেই প্রেমই তোমার একমাত্র সাধ্য—তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হও অন্য দিকে তাকাইও না, অন্য ভাবনা ভাবিও না। তাঁহাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও আপন মনে করিও না। যে কার্য্যে নিযুক্ত আছ সে কার্য্য নির্লিপ্তভাবে করিতে থাক, আর অনুক্ষণ সেই প্রেমের বাঁশীর মধুরধ্বনি শ্রবণ কর, তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন কর, অনন্ত সুখ অনন্ত আনন্দ পাইবে। ইহাই ব্রহ্মসাধনা।

রামপ্রসাদের মাতৃসাধন।*

(শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

ভক্তজীবনী ঈশ্বরবিশ্বাসী বিশেষতঃ ভক্তের নিকট অতি আদরের জিনিষ, ভবরোগগ্রস্ত বদ্ধজীবের পক্ষে অতি উপকারী পথ্য। কিন্তু সংসারে যে দ্রব্য যত উপকারী ও উপাদেয়, তাহা তত দুর্ল্লভ। প্রকৃত ভক্তের প্রকৃত জীবনী সংগ্রহের নানা অন্তরায়। ত্যাগ ও অনুরাগের পথে না চলিলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এই মার্গের পথিক সাংসারিক সকল বিষয়েই নিজের জন্য আস্থাশূন্য; সকল ব্যাপারই তাঁহারা অনুরাগের পাত্রের জন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পার্থিব ধন সম্পত্তির কথা দূরে থাকুক, যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি মানবের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার বস্তুর প্রতিও তাঁহারা দৃক্ পাত করেন না; কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি অনিবার্য্য কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে সংসারে সম্পাদন করিয়া প্রায় সর্ব্বদা তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতেই বাস করেন। ভক্তের জীবনকাহিনী তাঁহার হৃদয়ের রহস্যময় গুহ্য কথায় পরিপূর্ণ; তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষীভূত আধ্যাত্মিক সত্যে আলোকিত, তাঁহার নিত্যাস্বাদিত আনন্দে মধুর। ভক্ত স্বয়ং নিয়ত যাহা সম্ভোগ করেন, যাহার তাহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নাই, অন্যকে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজনও তিনি মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মজীবনী লিখেন; তাঁহারা সকলেই আপন আপন কার্য্যের একটা রোজনামচা রাখেন। মানবসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সীমাবদ্ধ, সুতরাং অনেক বিষয়েই তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন ও হেতু প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে যে আনন্দলহরী নিয়ত খেলা করিতেছে, তাহার হিসাব রাখিবার তাঁহার অবসরই বা কোথায়, আর প্রয়োজনই বা কি?

বসোয়েল যেমন জনসনের ভক্ত ছিলেন, অথবা শ্রীম—যেমন পরম হংস রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত, সেইরূপ অনুরক্ত ভক্ত কেহ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যদি সাধকজীবনের ছবি অঙ্কিত করিবার চেষ্টা

---

* এই প্রবন্ধটী "নচিকেতা" প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ "রামপ্রসাদ" ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইয়াছিল। আমরা তাহার দু একস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। লেখক কুলকুণ্ডলিনীকে দেহধর্ম্ম কি অর্থে বলিয়াছেন আমরা ঠিক বুঝিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে উঁহাকে আত্মশক্তি বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। ভঃ বোঃ সঃ।

করেন, তাহা হইলে তাহা সমাজের নিকট কতকটা অধিগম্য হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ অনুরক্ত ভক্ত অতি বিরল। এ অবস্থায় ভক্তজীবনী যে দুর্লভ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই জন্যই ভক্তজীবন এত আদরের জিনিস, এবং এই জন্যই যাঁহারা ভক্তের জীবনী সংগ্রহ করেন, তাঁহারা আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া রামপ্রসাদের খ্যাতি বিশ্রুত; যে সকল স্থানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত সেই সমস্ত স্থানেই রামপ্রসাদের সঙ্গীত গীত ও শ্রুত। যে বাঙ্গালী সঙ্গীতরসে নিতান্ত বঞ্চিত, সেও রামপ্রসাদের সঙ্গীত একটুকু দাঁড়াইয়া শুনে; যাহার কণ্ঠে সঙ্গীতের ধ্বনি কখনও ফোটে না, সেও রামপ্রসাদের অন্ততঃ দুই একটি পদ, দুই একটি ছত্র জানে। যিনি স্বজাতীয় আবালবৃদ্ধস্ত্রীপুরুষ সকলের নিকটেই এত পরিচিত, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু এমন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যে আমাদের প্রকৃত পরিচয় নাই, এমন লোকপ্রিয় কবির যে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত নাই, ইহা আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

রামপ্রসাদ একজন ভক্ত গায়ক ছিলেন, এবং নিজে সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন, এই মাত্রই আমরা জানি; সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের যে পরিচয়টুকু পাওয়া যাইতে পারে, কেবল তাহাই আমরা পাই। তিনি কোন্ স্থানে, কোন্ গ্রামে, কোন্ বংশে, কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এতদিন আমরা কিছুই জানিতাম না। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, কাজ কর্ম্ম, অভ্যাস অভিজ্ঞতা, আচার ব্যবহার, সাধন ভজন, পরিবার প্রতিবেশী কিরূপ ছিল, এবং কোন অবস্থায় পড়িলে তিনি কোন্ পথে চলিতেন, এ সমস্ত বিষয় জানিবার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এ সমস্তই আমাদের চক্ষে তমসাবৃত ছিল। তরুকুঞ্জ হইতে প্রবাহিত মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা যেমন কোকিলের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাহার অধিক কিছু ছিল না।

রামপ্রসাদ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন এ দেশে জীবনচরিতের আদর হয় নাই। তাহার পূর্ব্ব হইতেই কড়চা এবং ভক্তজীবন বঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহা একদেশব্যাপী এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংশ্রবে আসিয়া বাঙ্গালী জীবনচরিতের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থ এখন বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছে। মধুসূদনচরিত, বিদ্যাসাগরকাহিনী, রামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই সকল আধুনিক জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা যত সহজ, রামপ্রসাদের বিস্মৃত জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করা তত সহজ নহে। যুগযুগান্তরসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি এবং ঝোড় জঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্র আবিষ্কার করিতে যতটা কষ্ট হয়, তাঁহার জীবনের একটা ধারাবাহিক কাহিনী গ্রথিত করিতে গ্রন্থকারকে তাহার অনেক বেশী বেগ পাইতে হয়। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ভক্তিসিদ্ধ রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী লোকলোচনের বিষয়ীভূত করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

রামপ্রসাদ শাক্ত ছিলেন—মহাশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্ত ভক্তের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতার অনন্ত মূর্ত্তি রহিয়াছে, তন্মধ্যে কালীই রামপ্রসাদের আরাধ্য ছিলেন। একটা সংস্কৃত বচন প্রচলিত আছে, "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী"। এই বচনটির মূল কোথায় জানি না, কিন্তু ইহা অনেকের মুখেই শুনিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন "পন্নগী" বলিতে মনসাকে বুঝায়, কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী ইহার বাচ্য কিনা তাহাও বিবেচ্য। যাহার জন্য সাধন করা যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করাই সিদ্ধি। সাধকেরা বলেন, কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টসিদ্ধ হয় না, ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিতে হইলে শরীরস্থ কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ চাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে সিদ্ধিলাভে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ অপরিহার্য্য। কুলকুণ্ডলিনী না জাগিলে ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ করা গেল না;

আবার কুলকুণ্ডলিনী জাগিলেন, তিনি দূর হইতে ইষ্টদেবতাকে দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি নিদ্রিত অর্থাৎ শ্রুতিগত, শাস্ত্রগত, চিত্রগত অথবা বিশ্বাসগত অবস্থায় বর্ত্তমান, নিষ্ক্রিয়, সুতরাং এ অবস্থায় সিদ্ধি সুদূরপরাহত।

কুলকুণ্ডলিনী সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু এই আশ্চর্য্য বস্তুটি কি? তাঁহার জাগরণই বা কি? আপনার নাভিস্থ মৃগমদগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কস্তুরীমৃগ বনে বনে তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু সে জিনিষটা তাহার নিকট চিরদিন অজ্ঞাত এবং অপরিচিতই থাকিয়া যায়। কুলকুণ্ডলিনী দেহধর্ম্ম, দেহেতেই তাঁহার স্থিতি এবং দেহের অন্তে তাঁহারও অন্তর্ধান। এই কুলকুণ্ডলিনীকে বুঝিবার জন্য, জাগাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধকদিগের কত চেষ্টা! কিন্তু এই চেষ্টায় কতজন কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন বলা যায় না। কুলকুণ্ডলিনীকে বুঝাইবার জন্য তন্ত্রাদি শাস্ত্রের অনেকস্থলে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, এবং তাঁহাকে জাগাইবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে অনেক মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ এবং কল-কৌশলেরও উল্লেখ দেখা যায়। যোগীদিগের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইলে তাঁহারাও দয়া হইলে উপদেশ দেন, সাধনের ক্রম বলিয়া থাকেন। কিন্তু "আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়াছে" অথবা "আমি কুণ্ডলিনী প্রত্যক্ষ করিয়াছি," একথা অদ্যাপি কাহারও মুখে শুনি নাই। বৈষ্ণবেরা বলেন, "আপন ভজন কথা না বলিবে যথা তথা।" তন্ত্রশাস্ত্রের প্রায় পদে পদেই বলা হইয়াছে, "ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।" বোধ হয় এই কুণ্ডলিনী ব্যাপারেও এইরূপ লুকোচুরি কিছু থাকিবে। যাঁহারা লোকসমাজে অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, তাঁহারাও নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। সিদ্ধ পুরুষদিগের অন্তঃকরণ অগাধ সমুদ্র; তাঁহাদের অন্তর-রাজ্যে কি আছে কি নাই কে বলিতে পারে? তাঁহারা অবশ্য পরস্পর পরস্পরকে জানেন, কিন্তু অসিদ্ধ লোকের কাছে সে রাজ্য ঘোর অন্ধকারে আবৃত।

কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে সাধন না করিলেও তিনি জাগিতে পারেন। ইহাতে চিত্তের একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতার নিতান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধ মহাপুরুষের সাহায্যেও ইহা হইতে পারে, কিন্তু পাত্রের যোগ্যতা চাই। কুণ্ডলিনী জাগিলেই যে সিদ্ধি বা মুক্তি হইবে, এমন নহে। কুণ্ডলিনী শক্তি একবার জাগিলেই যে আমরণ জাগিয়াই থাকিবেন, এমন নহেন। তিনি কিছুদিন দেখা দিয়া আবার লুকাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কিভাবে দেখা দেন আর কি ভাবে লুকান, তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন কি পরিমাণ দৈব এবং কতটা পুরুষকারের উপর নির্ভর করে, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং তাঁহার জাগরণ হইতে প্রবাহিত আনন্দ কীদৃশ, এ সকল বিষয় শাস্ত্রের বর্ণনা বা অন্যের উপদেশে উপলব্ধ হইতে পারে না। সৌভাগ্যবলে যাহার রসনায় শর্করা-সংযোগ হয়, সে-ই কেবল চিনি কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারে। শাস্ত্রীয় বা মৌখিক বর্ণনা যে একেবারে বিফল তাহা বলিতেছি না। বর্ণিত বিষয়ের আলোচনায় তাহার জন্য কৌতূহল এবং তাহার দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিতে পারে, কিন্তু কেবল এইটুকুই বর্ণনার ফল, ইহার অধিক নহে। যিনি সাধক, তাঁহার জাগরণ বর্ণনার অপেক্ষা করে না; আর যিনি সাধনে বিমুখ তাঁহার জীবনে কুণ্ডলিনীর বর্ণনা সিদ্ধি উৎপাদন করিতে পারে না।

বর্ণনার গুণে প্রকৃত বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু তথাপি সকল কার্য্যেরই আরম্ভে চিত্রগত বা বাক্যগত একটা বর্ণনার প্রয়োজন। ইহার সাহায্যে হৃদয়ে যে একটা অস্পষ্ট অনুভূতি উপলব্ধি হয়, তাহাই প্রকৃত বিষয়ের ছায়া, এবং সেই ছায়ার অনুসরণ করিলে সেই ছায়াই একদিন প্রকৃত তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। আলোকচিত্র আর কিছুই নহে, আলোকের সাহায্যে অঙ্কিত ব্যক্তিবিশেষের ছায়া মাত্র; কিন্তু সেই আলোকচিত্র দেখিয়া প্রকৃত ব্যক্তিকে যে বাছিয়া লইতে পারা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ ব্যাপার। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচফলকে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত হয়, গ্রহ নক্ষত্রেরা সশরীরে আসিয়া কাচফলকে আবির্ভূত হয় না; কিন্তু সেই মাত্র অবলম্বন করিয়াই জ্যোতিষিগণ প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন। বহির্জগতে যেমন, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। এই কুলকুণ্ডলিনী ব্যাপার যোগগ্রন্থে যোগিগণ কর্ত্তৃক বহুতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বহু সাধক

আবার সেই বর্ণিত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আপন আপন শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া থাকেন। যাঁহারা এই বর্ণিত ও চিত্রিত বিষয় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষদর্শী যোগীদিগের উপদেশমতে সাধনপথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের এই কুণ্ডলিনাচক্র যথাকালে প্রত্যক্ষ না করিবার কোন কথা নাই। তবে বিশ্বাস ও সাধন চাই, এই দুইটার অভাবে অন্তর্জ্জগতে ক্রিয়া ও সিদ্ধি উভয়ই অসম্ভব।

সাধন ও সাধকের উল্লেখ সর্ব্বদাই শুনি, কিন্তু বিষয়টা প্রত্যক্ষ অতি অল্পই হয়। বহিঃসাধন প্রণালীর অবধি নাই, জনে জনে স্বতন্ত্র বলিলেও চলে। কেহবা জটামালা গৈরিক লইয়াই ব্যস্ত, কেহ বা পুষ্পচন্দন বিল্বপত্র লইয়াই উন্মত্ত, কেহ বা ব্রতোপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনেই রত, কেহ বা মন্ত্র তন্ত্র জপপাঠ লইয়াই বিব্রত। সকল সাধকই যে এক ছাঁচে গঠিত হইবেন এবং এক তানে এক মানে এক প্রাণে এক পথেই চলিবেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সাধকের ভিতর দেখিবার মত অন্তর্দৃষ্টি যখন জন্মে নাই, তখন কে সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়াছেন, আর কে নিরর্থক দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কিন্তু সাধন ও সাধকের সঙ্গে পরিচিত না হইলেও একটা আভ্যন্তরীণ সূত্র ধরিয়া বিষয়টা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধনের তিনটি স্তর কল্পনা করিয়া বিষয়টা ধারণার মধ্যে আনিতে পারা যায়। প্রথম স্তরে তত্ত্বান্বেষণ। সাধন কি, সাধ্য কে, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ কি, সাধনের প্রয়োজন কি, ইত্যাদি প্রশ্ন প্রথমাবস্থায় জিজ্ঞাসুর চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে। যখন এই সকল প্রশ্নের সমাধান হয়, তখন সাধক বলিতে পারেন, সাধ্যবস্তু "ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই অবস্থায় সাধ্য প্রথম পুরুষ, অবধারিত বস্তু।

দ্বিতীয় অবস্থায় সাধ্যের সঙ্গে সাধকের সম্বন্ধ স্থাপন এবং আত্মীয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা। এই অবস্থার সাধন মন্ত্র "তৎ-ত্বমসি"—যিনি প্রথম পুরুষরূপে অবধারিত হইয়াছিলেন, তিনি এখন মধ্যমপুরুষরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। সাধনের চরম পরিণতি, অর্থাৎ প্রকৃত সিদ্ধির অবস্থায় ক্রমে এই ব্যবধানটুকুও দূর হইয়া যায়, সাধক তখন "সোঽহং" মন্ত্রের প্রকৃত প্রতিপাদ্য প্রেমে একাত্মভাব আপনাতে জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন।

"তৎসৎ" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস হইলেই সাধনের আরম্ভ হয়, আর একাত্ম জ্ঞান জন্মিলেই তাহার নিবৃত্তি হয়। সাধ্য যে কাল পর্য্যন্ত প্রথম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষরূপে অবস্থান করেন, ততদিনই উপাসনা; যে মুহূর্ত্তে তিনি উত্তম পুরুষরূপে উপলব্ধ হন, যে মুহূর্ত্তে তিনি তুমি এবং আমি প্রেমসূত্রে এক হইয়া যায়; তিনি, তুমি এবং আমি এই তিনের প্রভেদজ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্ত্তেই সাধন বা উপাসনার সমস্ত প্রয়োজনের পর্য্যবসান হয়। তখন সাধক পরম হংস, সাধনভজন জ্ঞান বিজ্ঞান ব্রতনিয়মের অতীত পুরুষ। সাধনের জন্য যে সময়টি অবধারিত হইল, সাধকজীবনের সেই অংশটুকুই জানিবার জন্য আমরা লালায়িত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসের পূর্ব্বে মানুষ কি করে বা না করে, কোন্ পথে চলে বা না চলে, তাহার সংবাদ না রাখিলেও চলে। আবার পরমহংসত্ব লাভ করিয়া সাধক কি অবস্থায় থাকেন, তাহা যখন আমাদের মত সাধারণ মানবের পক্ষে অনুভবের অতীত তখন পরমহংসজীবনের আলোচনাতেও আমাদের বিশেষ লাভ নাই—যাহা উপলব্ধির বিষয় নহে, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বালক খেলাধুলার গল্প আগ্রহের সহিত শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে, কিন্তু ষড়দর্শনের বিচার বিতর্ক তাহার উপকার করিতে পারে না, বরং তাহার বিরক্তি জন্মাইতে পারে।

সাধনের প্রণালী কতপ্রকার, তাহার অবধারণ অসম্ভব। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মমত জগতে প্রচলিত আছে। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মমতের অনুশাসনে যাঁহারা চলে, তাঁহারা সকলেই যে এক প্রণালীতে উপাসনা করেন এমত নহে। এক এক ধর্ম্মে কত শাখা, প্রশাখা, সম্প্রদায় আছে, তাহার অবধি নাই। এক গুরুর বহু শিষ্য এক মন্ত্র এবং একই উপদেশ পায়, কিন্তু সাধনের পথে চলিতে চলিতে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের সাধনপ্রণালীতে বিভিন্নতা জন্মিয়া যায়। এমন কি, এক সাধক যে চিরদিন এক প্রণালীতেই চলেন তাহাও নহে; সাধনপথে যিনি যতটা অগ্রসর হন, তাঁহার

উন্নতির মাত্রানুসারে প্রণালীর পৌর্ব্বাপর্য্যে ততটা বিভিন্নতা আসিয়া পড়ে। অন্য ধর্ম্মের কিছু বুঝিনা; হিন্দুধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝি, তাহা লইয়াই সাধন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

মানব অসংখ্য, জগদম্বার মূর্ত্তি বা ভাবও অনন্ত। সাধকের শক্তি, বুদ্ধি, প্রকৃতি প্রভৃতি লইয়াই উপাসনা। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত ভাব অগ্রে উপলব্ধি করিব, তাহার পরে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইব, এ কথা যে ভাবে তাহার উপাসনা হয় না। যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবে, সে ত ঈশ্বর হইতেও বড় সুতরাং তাহার আর উপাসনা কি? সাধক হইতে সাধ্য চিরদিনই বড়, সকল প্রকার সাধনের মূলেই এই ভাব। সাধ্য আছেন, আমি আছি এবং সাধ্যের সঙ্গে আমার একটী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই জ্ঞান বা বিশ্বাসই সকল প্রকার সাধনের মূল সূত্র। এই সূত্র ধরিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেই সেই সম্বন্ধ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইবে, এবং সেই গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যের উপলব্ধি বিস্তৃতি লাভ করিয়া আমাকে ধন্য করিবে, এই আশাই সাধকের প্রথম সম্বল। আমাকে জগদম্বা যে ক্ষুদ্র ঘট দিয়াছেন, অপার জ্ঞান ও প্রেম-সাগরে অবগাহন করিয়া তাহাই পরিপূর্ণ করিতে পারিলে আমি ধন্য। আমি যাহা খাই, হস্তী তাহার অনেক গুণ বেশী খায়; কিন্তু আমি হস্তীর ন্যায় অধিক আহার করিতে পারি না বলিয়া আমার কোন দুঃখ হয় না। ক্ষুন্নিবৃত্তিতেই সুখ। আমার শক্তি বুদ্ধি প্রকৃতি প্রভৃতি যতটুকু সাধনের অনুকূল, ততটুকু সাধনেই আমার মঙ্গল। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের পাত্র-বিচার, ইহাই তাহার বিশেষত্ব, এবং ইহাই তাহার বিজ্ঞানসম্মত দৃঢ় ভিত্তি।

দূরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত ঈশ্বর যখন সাধকের সাধনবলে নিকটবর্ত্তী হন, যিনি এতদিন "তিনি" ছিলেন, তিনি যখন "তুমি" হইয়া দাঁড়ান, তখন সেই সাধ্যসাধকের সম্বন্ধ আপনা হইতেই গাঢ়তর হইয়া উঠে, স্নেহ ভক্তি প্রেম প্রভৃতি অমৃতধারা তাহা হইতে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমার জীবনের বহুমূল্য ধন, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সাধনের বস্তু এবং চরম আশ্রয়কে যখন এই রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করি, তখন সাংসারিক জীবনের ছায়াবলম্বনে একটা সম্পর্ক আপনা হইতে তাহার সঙ্গে জন্মিয়া যায়। প্রথমেই আকাঙ্ক্ষা হয়, আমার প্রিয়তমকে আমি কি বলিয়া ডাকিব। তখন সমাজ খুঁজিয়া বেড়াই, পরিবার খুঁজিয়া বেড়াই, অভিধান খুঁজিয়া বেড়াই, হৃদয়ের ভিতরে খুঁজিয়া বেড়াই কি বলিয়া প্রিয়তমকে ডাকিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। প্রত্যেকের হৃদয়ের অবস্থানুসারে সম্পর্ক নির্ণীত হয়, ডাক নির্ব্বাচিত হয়। এই কারণেই হিন্দুদিগের মধ্যে মাতৃভাব, পিতৃভাব, পুত্রভাব, গুরুভাব প্রভৃতি নানা ভাবের সাধনপ্রণালী প্রচলিত।

মানবজীবনে যত প্রকার সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা আছে, তন্মধ্যে মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আর কাহারো দ্বারা সন্তানের সর্ব্ব প্রকার অভাব দূর হইতে পারে না, কেবল মাতাই তাহার সকল প্রকার অভাব দূর করিতে পারেন। শিশুর আসন, শয্যা, আহার, পানীয়, যান, বাহন, ভৃত্য এবং ঈশ্বর, সমস্তই মা। শিশু যতক্ষণ মাতৃক্রোড়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার অভাব নাই, ভয় নাই, আনন্দের সীমা নাই। মাতার প্রতি শিশুর যে স্বাভাবিক নির্ভর ও বিশ্বাস, তাহা স্বয়ংসিদ্ধ এবং জন্মলব্ধ। যে সৌভাগ্যশালী সাধক দীর্ঘ কালের সাধন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করিতে পারেন তাঁহারই জন্ম সার্থক। শিশুর নিকটে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি ভীতি জনক ও প্রাণহানিকর যাহাই আসুক না কেন, শিশু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া নিশ্চিন্ত। শিশু খেলা করিতে করিতে যদি বজ্রনাদ শুনিতে পায়, অমনিই দৌড়িয়া সে মাতার কাছে যায় এবং মাতার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত হয়। মাতৃপ্রভাব এবং মাতৃনিহিত শক্তিই শিশুর ব্রহ্মাণ্ডকে সংযত রাখিতেছে, শাসন করিতেছে। মাতার মত শক্তিশালিনী এবং মাতার মত জ্ঞানশালিনী শিশুর ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ নাই। সহস্র পণ্ডিত এবং সহস্র আত্মীয় যাহা সমস্বরে সত্য বলিতেছেন, মা যদি একবার বলেন তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যাইবে, সহস্র প্রমাণের বলেও তাহা আর সত্য হইতে পারিবে না। সকল ভাবের সিদ্ধিই সাধনসাপেক্ষ, কিন্তু মাতৃভাবের সিদ্ধি সাধনের অপেক্ষা রাখে না।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার আঘাতে যদি শিশুর এই ভাব বিহত না হইত, তবে আর মানবজীবনে সাধনের প্রয়োজন থাকিত না, মানব বিনা সাধনেই মুক্তিলাভ করিত। কিন্তু শৈশবের বিশ্বাস ও নির্ভর শৈশব অতিক্রান্ত হইলেও অব্যাহত রাখিতে পারে, মানবকুলে এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

সাধনের কার্য্য, মাতার প্রতি শিশুর যেরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর থাকে, ঈশ্বরের প্রতি সেইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর লাভ করা। এইটুকু যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইষ্ট লাভ বা মুক্তি অসম্ভব।

সাধ্যে ঠিক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস এবং অটল নির্ভর মাতৃভাব-সাধকের পক্ষে যতটা সরল, সহজও স্বাভাবিক ততটা অন্যের পক্ষে নহে। মাতৃভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রকৃতি জন্ম হইতেই, বোধ হয় গর্ভাবস্থা হইতেই গঠিত, অভ্যস্ত ও নিয়মিত হইতে থাকে। এই স্বাভাবিক ভাব ভাঙ্গিয়া সাধনের সময়ে ভাবান্তর জন্মানও যেমন কঠিন, তাহাতে সিদ্ধিলাভও সেইরূপ দূরপরাহত।

শক্তিসাধক—মাতৃসাধক এই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থাই অবলম্বন করে না। তাঁহাকে ভাব ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয় না, অনভ্যস্ত ভাবে অভ্যস্ত হইতে হয় না, অনাত্মীয়ের সঙ্গে নূতন আত্মীয়তা স্থাপন করিতে হয় না। দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্বের ন্যায়, পরমাত্মাতে তিনি বিশ্বমাতার যে প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষ করেন, সে প্রতিবিম্বই বাস্তবের কার্য্য করে—তাঁহাকে বিশ্বমাতার কোলে পৌঁছাইয়া দেয়।

রামপ্রসাদ এই ভাবেরই সাধক ছিলেন—তাহা তিনি সহজে বিশ্বমাতার কোলে স্থান পাইয়াছিলেন, সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় নির্ভর এবং সরল মাতৃভাবের প্রতিকৃতি তাঁহার সঙ্গীতমালার প্রত্যেক মণিতে, তাঁহার ভাবের পরতে পরতে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার নির্ভর, আব্দার ও অভিমান শিশুরই যোগ্য। যে মাকে প্রত্যক্ষ না করে, তাহার জীবনে এগুলি আসিতে পারে না। মাতৃস্নেহ আকর্ষণ করিবার পক্ষে শিশুর সরলতা এবং নির্ভরই প্রবল অজেয় শক্তি। রামপ্রসাদের এই শক্তি ছিল, এবং ইহাতেই আকৃষ্ট হইয়া মা তাঁহাকে ধরা দিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যুক্তিতর্কের বাহুল্য নাই, পরমতত্ত্ব বুঝাইবার প্রবল চেষ্টা নাই, আছে কেবল মার সঙ্গে সন্তানের কথা, আর মধ্যে আত্মতত্ত্ব—ষট্‌চক্রের কথা। অন্ধকার গৃহে আলোকের আবির্ভাব হইলেই কোথায় কি বস্তু আছে দেখা যায়, দিবাকর উদিত হইলেই পদ্মগুলি ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রমাণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক সত্য।

গাও, বীণা গাও।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(১)

একে একে ধীরে দুখের চিন্তার শত
ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঢেউগুলি লাগিছে আসিয়া
হৃদয়ের বেলা-পরে—চিরসঙ্গী মম।
কাতর হয়ো না তায়—গাও বীণা গাও,
তারি মাঝে নিয়ে এসো আনন্দেরি তান—
যে গান বিহগে গাহে বসন্তের প্রাতে
প্রভাত-তপনে উঠে ফুটিয়া যে গান,
উষার শিশিরে প্রতি ফুলে প্রতি পাতে
যে আনন্দ শুভ্র-হাসি লুটোপুটি খায়;
গাও বীণা গাও তুমি সে আনন্দগান—
আকাশ হইতে নীরব সন্ধ্যার মত
চুপে অতি চুপে দেবতার আশীর্ব্বাদ
ঝরুক তাহার পরে। ঘুচে যাক যত
দুঃখশোকতাপ মলিন হৃদয় হতে।

(২)

নির্জ্জন আঁধারতলে পশেনাকো যেথা
একটী আলোক রেখা, গাও সেথা গাও
বীণাটী আমার; তোমার সুতান গান
আশার আলোক ধরে তুলুক জাগায়ে
দীনহীন যত আঁধার কুটীরবাসী।
মরুভূর অগ্নিময় বালুরাশি যেথা
ধূ ধূ করে দিবানিশি, তারি মাঝে যবে
দু'একটী তৃণগাছি তৃষাতুর কণ্ঠে
দু'ফোঁটা জলের তরে চাহে ঊর্দ্ধমুখে,
গাও বীণা গাও সেথা—তব হর্ষবাণী

ফল্গু নদী যথা আনন্দের স্রোত ঢালি
নিরাশ হৃদয়ে সেথা দিয়ে যাক আশা।
শুনে তব গান যত পথিকের প্রাণ
ভগবৎ-প্রেম-বলে হোক বলীয়ান।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতা ও প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্ভূত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ভাষ্য লিখিবার রীতি এইরূপ একবার সুরু হইলে পর, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐরূপ অনুকরণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্ন্যাস-প্রতিপাদনকারী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই শো বৎসর পরে, শ্রীরামানুজাচার্য্য (জন্ম শক ৯৩৮) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিলেন, এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় রামানুজাচার্য্যও প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে (সুতরাং তদন্তর্গত গীতা সম্বন্ধেও) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত এ দুইই সত্য নহে; জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব ভিন্ন হইলেও, জীব (চিৎ) ও জগত (অচিৎ) এই দুইই এক ঈশ্বরেরই শরীর; সুতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং ঈশ্বর-শরীরান্তর্ভূত এই সূক্ষ্ম চিৎ-অচিৎ হইতে পরে স্থূল চিৎ ও অচিৎ কিংবা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই রামানুজ সম্প্রদায়ের মত। এবং এই মতই উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ রামানুজাচার্য্য তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। (গী, রা, ভা, ২, ১২, ১৩, ২)। কিং বহুনা, ভাগবতধর্ম্মের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মত যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহাঁরই গ্রন্থ তাহার হেতু,—এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ, তৎপূর্ব্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবৎ-ধর্ম্মের যে সিদ্ধান্ত আছে তাহাতে অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত হইয়াছে দেখা যায়। রামানুজাচার্য্য ভাগবৎ-ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া প্রযুক্ত, গীতাতে কর্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে—এই কথা প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কিন্তু রামানুজাচার্য্যের সময়ে মূলভাগবত ধর্ম্মের অন্তর্ভূত কর্ম্মযোগ অনেকটা লুপ্ত হওয়ায় তিনি তাহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গীতাতে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনই বর্ণিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈত ও আচরণ-নীতির দৃষ্টিতে বাসুদেব-ভক্তিই গীতার সারতত্ত্ব; সুতরাং কর্ম্মনিষ্ঠাও জ্ঞাননিষ্ঠার নিষ্পাদক, স্বতন্ত্র নহে—এইরূপ রামানুজাচার্য্যও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (গী, রা, ভা, ১৮, ১ ও ৩০১ দেখ)। কিন্তু অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সন্ন্যাসের স্থানে ভক্তি—যদিও রামানুজাচার্য্য শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রভেদ করিয়াছেন, তথাপি নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিই শেষ-কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করায়, চাতুর্ব্বর্ণের স্বধর্ম্মোক্ত সাংসারিক কর্ম্ম মরণান্ত পর্য্যন্ত সম্পাদন করা—ইহা তাঁহার মতে গৌণ পক্ষের কথা। এবং সেইজন্য গীতাসম্বন্ধে রামানুজীয় তাৎপর্য্যও একপ্রকার কর্ম্ম-সন্ন্যাসপরই বলিতে হইবে। কারণ, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন থাকা অথবা প্রেমযোগে অপার-সীম বাসুদেব-ভক্তিতে মজিয়া থাকা—এই দুই মার্গই কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে একই উপাদানভূত অর্থাৎ উভয়ই নিবৃত্তিপর।

রামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী সম্প্রদায়েরাও এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। মায়ামিথ্যাতত্ত্ব-বাদ সত্য নহে বলিয়া, বাসুদেবভক্তির দ্বারাই অবশেষে মোক্ষলাভ হয়—রামানুজাচার্য্যের ইত্যাকার সিদ্ধান্ত সকল যদিও ঠিক হয়, তথাপি পরব্রহ্ম ও জীব কিয়দংশে এক ও কিয়দংশে ভিন্ন—ইহা স্বীকার করাটা পরস্পরবিরুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এইরূপ স্বীকার করিতেই হয়; পূর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে না;—এইরূপ শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী তৃতীয় সম্প্রদায়ের মত। এই হেতু এই সম্প্রদায়কে "দ্বৈতী সম্প্রদায়" বলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্য—ওর্ফে—শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ। ইনি ১১২০ শকে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল,

এইরূপ মাধ্ব-সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন। কিন্তু ডাক্তর ভাণ্ডারকর "বৈষ্ণব, শৈব ও অন্যান্য গ্রন্থ" নামে যে ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, (৫৯ পৃ) তাহাতে তিনি, শিলা-লেখ্যাদি প্রমাণের বলে, মধ্বাচার্য্যের কাল ১১১৯ হইতে ১১৯৮ শক পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রস্থানত্রয়ী সম্বন্ধে—সুতরাং গীতাসম্বন্ধেও—যে ভাষ্য আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বৈতমতেরই প্রতিপাদক—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ বলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্মের মাহাত্ম্য যদিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন করিয়া অবশেষে ভক্তি-নিষ্ঠাই উৎপন্ন হয়। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্ম কিছু করিলে বা না করিলে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। "ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ"—পরমেশ্বরের ধ্যান অপেক্ষা অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি কতকগুলি গীতাবচনও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ; কিন্তু ঐসকল বচন অক্ষরশঃ সত্য নহে, উহা অর্থবাদাত্মক এইরূপ বুঝিতে হইবে। গীতাসম্বন্ধীয় মাধ্ব-ভাষ্যাদিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে (গী, মা ভা, ১২, ১৩)।

চতুর্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য। জন্ম শক ১৪০১। রামানুজ ও মাধ্ব-সম্প্রদায় অনুসারে এই সম্প্রদায়ও বৈষ্ণবপন্থী। কিন্তু জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতী কিংবা দ্বৈতী মত হইতে, এই মতটি স্বতন্ত্র। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ জীব ও পরব্রহ্ম ইহারা একই, দুই নহে,—ইহাই এই সম্প্রদায়ের মত। এবং এইজন্যই এই মতকে 'শুদ্ধাদ্বৈত' বলে। তথাপি, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে জীব ও ব্রহ্ম একই, ইহা অগ্রাহ্য ; অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশমাত্র ; মায়াত্মক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মায়াপরতন্ত্র জীবের মোক্ষজ্ঞান ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্-ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য সাধন—এই যে সিদ্ধান্ত ইহা-রই দরুণ শঙ্কর সম্প্রদায় হইতে এই সম্প্রদায় ভিন্ন হইয়াছে। পরমেশ্বরের এই অনুগ্রহ, "পুষ্টি, পোষণ" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে ; তাই এই সম্প্র-দায়কে "পুষ্টিমার্গ"ও বলা হইয়া থাকে।

এই সম্প্রদায়ের গীতা সম্বন্ধে তত্ত্বদীপিকাদি যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সাংখ্য জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের কথা অর্জ্জুনকে প্রথমে বলিয়া শেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া যে অর্থে ভগবান তাহাকে কৃতকৃত্য করিয়াছেন সেই অর্থে ভক্তি—অর্থাৎ সেই সঙ্গে ঘর দ্বার ছাড়িয়া দিয়া কেবল নিবৃত্তিপর পুষ্টিমার্গীয় ভক্তি—ইহাই সমস্ত গীতার তাৎপর্য্য ; এবং এই জন্যই ভগবান "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গী, ১৮, ৬৬)—সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও—শেষে এই উপদেশ করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত নিম্বার্কেরও এক রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে। এই আচার্য্য, রামানুজাচার্য্যের পর ও মাধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে, ১০৮৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ডাক্তার ভাণ্ডারকর এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বার্কাচার্য্যের মত এই যে, এই তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও জগতের ব্যাপার ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না হইয়া উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবলম্বন করিয়া আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের সূক্ষ্মতত্ত্ব অন্তর্ভূত রহি-য়াছে। এই মত সিদ্ধ করিবার জন্য নিম্বার্ক বেদান্ত-সূত্র সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। এবং এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য, 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' নামে এক টীকা লিখিয়া, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনু-কূল। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 'দ্বৈতাদ্বৈতী' সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়াও ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি নিরাধার কিংবা কিয়দংশে সাধার এইরূপ ধারণাক্রমে শঙ্কর সম্প্রদায়ের যে মায়াবাদ সেই মায়াবাদকে স্বীকার না করিয়া, দ্বৈতের কিংবা বিশিষ্টাদ্বৈতের এই পৃথক আর এক ভক্তিপর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু ভক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ ত্যাগ করিতেই হইবে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, মায়া-বাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র

দেশের সাধু সন্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন, অতএব এই পন্থা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ দেখা যায়। অদ্বৈত, মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্ম্মত্যাগের আবশ্যকতা—এই যে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত,—ইহা উক্ত পন্থাতেও গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল সাধনা আছে, তন্মধ্যে ভক্তিমার্গই খুব সুলভ। "তুজ হবাবা আহে দেব। তরি হা সুলভ উপাব" (তুকা, গা. ৩০০২-২) অর্থাৎ—তোমার যদি দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপায়। এইরূপ তুকারাম-বাবাজির কথা অনুসারে এই পন্থাবলম্বীর উপদেশ। ভগবদ্গীতাতেও আছে—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা আরো অধিক ক্লেশকর। এইরূপ প্রথম কারণ দর্শাইয়া, পরে, "ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ"—অর্থাৎ আমার ভক্তও আমার অতীব প্রিয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। যে অর্থে ভগবান অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন সেই অর্থে অদ্বৈত-পর্য্যবসায়ী ভক্তিমার্গও গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—এইরূপ তাঁহারা বলেন। শ্রীধর স্বামী নিজের গীতার টীকাতে (গী. ১৮.৭৮) গীতার যে তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন তাহা এই প্রকারের। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের গীতাসম্বন্ধীয় উত্তম মরাঠী গ্রন্থ—"জ্ঞানেশ্বরী"। ইহাতে গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম চারি অধ্যায়ে কর্ম্ম, পরের সাত অধ্যায়ে উপাসনা এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ বলা হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন, "ভাষ্যকারাঁ তেঁ (শঙ্করাচার্য্যকে) বাট পুসত"—অর্থাৎ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের মতানুসরণ করিয়া আমি নিজের টীকা রচনা করিয়াছি। রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তথাপি অনেক সরল দৃষ্টান্তের দ্বারা পুষ্পিত করিয়া বলিবার এক অসাধারণ ক্ষমতা জ্ঞানেশ্বর মহারাজার ছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ভক্তিমার্গ ও কিয়দংশে নিষ্কাম ধর্ম্মেরও তিনি সমর্থন করায়, "জ্ঞানেশ্বরী" গীতা সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে যোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগাভ্যাসের বিষয় যে শ্লোকে আসিয়াছে তৎসম্বন্ধে ইঁহার এক বিস্তৃত টীকা আছে। তাহাতে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে,—অধ্যায়ের শেষে "তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন"—(অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও।) (গী. ৬. ৪৯), এইরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়া, সমস্ত মোক্ষপন্থার মধ্যে পাতঞ্জল যোগকেই, ভগবান্ 'পন্থরাজ' অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

সার কথা, গীতায় উপদিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্ম্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন স্থির করিয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায়ে যে যে তত্ত্বজ্ঞান এবং তাহারই অনুসারে মোক্ষদৃষ্টিতে শেষের কর্ত্তব্য বলিয়া যে সকল আচার বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল অর্থাৎ মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতবাদ ও কর্ম্মসন্ন্যাস, মায়াসত্যত্ব প্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত, ও বাসুদেব-ভক্তি, দ্বৈত ও বিষ্ণুভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, শঙ্করাদ্বৈত ও ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল-যোগ ও ভক্তি, কিংবা কেবলমাত্র ভক্তি, কেবলমাত্র যোগ, অথবা কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান—এইরূপ অনেক প্রকারের কেবল মাত্র নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্ম্মও গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে,—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্যকারেরা ও টীকাকারেরা, নিজ নিজ মতানুসারে গীতা-তাৎপর্য্য স্থির করিয়াছেন।*

ভগবদ্গীতায় কর্ম্মযোগ প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এ কথা কেহ মানে না। শুধু আমাদেরই নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র কবি বামন পণ্ডিতের মতও এইরূপ। গীতা সম্বন্ধীয় তাঁহার "যথার্থ দীপিকা" নামক বিস্তৃত মারাঠী টীকার উপোদ্‌ঘাতে তিনি প্রথম

পরী অজী ভগবন্তজী। যা কলিযুগ মাজী॥
জো জো গীতার্থ যোজী। মতানুরূপ॥

অর্থাৎ—কিন্তু হে ভগবান এই কলিযুগ মাঝে, যে-যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা নিজ নিজ মতানুরূপ।

* ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের গীতা সম্বন্ধীয় ভাষ্য ও সেই সেই সম্প্রদায়ের ছোট বড় সমস্ত মিলিয়া ১৫টি টীকা বোম্বায়ে "গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেসের" কর্ত্তা সম্প্রতি ছাপাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের অভিপ্রায় একযোগে অবগত হইবার পক্ষে এই গ্রন্থটী বড়ই সুবিধাজনক।

এইরূপ লিখিয়া তাহার পর—

কোণ্যা মিসেঁ তরী কোণী। গীতার্থ অন্যথা বাথাণী॥
মজনাবডে তো থোরামতীহি করণী।
কায় করুঁ জী ভগবন্তা॥

অর্থাৎ—কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান। এইরূপ ভগবানের নিকট তিনি গানে মনের আক্ষেপ জানাইয়াছেন।

অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত মোক্ষসম্প্রদায় পরস্পরবিরোধী, গীতায় কি প্রতিপাদিত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদায়ই বলিতে পারে নাই, সেই হেতু উক্ত সমস্ত মোক্ষসাধনের—এবং বিশেষতঃ তাহারই অন্তর্গত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের—স্বতন্ত্রভাবে, ও সংক্ষেপে পৃথক পৃথক সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরম্ভে, অনেক প্রকার মোক্ষোপায়ের গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিভ্রান্তচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। অনেক মোক্ষোপায়ের বর্ণনাই পৃথক পৃথক অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন না হওয়ায়, গীতায় সেই সমস্তের একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া দেখান হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপও বলেন; এবং সর্ব্বশেষে কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, গীতার ব্রহ্মবিদ্যা উপরি-উপরি যদিও সুলভ বলিয়া মনে হয় তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অতীব গূঢ়;—গুরুমুখ ব্যতীত তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী, ৪, ৩৪), এবং গীতার টীকা যদিও অনেক হইয়াছে তথাপি গীতার গূঢ়ার্থ বুঝিবার পক্ষে গুরুমুখ ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।

জলমগ্ন ব্যক্তির মনের অবস্থা।

(শ্রীসংজ্ঞা দেবী)

['Lusitania' জাহাজডুবিতে জলমগ্ন একটি স্ত্রী যাত্রী বাঁচিয়া উঠিয়া তাঁহার সে সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য Sir Oliver Lodgeকে একটি পত্র লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার 'Raymond or Life & Death' নামক গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আচার্য্যের পরলোকগত পুত্রের সহিত কথাবার্ত্তা ও জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বসকল সন্নিবিষ্ট আছে। পত্রখানি ভাষান্তরে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

"যদি বলি যে যাত্রার আরম্ভ হইতেই আমি জানিতাম যে পরিণামে কি ঘটিবে তবে সে কথা অলীক হইবে, কারণ আমার মনে যে ভাবটুকু আসিয়াছিল তাহাকে ঠিক জানা বলা যায় না। কিন্তু তখনই আমার চেতনার মধ্যে খুব একটা স্পষ্টরকম পূর্ব্বাভাস উদয় হইয়াছিল। যাত্রার আরম্ভে জল ও আকাশের মৃদুশান্ত ভাবেতেই যেন একটা কি প্রচণ্ড ঘটনার সূচনা হইয়াছিল। সুতরাং মনের ভিতর সর্ব্বদা একটা প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়া থাকায়, যখন জাহাজটা আঘাতের ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল তখন আমি বড় একটা কিছু চমকিত হই নাই। সে সময়কার একমাত্র উগ্রভাব যাহা আমার মনে জাগিতেছে সে শুধু রাগ—যে এমন পাপ কাজও মানুষে করে! এই অদৃশ্য অথচ নিকটবর্ত্তী শত্রু আসিয়া পড়ায় মনে একটা স্বাভাবিক সংগ্রামের স্পৃহা প্রধান হইয়া উঠিল। আমার মনে হয়, অন্যান্য যাত্রার মধ্যেও যে একটা প্রশান্ত দৃঢ়তা দেখা দিয়াছিল তাহার মূলেও ঐ একই স্পৃহা—মরি তো লড়িয়া মরিব। এই জাহাজডুবিটা তো দৈব-বিপাকে নয়, উহা যুদ্ধচেষ্টার ফল। আমার হাতের বইখানা রাখিয়া দিয়া আমি জাহাজের ওপাশে উঠিয়া গেলাম, যেখানে বোটগুলার চারিদিকে যাত্রীরা জটলা করিতেছিল। সেখানে অনেক কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছিলাম, কারণ জাহাজটা ক্রমশঃই বেশী রকম কাৎ হইতেছিল। কিন্তু ভয়ের হুড়াহুড়ি কোথায়ও কিছু দেখা গেল না। আমি আমার ক্যাবিনের মধ্যে গেলাম, জাহাজের এক জন চাকর আমাকে একটা (রক্ষা কবচ) Life jacket পরাইয়া দিল এবং বলিল যে ভারি পশমের fur coat ছাড়িয়া ফেলাই ভাল। আমি কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া ছাতে ফিরিলাম এবং সেখানে পূর্ব্ববৎ কষ্টে দাঁড়াইয়া একটি অল্প পরিচিত বুড়ো মানুষের সঙ্গে

আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই একটা স্বাভাবিক সাধনা আছে যাহা আমাদিগকে পাগলের মত জীবন রক্ষার জন্যে লড়ালড়ি হইতে বিরত রাখে। এবং জীবনই হউক মৃত্যুই হউক যাহা আপনি আসিয়া পড়ে তাহার জন্যে প্রস্তুত থাকিতে শেখায়, যাহাতে করিয়া যে সকল প্রাণী ঝাঁকে ঝাঁকে ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করিতে করিতে জাহাজের নীচের তলা হইতে উপরে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছে তাহাদের মত আমরা আত্মহারা হই না। মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে আমার পরপারে যাইবার সময় উপস্থিত—অন্ততঃ যতক্ষণ না আমি প্রশান্ত আকাশের নীচে প্রশান্ত সমুদ্রের জলে পড়িয়া সেই ভাঙ্গাচোরার, সেই দুঃখ কষ্টের দৃশ্য হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে ভাসিয়া গেলাম। যাহারা ডুবিয়া যাইতেছিল তাহাদের আর্ত্তনাদ, যে খালাসিরা জাহাজের Life Boat লইয়া জল হইতে লোক তুলিয়া বেড়াইতেছিল তাহাদের দাঁড়ের ঝুপঝাপ, তাহাদের হাঁকাহাঁকি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিল। আমাকে যে কেহ তুলিয়া লইবে এমন সম্ভাবনা মাত্র দেখা গেল না। তখন আমি নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম "দেখ অন্ধ আশা ত্যাগ কর সময় হয়েছে, পারে যাবার সময় এসেছে!" কিন্তু তবুও ভিতর হইতে ক্রমাগত কে যেন বলিতে লাগিল "না, এখনও না!" গাংচিলের দল মাথার উপরে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে নীল সমুদ্রের রঙের ছায়া তাহাদের সাদা পালকের উপর পড়িয়া কেমন দেখাইতেছিল তাহাও আমি নজর করিতেছিলাম। তাহারা সুখে প্রাণের স্ফুর্ত্তিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া আমার মনে কেমন উদাসভাব আসিতে লাগিল। আমার আত্মীয়স্বজনের প্রতি মন ধাবিত হইল তাহারা আমার পথ চেয়ে বসিয়া আছে। তাহারা হয়তো এখন বাগানে বসিয়া চা খাইতেছে। যখন আমার জন্য তাহাদের শোকের কথা মনে হইল তখন সেটা অসহ্য হইয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। কত রকম বইএর নাম আমার মাথার ভিতর দিয়া যাইতে লাগিল, বিশেষতঃ একটা যাহার নাম "Where no fear is"—ঠিক আমার মনোভাবের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। আমার সে সময়কার মনের ভাব 'উদাস' বলিতে পার—পরের শোকে কাতর বলিতে পার কিন্তু আমার মনে ভীতি ছিল না। আমার এই মনোভাব নিতান্তই সময়োচিত ও স্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হইতেছিল, যেমন করিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার প্রতীক্ষা করিতে হয় ঠিক তাহাই। তাহা হইবেই বা না কেন, যেহেতু ভাবটা স্বাভাবিক। মনে হইতে লাগিল যে ওপারের কাহারও সঙ্গে পরিচয় থাকিলে বেশ হইত, ভাবিতে লাগিলাম সেখানে এমন কি কেহ নাই যাহারা অচেনা অভ্যাগতকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিবে? উভয় লোকের মধ্যেকার সীমানার খুব কাছাকাছি আসিয়াছি এমন সময়, একটা দলছাড়া Life Boat নিঃশব্দে আমার পিছনদিক হইতে আসিয়া পড়িল, তাহার মধ্যে হইতে দুইজন খালাসি ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া লইল। আশ্চর্য্য, আমার গতপ্রায় জীবন কত বেগে ফিরিয়া আসিতে লাগিল! বোটের মধ্যে সকলকেই ধীর ও সংযত দেখিলাম, যদিও তাহাদের মধ্যে একজন মৃত ও একজন পাগল হইয়া গিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক চা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল—সে আকাঙ্ক্ষা অভাবনীয় রকমে শীঘ্রই পূর্ণ হইল, কারণ Queens Town হইতে একটি mine-ধরা জাহাজ আসিয়া পড়িল। ঐ জাহাজটার নাম মনে নাই, কিন্তু তাহার লোকজনের দয়া ও সৌজন্য কখনও ভুলিতে পারিব না, তাহারা আমাকে শুক্‌নো গরম কাপড় দিয়া সমূহ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া তুলিল।

কাগজে কলমে বর্ণনা করিবার আমার বড় একটা ক্ষমতা নাই। পরপারের সীমার নিকটবর্ত্তী গিয়া ফিরিয়া আসায়, এ সীমানা সর্ব্বদা আমাদের কত কাছে অনুভব করিতে পারায়, মনে আমার একটা বড় আনন্দ হইতেছে, দৈনিক কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় সেটা সচরাচর ঘটিয়া ওঠে না। আমার পক্ষে যে মৃত্যুর দ্বার বন্ধ ছিল, সেদিন তাহার মধ্য দিয়া অপর অনেকে চলিয়া গেল। আমার ধারণা তাহারা সে সময় মোটেই ভীত হয়নি, আমারই মত তাহাদেরও নিশ্চয়ই মনে হইয়াছিল যে যাহাই আসুক

না কেন তাহা সুন্দর তাহা পূর্ব্বজীবনের পরিণতি মাত্র। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে অন্ততঃ রোগের অবস্থায় ব্যতীত পরপারে যাইবার কোন কষ্ট নাই। অনন্ত জীবনের সোপানে ইহা একটী ধাপ মাত্র।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

উপোদ্ঘাত প্রকরণ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। সন্ত্বেবং শাস্ত্রাধ্যায়পাদপ্রতিপাদ্যা অর্থাঃ। কিং তত ইত্যত আহ—

উহিত্বা সংগতীস্তিস্রস্তথাঽবান্তরসংগতীঃ।
উতেদাক্ষেপদৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাদিকাঃ॥

তদ্যথা—ঈক্ষত্যধিকরণে—"তদৈক্ষত" ইতি বাক্যং প্রধানপরং, ব্রহ্মপরং বা, ইতি বিচার্য্যতে। তস্য বিচারস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাদ্‌ব্রহ্মবিচার শাস্ত্রসংগতিঃ। 'বাক্যং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যবৎ' ইতি নির্ণয়াৎ সমন্বয়াধ্যায়সংগতিঃ। ঈক্ষণস্য চেতনে ব্রহ্মণ্যসাধারণত্বেন স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গত্বাৎ প্রথমপাদ সংগতিঃ। এবং সর্ব্বেষ্প্যধিকরণেষু যথাযথং সংগতিত্রয়মূহনীয়ং। অবান্তরসংগতিস্ত্বনেকধা ভিদ্যতে—আক্ষেপসংগতিঃ দৃষ্টান্তসংগতিঃ প্রত্যুদাহরণসংগতিঃ প্রাসঙ্গিকসংগতিঃ ইত্যেবমাদিঃ।

অনুবাদ। শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদপ্রতিপাদ্য অর্থ সকল এইরূপ হউক। তৎপরে কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ত্রিবিধ সংগতি আলোচনা করিয়া আক্ষেপ, দৃষ্টান্ত, প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতি অবান্তরসংগতি সেইপ্রকার আলোচনা করিতে হইবে।

তদ্যথা—ঈক্ষতি অধিকরণে "তদৈক্ষত" এই বাক্য প্রধানপর অথবা ব্রহ্মপর ইহা বিচার্য্য বিষয়। উক্ত বিচারের ব্রহ্মসম্বন্ধিত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মবিচাররূপ শাস্ত্রের সহিত সংগতি হইল। "সকল বাক্য ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত" এই নির্ণয় থাকাতে (উক্ত বিচারের) সমন্বয় অধ্যায়ের সহিত সংগতি। ঈক্ষণকার্য্য চেতন ব্রহ্মের অসাধারণ লক্ষণ হওয়া প্রযুক্ত স্পষ্টলিঙ্গত্বের কারণে প্রথমপাদের সহিত সংগতি। এই প্রকারে সকল অধিকরণেরই ত্রিবিধ সংগতি যথাযথ আলোচ্য। অবান্তরসংগতি নানাপ্রকার—আক্ষেপসংগতি, দৃষ্টান্তসংগতি, প্রত্যুদাহরণসংগতি, প্রাসঙ্গিকসংগতি ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য। গ্রন্থের প্রারম্ভে মূল সংগতির ত্রিবিধ ভেদ—শাস্ত্রসংগতি, অধ্যায়সংগতি এবং পাদসংগতি উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকার শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদের তাৎপর্য্য জানিলে উক্ত সংগতিত্রয় সুবোধ্য এই কথা বলিয়া শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদের ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রাদি পদার্থের ব্যাখ্যা করিবার পর গ্রন্থকার উক্ত তিনটী পদার্থ সম্বন্ধীয় ত্রিবিধ মূল সংগতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি উপরোক্ত শ্লোকে বলিয়া গেলেন যে প্রত্যেক বিচারে ত্রিবিধ মূল সংগতি দেখিবার পর প্রসঙ্গক্রমে আগত নানাবিধ অবান্তরসংগতিও আলোচনা করা উচিত।

শ্লোকের টীকাতে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য উক্ত ত্রিবিধসংগতি এক একটী উদাহরণের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই একটী শ্রুতিবাক্য আছে। "ঈক্ষতের্নাশব্দং" প্রভৃতি কয়েকটী সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রকার একটী অধিকরণে উক্ত শ্রুতিবাক্যের বিচার করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের প্রথম শব্দ "ঈক্ষতি" ধরিয়া সেই অধিকরণের নাম দেওয়া হইয়াছে—"ঈক্ষতি অধিকরণ"। এই অধিকরণে আলোচিত হইয়াছে যে শ্রুতিবাক্যের "তদৈক্ষত" অর্থাৎ তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন এই বাক্যের সূচিত দ্রষ্টা কে—সাংখ্যোক্ত "প্রধান" বা অচেতন প্রকৃতি অথবা চেতন ব্রহ্ম? তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বপ্রথম এই অধিকরণ বা বিচারশরীরে শাস্ত্রসংগতি আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। এখন, উপরোক্ত বিচারের মূল প্রশ্নটী অন্যতর পক্ষের মতে ব্রহ্মপর হওয়াতে এবং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থটীও ব্রহ্মবিচার-বিষয়ক হওয়াতে, অধিকরণ এবং শাস্ত্র উভয়ের মধ্যে সংগতি দৃষ্ট হইতেছে।

সেই প্রকার, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সমন্বয় বা প্রথম অধ্যায়ে সমস্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে উপরোক্ত মূল প্রশ্নটীকেও ব্রহ্মে পর্য্যবসিত করা

হইয়াছে। অতএব উক্ত অধিকরণের সহিত ব্রহ্ম-সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের সংগতি রক্ষিত হইল।

এইবারে উক্ত অধিকরণের পাদসংগতি দেখানো যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ব্রহ্মের স্পষ্টলিঙ্গক বাক্যসকল, অর্থাৎ যে সকল বাক্য একমাত্র ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে সেই সকল বাক্য আলোচিত হইয়াছে। এখন, বিচারের অন্যতর পক্ষ "ঐক্ষত" বাক্যটীকে ব্রহ্মের স্পষ্টলিঙ্গাত্মক বলিয়া স্থির করায় যে প্রথমপাদে এই শ্রুতিবাক্য আলোচিত হইয়াছে সেই প্রথম পাদের সহিত উক্ত অধিকরণের পাদসংগতি রক্ষিত হইল। এই পক্ষ বলেন যে "ঐক্ষত" শব্দের অর্থ দৃষ্টি করিয়াছিলেন, কাজেই এই দৃষ্টিকার্য্য বা দৃষ্টি-মূলক সৃষ্টিকার্য্য অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না, চেতন ব্রহ্মেরই কার্য্য। সুতরাং, যখন এই বিষয়ের বিচার সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে করা হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে যে সমস্ত অধিকরণটার বা বিচারশরীরের সঙ্গে উক্ত বিচারাধিকৃত পাদের অসঙ্গতি নাই অর্থাৎ উক্ত পাদটী অধিকরণের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

এই প্রকারে যখনই এই গ্রন্থের কোন বিষয় আলোচিত হইবে, তখন প্রথমেই দেখিতে হইবে যে ব্রহ্মসূত্রের সহিত, তাহার কোন্ অধ্যায় এবং কোন্ পাদের সহিত উক্ত বিষয়ের সংগতি রহিয়াছে। যদি কোন বিচারে উক্ত ত্রিবিধ সংগতি দৃষ্ট না হয় তবে তাহা বিচার বা আলোচনার বিষয়ই হইতে পারে না।

ত্রিবিধ মূল সংগতি থাকিলে, তাহার পর দেখা যাইতে পারে যে অবান্তর সংগতির মধ্যে কতগুলি উক্ত বিচারে দেখা যায়। অবান্তরসংগতি নানাবিধ, সকলগুলি যে একটা বিচারেই থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

মূল। সেয়মবান্তরসংগতির্ব্যুৎপন্নৈর্নোহিতুং শক্যতে। অতস্তাং ব্যুৎপাদয়তি :—

পূর্ব্বন্যায়স্য সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে।
পূর্ব্বপক্ষস্য যুক্তিং চ তত্রাহক্ষেপাদি যোজয়েৎ ॥১০

তদ্যথা প্রথমাধিকরণে "ব্রহ্মবিচারশাস্ত্রমারম্ভণীয়ং" ইতি সিদ্ধান্তঃ। তত্র যুক্তিঃ—"ব্রহ্মণঃ সন্দিগ্ধত্বাৎ" ইতি। দ্বিতীয়াধিকরণস্য "জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মলক্ষণং ন ভবতি" ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র যুক্তিঃ—"জন্মাদের্জগন্নিষ্ঠত্বাৎ" ইতি। তদুভয়মবলোক্য তয়োরাক্ষেপসংগতিং যোজয়েৎ। "সন্দিগ্ধত্বাদ্ ব্রহ্ম বিচার্য্যং" ইত্যেতদযুক্তং। জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মণো লক্ষণাভাবে সতি ব্রহ্মৈব নাস্তি, কুতস্তস্য সন্দিগ্ধত্বং বিচার্য্যত্বং চ—ইত্যাক্ষেপসংগতিঃ। দৃষ্টান্ত-প্রত্যুদাহরণসংগতী চাত্র যোজয়িতুং শক্যেতে। "যথা সন্দিগ্ধত্বেন হেতুনা ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বং, তথা—জন্মাদ্যন্যনিষ্ঠত্বেন হেতুনা ব্রহ্মণো লক্ষণং নাস্তি" ইতি দৃষ্টান্তসংগতিঃ। যথা—বিচার্য্যত্বে হেতুরস্তি, ন তথা লক্ষণসদ্ভাবে হেতুং পশ্যামঃ' ইতি প্রত্যুদাহরণ-সংগতিঃ। তে এতে দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণসংগতী সর্ব্বত্র সুলভে। পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তবদুত্তরাধিকরণ-পূর্ব্বপক্ষে হেতুমত্ত্বসামান্যং, উত্তরাধিকরণসিদ্ধান্তে হেতুশূন্যত্ববৈলক্ষণ্যং চ মন্দৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যত্বাৎ। আক্ষেপসংগতির্যথাযোগমুন্নেয়া। অথ প্রাসঙ্গিকসংগতিরুদাহ্রিয়তে— দেবতাধিকরণস্যাধিকার বিচাররূপত্বাৎ সমন্বয়াধ্যায়ে জ্ঞেয়ব্রহ্মবাক্যবিষয়ে তৃতীয়পাদে চ সংগত্যভাবেঽপি বান্তরসংগতিরস্তি। তথাহি পূর্ব্বাধিকরণে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রবাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বাদঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং ব্রহ্মণো মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষং, মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য' ইত্যুক্তং। তৎপ্রসঙ্গেন দেবতাধিকারো বুদ্ধিস্থঃ। সেয়ং প্রাসঙ্গিকসংগতিঃ। তদেবং ন্যায়সংগতির্নিরূপিতা ॥

অনুবাদ। ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি সেই অবান্তরসংগতি বুঝিতে পারেন। অতএব (অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির জন্য) তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরবর্ত্তী ন্যায় বা অধিকরণে পূর্ব্ববর্ত্তী ন্যায় বা অধিকরণের সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি এবং পূর্ব্বপক্ষেরও যুক্তি এই উভয় অবলোকন করিয়া তাহাতে আক্ষেপাদি-সংগতি সংযোজিত করিতে হইবে।

তদ্যথা—প্রথম (বা জিজ্ঞাসা) অধিকরণে ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র আরম্ভ করা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্তের যুক্তি এই যে ব্রহ্ম-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় (বা ব্রহ্মলক্ষণ) অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ হইল এই যে জগতের জন্ম প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। সেই পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি হইতেছে এই যে জন্মপ্রভৃতি জগতেরই ধর্ম্ম। উপরোক্ত যুক্তিদ্বয় অবলোকন করিয়া উভয়ের মধ্যে আক্ষেপসংগতি যোজনা

করিতে হইবে। এই বিষয়ে সন্দেহের কারণেই যে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিতে হইবে, একথা যুক্তি-যুক্ত নহে। জন্মাদি কেবল অন্যেরই লক্ষণ হইলে ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপেরই অভাব হইল, সুতরাং ব্রহ্মের অস্তিত্বই রহিল না। তখন ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহই বা আসে কিরূপে এবং তাহার বিচারের কথাই বা উঠে কিরূপে? ইহাই হইল আক্ষেপ সংগতি। এই বিচারে দৃষ্টান্তসংগতি এবং প্রত্যুদাহরণসংগতিও যোজনা করা যাইতে পারে। যেরূপ সন্দিগ্ধত্বের কারণে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার্য্যত্ব স্বীকৃত, সেইরূপ জন্ম প্রভৃতির অন্যনিষ্ঠত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের লক্ষণ নাই, ইহাই হইল দৃষ্টান্তসংগতি। বিচার্য্যত্ব বিষয়ে যেমন হেতু আছে, (ব্রহ্মের) লক্ষণের অস্তিত্ব বিষয়ে আমরা সেরূপ হেতু দেখি না—ইহাই হইল প্রত্যুদাহরণসংগতি। দৃষ্টান্ত ও প্রত্যুদাহরণ সংগতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের ন্যায় উত্তরাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষে হেতুর অস্তিত্ববিষয়ক সাম্য এবং উত্তরাধিকরণে সিদ্ধান্তে হেতুর অনস্তিত্বরূপ (পূর্ব্বাধিকরণ সিদ্ধান্ত হইতে) পার্থক্য মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণও বুঝিতে সক্ষম। যথাযুক্তস্থলে আক্ষেপসংগতি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে প্রাসঙ্গিক সংগতির উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে—দেবতাধিকরণের অধিকারবিষয়ক বিচাররূপত্ব হেতু সমন্বয় অধ্যায়ে জ্ঞেয়ব্রহ্মবাক্য বিষয়ে এবং তৃতীয় পাদে সংগতির অভাব সত্ত্বেও বুদ্ধিস্থ অবান্তরসংগতি রহিয়াছে। পূর্ব্বাধিকরণে (অর্থাৎ দেবতাধিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে) "'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' এই বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব মনুষ্যের হৃদয়সাপেক্ষ কারণ শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার" ইহা উক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে দেবতার অধিকার বুদ্ধিস্থ হয় (অর্থাৎ স্বতই আসিয়া পড়ে)। ইহাই হইল প্রাসঙ্গিকসংগতি। এই প্রকারে ন্যায়সঙ্গতি নিরূপিত হইল।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে বিচার প্রসঙ্গে অবান্তরসংগতি দেখা সহজ, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিরহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সেই সকল সংগতি অবান্তর বা অপ্রধান হইলেও বাহির করা সহজ নহে। তাই গ্রন্থকার সেই সকল সংগতির স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেদান্ত সূত্রের প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণ হইতেছে ব্রহ্মবিচারবিষয়ক। এই অধিকরণে ব্রহ্মবিষয়ে যে বিচার বা আলোচনা করা উচিত তাহাই বিচার করা হইয়াছে। আলোচনার ফলে এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম বিচার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তে আমরা আসি কেন? ব্রহ্মবিষয়ে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়—তুমি যে কারণেই হোক বলিতেছ যে ব্রহ্ম বিচার্য্য নহে, আর আমি যে কারণেই হোক বলিতেছি যে ব্রহ্ম বিচার্য্য। এখন এই রকম সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হওয়া কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির উপযুক্ত নহে। কাজেই আমাকে একটা সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। আমি যে সিদ্ধান্তেই উপনীত হই না কেন, বিচার করিয়া সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ বা যুক্তিই হইল সেই সন্দেহ।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের দ্বিতীয় অধিকরণ হইতেছে ব্রহ্মলক্ষণবিষয়ক। এই অধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ বা স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। এই বিচারের প্রথমেই এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ব্রহ্মের কোন প্রকার লক্ষণ হইতে পারে কি না। এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকার লক্ষণ হইতে পারে না এবং উত্তরপক্ষ বলিবেন যে ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষ তখন উত্তরপক্ষকে এই প্রশ্ন করিবার অধিকারী যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি? উত্তরপক্ষ তখন শ্রুতি অবলম্বনে বলিবেন যে জগতের কারণত্ব ব্রহ্মের অন্যতর লক্ষণ। তখন পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন যে জগতের জন্ম প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষের এই উক্তির যুক্তি হইতেছে যে জন্ম বা উৎপত্তি জড় জগতের ধর্ম্ম, তাহা চেতন ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। উপরোক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের যে যুক্তি (ব্রহ্ম বিষয়ক সন্দেহ) তাহার সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষীয় যে যুক্তি (জন্মাদি জড় জগতের ধর্ম্ম, ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে), এই উভয় যুক্তির মধ্যে একটী আপত্তিমূলক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। সে সম্বন্ধটী এই যে, ব্রহ্মের যদি কোন লক্ষণই

না থাকে * তবে ব্রহ্ম বিষয়ে সন্দেহও আসিতে পারে না এবং সুতরাং ব্রহ্মের বিচার্য্যত্বও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই আপত্তিমূলক সম্বন্ধটাই হইল আক্ষেপসংগতি। গ্রন্থকার অব্যবহিত পরেই তাঁহার টীকাতে এইটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই আক্ষেপসংগতির ন্যায় অবান্তরসংগতি আরও অনেক প্রকার আছে। দুইটী অধিকরণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল সংগতি বা সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় সেইগুলিকেই অবান্তরসংগতি বলা হয়। দুইটী অধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচারকালে স্বভাবতই পরস্পরসম্বন্ধ নানা কথা আসিয়া পড়ে, কাজেই নানাবিধ সংগতিও অনায়াসে খুঁজিয়া লওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি যে সকল অবান্তরসংগতি বিচারকালে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান সংগতি গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আক্ষেপসংগতি প্রথমেই বুঝাইয়া এইবারে দৃষ্টান্ত ও প্রত্যুদাহরণসংগতি বুঝাইতেছেন।

দুইটী অধিকরণের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক যে সম্বন্ধ, তাহাই দৃষ্টান্তসংগতি। তুমি একটী যুক্তি দেখাইয়া বলিলে যে ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়াই ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য। আমিও সেইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই বলিতেছি যে জড় জগতের লক্ষণ বলিয়াই উহা ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না। তোমার যুক্তি যদি স্বীকৃত হইতে পারে, তবে আমারই বা যুক্তি অস্বীকৃত হইবে কেন ? তোমারও উক্তির যেমন হেতু আছে, আমার উক্তিরও সেইরূপ হেতু আছে। এই খানেই দুইটী অধিকরণের দৃষ্টান্তসংগতিরূপ পরস্পরসম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

কোন বিষয়ের বিচার কালে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের কোন সূত্রে সাম্য থাকিলেই তাহাকে দৃষ্টান্তসংগতি বলা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা যুক্তি বা হেতু থাকার সাম্য দেখা যায়—পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের (ব্রহ্ম বিচার্য্য) সন্দেহরূপ একটা হেতু আছে, আর পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষেরও (ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না) জন্মাদি জড় জগতের ধর্ম্মরূপ একটা হেতু আছে। পুনশ্চ, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের কোন সূত্রে বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহাকেই প্রত্যুদাহরণসংগতি বলা যায়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তের যেমন সন্দেহরূপ একটা হেতু দেখানো হইতেছে, উত্তরাধিকরণের সিদ্ধান্তের (ব্রহ্মের লক্ষণ আছে) সেরূপ কোন হেতু থাকা পূর্ব্বপক্ষ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইতেছে—দুইটী সিদ্ধান্তের একটাতে হেতু থাকা, অপরটাতে হেতু না থাকা, এই বৈষম্যমূলক সম্বন্ধই হইল প্রত্যুদাহরণসংগতি।

সর্ব্ববিধ সংগতির মধ্যেই আপত্তি উঠিতে পারে এবং আপত্তি উঠিলেই তাহা আক্ষেপ সংগতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। সেই কারণে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, "যথাযুক্তস্থলে আক্ষেপ-সংগতি বুঝিতে হইবে।"

এইবারে প্রাসঙ্গিকসংগতিটা কি তাহা বুঝানো যাইতেছে। বেদান্তসূত্রের সমন্বয় অধ্যায়ের (১ম অধ্যায়) তৃতীয় পাদে, জ্ঞানগম্য যে ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ক যে সকল শ্রুতিবাক্য আছে, তাহারই বিচার করা হইয়াছে। এই বিচারের একটী অধিকরণে দেবতার অধিকার আলোচিত হইয়াছে—সেই অধিকরণকে দেবতাধিকরণ বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই দেবতাধিকরণ উপস্থিত করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। যেখানে জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, সেখানে দেবতার অধিকারবিষয়ক আলোচনা আসিবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে ইহা প্রসঙ্গক্রমেই আসিয়াছে। এই অধিকরণের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি কঠোপনিষদুক্ত শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন, এই বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়াই এই আশঙ্কা উঠিতেছে যে, যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইবেন কি প্রকারে ? এই আশঙ্কার নিরাকরণে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তিনি যে মনুষ্যহৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধ হইবেন সেই হৃদয় অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়াই ব্রহ্মকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়াছে। এখন, উক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্রাধিকরণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শাস্ত্রে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বাক্যসমূহ আলোচনা করিবার অধিকার মনুষ্যেরই আছে। তৎক্ষণাৎ এই একটী প্রশ্ন মনে সমুত্থিত হইল যে তবে কি শাস্ত্রে দেবতাদিগের অধিকার নাই ? এই প্রশ্নটী প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা না হইলেও অঙ্গুষ্ঠমাত্রাধিকরণোক্ত বিষয়ের বিচারকালে বুদ্ধিস্থ বা নিগূঢ়ভাবে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ কোন বিষয়ের বিচারকালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপে কোন একটী বহির্ভূত বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইলেই তাহা অসঙ্গত হইবে না, প্রত্যুত তাহা আলোচনার পক্ষে সংগত বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এই ভাবে সংগত হইবার নামই হইল প্রাসঙ্গিকসংগতি।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থকার প্রধান এবং অপ্রধান বা অবান্তর সংগতিসমূহ যথাসম্ভব বুঝাইয়া আসিলেন।

আগামী সংখ্যা হইতে মূল বেদান্তসূত্রের অনুবাদ আরম্ভ হইবে। তং বোং সং।

---

* ব্রহ্মের জগৎ কারণত্ব রূপ লক্ষণ অস্বীকৃত হইলে অন্যান্য লক্ষণ জগত বাধিত হইয়া পড়ে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ধর্ম্ম ও নীতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পাণ্ডিত্য।

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্র শিক্ষা ফলে।

—মৃচ্ছকটিক ৪ অঙ্ক।

গুণের শ্রেষ্ঠতা।

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান
গুণহীন ধনী হ'তে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান॥
পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু তেথা কিছু নাই।
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন
অলঙ্ঘ্য শম্ভুর শির করিলা লঙ্ঘন॥
গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণে ফল ধরে,—এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস॥

—ঐ-ঐ।

আশ্রয় দান।

জয়লক্ষ্মী, আর যত মিত্র বন্ধু
ত্যাজে সে অধমে,
—লোক-উপহাস্য হয়,
যে ত্যজে শরণাগত জনে॥

ঐ-ঐ।

পর-উপকারী জন, ভীতজনে করে যদি
অভয় প্রদান,
যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা
তার গুণগান॥

ঐ-ঐ।

ধর্ম্ম সঞ্চয়।

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজারে ধ্যানের ঢাক্, সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ,
বিষম ইন্দ্রিয়-চোর হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম॥
সংসার অনিত্য দেখি লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
—ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে যে করয়ে জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বধি, রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
—পাপ-চণ্ডালেরে নাশে, নিশ্চয় সে যায় স্বর্গধামে॥
মস্তক মুণ্ডিত কর, অথবা মুণ্ডিত কর বদন মণ্ডল
চিত্তের মুণ্ডন বিনা, ও-সব মুণ্ডনে বল' আছে কিবা
ফল।
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত, মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি
কেবল॥

ঐ—৮ম অঙ্ক।

উদ্যানের আশ্রয় দান।

গৃহহীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ করিয়া বিধান
এই সব তরু করে পুণ্য অনুষ্ঠান।
দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম॥

ঐ—ঐ।

কুলশিক্ষা ও স্বভাব-চরিত্র।

কি হইবে বল' ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু
বাড়ে নাকি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

ঐ—ঐ।

আত্ম সংযম।

সুসংযত মুখ হস্ত, সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার
তাকেই মনুষ্য বলি, কি করিতে পারে রাজা
তার?
হস্তে তার পরলোক, কাড়ি লয় সাধ্য আছে
কার?

ঐ—১ অঙ্ক।

নববর্ষ।

(শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী)

খুলি দেও হৃদি দ্বার
আশীর্ব্বাদ দেবতার
বরষিবে সেথা আজি নব;
বরষেরে দূত ক'রে
পাঠাইছে ঘরে ঘরে,
রাজেশ্বর ক্ষমা করি সব।
ভুল ভ্রান্তি পুরাতন
নাহি তার নিদর্শন,
রাজকর দিতে নাহি হবে;
হিসাব নিকাশ সাপ্
বকেয়া বাকীর মাপ,
কায়েমী ব্যবস্থা নাহি ভবে।
আসে যায় এই নিত্য
জীবন প্রত্যক্ষ সত্য,
অগ্রসর হও নব কাজে;
বরষের সুপ্তি দূর
এ নহে স্বপন-পুর,
জাগরণ শঙ্খধ্বনি বাজে।
বাদ্য শব্দে মুখরিত
সচেতন চারিভিত,
জয় ধ্বনি করি উঠ সবে;
রাজপদে রাখি হিয়া
আপনারে সঁপি দিয়া,
বিশ্বব্রতে খাঁটি হতে হবে।
ছোটখাট স্বার্থ হীন
লইয়া রবে না দীন,
আজ পুনঃ নব জন্ম হবে।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ব্যাকুলতা।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী)

হৃদয় আমার পাইতে তোমারে
ব্যাকুল দিবসযামিনী
পরাণ নিয়ত কাঁদিছে লাগিয়া
তোমারি চরণ-তরণী।

তুমি কোথা আছ—না হেরি তোমায়—
তোমারে লভিতে খুঁজি বিশ্বময়,
আছ তুমি সদা বলিছে হৃদয়—
কোথা আছ নাহিক জানি।

অন্তরে বাহিরে করুণা-নিঝর—
মহিমা ব্যাপিছে দিক্ দিগন্তর—
আনন্দে গাহিছে বিশ্বচরাচর
মধুর তব যশো বাণী

কোথায় রেখেছ তব সিংহাসন—
কোথা আছে তব প্রেমনিকেতন—
যেথায় বসিয়া করিছ শাসন
ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল প্রাণী।

দেবের অগম্য তোমার সদন,
পায় তথা স্থান নিরাশ্রয় জন,
যে তোমারে ডাকে ভাবিয়া আপন,
(তুমি) ডেকে লও তারে আপনি।

তোমার মন্দির নহে অতি দূরে,
থাক তুমি মম হৃদয় কুটীরে—
হেরিবারে দাও ঘুচায়ে তিমিরে,
তোমারে আমার জননি।

উদ্বোধন।

এই শুভ পবিত্র সময়ে এই পবিত্র স্থানে আমাদের সেই প্রাণারাম পরমেশ্বরের দর্শনলাভের জন্য এখানে আসিয়াছি।

হে প্রাণারাম হৃদয়দেবতা, তুমি এসো, প্রাণের ভিতরে এসো। আমাদের সমুদয় প্রাণকে কাড়িয়া লইয়া তোমাদ্বারা সেই প্রাণের স্থান পূর্ণ কর। তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি মঙ্গলময়, তুমি আমাদের পিতামাতা সকলই। তোমার মঙ্গলভাব আমাদের সম্মুখে চিরবিরাজমান রাখ। তোমার সঙ্গে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখ, তোমার সঙ্গে আমাদিগকে এক করিয়া দাও। তোমার বিরহের ব্যথা আর আমাদের সহ্য হয় না। তোমাকে ছাড়িয়া কঠোর সংসারে ডুবিয়া যাই, অতল অন্ধকারের পাতালে ডুবিয়া যাই। কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানে তোমার চক্ষু ধ্রুবতারারূপে জাগ্রত থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করে। যতই আমরা তোমার দিকে অগ্রসর হই, ততই সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূরে সরিয়া যায়, হৃদয়ের অন্ধকার ততই

কাটিয়া যায়। চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতি তোমার নিকট অপহৃত হইয়া যায়।

তাঁহার সেই মধুর শান্তিপ্রদ জ্যোতি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি আর কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না। আমরা এখানে কি-ই বা মিষ্ট গান শুনিতেছি? ঐ সুনীল গগনের মহান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পরমদেবতা পরমেশ্বরকে ঘিরিয়া দেবতাদের যে অনাহত সুরের গীত দিবানিশি ধ্বনিত হইতেছে, সে গান যিনি শুনিয়াছেন, তিনি কখনই তাহা ভুলিতে পারেন না। চেষ্টা থাকিলে মনুষ্যের ভাগ্যে এক আধবার সেই গান কানে পৌঁছিতে পারে, সেই জ্যোতি এক আধবার নয়নে প্রতিভাত হইতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সেই জ্যোতি অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইবে, যে মুহূর্ত্তে সেই অনাহত সুরের গান কানে আসিয়া পৌঁছিবে, সেই মুহূর্ত্তে সেই জ্যোতি, সেই গান অন্তরে না ধরিয়া রাখিলে সে জ্যোতি অদৃশ্য হয় এবং সে গানও শ্রুতির অগোচর হইয়া যায়। তখন তাহার জন্য পাগল হইতে হয়, অথচ পাগল হইলেও তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমাদের সেই করুণাময়ী মাতার স্নেহদয়া অসীম। যখনই তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া উঠে, তখনই হৃদয় হইতে সংসারের সকল ভাবনা দূরে চলিয়া যায়। কোথায় বা মর্ম্মরখচিত অট্টালিকা, আর কোথায় বা স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের বিন্দুপরিমিত প্রেম, তখন সে সকলই তুচ্ছ অতিতুচ্ছ বলিয়া জানিতে পারি। তখন ইচ্ছা হয় যে সকল সংসার ছাড়িয়া গিরিকন্দর বৃক্ষতলে গিয়া সেই মাতার অতুলনীয় প্রেমের মধ্যে নিয়ত বাস করি। তাঁহারই সঙ্গে নিয়ত আহার বিহার করিতে, তাঁহার সহিত নিত্য বিচরণ করিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

এই উপাসনামন্দিরে প্রাণ খুলিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখ, আমাদের মাতা আমাদের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য এখনই এখানে দাঁড়াইয়া আছেন। সংসারের কোলাহল এখন পশ্চাতে পড়িয়া থাক্, সংসারের কথা যেন এসময়ে এক মুহূর্ত্তও আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়। যিনি আমাদিগকে সকলই দিতেছেন, তাঁহাকে একটীবার অনিমেষ নয়নে দেখিয়া লও, হৃদয়ের পূজা অর্পণ কর, জীবনের সঙ্গী করিয়া লও। আমাদের প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাক। তাঁহার কথা শোন—আমাদের অন্য কথা সকলই থামিয়া যাক। এসো, একবার মাতার চরণে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে বলি—ছাড়িব না কভু চরণ তোমার। প্রাণ মন সকলই তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণ হইতে দুঃখশোকের কঠোর ভার কেমন সহজে নামিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের অভিব্যক্তি।

১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বেদের নিত্যতা ও অভ্রান্ততা বিষয়ক বাদানুবাদ বড়ই তীব্রতা ধারণ করিয়াছিল। ১৭৬৮ শকে এই বিষয়ে জগদ্বন্ধু পত্রিকার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বাদানুবাদ প্রকাশেই চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজ বেদবেদান্তকে কতকটা অপৌরুষেয়, নিত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বর্ত্তমানে আর্য্যসমাজ বেদেতে সত্য ভিন্ন আর কিছুই উক্ত হয় নাই, এইভাবে বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজও পূর্ব্বে কতকটা সেইভাবেই বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। জগদ্বন্ধু পত্রিকায় একবার বেদ অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, এই কথা লেখা হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয় বাবু তাহার প্রতিবাদে অস্বীকৃত হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু তাহার প্রতিবাদ লিখিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন। এই সকল প্রতিবাদ আলোচনা করিলে দেবেন্দ্রনাথ ও তৎমতানুযায়ী ব্রাহ্মদিগের বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ে কি প্রকার মত অবলম্বিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহাদের এই মত ছিল যে "পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রেরই মনে সামান্যত ধর্ম্মজ্ঞানের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তিবশত তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়; সকল সময়ে জ্ঞানের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয় না। এই সময় মহাজনের বাক্য বিশেষ ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। এই মহাজনকে তপস্বী ঋষিই বল বা বেদান্তের ব্রহ্মাই বল, তাঁহার কথিত বাক্য বা বেদ দীপবৎ মোহান্ধকার দূর করিয়া দেয়।" আর একটী প্রতিবাদের উপসংহারে আছে যে "পক্ষপাত ও মোহন্যশূ

হইয়া সেই বেদভাবকে আমরা আলোচনা করিলে যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তখন বেদমধ্যে আমাদিগের বুদ্ধিসীমার অতীত সমুদয় ধর্ম্মও যে অখণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি সংশয় কি ?”

১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রশ্নোত্তরগুলির নিম্নে “কস্যচিৎ সভ্যস্য” (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যের) স্বাক্ষর দেখা যায়। আমরা দু একটী প্রশ্নোত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

১ম প্রশ্ন। বেদশাস্ত্র নিত্য কিনা ?

উত্তর। জন্মমৃত্যুশূন্য যে বস্তু তাহাকেই নিত্য বলা যায়, সুতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় না, কারণ শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে—“তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সম্বৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥ অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদঃ॥ শঙ্করাচার্য্যধৃতশ্রুতি॥ অতএব শ্রুতিতে যখন বেদের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কদাপি কূটস্থ নিত্য নহে, কিন্তু বহুকাল স্থায়ী প্রযুক্ত কোন কোন মুনিরা তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন। কূটস্থ নিত্য এক বস্তু ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই।” * *

৪র্থ প্রশ্ন। স্মৃতি আগম পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য কি না ?

৫ম প্রশ্ন। উক্ত শাস্ত্রাদির বচন গ্রাহ্য কিনা ?

উত্তর। অবিভাগে বেদবাক্য মাত্রই প্রামাণ্য, বেদার্থানুযায়ী যে স্মৃতি তাহাও সুতরাং মান্য, এবং বেদসম্মত বা বেদাবিরোধী যুক্তিযুক্ত যে পুরাণতন্ত্র তাহাও অবশ্য মান্য।

৯ম প্রশ্ন। বেদবাক্য তর্কাভাব কিনা ? *

উত্তর। তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে অমান্য করিবেক না।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ মনুঃ

* তঃ বোঃ পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৬৭।

কিন্তু বেদবাক্যের অর্থ তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ মনুঃ॥

১০ম প্রশ্ন। তর্কের দ্বারা যে বেদবাক্য যুক্তিসিদ্ধ হইবেক, ঐ বেদবাক্য সত্য, অন্য অসত্য কিনা ?

উত্তর। বেদবাক্যমাত্রেই সত্য, তাহার কোন অংশই অসত্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ মনুঃ॥
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥ মনুঃ॥

শ্রুতিই যখন সকল ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেন, তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে ধর্ম্মরক্ষা হয় ?” বেদের নিত্যতায় ব্রাহ্মসমাজের এই প্রকার বিশ্বাসের মূল যে রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশ, তাহা তাঁহারই উক্তি হইতে সপ্রমাণ হয়।

যাই হৌক, এই সময়ে অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই বিষয় লইয়া বিশেষ তর্ক উপস্থিত হয়। তাহার ফলে দেবেন্দ্রনাথকে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। অবশেষে জগদ্বন্ধু পত্রিকার সহিত বাদানুবাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং কাশীধামে যাইয়া বেদবেদান্ত আলোচনা করিয়া ১৭৬৯ শকে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। এই আলোচনার ফলে এই বৎসরের প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইলেন। তাই ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে সেই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ মন্ত্র শোভিত দেখিতে পাই—“অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণন্নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।” * এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্দ্দম মানসিক বলের পরিচয় তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না। শতসহস্র যুগ যুগান্তরের অর্জ্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্ব্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল, বিনা রক্তপাতে একটী মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল। বেদ অভ্রান্ত ও

* ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

নিত্য কিনা, সে বিচার এক্ষণে অনাবশ্যক, কিন্তু এই বিচার উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ ভারতে চিন্তার যে স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না।

এদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী ও উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহের এক মহাতরঙ্গ উঠিয়াছিল। সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল। লালা হাজারীলালের প্রচারপ্রণালী বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। হাজারীলাল ব্যতীত সেই সময়ে আরও দুইজন প্রচারক, হরদেব চট্টোপাধ্যায় এবং রাজনারায়ণ বসু মহোদয়দ্বয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। হরদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচারপ্রণালী কর্ম্মভিত্তি ছিল—কোথায় কোন্ কলেরা রোগী রহিয়াছে, কোথায় কোন্ পথিক আসন্নমৃত্যু অবস্থায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংবাদ পাইলেই সেখানে উপস্থিত। তাঁহার সেই সেবাগুণে বিস্তর লোক সেকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রচারপ্রণালী শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রীতিমূলক বক্তৃতা ও উপদেশের উপর গ্রথিত ছিল।

কলিকাতার বাহিরে মেদিনীপুরে সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। পরে সুখসাগর, বংশবাটী ও মণিরামপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক ব্রজসুন্দর মিত্র কর্ত্তৃক ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ১৭৭০ শকে বর্দ্ধমানে তদানীন্তন মহারাজ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই সমসময়ে কৃষ্ণনগরেও এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এই কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন তদানীন্তন হিন্দুসমাজপতি নবদ্বীপাধিপতির প্রাসাদে হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মহারাজা মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী প্রাচীনপন্থীদিগের পরামর্শে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশে বিরত হয়েন। অগত্যা ব্রাহ্মসমাজও কিছুকালের জন্য কৃষ্ণনগর হইতে উঠিয়া গেল। নবদ্বীপাধিপতি স্বীয় হৃদয়ের বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও এক যুগান্তর উপস্থিত হইত নিঃসন্দেহ। নবদ্বীপাধিপতির সহানুভূতির অভাব ঘটিলেও কৃষ্ণনগর বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃ স্থাপিত করেন।

এইরূপে একদিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আগম নিগমের প্রতি ধর্ম্ম ও জীবনের একমাত্র নিয়ামক বলিয়া যে অটুট শ্রদ্ধা ছিল তাহাও শিথিল হইয়া পড়িল। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জীবনের নিয়ামক কতকগুলি মূলমন্ত্রের বড়ই অভাব বোধ হইতে লাগিল। কোন্ মন্ত্র স্বীকার করিলে ব্রহ্মোপাসকের জীবন নিয়মিত হইতে পারে, এবং লোকসমক্ষে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর সভ্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, ব্রাহ্মগণ সেই বিষয়ে গুরুতর অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মোপাসনা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল বটে ; কিন্তু কিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য, তাঁহার উপাসনারই বা স্বরূপ কি, কিভাবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে, এই সকলের মূলভিত্তি তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতনকে চূর্ণ করা সহজ, কিন্তু তাহার স্থলে নূতন কিছু গড়িয়া তোলাই বড় কঠিন। ব্রাহ্মদিগের মতের মূলভিত্তি আবিষ্কার করিবার ভার স্বভাবতই দেবেন্দ্রনাথের উপর পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা বিশেষ কঠিন কার্য্য হয় নাই। এই সময়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনায় বিশেষভাবে নিরত ছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে তৎকৃত বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় একস্থলে * উক্ত হইয়াছে যে "পরমেশ্বরে এবং তাঁহার সৃষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি এবং তৎপ্রিয় কার্য্যসাধন, এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা।" দেবেন্দ্রনাথ ইহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

---

* ৩ অঃ, ৩ পাঃ, ৫৩ সূঃ।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ কয়টাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। সেই বীজচতুষ্টয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমৎ ধ্রুবং অপ্রতিমমিতি।

৩। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।

৪। তস্মিন্ প্রীতি স্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।*

১৭৭০ শকে দেবেন্দ্রনাথ এই বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া একখণ্ড কাগজে লিখিয়া তাঁহার বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলেন। এক বৎসর পরে সেই বাক্স হইতে তিনি উক্ত কাগজখানি বাহির করিয়া উক্ত বীজচতুষ্টয় আর একবার আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া যখন তিনি তাহাতে পরিবর্ত্তিত করিবার কোন কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি বুঝিলেন যে এই বীজগুলি ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মমতের বীজরূপে গৃহীত হইতে পারে, এবং তখন তিনি সেই বীজচতুষ্টয় ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজরূপে প্রদান করিলেন।

এই বীজচতুষ্টয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মিলনের এক অত্যন্ত উদার পত্তনভূমি, এক মহা সঙ্গমক্ষেত্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম বীজে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বাক্যে বলিয়াছেন যে কিছুই ছিল না, একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন এবং তিনিই এই সকল সৃষ্টি করিলেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বটে যে এই বীজের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিপ্রকরণের বিরোধ আছে। আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে সেরূপ কোন বিরোধ নাই। ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন, ইহার অর্থ এমন নহে যে তিনি প্রত্যেক বস্তু হাতে করিয়া গড়িলেন। ইহার ভাব এই যে তাঁহার আদেশে, তাঁহার নিয়মে এই সৃষ্টিকার্য্য ঘটিয়াছে; তাঁহার শক্তির বিকাশেই এই সৃষ্টি, ইহাই প্রথম বীজের তাৎপর্য্য। আমরা দেখিতেছি যে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই এই তত্ত্বেরই অভিমুখে চলিতেছে। দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, যে মতই সত্য বলিয়া গৃহীত হউক না কেন, এই বীজের সহিত কোনটারই বিরোধ ঘটিবে না, কারণ এই বীজনিহিত সত্য সকল সত্যের সাধারণ সত্য। দ্বৈতবাদী যেমন এই সৃষ্টি অস্বীকার করেন না, অদ্বৈতবাদীও সেইরূপ সৃষ্টি ব্যাপারটী অস্বীকার করিতে পারেন না, কেবল মায়া প্রভৃতি কথার অবলম্বনে সমস্ত সৃষ্টি যে সেই একেরই বিকাশ তাহাই নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। প্রথম বীজ সম্বন্ধে তবু কতকটা তর্ক বিতর্কের সম্ভাবনা থাকিলেও অপর তিনটী বীজ সম্বন্ধে সে সম্ভাবনাটুকুও আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেশ যখন সমাজের কঠোর দাসত্বশৃঙ্খলে, মানসিক পরাধীনতার কঠিন পাশে আবদ্ধ ছিল, সে সময়ে যে দেবেন্দ্রনাথ সেই কঠোর শৃঙ্খল কাটিয়া এই উদারতম অসম্প্রদায়িকতার মূলভিত্তি বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার আত্মার আশ্চর্য্য বলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একমাত্র এই বীজচতুষ্টয় দৃষ্টি করাই তাঁহাকে মহর্ষির আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারিত এই ধর্ম্মবীজমূলক উদার অসাম্প্রদায়িকভাবে চমকিত হইয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর তাঁহার খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা যদি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আলোচনা না কর, তবে অন্য জাতি, অন্য সম্প্রদায় তোমাদের স্থান অধিকার করিবে।" বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজের এই বীজমূলক উদারতাই বর্ত্তমান যুগের উদার ধর্ম্মমতসমূহের নেতা এবং মহাধর্ম্মপরিষৎ প্রভৃতির জন্মদাতা বলিতে পারি।

পরলোকগত ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে

---

* ১। পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটী সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনামেব' ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটী মহর্ষির নিজের রচিত। বাইবেলে এইরূপ একটী বাক্য আছে—"সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমার ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তোমার প্রতিবাসীদিগকে নিজের ন্যায় দেখ।" মহর্ষির বাক্যটী বাইবেলোক্ত উক্ত রচনা অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ বাইবেলে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়াছে। কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটী অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা।" রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এই ভাবের কথা থাকিলেও এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি করা এবং বীজমন্ত্রের আকারে তাহাকে একটা বিশুদ্ধ গঠন দিয়া সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতের ধর্ম্মজগতে দেবেন্দ্রনাথের আসন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্ম।

(শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)

মনুষ্য স্বভাবত ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ পাইয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং তাহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা প্রাপ্তির নিয়মের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মনুষ্যকে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মানব যাহাতে ত্রিবিধ তাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া যথার্থ সুখ বা পরমানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহারই জন্য ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শনে আছে—"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের অতিক্রমকারী আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যে নিবৃত্তির ফলে উক্ত তাপত্রয় কেবল যে ক্ষণেকের জন্য নিবৃত্ত হয় তাহা নহে, পরন্তু আর কখনও উদ্ভূত হয় না সেই নিবৃত্তিই মানবের পক্ষে পরম পুরুষার্থ বা প্রয়োজন।

যে তাপ বা ক্লেশ আমরা শরীর ও মনে অনুভব করি তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ। জ্বরাদি জন্য আমরা শরীর ও মনে যে তাপ বা কষ্ট প্রাপ্ত হই তাহাকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায়। চৌর তস্কর সর্প ব্যাঘ্র আদি অপর জীবজন্তু হইতে যে কষ্ট বা দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আধিভৌতিক তাপ এবং শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বজ্রাঘাত উল্কাপাত প্রভৃতি যে সকল দুঃখ দৈবনিবন্ধন পাওয়া যায় সে গুলিকে আধিদৈবিক তাপ বলা যায়।* এই তাপত্রয়ের অতিরিক্ত মানবের অন্য কোন তাপ বা দুঃখ অনুভূত হয় না। এখন দেখা যাউক যে ধর্ম্ম কাহাকে বলে। ধৃ ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করিলে "ধর্ম্ম" পদ সিদ্ধ হয়। ধৃ ধাতু ধারণার্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা ধারণ করা যায় বা যদ্দারা ধারণ করা যায় অর্থাৎ যদ্দারা ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির বিষয়সমূহ ধারণ করা যায়, এক কথায়, যাহা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ভগবান কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনে লিখিয়াছেন—যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ অর্থাৎ যদ্দারা মানবগণের ইহকালে সাংসারিক উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং পরকালে নিঃশ্রেয়স বা পরা মুক্তি উপভোগ করণে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। ধর্ম্ম কেবল পরকালেরই জন্য উপযোগী নহে। যদ্দারা আমরা পুরুষকারের সাহায্যে ইহলোকে সুখসমৃদ্ধি লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া জীবনান্তে পরকালে পরমাত্মার অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায়। যদ্দারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফললাভে সমর্থ হওয়া যায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে।

---

* কোন কোন আচার্য্যের মতে এবং লেখকের পূজ্যপাদ গুরু মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতে জ্বরাদি জন্য তাপ প্রভৃতি যাহা কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা অনুভূত হয় তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ, যাহা অপর প্রাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা আধিভৌতিক এবং দিব্যগুণযুক্ত মন ইন্দ্রিয়বিকার, অশুদ্ধি ও চিত্তবিকারাদি যে তাপ অনুভব করে তাহাই আধিদৈবিক তাপ।

অভিধানে ধর্ম্মশব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা—গুণ, কর্ম্ম, শক্তি, স্বভাব, রীতি যম ইত্যাদি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধর্ম্মশব্দের অন্যান্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র যদ্দারা মানবের যথার্থ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সাধিত হয় সেই অর্থই গৃহীত হইবে। শাস্ত্রে আছে—প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।

ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিজ হিত বুঝিতে পারে না তাহাকে আত্মঘাতী বলা যায়।

মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম যে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা বলিয়াই আসিয়াছি যে যদ্দারা মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার উন্নতি সাধিত হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। যাহা দ্বারা কেবল ঐহিক উন্নতি মাত্র সাধিত হয়, তৎসঙ্গে পারলৌকিক কোন প্রকার উন্নতি সাধিত হয় না তাহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। যদিও ঐহিক অপেক্ষা পারলৌকিক উন্নতিই ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্ম্য পুরুষকারের সাহায্যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করত ইহকালেও উন্নতি প্রাপ্ত হয়েন ও জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করেন এবং দেহান্তে পরা মুক্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। পরলোকে উন্নতি সাধনে ধর্ম্মের ন্যায় মানবের দ্বিতীয় সহায় নাই।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভূংক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥
ধর্ম্মঃ প্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষং।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খ-শরীরিণং॥

মনু অঃ ৪, শ্লো ২৩৮-২৪৩

উপরোক্ত মনুবচনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পরলোকে জীবের নিজকৃত ধর্ম্ম বা সুকৃতি ভিন্ন অপর কেহই কোন প্রকারে সহায়তা করিতে সমর্থ হয় না। এই ধর্ম্মসাধনে বলিদান প্রভৃতি কারণে পশুহিংসার পরিবর্ত্তে জীবমাত্রেরই প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রকাশ করিতে হইবে। আমাদের দেশে সাধারণত হিন্দুদের মধ্যে ধারণা আছে যে, গয়াধামে পিণ্ডাদি প্রদান করিলে ও তথায় ফল্গু নদীতে তর্পণ করিলেই মৃত ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই প্রকার আরও অনেক বিশ্বাস আছে, যেগুলি উক্ত মনুবচন হইতে কেবল ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে না, কিন্তু স্পষ্টই অনিষ্টকর। ঐ সকল বিশ্বাস ও ধারণা সত্য হইলে ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনান্তে পিণ্ডাদির ব্যবস্থা* করিয়া সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রমুক্ত পুরুষ হইতে পারিতেন। মনু তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন—এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ” একমাত্র ধর্ম্মই মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে। এই কারণে ধার্ম্মিকগণ এই পরম সহায় ধর্ম্মকে কদাপি পরিত্যাগ করেন না। মহাভারতে আছে—ন জাতুকামান্ন-লোভাদ্ধর্ম্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ, অর্থাৎ কাম, ভয়, লোভ, এমন কি পরমপ্রিয় নিজের প্রাণের জন্যও ধর্ম্মকে ত্যাগ করা বিধেয় নহে। মনু বলিয়াছেন—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥

মনু ৮ম অঃ, ১৫

ধর্ম্মকে যে নষ্ট করে, ধর্ম্মও তাহাকে নষ্ট করেন এবং ধর্ম্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন ; অতএব ধর্ম্মকে নষ্ট করা উচিত নহে এবং ধর্ম্ম যেন নষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট না করেন। ধর্ম্ম কোন কালেই আমাদের অতিক্রমণীয় নহেন। আমাদের সর্ব্বদাই সাবধান হওয়া উচিত, যেন ধর্ম্ম অতিক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে বিনষ্ট না করেন। মানবগণ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্তির কারণেই লোকসহায়ক ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হয়।

ডাকা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

তোমারি দুয়ারে আসিয়াছি প্রভু
বিরহের জ্বালা লয়ে।

---

* আমাদের বিশ্বাস যে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ পিণ্ডাদির প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। তঃ বোঃ সং।

তুলে মোরে কোলে দাও শান্তি
দগ্ধ তপ্ত হৃদয়ে ॥

জানি না কেমনে ডাকিবার মত
তোমারে ডাকিব হায়—
প্রাণের মাঝারে ডাকা আসে তাই,
প্রাণ সদা ডেকে যায় ॥

ডাকের ভিতর অবোধের মত
বলে যাই কত কথা।
তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে তাহে
কত জাগে মর্ম্মব্যথা ॥

ডাকিবার মত শিখাও হে ডাকা,
কাঁদিতে শিখাও আর।
তব পদে যাহে পারি গো নামাতে
পাষাণ হৃদয়ভার ॥

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়ত পুরোহিতগণকে জঙ্গম বলে। জঙ্গম দুই শ্রেণীভুক্ত। প্রথম বিরক্ত বা সন্ন্যাসী, দ্বিতীয় গুরুস্থলী বা সংসারী। বিরক্তগণের বিবাহ করিবার অধিকার নাই। গুরুস্থলীরা বিবাহ করিয়া পুত্র কালত্রসহ বাস করেন। বিরক্তগণ গুরু বা পুরোহিতের কার্য্য করেন না। তাহারা কেবল শাস্ত্র পাঠ বা শাস্ত্র ব্যাখ্যান ও উপদেশ প্রদান কার্য্যে নিরত থাকেন। ইহাঁদের সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু ইহাঁরা দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরা বৃদ্ধ হইলে কোন সাধু গুরুস্থলী জঙ্গম বালককে শিষ্য এবং উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন। গুরুস্থলী জঙ্গমেরা গুরু এবং পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ লিঙ্গায়তের ন্যায় বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

বিরক্তগণ মঠে বাস করেন এবং সর্ব্বদা মঠের ভিতরেই থাকেন। তাঁহাদের চরন্তি নামক প্রধান শিষ্যগণ নানা স্থানে গমন করিয়া অর্থ শস্য বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে—এবং মঠের কার্য্যাদি করিয়া থাকে। চরন্তিগণের অধীন দুই হইতে দ্বাদশটী সহকারী থাকে। ইহাদিগকে মরিস বা যুবা কহে। মরিসগণ বৃদ্ধ হইলেও যুবা নাম হইতে বঞ্চিত হয় না। মরিসগণ পূজার জন্য পুষ্প সংগ্রহ, বর্ত্তনাদি ধৌত করা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। চরন্তি এবং মরিসগণ গুরুস্থলী জঙ্গম বংশ হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণ লিঙ্গায়তগণের এই পদ পাইবার অধিকার নাই। যে সকল চরন্তি বা মরিসের ভবিষ্যতে বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহারা বিবাহ করে না। অপর সকলের বিবাহ করিবার অধিকার আছে।

মঠের অধ্যক্ষকে পাটদয়া বলে। ইহাঁরা সকল ধর্ম্মকর্ম্মের তত্ত্বাবধারক এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যের বিচারক। লিঙ্গায়তগণের মধ্যে কেহ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিলে ইহাঁরা তাহাদিগের অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। এই অর্থ মঠের প্রাপ্য। গুরুতর অপরাধ করিলে জাতিচ্যুত করিবার ক্ষমতাও ইহাঁদের আছে। জাতিচ্যুত ব্যক্তিগণ অর্থদণ্ড দিলে সমাজ মধ্যে পুনর্গৃহীত হইতে পারে।

বিরক্তগণ মঠ মধ্যেই বাস করেন এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করাও অনুচিত বিবেচনা করেন। গুরুস্থলীগণও মঠে বাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়গণের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। কয়েকটী মঠ চরন্তিদিগের অধীনেও আছে।

প্রতিদিন প্রাতে এবং সায়ংকালে মঠমধ্যে বিরক্ত বা পাটদয়াগণ পুষ্পাদির দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া থাকেন। তৎপরে শিষ্যগণ তাঁহাদের পদ ধৌত করিয়া উক্ত জল (ধূল পদক) উপস্থিত লিঙ্গায়তগণের অঙ্গে নিক্ষেপ করে। তদনন্তর প্রধান বিরক্তের পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত করিয়া উক্ত জল দ্বারা তাঁহার গলদেশলম্বিত লিঙ্গকে ধৌত করিয়া রাখে। এই জলকে করুণা কহে। ইহা অতি পবিত্র। জঙ্গম এবং সাধারণ লিঙ্গায়ত সকলেই এই জল অতি ভক্তির সহিত পান করিয়া থাকে।

জঙ্গমগণ তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দিরে সকলে মিলিত হইয়া আহার করিয়া থাকেন। প্রথমে একখানি গালিচা বা সতরঞ্চ বিছাইয়া তাহার উপর সকলে উপবেশন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে

এক একখানি ক্ষুদ্র চৌকি রাখা হয়। এই চৌকির উপর রৌপ্য, কাংস্য বা পিত্তলের থালা রাখিয়া তদুপরি আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করা হয়। ভোজনান্তর ঐ সকল পাত্রাদি তাঁহারা নিজেরাই ধৌত করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখেন। তৎপরে যে জল দ্বারা পাত্র সকল ধৌত হয়, সেই জল তাঁহারাই পান করিয়া থাকেন। উক্ত জল অন্যত্র প্রক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য যে পাত্র ধৌত করিতে তাঁহারা অতি অল্পই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। জঙ্গমদিগের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্যের নাম মুর্গ্যাস্বামী। তিনি মহীশূরের চিতলদ্রুগ নামক স্থানে বাস করেন।

লিঙ্গায়তগণের মধ্যে এক গুরুর শিষ্য বা এক বংশসম্ভূত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ইহারা প্রথমে জ্যোতিষ মতে কোষ্ঠিগণনা করিয়া বিবাহের মিল বা শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকে। তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয় এবং উক্তদিবস বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের শুভাগমন জন্য পান সুপারি বিতরণ ও ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হয়।

বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে কন্যার বাটী হইতে বরকর্ত্তাকে একখানি পত্র, দুখানি বিছানার চাদর, পাঁচটি নারিকেল, পাঁচখানি তালপত্র, পাঁচ সের চাউল, পাঁচটি পাতিলেবু, পাঁচটি সুপারি, পাঁচখানি হলুদ, পাঁচ টুকরা মিছরি প্রেরিত হয়।

বিবাহের দিন বর স্বপক্ষীয়গণের সহিত কন্যার গ্রামে আসে এবং গ্রামের বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে। কন্যাপক্ষীয়গণ এই সংবাদ পাইবামাত্র সদলবলে পুরোহিত ও বাদ্যগীত সহ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করে এবং তৎপরে তাহাদিগকে গ্রাম মধ্যে আনয়ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসভবনে লইয়া যায়।

পরদিবস প্রাতে কন্যার বাটীতে পাঁচটি মাটির হাঁড়ি পূজা করা হয়, তৎপরে কন্যাকে লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজন বরের বাসায় গমন করে। তৎপরে বরকন্যাকে কাষ্ঠের চৌকীর উপর বসাইয়া তাহাদের গায়ে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেয়। অপরাপর হিন্দুগণের ন্যায় এই কার্য্যে পাঁচজন "এয়ো"র প্রয়োজন হয়। যে সকল স্ত্রীর প্রথম স্বামী বর্ত্তমান আছে তাহারাই এয়ো হইতে পারে। গাত্রহরিদ্রার পর এয়োগণ বরকন্যার চারিদিকে পাঁচবার সূতার দ্বারা বেষ্টন করে। এই সূতার নাম "সুর্গিসূত্র" বা উদ্বাহ সূত্র।

পরদিবস বরকন্যার গাত্রে পুনরায় তৈল ও হরিদ্রা মর্দ্দিত হয় এবং তাহাদিগকে পবিত্র উদক পান করান হয়। তৎপরে কন্যার পক্ষ বরের বাটীতে পাত্রপূর্ণ মিষ্টান্ন, "সিদা" এবং এক কলসী জল পাঠাইয়া দেয়। বরপক্ষ এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে এবং বাদকদিগকে সুপারি, বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও অর্থ দ্বারা পরিতুষ্ট করে। বর ও কন্যা উভয় পক্ষই নিজ নিজ বাটীতে দেবতার আরাধনা করায় এবং দেবমন্দিরে পূজা বা সিদা পাঠাইয়া দেয়। তৎপরে উভয় পক্ষই দেবমন্দিরে তৈলপ্রদীপ প্রেরণ করে।

পরদিবস বিবাহিতা স্ত্রীগণ পুনরায় বরকন্যার গাত্রে হরিদ্রা ও তৈল মাখাইয়া দেয় এবং পুরোহিতগণ পবিত্র জল প্রস্তুত করিয়া উভয়কে পান করিতে দেন। এই দিবস কন্যার বাটী হইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি বরের বাসায় প্রেরিত হয় এবং উক্ত খাদ্য বর স্বয়ং আহার করে। তৎপরে বরের পিতা বরকে একখানি থালার উপর দাঁড় করাইয়া তাহার পদ ধৌত করিয়া দেয় এবং সস্ত্রীক উক্ত পাত্রে লাল গুঁড়া প্রক্ষেপ করে।

তৎপরে বর বিবাহসজ্জা পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে টোপর এবং কপালে বিভূতি মাখিয়া বৃষভবাহনে সদলবলে দেবমন্দিরে যাইয়া পূজা করে এবং তদনন্তর কন্যার বাটীতে গমন করে। বর বিবাহসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে একখানি খাটের উপর বসিতে দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা বরকে নব বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপহার দেয় এবং বরের গণ্ডদেশে হস্তে ও পদে হরিদ্রার গুড়া মাখাইয়া দেয়। তৎপরে বরকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া দান কার্য্য সমাপ্ত করা হয়।

প্রথমে "বরকনে"কে একখানি তণ্ডুলাবৃত গালিচায় বসান হয়। তাহাদের দক্ষিণ দিকে দুইটি অবিবাহিত কন্যা বা কুমারীকে বসিতে দেওয়া হয় এবং তাহাদের সম্মুখে পাঁচটি কুম্ভে হিরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা তাম্রমুদ্রা রাখিয়া দেওয়া

হয়। এই পঞ্চ পাত্রের নাম "পঞ্চ কলস।" তৎপরে পঞ্চকলসের উপর পান রাখিয়া তাহাদের চারিদিকে পাঁচবার সূত্র দ্বারা বেষ্টন করা হয়। এই সূত্রের অগ্রভাগ পুরোহিতের হস্তেই থাকে। সূত্রের যে অংশ পঞ্চকুম্ভের চারিদিকে বেষ্টিত থাকে তাহার নাম "সূর্গি" এবং যে অংশ বর ও পুরোহিতের মধ্যে থাকে তাহার নাম "গুরুসূত্র।" এই সময় পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকেন এবং পাত্রী পাত্রের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া থাকে। তৎপরে মঠপতি একটি পাত্রে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া কিয়দংশ বরের দক্ষিণ হস্তে প্রদান করে। "কনে"কে ইহা স্পর্শ করিতে হয়। তদনন্তর বরকনের হস্ত পঞ্চবার ধৌত করিয়া দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিত এবং উপস্থিত বর ও কন্যাযাত্রগণ "বরকনের" মস্তকে লাল গুঁড়ামিশ্রিত তণ্ডুল নিক্ষেপ করে। পুরমহিলাগণ আঁচলা করিয়া উক্ত তণ্ডুল তাহাদের মস্তকে ঢালিয়া দেয়, এবং উভয়ের সম্মুখে প্রদীপ লইয়া আরতি করে।

ইহার পর পুরোহিত মঙ্গলসূত্রকে পুষ্প, লাল গুড়া ও শশা দ্বারা পূজা করেন এবং পঞ্চ এয়োগণ এই সূত্র নববধূর কণ্ঠদেশে বাঁধিয়া দেন। এই সূত্র স্ত্রীকে স্বামীর জীবনান্ত পর্য্যন্ত কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়। ইহাই এ দেশে বিবাহিত স্ত্রীর চিহ্ন, এয়োতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকুম্ভবেষ্টক সূত্রের যে অংশ বর এবং পুরোহিতের হস্তে থাকে তাহা বরের দক্ষিণ হস্তের কবজির উপর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম গুরুকঙ্কন। তৎপরে বরকন্যা উঠিয়া পুরোহিত, গুরুজন এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রণাম করে। ইহার পর যথাসাধ্য ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। তৎপরে নৃত্য বাদ্য সঙ্গীতাদির দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করা হয় এবং "বরকনে" লইয়া সকলে জাকজমকের সহিত দেবমন্দিরে গমন করে।

বিবাহের পর বরকন্যা প্রথমে বরের ভগ্নীর গৃহে প্রবেশ করে। সে সময় বরের ভগ্নী তাহাদিগকে বাধা দিয়া প্রথমে শপথ করিতে বলে যে তাহাদের কন্যা হইলে তাহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিবে। বরের ভগ্নী না থাকিলে অপর কোন স্ত্রীলোক দ্বারা বা আত্মীয়ের ভগ্নীর দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। তৎপরে উভয়ে বরের মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করে।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী একটি বৃষভ-জিনের উপরে বসিয়া থাকেন। বরকে তাহার দক্ষিণ উরুতে এবং কন্যাকে বাম উরুতে বসিতে দেওয়া হয়। তৎপরে তাহারা উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করে। এই সময়ে পঞ্চ এয়ো বরের মাতাকে প্রশ্ন করে "এই দুইটি ফলের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব অধিক।" তিনি উত্তর করেন "দুইটিই সমান"। তৎপরে বিবাহিত স্ত্রীরা তাঁহাকে উপদেশ দেয় যে তিনি যেন চিরদিন উভয়কেই সমানভাবে দেখেন।

এই সকল ক্রিয়া সমাপন হইবার পর "বরকনে" উভয়কে উদ্বাহমঞ্চে লইয়া যাওয়া হয় এবং ক্ষৌরকার আসিয়া তাহাদের হস্তপদে হরিদ্রা লেপন করিয়া দেয় এবং পঞ্চ এয়োগণ তাহাদিগকে স্নান করাইয়া দেয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে উপরি-উক্ত সমস্ত কার্য্যই কন্যার গ্রামে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবাহের পর বর এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ নিজ গ্রামে বা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। নববধূ পিত্রালয়েই থাকিয়া যায়। পুনর্বিবাহের পর তাহাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণের শবসৎকার প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিব। যখন কোন লিঙ্গায়ত জঙ্গমের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন একজন পুরোহিতকে তথায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে স্নান এবং নববস্ত্র পরিধান করাইয়া একখানি গালিচার উপর বালিশে ঠেস দিয়া বসান হয়। পুরোহিত উপস্থিত হইবামাত্র দুইবার তাঁহার পদ ধৌত করাইয়া উক্ত জলের কয়েক বিন্দু মৃতবৎ ব্যক্তিকে পান করিতে দেওয়া হয়। তৎপরে পুরোহিত তাহার অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দেন এবং গলদেশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেন। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি উক্ত পুরোহিতকে পান, সুপারি এবং কিছু বিভূতি ও অর্থ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করে।

মৃত্যুর পর পুরোহিতকে পুনরায় আনয়ন করা হয়। প্রধান পুরোহিত মৃত ব্যক্তির মস্তক স্বীয় পদ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং মঠপতি মৃত দেহের

উপর পুষ্প নিক্ষেপ করেন। তৎপরে মৃতদেহকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া একখানি সজ্জিত পর্য্যঙ্কে শায়িত করা হয়। এই সময় মঠধারী একখণ্ড নব বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলেন। ইহার তাৎপর্য্য যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হইল। তৎপরে শবদেহ শ্মশানাভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্মশানে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে শব সাবধানে নামাইয়া শবের অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কারাদি খুলিয়া লইয়া মৃত ব্যক্তির পুত্র বা উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হয় এবং তাহার উষ্ণীষ উক্ত ব্যক্তির মস্তকে রক্ষিত হয়।

তৎপরে দুইজন পুরোহিত যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য গর্ত্ত করা হইয়াছে তথায় গমন করিয়া শবযাত্রিগণের নিকট ফিরিয়া আইসেন। লিঙ্গায়তগণ এই দুই ব্যক্তিকে শিব-দূতের প্রতিনিধিস্বরূপ মনে করে।

তৎপরে মৃতব্যক্তিকে নববস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর এক-জন পুরোহিত সেই গর্ত্তে নামিয়া মৃতদেহের নানা স্থানে একবিংশটী তাম্র মুদ্রা রক্ষিত করে। তদ-নন্তর একখণ্ড বস্ত্র ঐ গর্ত্তের উপর রক্ষিত হয় এবং সকলে সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে এবং উক্ত বস্ত্রের উপর বিল্বদল পুষ্প গন্ধাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। ইহার পর প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অল্পবিস্তর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ গর্ত্তটি পূর্ণ করিয়া ফেলে। তৎপরে পুরোহিত ঐ কবরের উপর যাইয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার পদতলে পুষ্পাদি নিক্ষেপ এবং একটি নারিকেল ভগ্ন করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃতব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাটীর চারিদিকে শান্তিজল নিক্ষেপ করিয়া গৃহ সংস্কার করিয়া থাকে। লিঙ্গায়তগণের অশৌচ ব্যবস্থা নাই। তবে প্রায় এক মাস পরে পুরোহিত ও আত্মীয়গণকে ভোজন করান হয়।

রাণাডের স্মৃতি কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার বিবাহ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সে যাক্, তাঁহারা যেদিন চলিয়া গেলেন সেইদিন সন্ধ্যাকাল প্রায় ৬৷৷০ টার সময় কোর্ট হইতে বাড়ী আসিয়া আমার স্বামী আমাকে ছাদের উপর ডাকিয়া আনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পিতা কি চলে গিয়েছেন?" আমি বলিলাম,—"হাঁ"। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে তোর বিবাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কে, আমার নাম কি, এই সব তুই কি জানতে পেরেছিস্? আমি ঘাড় নাড়িয়া বলি-লাম "হ্যাঁ"। "আচ্ছা বল্ দিকি আমার নাম কি।" তখন, লোকেরা যে নামে তাঁকে ডাকে সেই সমস্ত নামটা বল্লেম। (যাই হোক না কেন, তখন লজ্জা কি তা বুঝ-তেম না) কিন্তু তাহা শুনিয়া মনে হল যেন তিনি একটু সন্তুষ্ট হলেন, এটা আমার খুব মনে আছে। তার পর, আমার বাপের বাড়ীর সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ও আমিও, যা আমার জানা ছিল, সমস্ত বলিলাম। লেখা-পড়ার কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি লেখাপড়া কিছুই জানিতাম না। তাই তিনি সেই রাত্রেই এক শ্লেট ও পেন্সিল আনাইয়া "শ্রীগণেশায় নমঃ" --এই পদের প্রথম ৭ অক্ষর এই পাঠ অভ্যাস করিতে দিলেন। তখনো পর্য্যন্ত শ্লেটের ১১ অক্ষর আমার পরিচয় না হওয়ায়, ঐ ৭ অক্ষর না দেখিয়া লিখিতে ও চিনিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। তখনো অক্ষর পরিচয় পাকা হয় নাই। দ্বিতীয় দিন হইতে প্রতিদিন রাত্রে দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমার শিক্ষার জন্য একটা পাঠ-ক্রম স্থির করি-লেন এবং মূল অক্ষরগুলি ও অক্ষরের ১২ বর্ণ প্রভৃতি শিখাইয়া প্রায় ১৫ দিনের দিন, আমাকে দিয়া প্রথম পুস্তকের প্রথম-পাঠ পাঠ করাইলেন। সেইদিন মনে হইল যেন তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এইখানে, যে সব কথা সহজে আমার মনে পড়িতেছে তাহা বলিতেছি—

আমার বাপের বাড়ীর লোকেরা অর্থাৎ যাহাদের প্রকৃত মারাঠী চাল-চলন সেই সব জায়গীরদার;—তাঁহা-দের বংশে, পিতৃগৃহবাসিনী ৮ বৎসরের বেশী বয়সের মেয়েরা, গুরুজনদের সম্মুখে ঘরের দাওয়াতেই আসিতে পারে না, তো খেলা কিম্বা গান করা আর কি করিয়া হইবে? লিখিবার ত নামই নাই। আমার এক বড় পিসী, যাঁহার শ্বশুরালয় ব্রহ্মাবর্ত্তে ছিল, তিনি কেবল

ব্যঙ্কটেশ স্তোত্র প্রভৃতি পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈধব্য ঘটিবার পর হইতে আমাদের বড় খুড়ী স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা 'সয় না' বস্। এইরূপ শুনিবার পর, লিখিবার কথা শুধু মনে আনিলেও পাপ হইবে কি কি-হইবে এইরূপ বাড়ীর সব মেয়েদের আশঙ্কা হইতে কি আর বিলম্ব হয়? এই অনুসারে, সব মেয়েদেরই এইরূপ ধারণা হওয়ায়, আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার গন্ধ পর্য্যন্ত না থাকাই স্বাভাবিক। আমার দুই ভগিনীরই বিবাহ ৫ ও ৭ বৎসর বয়সে হইয়াছিল। কেবল আমার বিবাহই ১১ বৎসরে হইয়াছিল। আমার ভগিনী শ্বশুর-বাড়ী যাইবার পর, আমার খেলিবার সাথী কেহ ছিল না। আমার যে মিত্রাণী ছিল, সে রোজ আসিত না। কারণ আমার পিতার স্বভাবটা বড় কড়া ছিল। তাঁহার মেয়েরা কোথাও গিয়া খেলা করে, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাহিরের মেয়েরাও আসিয়া যে চেঁচা-মেচি করিবে, টানাটানি করিবে, দৌৎকামি করিবে ইহাও তাঁহার ভাল লাগিত না। এইজন্য পিতা ধানের গোলা প্রভৃতি স্থানে গেলেও সেইদিন সেখানে সকলকেই যাইতে হইত। এই কারণে একদিন শরীর খারাপ ছিল বলিয়া,—আমার বড় ভাই বাড়ী ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গ ধরিলাম এবং তাঁহাকে গল্প প্রভৃতি পড়িতে দেখিয়া আমার বড় কৌতূহল হইল; এবং কি করিয়া তিনি এই সব পড়িতে পারেন মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সরকারী কাজে ও ঘোরো মোকদ্দমা মামলার জন্য আমার পিতাকে প্রায়ই মফস্বলে যাইতে হইত। তিনি চলিয়া গেলে তাঁর পত্রাদি আসিত। আমার ভাই সেই সকল পত্র মাকে পড়িয়া শুনাইতেন। কিন্তু আমি সে-দিকে লক্ষ্য করিতাম না। একদিন আমার পিতা মফঃ-স্বলে যাত্রা করিবার পর, আমার ভাই বাড়ীর উঠানে একলা আছেন দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট গেলাম। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কোন ছেলেপিলেই তাঁহার নিকট কখনও যাইত না। কারণ, আমার জন্মাবার পূর্ব্বে এক বৎসর আমার ঠাকুর মা (আজী) জীবিত ছিলেন। তাই তিনি জীবিত থাকিতে কোন ছেলে-পিলের সঙ্গে আমার ভাই কথা কহেন নাই। তবে ছেলে পিলের তত্ত্বাবধান করিবেন কি করিয়া? ঠাকুরমার মৃত্যুর পর আমার জন্ম হয়। সেইজন্য পরে, আমাকে খাওয়া-বার ও ঘুম পাড়াইবার ভার আমার ভাইকে লইতে হইত, আদর যত্ন করিতে হইত। তিনি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এলে? তোমার কিছু চাই?" আমি বলিলাম,—"তুমি যখন পুণার যবে, আমার জন্য পুঁতির পুতুল ও একটা শাড়ী এনো। ভুলো না—এনো।" এই কথা বলিয়াই আমি ছুটিয়া পলাইলাম। তিনি পুতুল আনিবার আগে এ কথা কাহাকেও জানাইবেন না, এইরূপ আমি মনে করিয়াছিলাম। তদনুসারে কেহ শুনে নাই এই-রূপ আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। পরে দুপুর বেলায় আপ্পা সাহেব পুণায় গেলেন। "তাঁকে কি কি জিনিস তুই আনতে বলিছিস্ রে" আমার পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কোন কিছু জিনিস্?—কোন কিছু জিনিস?" কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। খেলিতে চলিয়া গেলাম। পরে, ৭।৮ দিনের মধ্যে পুণা হইতে তাঁর পত্র আসিল। সেই পত্রের শেষে আমাকে আশীর্ব্বাদ লিখিয়া —"তোর শাড়ী ও পুতুল নিশ্চয়ই আনিব। ভুলিব না" এইরূপ লিখিত হওয়ায়, তাহা পাঠ করিয়া "দাজী (?) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরে চোট্টা, পরশুদিন, পিসিমা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তুই পালিয়ে গেলি; কিন্তু তুই আপ্পা সাহেবকে যে জিনিস আন্বার জন্য বলেছিলি, তা আমি জানি।" আমি বলিলাম,— "জানতে আর হয় না, তুই কি দেবতা? কেবল আমার গণপতিই (আমি রোজ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতাম) জানেন। কিন্তু তিনি ত আমার। ঐটী তিনি কাকেও বল্‌বেন না।" সে খুব জোরের সহিত বলিল, "আরে যা। তোর গণপতি কি জানে? আমি জানি, তুই পুঁতির পুতুল ও শাড়ী আন্‌তে বলেছিস ত?" এই কথা শুনিয়া আমি একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সে কি করিয়া জানিতে পারিল, ইহা আমার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। একটু পরেই সে নিজ অভ্যন্ত কামরায় চলিয়া গেল দেখিয়া আমি সেখানে গেলেম এবং খুব কাকতি মিনতি করিয়া বলিলাম,—"দাজী, এ তুই কি করে' জান্‌লি আমাকে বল্।" সে বলিল,—"ওরে, তাঁর যে পত্র আজ এসেছে তাতেই ওকথা লেখা আছে।" আমি এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—"পত্র এসে থাক্‌বে, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি তুই কি করে' জান্‌লি?" সে বলিল—"ওরে, তিনিই লিখেছেন।" আমি বলিলাম—"তিনি লিখে থাক্‌বেন, কিন্তু তুই কি করে টের পেলি?" আমার জিজ্ঞাসার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে নাই; সেইজন্ত পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তবু আমার জেদ্ আমি ছাড়িলাম না। তখন সে আরো বিরক্ত হইয়া আমাকে এমন এক থাপ্পড় দিল যে, সেই দিন হইতে আর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হইলাম না। ছেলেমানুষ বলিয়া আমি শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম। এখন একটু পড়িতে পারি; এবং তৃতীয় পাঠ্য পুস্তকের ছোট ছোট গল্প পড়িয়া তাহার পূর্ব্ব দিনের গল্প আমার মনে পড়িল ও খুব আনন্দ হইল। যেন অনেক দিনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল এইরূপ মনে হইল। সে কথা যাক্।

কিন্তু পরে পুস্তকের ইয়ত্তা (standard) অনুসারে পদ্ধতি ক্রমে আমার শিক্ষা আরম্ভ হইল। ব্যাকরণ, গণিত, মোড়ী অক্ষর ও দেবনাগরী অক্ষর লেখা, পড়া—এইরূপ সুরু হইল। আমার স্বামী রোজ রাত্রে নিয়মিত দুই ঘণ্টা সময় দিতে পারিবেন না বলিয়া এই শিক্ষা দিবা-ভাগে দিবার জন্য, পরে দুই তিন মাস, "ফিমেল ট্রেনিং কালেজ" হইতে এক শিক্ষয়িত্রী (মাষ্টারণী) রাখা হইল। ঐ পর্য্যন্ত শিক্ষার আনন্দ। সেই মাষ্টারণীকে ভয় করবে কে? তিনি আসিলে পর শ্লেট ও পুস্তকাদি খুঁজিতেই অর্দ্ধঘণ্টা কাটিত। মাষ্টারণী অল্পবয়স্কা। তিনি কি করিয়া আমায় শাসনে রাখিবেন? তাঁকে স্কুলের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতাম। একবার বলিতে আরম্ভ করিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেন। প্রায়ই "আগে পড়, তারপর গল্প করব" এইরূপ স্পষ্ট বলিবার পর তবে আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম। দুই এক পৃষ্ঠা হইতে না হইতেই ঘণ্টা পূর্ণ হইবামাত্র তিনি চলিয়া যাইতেন। শিক্ষা হইয়া গেল। মাষ্টারণীর আসা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিনে, শ্লেট পেন্‌সীল পুস্তকের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইত না। এইরূপে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে তিন মাসের ছুটি লইয়া আমার স্বামী এলাহাবাদ, কাশী, কলিকাতা ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ দেখিবার জন্য, নারায়ণ-মহাদেব-পরমানন্দ, রাঃ বালমঙ্গেশ ওয়াগ্লে ও রাঃ শঙ্কর-পাণ্ডুরং পণ্ডিত ও আরো কতকগুলি বন্ধুবর্গের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। আমি পুনাতেই ছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া আসিলে পর, একদিন আমার স্বামী আমার পাঠাভ্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পড়া শুনিলেন। কিন্তু এ কি! আমার স্বামী পূর্ব্বে যতটা শিখাইয়াছিলেন তাহাই আছে—তাহার বেশী কিছু হয় নাই। ইহা দেখিয়া তার পরদিন মাষ্টারণীকে বলিলেন—"আমি এর শিক্ষার ভার তোমার উপর দিয়ে গিয়াছিলেম, কিন্তু তুমি দেখছি উচিত মত পরিশ্রম করনি।" এইকথা বলিবামাত্র সে রাগিয়া বলিল, "মেয়েটা বড় বোকা, খেলা-ভক্ত, যা বলি তা বোঝে না, কত মেহনৎ করেছি, কিন্তু ওদিকে ওর মন নেই। ওর সব মনটা খেলাতেই পড়ে আছে। খেলার দিকে যার ঝোঁক, তার শিখতে মন লাগ্‌বে কি করে? আপনি নিজে শিখালে বুঝতে পারবেন। এর যদি কখন লেখা পড়া হয় তো আমি আমার নাম বদ্‌লে ফেল্‌ব। আমি কাল থেকে আর আস্‌ছি নে।" এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। আমার স্বামী কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, এক পুস্তক হস্তে লইয়া, শান্তভাবে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, এই সর্ব্ব-প্রথম আমার মন খারাপ হইল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কিন্তু পাছে কেহ দেখে, এই মনে করিয়া চট্ করিয়া চোখ মুছিয়া নীচে চলিয়া গেলাম। সেই দিন হইতে আমার মনে হয় আমার চঞ্চলতা কমিয়া গিয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই "ফিমেল ট্রেনিং কালেজের" সগুণা বাঈদেব নামক এক মাষ্টারণী বাঈকে পড়াইবার জন্য রাখা হইল। ইনি শান্ত-স্বভাব ও সুশীলা ছিলেন। তাঁহার নিকট ১৮৭৫ সালের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা ৫ম ইয়ত্তা পর্য্যন্ত ভাল রকম হইয়াছিল।

১৮৭৫ অব্দের মার্চ মাসের মধ্যে বাবা ভাউজীর (ছোট ভাই) পৈতা হইল। এই বৎসর বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা-বিবাহ করেন এবং তিনি মহাবলেশ্বরে যাইবার জন্য পুনায় আসিয়াছিলেন। কাছারীতে খুব গোলমাল হওয়ায়, আমার স্বামী রাত্রিতেই ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুপুর বেলায় আহারের সময় আমার স্বামী আমার ননদকে বলিলেন—"আজ রাত্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত ও কতকগুলি লোককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছি। মনে থাকে যেন।" সে দিন কাছারী ছিল বলিয়া আমার স্বামীর ও আমার শ্বশুর মহাশয়ের দুপর বেলায় খাওয়া এক-দম হয় নাই। কারণ, শ্বশুর মহাশয় ১১ টার পরেই স্নান করিতে উঠিতেন। সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ, জপ, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি শেষ হইতে সহজেই ১২টা বাজিত। সেই জন্য, ১॥০ টার সময় আমার স্বামী ও ছেলেদের পাত পড়িত। এই সময়ে শ্বশুর মহাশয় শাশুড়ী ঠাকরুণ প্রভৃতি মণ্ডলী, বাবা-ভাউজীর পৈতা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তখনো তাঁহারা পুনায় ছিলেন। আমার ননদের নিকট আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, যখন দ্বিতীয় পংক্তি বসিবে তখন সহজ-ভাবে যেন শ্বশুর মহাশয়কে খবর দেওয়া হয়, আজ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিতকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া শ্বশুর মহাশয় রাগিয়া গেলেন। কিন্তু এ সময় তিনি কিছু বলিলেন না। ৪॥০ টা বাজিলে, দেবালয়ে যাইবার সময় শাশুড়ী ঠাকরুণ হাঁক দিয়া বলিলেন, "আজ 'তুমি পংক্তিতে পরিবেশন করতে যেও না। ঐ মেয়েটাই পরিবেশ

করবে, তুমি খেয়ে নেও। আমাদের বাড়ী, ব্রাহ্মণ কিংবা মেয়েদের কাহারও পরিবেষণ করা ভাল লাগে না বলিয়া, আমাদের বাড়ীতে,কেবল মেয়েদের দুইবার পরিবেষণ করবার রীতি ছিল। আমার যেতে যেতে রাত হবে, তুমি খেয়ে নেও। আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না।" এই কথা বলিয়া তিনি সন্ধ্যা হইতে শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁরা ১১টা পর্য্যন্ত বাড়ী আসিলেন না। এদিকে নিমন্ত্রিত মণ্ডলী আহারান্তে ইতস্ততঃ চলিয়া গেলেন। শ্বশুর মহাশয় ১১ টার সময় বাড়ী আসিলেন এবং বালভট্টজীকে হাঁক দিয়া বলিলেন, "কালই আমাদের কোল্হাপুরে যেতে হবে। খুব ভোরে উঠে গাড়ী ঠিক্ করে নিয়ে আস্‌বে"; এই কথা বলিয়া আহার কিংবা জলযোগ না করিয়াই শুইতে গেলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্বামী আমার ননদের নিকট জ্ঞাত হইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের স্বভাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায়, তাঁহার কোল্হাপুরে যাইবার মৎলবটা আমার স্বামীর বড় খারাপ লাগিল এবং নিজের বিশেষ হেতু না থাকিলেও ছোট খাটো কথা লইয়া এত কেশ হইবে এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার স্বামীর মনে শান্তি আসিল না। সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় বারণ্ডায় বসিয়াছিলেন; আমার স্বামী তথায় গিয়া স্তম্ভের ন্যায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্বশুর মহাশয় দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্য নাই এইরূপ ভাব দেখাইয়া কোন কথাই বলিলেন না। আমরা ঘরের লোকেরা শুধু ঠাকুর ঘরের জালি দিয়া দরজার আড়াল হইতে সম্মুখে কি হইতেছে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। কারণ, শ্বশুর মহাশয়ের কোল্হাপুরে যাত্রার সংকল্প শুনিয়া আমাদের ভয় হইয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ঐরূপেই কাটিয়া গেল। এই দুজনের মধ্যে কেহ কাহারো সহিত কথা কহিলেন না ও মুখ চাওয়া-চাওয়ি পর্য্যন্ত হইল না; কারণ প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করিয়া থাকিবেন যে দ্বিতীয় ব্যক্তি আগে কথা কহিবেন। কিন্তু শেষে শ্বশুর মহাশয় উপর দিকে তাকাইয়া নাম ধরিয়া আমার স্বামীকে নীচে বসিতে বলিলেন। তিনি "মাধব রাও" এই পাঁচ অক্ষর যুক্ত নাম ধরিয়াই সর্ব্বদা আমার স্বামীকে ডাকিতেন। অনেক ক্ষণের পর আবার আমার স্বামীকে বসিতে বলিলেন। তখন আমার স্বামী এই উত্তর দিলেন যে, "আপনি কোল্হাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত করিলেন এই কথা আমাকে বল্লে তবে আমি বস্‌ব। আপনারা সবাই যদি কোল্হাপুরে যান, তবে—আমার এখানে কি আছে—আমিও আপনার সঙ্গে যাব, কাল্‌কের কথায় আপনার এত রাগ হবে, আমি মনে করি নি। এ রকম হবে জান্‌লে আমি কোন গোল-যোগ করতেম না" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার ও শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না। ৯টা বাজিয়া গেল, তখনও আমার স্বামীর প্রাতঃকৃত্য পর্য্যন্ত হয় নাই ও সে দিন কাছারীর ছুটিও ছিল না। তবুও শ্বশুর মহাশয় কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু বালভট্টজী সম্মুখে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে বলিলেন যে, "আপনার কথা-মত গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি গাড়ী আস্‌বে।" ইহা শুনিয়াও এতক্ষণ ধরিয়া মিনতি করা সত্ত্বেও শ্বশুরমহাশয় কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমার স্বামীর বড়ই খারাপ লাগিল এবং বালভট্টজীর দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "শেষে যাওয়াই বুঝি স্থির হল! আমাকে এখানে রেখে সকলেই চলে যাবে! যে দিন আমার মা মারা যান সেই দিনই আমি অনাথ হয়েছি।" এই কথা বলিয়া সেখানে আর দাঁড়াইয়া রহিলেন না। একেবারে উপর তলায় চলিয়া গেলেন। কিছু কাল পরে, বালভট্টজীকে উপরে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনি যদি কোল্হাপুরে যাবার সঙ্কল্প রহিত না করেন তবে আমিও কাজে ইস্তফা দিয়া রাজি-নামা লিখে দেব।" এই কথা বালভট্টজী শ্বশুর মহাশয়কে বলার পূর্ব্বেই আমার স্বামী দোতালায় চলিয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের মন খারাপ হইয়া ছিল। বালভট্টজীর নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই খারাপ লাগিল এবং একেবারেই বলিলেন যে—"আমি কোল্হাপুরে যাচ্ছিনে, সে সঙ্কল্প রহিত করেছি। এখন আমি তবে স্নান করতে উঠছি। কোর্টের সময় হয়েছে, উপরে গিয়ে তাঁকে বলো।" এই কথা শুনিয়া, আমার স্বামীর মনে এতক্ষণ যে একটা ভার চাপিয়াছিল, এখন একটু কমিয়া গিয়া আবার মন চাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং তাঁহার নিত্য নিয়মিত কাজ আবার আরম্ভ করিলেন। আমার স্বামী আর কখন ঐ রকম অবস্থা ঘটিতে দেন নাই। এই বৎসরেই, যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন সেই বাড়ীটা আমার স্বামী খরিদ করিবার পর (১৮৭৫) জুন মাসে শ্বশুর মহাশয়, ছেলেপিলেদের সঙ্গে লইয়া কোল্হাপুরে গেলেন। পুণায় বাড়ী খরিদ করা হইয়াছে বলিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইল। কারণ, সমস্ত কাজকর্ম্মের দরুণ তখন ২৫০৲ টাকা পাইলেও, খর্চে-স্বভাব হওয়ায়, তিনি তাঁহার সম্বলের অতিরিক্ত এত খরচ করিয়াছিলেন যে কয়েক হাজার টাকা তাঁর ধার

হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ অবস্থা হওয়ায়, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে স্থাবর সম্পত্তি আদৌ খরিদ করা হয় নাই। শ্বশুর মহাশয়ের যে ধার হইয়াছিল তাহা কোন প্রকার সুখোপভোগ বা আয়েষের দরুণ নহে। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উদার ও দয়ালু হওয়ায় এবং তাঁহার তিন সহোদর ভাই ও অন্য খুড়তুতো ভায়ের পরিবারের বিবাহ, উপবীত ও শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত ভার তাঁহার উপর পড়ায় এই ধার হইয়াছিল।

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও খরচের টানাটানি হইলে তাহারা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট আসিয়া মিনতি করিত ও সেই সময়ে শ্বশুর মহাশয়ের হাতে পয়সা না থাকিলেও তাহারা কর্জ্জ করিয়া তাহাদের গরজ মিটাইত, কিন্তু কিছু বলিত না। তাঁহার এই উদারতার দরুণ তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল; অন্য কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার পুণ্যে, তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করায় আমার স্বামী সমস্ত কর্জ্জ শোধ করিয়াছিলেন ও পুত্রধর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয় পেন্সন লইলে পর, সেই পেন্সনের টাকায় খরচ কুলাইত না বলিয়া আমার স্বামী পুণা হইতে ১৫০৲ টাকা প্রতি মাসে খরচের জন্য পাঠাইতেন। আজ পর্য্যন্ত যাহা করা হয় নাই তাহা আজ পুত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইল। তাই, পুণা ও কোল্হাপুরের দুই সংসারের খরচ চালাইয়া ও আমীয় স্বজনের পরামর্শ না লইয়া আজ পরমেশ্বরের কৃপায় স্থাবর সম্পত্তি হইতে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ হওয়ায় শ্বশুর মহাশয়ের খুব আনন্দ হইল, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রয়পত্রের লেখাপড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্বশুর মহাশয় মুসবিদা প্রস্তুত করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। আমার স্বামী তাহা হাতে লইয়া, পড়িয়া দেখিয়া পেন্সিলে তাহার উপর এই কথা লিখিলেন যে, "আমার নাম লেখা হইয়াছে, সেই জায়গায় আপনার নাম থাকে এই আমার ইচ্ছা। এতে আর কিছু বদল করবার মত নেই।" এই কাগজ বাড়ীর নীচের তলায় আসিলে পর, শ্বশুর মহাশয় পড়িয়া দেখিলেন ও 'গম্' হইয়া বসিলেন। "আগামী কল্য কবলাপত্র রেজিষ্ট্রী করাইব," সমাগত রেজিষ্ট্রারকে এই কথা বলিয়া তিনি আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর, শ্বশুর মহাশয় ছাদের উপরে যাইয়া আমার স্বামীকে নিরালা ডাকাইয়া বলিলেন যে, "আমাদের এত বড় বংশে আজ পর্য্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি কিংবা ভাগাভাগি হয় নি। তার কারণ, বংশের সকলেই দৃঢ়চিত্ত ত ছিলেনই, তা-ছাড়া আমাদের বংশে কেহ হালে স্থাবর সম্পত্তি খরিদ করেন নি। এখন জগদম্বার কৃপায় আমাদের বাড়ী খরিদ করবার সুযোগ এসেছে, ঐ বাড়ীর কোবালা আমার নামে না ক'রে তোমার নামেই হবে। কারণ এই ছেলের সম্বন্ধ একটু স্বতন্ত্র হওয়ায় কোবালা তোমার নামেই হবে, তাহলে কোন গোলযোগ থাকবে না।" এই সমস্ত শুনিয়া লইয়া আমার স্বামী বলিলেন যে, "আমি এরই দিক দিয়া সমস্ত বিচার করেছি। এই প্রথম স্থাবর সম্পত্তির কোবালা আপনার নামে হওয়াই আমি বেশী শোভন মনে করি ও তাহলে মনেও শান্তি পাই। অতএব আপনি 'না' বলবেন না।" এইরূপ বলা হইলে পর, শ্বশুর মহাশয় নীচে চলিয়া গেলেন এবং তার পর দিন আমার স্বামীর ইচ্ছা অনুসারে শ্বশুরমহাশয় ঐ বাড়ীর কোবালা করিয়া লইলেন। (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ)

কোন্ কল্পলোকের বিহগ তুমি
বেড়াও উধাও হয়ে।
নিশুত রাতের তারার সাথে
কত কথা যাও কয়ে॥
নীল আকাশে ভেসে বেড়াও
ঢালি অবিরল তান।
আলোকের সাথে বাতাসের সাথে
গেয়ে যাও তুমি গান॥
মরতের সুখে মরতের দুখে
মোদের জরজর মনপ্রাণ।
নন্দনের পাখী তুমি সেথা এসে
করিছ গো সুধাদান॥
সংসার তাপে তাপিত যে জীব
তাহারে দিতে সান্ত্বনা
পাঠালেন তোমা বিধি দয়াময়
ঘুচায়ে সকল বেদনা॥
তব গীতিতান ভেসে আসে ওই
আকাশে আলোয় বাতাসে।
ঝরণার সম বহিছে মোদের
জীবনের আশেপাশে॥
কলমুখরিত অরুণ উষায়
শুনি সে তোমার গান।
সকাল সাঁঝে দিবস মাঝে
শুনি সে পাগল তান॥

যে কুসুম ঝারি লয়ে এসেছিলে
এখনো হয়নি শেষ।
শেষ কি গো আছে—শেষ কি গো হবে—
তার নিতি নিতি নব বেশ॥
গেয়ে যাও কবি গেয়ে যাও গান
সুশীতল হোক প্রাণ।
ও বীণার রেশ রবে চিরদিন
নাহি—নাহি অবসান॥
কত সুরে তুমি বাজালে যে বীণা
ও গো অদ্ভুত যন্ত্রী।
মোদের সুখে দুখে কাজে বাজে নানা সাজে
তোমারি বীণার তন্ত্রী॥
ধন্য তুমি ধন্য হে কবি
ধন্য নিখিল বিশ্ব।
ধন্য আজি মা জননী বঙ্গ—
নহে নহে দীন নিঃস্ব॥

নববর্ষের উপদেশ।*

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ নববর্ষের আরম্ভে যাহা কিছু প্রকাশমান তাহার মধ্যে দীপ্যমান পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার চিন্তনে নববলে বলীয়ান হইয়া এস আমরা জীবনপথে অগ্রসর হই। এই পরম পুরুষের ন্যায় এমন জীবন্ত সত্য, এমন পরম সহায়, এমন বলদাতা এমন জীবনধন্যকর স্পর্শমণি জগতে আর কিছুই নাই।

জীবন্ত সত্য। যে সত্য উৎসের ন্যায় উৎসারিত হইয়া জগতের বহিঃরূপ ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, যে সত্য জগতের প্রাণস্বরূপ, যে সত্য আছেন বলিয়া এ জগৎ সত্য হইয়াছে। মূল সত্য, একমাত্র সত্য, অনাদ্যনন্ত সত্য। এমন সত্য, এত বড় সত্য, এমন জাজ্জ্বল্যমান সত্য জগতে আর কিছুই নাই।

পরম সহায়। যে সহায় জ্বলন্ত সূর্য্য, দুরন্ত সমুদ্রকে সৃজন ও শাসন করিয়া আমাদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, যে সহায় দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরের শোকার্ত্তের ভগ্নপ্রাণের একমাত্র ভরসাস্থল, যে সহায়চ্যুত হইলে এ জগৎ এক মুহূর্ত্তও রক্ষা পায় না, নিমেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এমন সহায়, এত বড় সহায়, এমন অসহায়ের সহায় জগতে আমাদের আর কে আছে?

বলদাতা। যাঁহার কথা স্মরণ করিলেও আশায় উৎসাহে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, প্রাণে অসুরের বলসঞ্চার হয়, সকল দুঃখশোকতাপ দূরে পলায়ন করে; এবং যাঁহাকে লাভ করিলে মানব কি যে হইয়া যায় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমন বলদাতা জগতে আর নাই।

স্পর্শমণি। যাঁহার স্পর্শে জন্মজন্মের পাপ মলিনতা ধৌত হইয়া যায়, শুষ্ক মৃত তরুও মুঞ্জরিত হয়, কদর্য্য পঙ্ক ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব শোভায় পঙ্কজ ফুটিয়া উঠে। এ স্পর্শমণি জগতে কেবল এক—সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর।

তাই বলি, আজ নববর্ষে এস আমরা এই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহাকে সহায় পাইলে আমাদিগের আর কোনও ভয় ভাবনা থাকিবে না, প্রাণে বল পাইব, নির্ভয়ে জীবনের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিব, আমরা ধন্য হইব।

আকাশ যখন গুম্ হইয়া থাকে,—মেঘাচ্ছন্ন রহে অথচ বারিবর্ষণ হয় না, পাতা নড়ে না, বাতাস বহে না, প্রকৃতির তখন যেরূপ অবস্থা হয় ঈশ্বরকে হারাইলে মানবাত্মারও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়—একেবারে কেমনতর হইয়া যায়; প্রাণে কিছুমাত্র সুখ থাকে না শান্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, জীবন একেবারে শুষ্ক নীরস শূন্য বলিয়া বোধ হয়। মানবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যাতনাদায়ক অবস্থা আর নাই।

তখন দুঃখ দিয়া ঈশ্বর আমাদিগের উদ্ধার সাধন করেন, তাঁহার দিকে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। দুঃখে না পড়িলে আমরা ত তাঁহার মুখের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহি না। এ দুঃখ তাঁহারই স্নেহের দান। ঈশ্বর আমাদিগকে চাহেন, আমাদের না হইলে তাঁহার চলে না, কেন না তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরা তাঁহার সন্তান—ঈশ্বরকে না হইলে আমাদেরও

* গত ১লা বৈশাখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে নববর্ষের ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে বিবৃত।

চলে না, কেন না তিনি আমাদের পরম পিতা, পরম গতি, পরম আশ্রয়। সকল আশ্রয় খুঁজিয়া যখন আমরা নিরাশচিত্তে পথে আসিয়া দাঁড়াই, তখন এ আশ্রয় আমাদিগকে বক্ষে টানিয়া রক্ষা করেন।

মানবের অশ্রুজলের মূল্য তখন, যখন তাহাতে পরমাত্মরূপ প্রকাশ পান। তাই ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভক্ত যখন অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন, লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করে। ইহার কারণ, যাঁহাকে লইয়া ভক্তের বিরহব্যথা অশ্রুজল, তাঁহাকে পাইলেই মানবের চিরজন্মের মত সকল ব্যথা অশ্রু মুছিয়া যায়।

কথায় বলে, মা'র চেয়ে যা'র টান বেশী সে ডাইন। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় কেবল এই যে, মা'র অপেক্ষা অধিক জগতে কেহ আর ভালবাসিতে পারে না। যেখানে তাহা দেখিবে, তাহাতে তুমি বিশ্বাস করিও না, আস্থা রাখিও না, নিশ্চিত জানিও তাহার মধ্যে কিছু দুরভিসন্ধি আছে। জগন্মাতা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। জগতে যাহা কিছু তাঁহাকে ভুলাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে মন কাড়িয়া লইয়া আমাদিগকে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তুমি তাহাতে ভুলিও না প্রলুব্ধ হইও না, নিশ্চিত জানিও তাহা হইলে পরিশেষে তোমাকে ঠকিতে হইবে, অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে।

কিন্তু মানবের মন—বাহিরের চমক্ দেখিয়াই আমরা ভুলিয়া যাই। তাই এই ডাইনের ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া আজ আমরা এত দুঃখ পাইতেছি, মৃত্যুকে ইচ্ছা করিয়া আমরা ঘরে ডাকিয়া আনিতেছি, এমন যে মা তাঁহাকেও ভুলিতে বসিয়াছি। তাই আজ এই জগদ্ব্যাপী মৃত্যুদহন, এই হাহাকার অশ্রুপাত—চতুর্দ্দিকে চিতার আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে। যে জড়-বিজ্ঞান-শক্তিকে মাতৃজ্ঞানে এতদিন আমরা সেবা করিয়া আসিতেছি তাহাই আজ রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের বিনাশসাধন করিতেছে।

কিন্তু এই ডাইনের হাতে চেতনা পাইয়াই আবার আমরা আমাদিগের মাকে চিনিতে পারিব—তখন আরও ভাল করিয়া চিনিব; মাতার সে অনন্ত মঙ্গল-দৃষ্টি, সে অপার প্রেমের মূল্য আমরা বুঝিতে পারিব। তাহারই আয়োজন লক্ষণ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। ইহাও সেই ঈশ্বরের করুণাসাপেক্ষ। তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন।

যিনি আমাদের জীবনের আলো, যিনি আমাদের চিরসঙ্গী থাকিয়া জীবনপথে আমাদিগকে এতদূর লইয়া আসিয়াছেন, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি গত রজনীতে আমাদের নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নির্নিমেষ নয়নপাতে সকল বাধাবিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়ছেন, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি আমাদিগের ভবিষ্য জীবনের একমাত্র সহায় আশ্রয়স্থল, আজ নববর্ষের ঊষালোকে তাঁহাকে প্রণাম করি।

হে জননি! হে জনক! শিশু আমরা খেলাঘরে খেলা লইয়াই মত্ত ছিলাম,—তুমি আমাদিগের নিকটে আছ এই বিশ্বাসে। এখন তোমাকে পাইবার জন্য আমাদিগের প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, মন আর প্রবোধ মানিতেছে না। তুমি এস; তোমার স্নেহাঞ্চলে আমাদের অঙ্গের সমস্ত ধূলামলা মুছিয়া দিয়া তুমি তোমার অভয় ক্রোড়ে আমাদিগকে লহ। আমরা ডাইনের ভয়ে ভীত, তুমি আমাদিগকে সে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। আজ নববর্ষে দয়া কর, তুমি দয়া কর। তোমার চরণে ভক্তিভরে আবার আমরা বারবার প্রণাম করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

স্বরলিপি।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসগোচরম্ বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

কথা—স্বামী বিবেকানন্দ। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

সম্পূর্ণ। বাদী জ্ঞ; সম্বাদী ম, প; অনুবাদী র, ধ, ণ, ন।

ঠাট—স র জ্ঞ ম প ধ ন স ণ ধ প ম জ্ঞ র স।

॥ ১ ২´ ৩ •
সা সা II ^প^মা -া মা মা। ণা -পা -া -া। মা -জ্ঞা জ্ঞা রা। -মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I
না হি সূ • র্য্য না হি • • • জ্যো • তি না •• • হি শ

১ ২´ ৩ •
I মা -পমা -ণণা পা। -া -মজ্ঞা -রজ্ঞা -রজ্ঞমা। -া -রা -া রা। সা -া -া সা I
শা •• •• ঙ্ক • •সু •• ••• • • ন্‌ দ র • •ভা

১ ২´ ৩ •
I সা -মা -া -জ্ঞমপা। পা -া -া পা। -া মা জ্ঞা -রা। -মজ্ঞা -া মজ্ঞা জ্ঞা I
সে • • ••• ব্যো • • মে • ছা য়া • •• • স• ম

১ ২´ ৩ •
I মা পা -মা -া। পা -া পা -ধা। -পধণা ণা -ধণর্সা -া। -ণর্সর্রা -া -র্সর্রজ্ঞা -র্রজ্ঞর্মা I
ছ বি • • বি • শ্ব • ••চ রা ••• • ••• • ••• •••

১ ২´ ৩
I র্মা র্মা -জ্ঞা -র্রা। -র্সা -ণা -ধা -পধা। -পধণা -া -ধণর্সা -া।
চ• র .• • • • • •• ••• • ••• •

•
। -ণর্সর্রা -র্সা ^ন^র্সা র্সা II
••• • "না হি"

১ ২´ ৩ •
II মা মা -ণধা না। না র্সা -া ^র্স^র্রর্সনা। র্সা -া -না র্সা। -া -া -া -র্সনা I
অ স্ফু •• ট ম ন • আ•• কা • • শে • • • ••

১ ২´ ৩ •
I র্সা র্রর্সা না -া। না র্সা -নর্সা -নর্সর্রা। -র্রর্সা র্সা -ণা ধা। -পধা -পধণা -ধণর্সা সা I
জ গ• ত • সং• সা •• ••• •র ভা • সে •• ••• ••• ও

১ ২´ ৩ ০
I -র্সণা -ধপা -মা মা। -ণণা পা -মা -জ্ঞা। -রজ্ঞমা জ্ঞমা রা -া। সা -া -া -া I
০ঠে ০তা ০ সে ০ভো বে ০ ০ ০০পু নঃ অ ০ হং ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
I সা -মা -া মা। মা পা -ধা -পধণা। -ধণর্সা -া -ণর্সর্রা -া। -র্সর্রজ্ঞা -া র্রজ্ঞর্মা -া I
শ্রো ০ ০ তে নি র ০ ০০০ ০০০ ০ ০০০ ০ ০০০ ০ ০০০০

১ ২´ ৩ ০
I র্পর্মা র্মা -র্জ্ঞা -া। -র্রা -া -র্সা -ণা। -ধা -া -পা -ধা। -পধা -পধণা ধা পা II
নৃত র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০০ "না হি"

১ ২´ ৩ ০
II সা -মা মা মা। -পা পা পা -মা। -জ্ঞা -া -রা -া। মজ্ঞা -া -া রা I
মী ০ রে ধী ০ রে ছা ০ ০ ০ ০ ০ য়া০ ০ ০ দ

১ ২´ ৩ ০
I জ্ঞা জ্ঞা মা পা। পা মা মা -জ্ঞা। -রজ্ঞমজ্ঞমা -রা -া -া। সা -া -া ন্‌া I
ল ম হা ন য়ে প্র বে শি ০০০০০ ০ ০ ০ ল ০ ০ ব

১ ২´ ৩ ০
I সা রা -া সা। ন্‌া সা -ন্‌সরা সা। সা -ণ্‌া -ধ্‌া সা। সা মা মা পা I
হে মা ০ ন্ত আ মি ০০০ আ মি ০ ০ এ ই ধা রা অ

১ ২´ ৩ ০
I পা -মজ্ঞা -রজ্ঞা -রজ্ঞমা। রা সা -া মা। মা -ণধা না র্সা। র্সনা -র্সর্মা র্সা র্সা I
মৃ ০০ ০০ ০০০ ক ণ ০ সে ধা ০রা ও ব হু০ ০হ ন শূ

১ ২´ ৩
I র্সা নর্সর্রর্সনা র্সনর্সর্রা র্সা। র্সণা -ধপধা -পধণা ধা। পমা মমা ধপা -মজ্ঞা।
ন্যে শূ০০ন্যমি লা০০০ ই ল০ ০০০ ০০০ অ বাঙ্‌ মন সগো ০০

০ ১ ২´ ৩
। -রজ্ঞমজ্ঞমা রা সা সা I -া মা -া মা। মা পা ধা -া। -পধা -ণা -ধণা -র্সা।
০০০চর ম্ বো ধে ০ প্রা ০ ণ বো ধে ০ ০ ০০ ০ ০০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০
। -ণর্সা -র্রা -র্সর্রা -র্জ্ঞা I -র্রর্জ্ঞা -র্মা র্মা -া। -র্জ্ঞা -র্রা -র্সা -া। -ণা -ধা -পা -ধা।
০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০
। -পধা -ণা ধা পা II
০০ র্ "না হি"

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপে, স্বয়ং মহাভারতকার কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত ভাগবত ধর্ম্মানুসারী অর্থাৎ প্রবৃত্তিপর তাৎপর্য্য এবং তাহার পর আবির্ভূত অনেক বিদ্বান আচার্য্য, কবি, যোগী ও ভগবদ্ভক্তদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুরূপ প্রতিপাদিত শুদ্ধ নিবৃত্তিপর তাৎপর্য্য, ভগবদ্গীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে,—এই পরস্পরবিরোধী নানাবিধ তাৎপর্য্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? বাহির করা যাইতে পারে শুধু নয়; উহাতে ইষ্টও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আচার্য্য, বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত সাত্বিকপ্রকৃতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিং বহুনা, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত মহাতত্ত্বজ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত জগতে আবির্ভূত হয় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহার সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যদিগের এতটা মতভেদ কেন? গীতাতো একটা ভোজবাজী ("গৌড়বঙ্গাল") নহে যে তাহা হইতে যে যাহা খুসি একটা অর্থ বাহির করিবে। উপরি উক্ত সমস্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুনের ভ্রম বাড়াইবার জন্য নহে, পরন্তু তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা অর্জ্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাৎপর্য্যের উপদেশ করায়, অর্জ্জুনের উপর উহার পরিণামফলও সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু গীতার তাৎপর্য্য লইয়া এতটা গোলযোগ কেন?

প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় সত্য। কিন্তু উহার উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে যতটা কঠিন বলিয়া মনে হয় আসলে ততটা কঠিন নহে। মনে কর কোন সুমিষ্ট ও সুরস পক্কান্ন দেখিয়া একজন যদি তাহাকে গমের, আর একজন ঘৃতের ও তৃতীয় ব্যক্তি চিনির পক্কান্ন এইরূপ নিজের রুচি অনুসারে বলে, তাহা হইলে আমরা কোন্‌টা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিব? তিনই আপন আপন হিসাবে সত্য। কারণ গম, ঘৃত ও চিনি এই তিন পদার্থই একত্র মিলিত হইয়া তাহা হইতে লাড্ডু, জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার পক্কান্ন প্রস্তুত হইতে পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে প্রস্তুত পক্কান্ন কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, উহা গোধুমপ্রধান, ঘৃতপ্রধান কিংবা শর্করাপ্রধান, শুধু এইরূপ বলিয়াই নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সমুদ্রমন্থনের সময় যেরূপ একজন অমৃত, আর একজন বিষ, আবার কেহ কেহ ঐরাবত, কৌস্তুভ, পারিজাত, প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তবু তাহা দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণয় হয় নাই; সাম্প্রদায়িকভাবে গীতাসাগরের মন্থনকারী টীকাকারদিগের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। কিংবা কংসবধের সময় রঙ্গমণ্ডপে অবতীর্ণ একই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক প্রেক্ষকের নিকট বিভিন্ন অর্থাৎ মল্লের নিকট বজ্রসদৃশ, স্ত্রীলোকের নিকট মদনসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদ্গীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উহা বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, সে সম্প্রদায় একটা প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের অনুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না হইলে ঐ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্য হইবে। এইজন্য, বৈদিক ধর্ম্মের যত সম্প্রদায়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ বিষয় যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পরসম্বন্ধ বাদ দিলে বাকী বিষয় এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একই থাকে; এবং সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বা টীকা আছে তন্মধ্যে প্রায় শতাধিক বচনের কিংবা লোকের অভিপ্রায় একই প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা কিছু ভেদ তাহা অবশিষ্ট বচন সম্বন্ধেই দেখা যায়। ঐ সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ করিলেও উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান অনুকূল হইবে ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল সেইগুলিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া, অথবা প্রতিকূল বচনগুলির অর্থ যুক্তির দ্বারা অন্যথা করিয়া কিংবা যতটা সম্ভব তাহাতে সহজ ও সরল বচনাদি হইতেও নিজ নিজ অনুকূল শ্লেষার্থ ও অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্রদায় যাহাতে সেই অর্থে সিদ্ধ হয় এইরূপ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ, গীতা, ২—১২ ও ১৩; ৩—১৯; ৬—৩ এবং ১৮—২ উপরি উক্ত আমার টীকা দেখ। কিন্তু এই রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা, আর নিজ সম্প্রদায় গীতাতে প্রতিপাদিত হওয়া চাই এইরূপ কিংবা অন্য কোনরূপ অভিমান না রাখিয়া স্বতন্ত্র রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়া কেবল তাহা হইতে সার অর্থ বাহির করা—এই দুই

বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা যে-কোন ব্যক্তি-রই সহজে উপলব্ধি হইবে।

গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সদোষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল ; এখন তবে গীতার তাৎ-পর্য্য বাহির করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্যক। গ্রন্থ, প্রকরণ কিংবা বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণয় কার্য্যে অত্যন্ত কুশল যে মীমাং-সাকার তাঁহারই এই সম্বন্ধে সর্ব্বমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, যে কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাৎপর্য্য বাহির করিতে হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায় স্বরূপ (লিঙ্গ) হওয়ায় ঐ সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক। তন্মধ্যে, 'উপক্রমোপসংহারৌ' অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ এই দুই বিষয়। যিনিই হউন না কেন, তিনি মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন ; এবং উক্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর, গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এই জন্য, গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়কার্য্যে প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। সরল রেখার ব্যাখ্যা দিবার সময়, ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, আরম্ভের বিন্দু হইতে যে রেখা দক্ষিণ-বাম দিকে কিংবা উপর নীচে না বাঁকিয়া শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান যায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎপর্য্যেও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য্য গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষকে ত্যাগ না করিয়া এই দুই সীমা-বিন্দুর মধ্যে ঠিক অবস্থান করে তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্য্য। প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাইবার অন্য পথ থাকিলে সে সব বাঁকা পথ বা আড়-পথ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আদ্যন্ত দেখিয়া এইরূপ গ্রন্থের দিক নির্ণয় করিবার পর, সেই গ্রন্থে 'অভ্যাস' অর্থাৎ পুনরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে। কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া প্রত্যেকবার "অতএব এই বিষয় সিদ্ধ হইল" কিংবা "অতএব অমুক করা আবশ্যক" এইরূপ একই সিদ্ধান্ত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন।

গ্রন্থতাৎপর্য্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাধন 'অপূর্ব্বতা' ও "ফল"। 'অপূর্ব্বতা' অর্থাৎ নূতনত্ব। যে কোন গ্রন্থকার হউন, একটা কিছু নূতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রায়ই তিনি নূতন গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন না। অন্তত যে সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এইরূপ হইত না। এই জন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, সেই গ্রন্থে অপূর্ব্বতা, বৈশিষ্ট্য, কিংবা নূতনত্ব কি আছে তাহা দেখা আবশ্যক। সেইরূপ, সেই লেখার বা গ্রন্থের কোন ফল বা তাহার দরুণ কোন পরিণাম কিছু যদি ঘটিয়া থাকে, তবে সে কিরূপ ফল, কিরূপ পরিণাম সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য করা উচিত। কারণ, এই ফল মিলিবে কিংবা হইবে মনে করিয়াই যদি গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে তবে সংঘটিত পরিণাম সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় আর-একটু অধিক করিয়া ব্যক্ত হইত।

ষষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি ? না,—'অর্থবাদ' ও 'উপপত্তি'। 'অর্থবাদ' এই শব্দটি মীমাংসাকারের পারিভাষিক শব্দ। মুখ্যত কোন্ বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারিত হইলেও, উপপাদনের যুক্তি-ক্রম দেখাইবার জন্য তুলনা করিয়া একবাক্যতা সম্পাদনার্থ, অথবা সাম্য বা ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতি-পক্ষের দোষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, অলঙ্কারার্থ, অতিশয়োক্তির ভাবে, কিংবা যুক্তিবিন্যাসের পরি-পোষক ঐ প্রশ্নের পূর্ব্ব-ইতিহাসের সম্বন্ধসূত্রে, অথবা আর কোন কারণে, এবং কখন কখন কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও, গ্রন্থকার প্রসঙ্গ-ক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যে বর্ণনা করেন, মূল উদ্দেশ্যটা একেবারে ছাড়িয়া না দিলেও গৌরবার্থ, স্পষ্টী-করণার্থ কিংবা পূর্ণতাসম্পাদনার্থ, এইরূপ করেন বলিয়া উহা অক্ষরশ সকল সময়ে যে সত্য হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই।* কিংবহুনা, এই বিধানাদি সম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা অক্ষরশ সত্য কি সত্য নহে ইহা দেখিবার জন্য গ্রন্থকার সাবধানতাও অবলম্বন করেন না বলিলেও চলে। এইজন্য ঐ সকল বিধানকে প্রমাণসিদ্ধ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ তদন্তর্গত বিভিন্ন বিষয় গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তপক্ষ সপ্রমাণ করে এরূপ স্বীকার না করিয়া উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ স্তুতিগর্ভ, আগন্তুক, বা স্তুতিবাচক এই ভাবে গ্রহণ করিয়া মীমাংসাকার উহাকে 'অর্থবাদ' এই নাম দিয়া থাকেন, এবং এই অর্থবাদাত্মক বিধানগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এ সমস্ত হইলেও শেষে উপপত্তিকে দেখিতেই হইবে। কোন বিশিষ্ট বিষয় প্রমাণ করিয়া দেখাইবার জন্য তর্ক-

* অর্থবাদ প্রকৃত বর্ণনা, বস্তুস্থিতিমূলক বর্ণনা হইলে তাহাকে 'অনুবাদ', বস্তুস্থিতির বিরুদ্ধ হইলে তাহাকে 'গুণবাদ' এবং পূর্ব্বে বস্তুস্থিতি ধরিয়া কিন্তু আপাততঃ বস্তুস্থিতি ছাড়িয়া দিয়া যে বর্ণনা তাহাকে "ভূতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ' এই সামান্য শব্দের অন্তর্গত নিবন্ধাদির সত্যাসত্য অনুসারে এই তিন ভেদ।

শাস্ত্রানুসারে বাধক প্রমাণাদি ছাড়িয়া সাধক প্রমাণ সমূহের যে অনুকূল বিন্যাস করা হয় তাহাকে 'উপপত্তি' বা 'উপপাদন' বলে। উপক্রম উপসংহার-রূপ দুই সীমান্ত প্রথমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ ও উপপত্তির ছাপ্ দিয়া সুনিশ্চিত করিতে পারা যায়। কোন্ বিষয়টি অসংলগ্ন কিংবা আনুষঙ্গিক ইহা অর্থবাদ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অর্থবাদের একবার নির্ণয় হইলে পর, যে ব্যক্তি গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি সমস্ত বাঁকা পথ ছাড়িয়া দেন; এবং বাঁকা পথ ছাড়িয়া আসল রাস্তায় আসিয়া, উপপত্তির সিধা রাস্তা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা গ্রন্থ সমালোচককে প্রথম হইতেই সম্মুখে ক্রমশ ধাক্কা দিয়া-দিয়া শেষের তাৎপর্য্যে সোজা আনিয়া তবে ছাড়ে। আমাদের প্রাচীন মীমাংসাকারের স্থিরীকৃত গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্ব্ব দেশীয় বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার যোগ্যতা বা আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার দরকার নাই। *

এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, মীমাংসাকারের এই নিয়ম সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যের জানা ছিল না কি? এবং তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যেও এই নিয়ম জানা ছিল বলিয়া যদি তুমি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাঁহার নিষ্কাশিত গীতাতাৎপর্য্য একদেশীয়তা দোষে দুষ্ট এরূপ মনে করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই—দৃষ্টি একবার সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িলে, যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রামাণিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিজ সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে, ইহা যে রীতিতে দেখান যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক টীকাকার সেই রীতিই স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ, নিজ সম্প্রদায় ছাড়া উক্ত গ্রন্থের অন্য কোন অর্থ হইলেও উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না কোন স্বতন্ত্র হেতু আছে, এইরূপ গ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সাম্প্রাদায়িক টীকাকারদিগের পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ় ধারণা হইয়া থাকে; এবং নিজ মতানুসারে যে অর্থ পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের কোন নিয়মের বাধা আসিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টীকাকারেরা ঐ সকল নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রান্তর্গত মিতাক্ষরা, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থাদির স্মৃতি-বচনসমূহের ব্যবস্থা কিংবা একবাক্যতা এই তত্ত্বের প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদিতেই এইপ্রকার পাওয়া যায় এরূপ নহে। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ বাইবেল ও কোরাণের যে সকল গ্রন্থকার পরে আবির্ভূত হইয়াছেন সেই শত শত সাম্প্রদায়িক গ্রন্থকারও এইরূপেই উক্তধর্ম্মের অর্থান্তর করিয়াছেন। এবং বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতকগুলি বাক্যের অর্থ এই নিয়মানুসারেই ইহুদি লোকদিগের অর্থ হইতে খৃষ্টভক্তেরা ভিন্নরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিংবহুনা, কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ কিম্বা লেখা কোন্‌টি, ইহা যে-যে স্থলে পূর্ব্ব হইতেই স্থির নির্দ্দিষ্ট-হইয়াছে এবং এই নির্দ্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণবলে পরবর্ত্তী সমস্ত বিষয়ের নির্ণয় করা হইয়া থাকে, সেই-সেই স্থলে গ্রন্থার্থনির্ণয়ের এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পণ্ডিত, উকীল ও বিচারপতি ইহাঁরা পূর্ব্বেকার প্রামাণিক আইন গ্রন্থাদিকে কিংবা বিচার-নিষ্পত্তির সম্বন্ধে আপন আপন দিকে যেরূপ ভাবে টানিয়া থাকেন, তাহারই মধ্যে এই বীজ নিহিত আছে।

যদি শুধু লৌকিক বিষয়ের সম্বন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে উপনিষদ ও বেদান্ত সূত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় গ্রন্থ ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে যে বিভিন্ন ভাষ্য হইয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে ভগবদ্গীতার উপক্রম উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের উপর দুই দিকের সৈন্য যুদ্ধে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের উপর শস্ত্রসম্পাতে উদ্যত, এই অবসরে একাদিক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বিবৃত করিয়া, 'বিমনস্ক' ও সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অর্জ্জুনকে নিজ ক্ষাত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। দুষ্ট দুর্য্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কে কে আসিয়াছেন, যখন অর্জ্জুন দেখিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য, ও গুরুপুত্র অশ্বত্থামা প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয়, এইরূপ কৌরব, এবং অন্যান্য সুহৃৎ, আত্মজন, বন্ধু, মিত্র, মামা কাকা, ভগ্নীপতী শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাঁহার নজরে পড়িল। এবং কেবল হস্তিনাপুরের রাজ্যলা-

* গ্রন্থতাৎপর্য্যের এই নিয়ম ইংরাজি আদালতেও পালিত হইয়া থাকে। যেমন মনে কর, কোন বিচারনিষ্পত্তির অর্থ ঠিক বুঝা না গেলে, ঐ বিচারনিষ্পত্তির ফল যে হুকুমনামায় আছে তাহা দেখিয়া নিষ্পত্তির অর্থ নির্ণয় করা হয় এবং কোন নিষ্পত্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার আবশ্যকতা নাই এইরূপ কোন বিধান থাকিলে উহা পরবর্ত্তী মোকদ্দমার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ বিধানকে (obiter dicta) কিংবা 'বাহ্য বিধান' বলে এবং বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে ইহা অর্থবাদেরই প্রকারান্তর মাত্র।

ভার্থ ইহাঁদিগকে বধ করিয়া নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ করিতে হইবে এই বিচার তাঁহার মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় একেবারে ক্ষুব্ধ হইল। একদিকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম "যুদ্ধ কর" বলিতেছিল, এবং অন্যদিকে পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রেম, সুহৃৎপ্রীতি তাঁহাকে পিছনে টানিতেছিল! যদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে পিতামহ গুরু ও আত্মীয়দিগকে হত্যা করিয়া ঘোর পাতকে পতিত হইতে হইবে, আর যদি না করি তবে ক্ষাত্রধর্ম্মকে লঙ্ঘণ করা হইবে। এইরূপ একদিকে গর্ত্ত আর একদিকে কূপ দেখা দিলে পর, দুই ম্যাড়ার গুঁতার মধ্যে পড়িয়া কোন নিরুপায় প্রাণীর যে অবস্থা অর্জ্জুনের সেই অবস্থা হইয়াছিল! খুব বড় যোদ্ধা সত্য; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সেই নৈতিক ফাঁদে অকস্মাৎ পতিত হওয়ায় তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, হাতের ধনু খসিয়া পড়িল এবং "আমি যুদ্ধ করিব না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। শেষে মনুষ্যের যাহা স্বভাবতই বেশী প্রিয় সেই মমতা—অর্থাৎ কাছাকাছির বন্ধুস্নেহ, দূরস্থ ক্ষাত্রধর্ম্মের স্থান অধিকার করায়, মোহবশে তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহৃদ্বধ, অধিক কি সমগ্র কুলক্ষয় প্রভৃতি ঘোরতর পাপ করিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষা উদরপূর্ত্তির জন্য ভিক্ষা করা কি মন্দ? শত্রু এ সময় আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গলা কাটিয়া ফেলে সেও ভাল; কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিরা তাঁহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও অভিশাপগ্রস্ত হইতে আমি ইচ্ছা করি না! ক্ষাত্রধর্ম্ম হইল ত কি হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধ-রূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদি করিতে হয় তবে পুড়ে যাক্ সে ক্ষাত্রধর্ম্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে! প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করিলেও, তাহারা দুর্জ্জন হইলেও, এইরূপ আচরণ আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাই আমার দেখা আবশ্যক। আমার যখন মনে হইতেছে এই-রূপ ঘোর পাতক করা শ্রেয়স্কর নহে তখন ক্ষাত্রধর্ম্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহা আমার কি কাজে আসিবে? এইরূপ তাঁহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, ধর্ম্মসম্মূঢ় হইয়া অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান গীতা-উপদেশ দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য হওয়ায়, ভীষ্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভয়ে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছা-ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন।

গীতা-উপদেশের রহস্য যদি উদ্ঘাটন করিতে হয় তবে এই উপক্রম উপসংহার ও ফলকে ধরা আবশ্যক। ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষলাভ হয়, কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিছক নিবৃত্তিপর মার্গ কিংবা কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মও এস্থলে বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে ভিক্ষা করিতে করিতে বনে পাঠানো কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়া ও নিম্বফল খাইয়া আমরণ যোগাভ্যাস করিবার জন্য হিমালয়ে প্রেরণ করা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। অথবা ধনুর্ব্বাণের বদলে, হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণা দিয়া সেই সকল বাদ্য সহযোগে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া কুরু-ক্ষেত্রের ধর্ম্মভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় সমস্ত ক্ষাত্র-সমাজের সম্মুখে বৃহন্নলার ন্যায় অর্জ্জুনকে আবার নৃত্যে প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত হইলে পর সমস্ত কুরুক্ষেত্রের উপর অন্যপ্রকার কঠোর নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গীতা বিবৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে, অনেক প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া এবং পরে 'তস্মাৎ' অর্থাৎ 'অতএব' এই পদ—অনুমানবাচক গৌরবা-ত্মক পদ প্রয়োগ করিয়া "তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত"—হে অর্জ্জুন, অতএব তুমি যুদ্ধ কর (২—১৮); "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—অতএব তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর (গী,২—৩৭) "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—অতএব তুমি আসক্তি ছাড়িয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর (গী, ৩—১৮,); "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং"—অতএব তুমি কর্ম্মই কর (গী, ৪—১৮); "মামনুস্মর যুধ্য চ"—আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর (গী, ৮—৭) "সর্ব্বকর্ত্তা ও কারয়িতা আমি, তুমি নিমিত্ত মাত্র, অতএব যুদ্ধ কর ও শত্রুকে জয় কর" (গী ১১—৩৩) "শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য করা তোমার উচিত" (গী ১৬—১৪);—এইরূপ অর্জ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্ম্মপর উপদেশ করিয়া, ১৮তম অধ্যায়ের উপসংহারে পুনর্ব্বার "এই সমস্ত কর্ম্ম করা উচিত" (গী ১৮—৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াছেন; এবং পরিশেষে, "অর্জ্জুন! তোমার অজ্ঞান মোহ এখনো কি নষ্ট হইল না? (গী ১৮—৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ঃ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

"আমার কর্ত্তব্যমোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে, এখন আমি তোমার কথা মত কাজ করিব।"

এইরূপ প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ প্রাপ্তি-স্বীকার অর্জ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর, তদনুসারে সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সেই প্রসঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ জয়দ্রথাদির বধ সাধন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, 'অর্জ্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞানের, যোগের কিংবা ভক্তির উপদেশ হওয়ায় তাহাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া কর্ম্মের মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে ঐ যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধের সম্পূর্ণতা সাধনকে মুখ্য বিষয় না ধরিয়া আনুষঙ্গিক কিংবা অর্থবাদাত্মক বলিয়াই ধরিতে হইবে।' কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার উপক্রম উপসংহারের কিংবা ফলের যুক্তিটা ঠিক সংলগ্ন হয় না। স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্ত্তব্য যাহাই হউক না কেন, আমরণান্ত উহা সাধন করিবার মহত্ব ও আবশ্যকতা এইস্থলে দেখান প্রয়োজন ছিল। এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তরূপ শূন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই। এবং কথিত হইলেও অর্জ্জুনের ন্যায় বুদ্ধিমান ও চৌকোস পুরুষ উহা গ্রহণ করিতেন না, এবং করিতে বলিলেও পাপ না করিয়া কিরূপে করিবেন, ইহাই তাঁর মুখ্য প্রশ্ন হইত; এবং যতই কেন তর্ক কর না, "নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর" কিংবা "কর্ম্ম কর" এইরূপ ঐ প্রশ্নের অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্যের যে উত্তর তাহা "অর্থবাদ" বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। সেরূপ করা, আর নিজ যজমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া থাকা একই কথা! বেদান্ত, ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমস্ত গীতায় আদৌ উপদিষ্ট হয় নাই, একথা আমি বলি না। কিন্তু গীতায় এই যে তিন বিষয় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ হওয়া চাই যে, তাহার দরুণ পরস্পরবিরুদ্ধ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া "এটা করিব, কি ওটা করিব" এই প্রকার কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুন যাহাতে নিজ কর্ত্তব্যের নিষ্পাপ পন্থা লাভ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে স্বকীয় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে পারে। তৎপর্য্য,—প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের জ্ঞান এস্থলে মূল বিষয় হওয়ায় তৎসিদ্ধির নিমিত্ত বাকী বিষয় কাজেই আনুষঙ্গিক বলিয়া ধর্ত্তব্য; সুতরাং গীতাধর্ম্মের যে রহস্য, তাহাও প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্ম্মপরই হইবে, ইহা ত স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিপর রহস্যটি কি এবং তাহা বেদান্তশাস্ত্র হইতেও কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টীকাকারই তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই যে-কোন লোকের ইহা উপলব্ধি হইবে। গীতার উপক্রম অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়, ও শেষের উপসংহার ও ফল,—ইহার দিকে ঠিক্ লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা ভক্তি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কিরূপ অনুকূল হয়, নিবৃত্তিদৃষ্টিতে তাহাতেই তাঁহারা নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন। যেন কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা একটা মহা পাপ! আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা এক জনের হওয়ায় আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় চরিত্র চোখের সামনে রাখিয়া ভগবদ্গীতার অর্থ করা উচিত; * এবং শ্রীক্ষেত্র কাশীর সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতী পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, 'গীতার্থ-পরামর্শ' নামে ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে যে এক ক্ষুদ্র সংস্কৃত নিবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে "তস্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামূলং নীতি শাস্ত্রম্"—অর্থাৎ গীতা কর্ত্তব্যধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।† জর্ম্মন পণ্ডিত প্রফেসর-ডায়সনও স্বকীয় "উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান" গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আরো কতকগুলি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতাসমালোচকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ম্মপর দৃষ্টিতে তদন্তর্ভূত সমস্ত প্রতিপাদনের কিংবা অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার প্রযত্ন করেন নাই। উল্টা, এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ডায়সন স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন। ‡ এই জন্য ঐরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া গীতার সঙ্গতি প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে, গীতার প্রারম্ভে পরস্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ম্মের কঠিন সমস্যা দেখিয়া অর্জ্জুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আরো বেশী খোলসা করিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। নচেৎ গীতান্তর্গত বিষয়ের মর্ম্ম ভাল করিয়া পাঠকের ধারণায় আসিবে না। অতএব, এই কর্ম্ম অকর্ম্মের বিচারসঙ্কট কিরূপ এবং অনেক প্রসঙ্গে, "ইহা করিব কি উহা করিব" এইরূপ সংশয়-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্ বুঝিবার জন্য, এই প্রসঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা শাস্ত্রে, বিশেষত মহাভারতে পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি বিষয়-প্রবেশ সমাপ্ত।

---

* এই টীকাকারের নাম এবং তাহার টীকা হইতে উদ্ধৃত কিয়দংশ বহু বৎসর পূর্ব্বে একটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্র আমার গোলযোগের সময় কোথায় যে গেল তাহা আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এবং ঐ পত্র যদি কখন ঐ ভদ্রলোকটির চোখে পড়ে তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি যেন আমাকে আবার জানান তাঁহার নিকট আমার এই মিনতি।

† শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর শ্রীগীতা-রহস্য, গীতার্থ প্রকাশ, গীতার্থ-পরামর্শ এবং গীতাসারোদ্ধার এইরূপ এই বিষয়ে চারি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে। তাহা সমস্ত এক করিয়া রাজকোটে ছাপান হইয়াছে। উপরিপ্রদত্ত বাক্য তাঁহার গীতার্থপ্রকাশে আছে।

‡ Prof Deussen's Philosophy of the Upanishads (p. 362) English Translation.

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

প্রেমের বাঁশী।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নশাস্ত্রী)

প্রেমের বাঁশী ভুবন ভরিয়া বাজিতেছে। কোথায় না সেই হৃদয়োন্মাদনকারী বংশীধ্বনি শুনিতেছি? অন্তরে বাহিরে সেই বাঁশী নিয়ত বাজিতেছে। জলে, স্থলে, আকাশে ভূতলে, যেথানে যাই, সেই মধুর মুরলী সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকাগণ অসংখ্য গ্রহগণ, কোটি কোটি রবি শশী, সকলে সেই আনন্দের গান গাহিতেছে। সকলে সেই প্রেমের বাঁশী বাজাইতে বাজাতে অনন্তের পথে চলিয়াছে। শ্যামল পুষ্পপরিশোভিত বিজন প্রান্তর, তরুরাজিসুসজ্জিত ও নির্ঝর-ঝঙ্কারে নিনাদিত গিরিকন্দর, বীচিমালা-বিক্ষোভিত সমুদ্রোপকূল; সমস্তই সেই আনন্দের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নববসন্তসমাগমে যথন তরুরাজি নব পল্লবে সুশোভিত হয়, যখন কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে দশদিক ভূষিত ও আমোদিত করিতে থাকে, যখন মধুর মলয়হিল্লোল বহিয়া উল্লাসের স্রোতে জগত পরিপ্লাবিত করিতে থাকে, যখন পাপিয়ার সুমধুর স্বরে, কোকিলের কুহুরবে, মধুকরবৃন্দের শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারে চারিদিক শব্দায়মান হইতে থাকে, তখন ঐ বিজন প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দেও, সংসারগণ্ডীর সীমান্তরেখা হইতে ক্ষণকাল হৃদয়কে সুদূরে লইয়া যাও, ঐ সৌন্দর্য্যে, ঐ সৌরভে, ঐ মধুরনিনাদে, ঐ মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোলে তোমার মনপ্রাণ ঢালিয়া দেও, তোমার উন্মুক্ত হৃদয়কে উহাতে একবার ভাসাইয়া দেও; তোমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিবে, প্রাণে প্রবল উচ্ছ্বাসবায়ু বহিতে থাকিবে, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে; মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি আত্মহারা হইবে—অপার আনন্দজলধিতে সন্তরণ করিতে থাকিবে;—অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি, অযুতবর্ণের স্বর্গীয় আলোকমালা তোমার দর্শনিপথে পতিত হইবে, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবলবেগে তোমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তুমি বিহ্বল হইয়া পড়িবে; তুমি এক অনির্ব্বচনীয় নূতন রাজ্যে নীত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। সেই অমৃতভাণ্ডে নিপতিত হইয়া তুমি তোমার পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সুখশান্তি সমস্তই ভুলিয়া যাইবে। সেগুলি তোমার নিকট তখন তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ও স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইবে; সেই প্রেমের বাঁশীর মধুর নিনাদে তুমি আত্মবিসর্জ্জন করিবে! আবার ঐ পৌর্ণমাসীর পূর্ণ শশধরের কিরণধবলিত শৈকত চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই, বিজনতা একাকিনী এই শৈকতরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে; একবার ঐ বিজনতাকে প্রাণের সঙ্গিনী করিয়া যদি তুমি তাহার সঙ্গে একপ্রাণে তাহারই আনন্দে

আনন্দিত হইয়া আর সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সমস্ত প্রাণটী সেই আনন্দে উৎসর্গ করিয়া দিয়া নৃত্য করিতে পার, দেখিবে তোমার প্রাণের বীণা ঝঙ্কার করিতে থাকিবে, তোমার ধমনীস্থ শোণিতস্রোত প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিবে, তোমার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু দর দর বেগে বিগলিত হইতে থাকিবে, ঘূর্ণিবায়ুতে নিপতিত শুষ্ক পত্রের ন্যায় তোমাকে অপার আনন্দের প্রবল তুফান সুদূরে লইয়া যাইবে, তোমার সম্মুখে অনন্ত সৌন্দর্য্য অনন্ত সুখ উপস্থিত হইবে। সে সুখ সে সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত, ভাষার অতীত, চিন্তার অতীত, কল্পনার অতীত। সে এক অমৃতময় রাজ্য! প্রেমের বাঁশী আমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া যায়।

সেই বাঁশী আমাদের চারিদিকে বাজিতেছে, আমাদিগকে চারিদিক হইতে আহ্বান করিতেছে, আমাদের চারিদিকে অমৃতের ভাণ্ডার বিস্তার করিতেছে। ঐ শিশুর হাসিতে, সংগীতের সুমধুর স্বরলহরীতে, জননীর অকৃত্রিম স্নেহরাশিতে, সুহৃদের নিঃস্বার্থ ভালবাসায়, নিখিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে প্রেমের বাঁশী সকল সময় বাজিতেছে,—সে বাঁশী আয় আয়, বলিয়া নিয়ত আমাদিগকে ডাকিতেছে। আমরা যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ভুলিয়া সেই বংশীনিনাদে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, এক মনে এক প্রাণে সেই বংশীনিনাদ শ্রবণ করিতে পারি, তবেই উহার অমৃত আস্বাদন করিতে পারিব, তবেই উহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। বাঁশী আমাদের সমস্ত প্রাণটী চায়। প্রাণটীকে ধরিয়া রাখিলে সে বাঁশীর স্বর শুনা যায় না। প্রাণের বন্ধন খুলিয়া দিতে হইবে, প্রাণের অন্য পথগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, তবেই সে বাঁশীর রব প্রাণের কানে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে উন্মাদ করিয়া দিবে। তখন তোমার সম্মুখে অনন্ত স্বর্গ রাজ্য!

জগতের সৌন্দর্য্য ত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি, সঙ্গীতের স্বরলহরী ত আমরা নিয়তই শুনিতেছি; পিতামাতার স্নেহ, সুহৃদের ভালবাসায় ত আমরা কেহই বঞ্চিত নহি, তথাপি সেই বংশীনিনাদ কেন শুনিতে পাইনা? প্রাণ কেন সে সৌন্দর্য্যে, সে সংগীতে সে স্নেহে উন্মত্ত হইয়া উঠে না? সে স্বর্গরাজ্য কেন আমাদের সম্মুখে আইসে না? আমাদের দেখা দেখা নয়, শোনা শোনা নয়, আমাদের ভালবাসা ভালবাসা নয়। আমরা এক কানে ভাগবত শুনি অন্য কানে গান শুনি। কিন্তু আসলে দুই কানে দুই কাজ হয় না। ভাগবতও শুনিনা গানও শুনিনা। মন অতি সূক্ষ্ম পদার্থ—তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় না। মন একদা দুইকার্য্য করিতে পারে না। তাহাই করিতে চাই বলিয়া প্রেমের বাঁশীতে বঞ্চিত হই। সুন্দর বস্তু দর্শন করি, কিন্তু নয়ন ভরিয়া দর্শন করি না, সে সৌন্দর্য্যে ডুব দিতে পারি না;—দর্শনের আনন্দকে অধিককাল হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। সুমধুর সংগীত শ্রবণ করি, কিন্তু প্রাণ দিয়া করি না;—প্রাণটী তাহাতে ঢালিয়া দিই না;—সংগীতের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে পারি না। স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকভাবে মোহিত হই, কিন্তু সে ভাব আমাদের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, মরমে আঘাত করিতে পারে না, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। তাই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আমাদের প্রাণকে তাহা আকুল করিতে পারে না। ঐ সুন্দর বস্তুতে, ঐ মধুর স্বরে ঐ আধ্যাত্মিকভাবে যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি নাই একথা আমরা বলিতে পারি না। সে প্রবল শক্তি যিনি কখনও অনুভব করিয়াছেন, তিনি জানেন যে উহার আয়ত্তে পড়িলে আর ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে না। কিন্তু আমরা সে ফাঁদে পড়িতে চাই না, আমরা ধরিতে ছুঁইতে দিই না; আমরা যে আমাদিগকে নানাভাবে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছি, কাজেই সে শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য করিতে পারে না।

আমাদের বন্ধন অনেক প্রকারের; তন্মধ্যে কতকগুলি মিথ্যা বিভীষিকার, আর কতকগুলি ভগবানের উপর নির্ভর-শূন্যতার ফল। প্রথমোক্ত বন্ধনগুলি সম্বন্ধে বঙ্গের কোন মহাত্মা পুরুষ নিম্নলিখিত উক্তিটী করিয়াছেন।

"লজ্জা ঘৃণা ভয়
তিন থাকতে নয়।"

আমরা অনেক সময় আমাদের প্রাণের আবেগ লজ্জাবশত রোধ করি, পাছে লোকে কিছু মনে করে, পাছে আমাদের সামাজিক অবনতি হয়;

মানের খর্ব্বতা হয়। মধুর ব্রহ্মনাম গান হইতেছে তাহা শুনিয়া আমার নয়নাশ্রু নির্গত হইতে চায়, শরীর পুলকিত হইয়া ঐ সংগীতের তালে তালে নৃত্য করিবার স্পৃহা হয়। আমি যদি আমার ইচ্ছাটুকু দমন না করিয়া সেই মধুর ব্রহ্মনামে প্রাণটাকে ঢালিয়া দিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ ব্রহ্মনামসুধা আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আমার অন্তরস্থ প্রেমজলধিতে প্রবল তুফান আনয়ন করিবে—আমি সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশির সম্মুখীন হইতে পারি।

লজ্জা যেমন একটী মিথ্যা বিভীষিকার বন্ধন, ভয় ও ঘৃণা আরো দুইটী বিভীষিকার বন্ধন। মানুষ আত্মহারা হইতে ভয় পায়। আপনাকে হারাইতে গেলেই মনে হয়, না জানি কি বিপদে পড়িব, তখন আর আমি তাহার প্রতীকার করিতে পারিব না। ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কে ইচ্ছা করিয়া জলে ঝাঁপ দিতে চায়? কথাটা সত্য, কিন্তু সকল স্থানে এই সাবধানতার প্রয়োজন নাই। যাহাতে বিপদ নাই পক্ষান্তরে মঙ্গল আছে সেখানে এই আত্মসংযমের কোন আবশ্যকতা নাই। ঘৃণাও অপর একটী বন্ধন। উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন যে মহাত্মার উপরোক্ত উক্তি, তাঁহার জীবনী পড়িলে জানিতে পারিবেন যে, সাধনার পথে তাঁহাকে কত দূর ঘৃণিত কার্য্য করিতে হইয়াছিল, ঘৃণাকে তখন তিনি আর মনে স্থান দেন নাই।

শেষোক্ত প্রকারের বন্ধনগুলির সংখ্যা অনেক। সেগুলির সহিত জীবিকা ও বৈষয়িক উন্নতির সম্বন্ধ—সেগুলি লাভালাভের চিন্তাসমুদ্ভূত। আমি যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিহ্বল হইয়া উহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করি, আমি যদি অধ্যাত্মিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া আত্মপর ভুলিয়া যাই তাহা হইলে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে, আমার জীবিকা কি প্রকারে চলিবে? আমি বৈষয়িক উন্নতি কি প্রকারে করিব? এই সকল চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় আমরা আমাদের অন্তরস্থ সুমধুর ভাবগুলিকে বাড়িতে দিইনা, অনেক সময় প্রশ্রয়ও দিই না। অনন্ত সুখের পরিবর্ত্তে অলীক সাংসারিক সুখে সন্তুষ্ট থাকি, এবং তাহারই উন্নতি সাধনের জন্য জীবনটাকে সংসারগণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া আজীবন সেই সংসারহ্রদের বিষবারি পান করি। একবারও ভাবিনা যে সেই প্রেমের বাঁশরী আমাকে যে সুখময় রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে তাহার কাছে এই সাংসারিক সুখ সাংসারিক উন্নতি তুচ্ছাদপিতুচ্ছ অলীক স্বপ্নসদৃশ। একবারও ভাবিনা সে যিনি এই প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন তাঁহারই সব, আমার কিছুই নহে। আমিও তাঁহারই, আমার সংসারও তাঁহারই। তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন, তাঁহার সংসার তিনি দেখিবেন—আমার এত ভাবনা কেন? তাঁহার ডাক শোনাই আমার কার্য্য। তিনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই প্রতিপালন করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল। এ তথ্য বুঝেন কয় জন? যিনি বুঝেন তাঁহার কখনও অভাব হয় না। তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন। মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি মহাভক্তগণ তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নগরে নগরে জনপদে জনপদে হরিগুণ গাহিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে পারিয়াছিলেন।

প্রেমের বাঁশী ত চারিদিকে বাজিতেছে, অন্তরেও বাজিতেছে বাহিরেও বাজিতেছে। আমরা যে সে বাঁশী শুনিয়াও শুনি না, আমরা যে তাহার মধুর নিনাদ দূর হইতে শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করি—পাছে ফাঁদে পড়ি এই ভয়ে সুদূরে পলায়ন করি। আমরা কি প্রকারে সে স্বর্গীয় ধ্বনি শুনিতে পাইব, সে অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইব? আমরা কি প্রকারে সে অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিব?

মূকের বাণী।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস-গুপ্ত এম-এ, বি-এল)

মূকের বাণী বুঝবি কি তুই মূকের কথা শুনবি কিরে?
বিশ্বজোড়া রূপের বাহার আছে যে তোর নয়ন ঘিরে,
লুব্ধ অলির মত্ত গানে মুগ্ধ যে তোর শ্রবণ দুটি,
যক্ষরাজের রত্নরাজি পড়ছে যে তোর পায়ে লুটি।
যেই দিকে চা'স, হাসির রাশি ছড়িয়ে পড়ে ডাইনে বামে,
তৃপ্ত যে তোর চিত্তচকোর বৈঠকখানার সরঞ্জামে।
মূকের কথা শুনবি যদি এ সব ছেড়ে চল্ ভিতরে,
নকল ফেলে আসল নিবি, এই বেলা তুই পড়্‌রে সরে।

ওই গগনে নীল বরণে মেঘের কোলে রবির খেলা,
ফুল বাগানে মুচকি হাসি হাস্‌ছে যে অই ফুলের মেলা;
খেলুক তারা হাসুক তারা চোখ বুজে তুই যা'না চলে,
যার খেলা এ, যার হাসি এ, তারেই একবার দেখবি বলে।
বাহির থেকে চোখ টেনে নে, চেয়ে দেখ্ আজ প্রাণের মাঝে
অপরূপ তোর আসনে কোন্ অরূপ দেবের রূপ বিরাজে।
বধির কর আজ শ্রবণ দুটী বিহগের অই কল কূজনে,
সরিৎপতির গর্জ্জনে আর স্রোতস্বতীর মধুর স্বনে;
পায় ঠেলে দে ধরার ধনে গায় মেখে নে ভক্তি মাটি,
দূর করে দে কুটিলতায়, মন করে নে পরিপাটী;
বহু দিনের রুদ্ধ গৃহের মুক্ত আজি দুয়ারপথে
গোপন বাণী শুনবি যদি কান পেতে থাক্ কোন মতে,
সকল গীতির সার যে গীতি, গীত সেথায় তালে তালে,
সব কথার সার সেথায় কথা, শুনিস্‌নি যা কোন কালে,
(ওরে সেই) মধুর কথার সুধার ধারায় সব ইন্দ্রিয়ই তৃপ্ত হবে
সুখের সেরায় মহাসুখে আত্মা যে তোর মগ্ন রবে!
সেথায় বসে শুন্‌বিরে তুই মেঘের সনে তারার কথা,
হেসে হেসে চাঁদ চলে যায় ক'য়ে তোরে কোন্ বারতা,
কি গান গেয়ে ধেয়ে ধেয়ে যাচ্ছে ছুটে তরঙ্গিনী,
অভিমানে ম্লান মৌন কি কহে অই নিশীথিনী,
কোন্ বা রঙ্গে ধরার অঙ্গে লুটিয়ে পড়ে শস্যরাজি—
যার যে কথা সবই সেথা শুনবিরে তুই শুনবি আজি।
মন মজিয়ে দণ্ড দুয়েক আত্মা গুরুর চরণতলে
দেখনা বসে, বাইরে যত আসবে সবাই সেথায় চলে।
অন্তরে তোর অন্তর্য্যামী আসন পেতে আছেন বসে
যুক্ত হ'লে তাঁর সনে তুই মুক্ত হবি তাঁর পরশে—
ব্রহ্ম হ'তে তুচ্ছ তৃণ সবাই সেথা মিলছে গিয়ে,
মহাযোগীর যোগসাধনা দেখবি যদি আয় পালিয়ে।
স্নেহের ডাকে ডাকছে তোরে ডাক শুনে আর থাকিস্ নারে
বাইরে যদি থাকিস্ বসে বদ্ধ হবি কারাগারে।
গুরুর গুরু পরমগুরু পরমাত্মার মুখের বাণী
শুনবি যদি মুক্তের কথা, আয় চলে আয় সকল প্রাণী।

বোধগয়া প্লাকের নূতন কথা।

(অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ ভিনসেণ্ট এ, স্মিথের অভিমত)

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

ডাঃ স্পুনার বাঁকিপুরের নিকটবর্ত্তী কুমাহরহারে আবিষ্কৃত 'বোধগয়া প্লাক' পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 'ইহাই বোধগয়া মন্দিরের অতি প্রাচীনতম চিত্র।' প্লাকে অঙ্কিত সরল রেখাঙ্কিত মন্দিরে ধ্যানী বুদ্ধ, বেষ্টনী ও কতকগুলি স্তূপের চিত্রাবলীই এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি। বেষ্টনী ও স্তূপ এই সিদ্ধান্তে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বহু বিখ্যাত স্মৃতিমন্দিরে এই ধরণের চিত্রাবলী পরিলক্ষিত হয়।

এখন প্রশ্ন এই, প্লাকে অঙ্কিত চিত্র বোধগয়া মন্দিরের প্রামাণিক বিবরণের সহিত মিলে কি না? ডাঃ স্পুনারের অনুমানে একটি পূর্ণায়বয়ব স্তূপাকৃতি মন্দিরের চূড়াই এই নক্সার বিশেষ পরিচয় নিদর্শনস্বরূপ। বোধগয়া মন্দিরের চূড়ার গঠনপ্রণালী কখনও এই ধরণের ছিল ইহা অনুমান করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি না ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং ৬৪২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিহারে ছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, 'বোধগয়া মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ইহার গায়ে চূণকাম করা ছিল। প্রাচীরগাত্রে ক্রমশ উপরে উপরে সজ্জিত কুলুঙ্গিতে সুবর্ণনির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ইহার চারিদিকের প্রাচীর মুক্তার মালা ও যক্ষের মূর্ত্তির অতি মনোরম খোদাই কাজে পরিশোভিত ছিল। খিলানের মধ্যভাগে গিল্টি করা তাম্রের আমলক; মন্দিরের পূর্ব্বভাগে পর পর অতি উচ্চ ও জাঁকাল তিনটি বৃহৎ 'হল' বা কক্ষ। এই কক্ষগুলির কাঠের কাজে সোণা ও রূপার খোদাই কাজ করা এবং নানারঙ্গের মূল্যবান প্রস্তর বসান ছিল। একটি খোলা প্রশস্ত দরদালান এই কক্ষগুলিকে মাঝখানের প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই কক্ষ তিনটির বহির্ভাগের দরজার বামপার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত দশ ফিট উচ্চ 'কুয়ান-জু-সাই পুশার' (Kuan-tyu-tsai) মূর্ত্তি ও ডানদিকে জু-শী (মৈত্রেয়ী) বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপতি অশোক বোধগয়া মন্দিরের জমীতে প্রথমে একটি ক্ষুদ্র চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্দিরটি কোন এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কিম্বদন্তী এই,—'বোধিবৃক্ষের নীচে বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি ইনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তি আসনে উপবেশন পূর্ব্বক জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মারকে বলিতেছেন সংসার এই
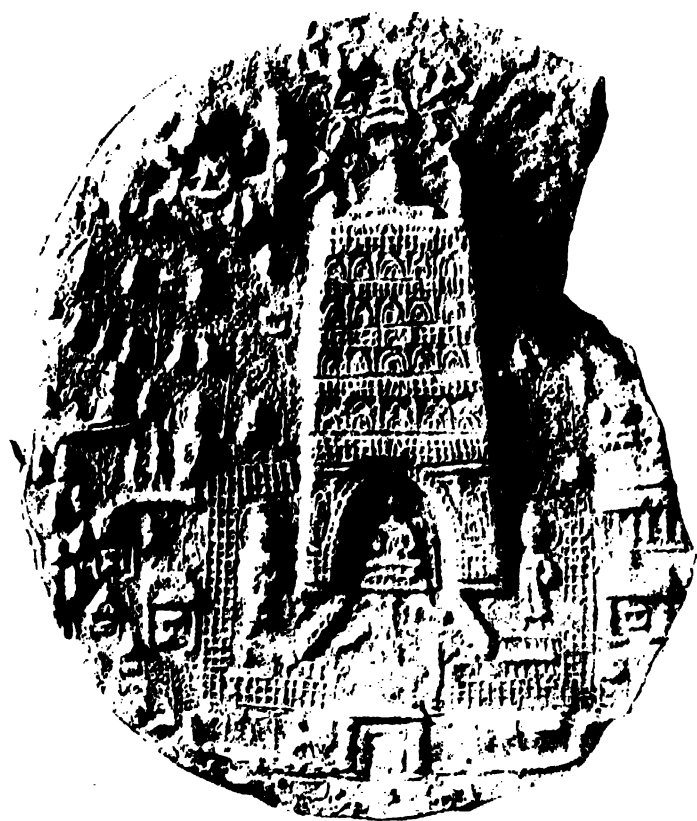
বোধগয়া প্লাক।

ব্যাপারের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।' মিঃ বিলও এই আখ্যায়িকা এই ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'থিলানের মধ্যভাগ গিল্টি করা তাম্রনির্ম্মিত আমলকী ফলে পরিশোভিত। বুরুজের উপরে আসনে উপবিষ্ট অতি সুন্দর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, ডান পা খানি বাম পায়ের উপর স্থাপিত, বাম হাতখানি আসনে রক্ষিত এবং ডান হাত নীচের দিকে প্রসারিত।'

এই বিবরণী হইতে মিঃ স্মিথ তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন :—

১। সপ্তম খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সিয়াং যে মন্দির দেখিয়াছিলেন তাহাই অশোকের প্রতিষ্ঠিত স্তূপের উপর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে অপর কোন মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই।

২। মন্দিরের শীর্ষদেশ গিল্টি করা তাম্রনির্ম্মিত আমলকী সদৃশ ছিল ; ডাক্তার স্পুনারের মতে উহার অগ্রভাগ স্তূপাকার ছিল না।

৩। বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার ডান হস্ত নীচের দিকে প্রসারিত এবং অঙ্গুলিগুলি সংসারকে মার-বিজয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল।

ডাঃ স্পুনার যে অনুমান করিয়াছেন 'প্লাক খানা সম্ভবতঃ কুষাণ যুগের, অন্ততঃ ২য় বা ৩য় শতাব্দের হইবে'—ইহা হইতেও পারে না-ও বা হইতে পারে। যাহা হউক, এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে এরূপ উল্লেখ নাই যে মন্দিরের অগ্রভাগ স্তূপাকার ছিল। প্লাকের ফটোতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহা হইতে ইহাই স্পষ্টীকৃত যে বুদ্ধদেবের ডান হাতখানা উর্দ্ধে উত্তোলিত অবস্থায় জীবকে আশীর্ব্বাদ দিতেছে এবং ইহা কিছুতেই নীচের দিকে প্রসারিত নয়। এইভাবে দুইটি অপরিহার্য্য বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এই প্লাকখানার সহিত বোধগয়া মন্দিরের কোনই সাদৃশ্য নাই। অধিকন্তু ডাঃ স্পুনার অসাবধানভাবে বলিয়াছেন 'মূল মন্দিরের প্রধান মন্দিরাংশের দক্ষিণে ও বামদিকে দুইটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে, সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তি চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত বোধিসত্ত্বের রৌপ্য মূর্ত্তি।' কিন্তু এই মূর্ত্তিদ্বয় প্রধান কক্ষ তিনটির বহির্ভাগের দরজার বামপার্শ্বে অবস্থিত। এই কক্ষগুলি মূল মন্দির হইতে বিভিন্ন, শুধু একটি খোলা প্রশস্ত দরদালান এই কক্ষগুলিকে মাঝখানের প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ডাঃ স্পুনারের উপরোক্ত উক্তি খাটে না। প্লাকখানা বোধগয়ায় আবিষ্কৃত হয় নাই, ইহা পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছে, এই কারণেও মিঃ স্মিথের মনে একটা সন্দেহ আসিয়াছে। তিনি মনে করেন সম্ভবতঃ ইহা পাটলিপুত্রের কোন বিখ্যাত মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা অস্বীকার করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই যে এই মন্দিরটার চূড়া একটি সরল রেখায় গঠিত ছিল, কিন্তু ইহার স্থাপত্যের সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই যুক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মিঃ বেগলার যে বোধগয়া মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন সেই বর্ত্তমান মন্দিরটির সহিত হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত মন্দিরের অভিন্নতা প্রতিপাদনের কোনই সম্পর্ক নাই। মিঃ স্মিথের সমালোচনার বক্তব্য এই যে, তিনি প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত মন্দিরের কোনই সামঞ্জস্য দেখিতে পান না। বরং তাঁহার ভাষ্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে স্তূপাকৃতি অগ্রভাগবিশিষ্ট কোনও মন্দির পূর্ব্বে এখানে ছিল না। মিঃ স্মিথ ইহা একবারও অনুমান করেন না যে এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দির ও বোধগয়া মন্দিরের সহিত চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত 'তিলোশিকা' (তিলোদক) মন্দিরের কোনও সাদৃশ্য আছে—এই উভয় ক্ষেত্রে কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। এই 'তিলোশিকা' মন্দিরের বর্ণনায় আছে 'রাস্তার প্রান্তভাগে মাঝখানের ফটকের মধ্য দিয়া তিনটি মন্দির (চিংশী) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলির ছাদ গোলাকার থালার মত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলিতেছে। মূল ভিত্তির চতুর্দ্দিক রেলিং দিয়া ঘেরা ; দ্বার, বাতায়ন, কড়ি, বর্গা, প্রাচীর এবং সিঁড়ী সমস্তই গিল্টি করা খোদিত কারুকার্য্যে পরিশোভিত। মাঝখানের মন্দিরে ত্রিশ ফিট্ উচ্চ বুদ্ধদেবের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি, বাম পার্শ্বের মন্দিরে তারা বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি। এই তিনটি মূর্ত্তি ব্রঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত। মিঃ স্মিথ

মোটামুটিভাবে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন যে 'প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের সহিত বোধগয়া মন্দিরের সাদৃশ্য ঠিক করিয়া মিলাইবার উপায় নাই। হিওয়েন সিয়াং বর্ণিত বোধগয়া মন্দিরের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই এবং ইহা যে বোধগয়া মন্দিরের 'প্রাচীনতম চিত্র' ইহাও বিশ্বাস করিবার কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নাই।'

মিঃ স্মিথের অভিমত পাঠ করিয়া ডাঃ স্পুনার বলেন 'ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই দুইটি মন্দিরের একত্ব সম্বন্ধে কোন সবিশেষ প্রমাণ নাই, তবে বিহার প্রদেশে যতগুলি মন্দির বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বোধগয়া মন্দিরের সহিত এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের অনেক বিষয়ে মিল আছে। বোধগয়া মন্দির যদি সাধারণ মন্দিরের মত হইত তাহা হইলে সম্ভবতঃ এ বিষয়ে কিছুই বলিতে হইত না। প্রকৃতপক্ষে বোধগয়া মন্দিরের স্থাপত্য ভারতবর্ষে প্রায় অদ্বিতীয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে প্লাকে অঙ্কিত মন্দির বোধগয়া মন্দিরেরই অনুকরণে চিত্রিত। প্লাক হইতে ইহাও বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্লাকের মন্দির কোন বিখ্যাত মন্দিরের প্রতিচ্ছবি লইয়াই চিত্রিত হইয়াছিল। অতি সাধারণ মন্দিরের চারিদিক এভাবে রেলিং বেষ্টিত অথবা এইরূপ অসংখ্য স্তূপবেষ্টিত হয় না, অথবা সম্মুখভাগে এইরূপ স্তম্ভশ্রেণীও দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই রেলিং ও স্তূপ প্রমাণের দিক দিয়া ধরিতে হইবে না—ইহাতে আমি মিঃ স্মিথের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার অনুমানে ইহা ঠিক হইতে পারে যে বোধগয়া প্লাকের কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ অন্যান্য বিখ্যাত মন্দিরের সঙ্গে সমানভাবে একই প্রকারের কিন্তু পাটনার চারিদিকের নিকটবর্ত্তী স্থানে এইরূপ বিখ্যাত মন্দির একমাত্র বোধগয়া মন্দির,এই কারণে ইহাকে এই ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া চলে না। প্লাকের মন্দিরের স্বাভাবিক আদর্শ একমাত্র বোধগয়া মন্দিরের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে, তবে ইহাতে যে সামান্য একটু সন্দেহ আসিতে পারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক এই মন্দিরকে মিঃ স্মিথ যেভাবে বড় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাও যে ঠিক নহে ইহা সুনিশ্চিত। মিঃ স্মিথের সন্দেহ প্রধানতঃ চীন পরিব্রাজকের বর্ণনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বর্ণনা হইতে তিনটি বিষয়ের অসামঞ্জস্য মিঃ স্মিথের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে যথাঃ—(১) মন্দিরের ছাদ আমলকাকৃতি ছিল, (২) মন্দিরাভ্যন্তরে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট এবং (৩) মন্দিরের পূর্ব্বাংশে যে তিনটি অতিরিক্ত 'হল' ছিল তাহা এই প্লাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় যে এই সকল অনৈক্য সত্ত্বেও খুব সম্ভবপর অনুমানদ্বয়ের একটির উপর নির্ভর করিলে আমার অভিন্নতা-নিরূপণ ঠিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। মিঃ স্মিথ বলেন যে হিওয়েন সিয়াংএর সময় পর্য্যন্ত (৭ম শতাব্দের মধ্যভাগে) এইস্থানে দুইটিমাত্র মন্দির ছিল, ইহার মধ্যে একটি অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং অপরটি পুরাতন মন্দিরের স্থানে কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পরিব্রাজক শেষোক্তটিই দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বর্ণনা আমাদের প্লাকের সহিত মিলে না। প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরটি যে অতি প্রাচীন ইহা সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৌর্য্যেরা যে খরোষ্ঠি * অক্ষর ব্যবহার করিতেন এই প্লাকে সেই অক্ষর খোদিত, ইহা অশোকের রাজধানীতে পাওয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে দেখা যায় যে মন্দিরের পুরোভাগে যে লিখিত অংশ আছে তাহা মৌর্য্যদের অক্ষরে লিখিত এবং অপর পক্ষে প্লাকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার গুরুত্ব কিছুতেই উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। চীন পরিব্রাজকের মতে এই প্রাচীন মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র চৈত্য ছিল, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারা যায় না, কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অধিকন্তু আমরা বর্ত্তমানে যে রেলিং দেখিতে পাই ইহাতে বিপরীত অনুমানই আসিয়া পড়ে। প্রথম দেখিতে গেলে ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় যে রাজা অশোক এইরূপ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থে অতি ক্ষুদ্র একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই সম্ভব যে

---

* 'ইহা প্রাচীন আরামীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। ইহা বর্ত্তমান পারস্য লিপির ন্যায় দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে লিখিত হইত। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পর লোপ হয়।'

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪ সন।

এই প্লাকে অঙ্কিত মন্দির অশোকের মন্দিরেরই অনুরূপ। ডাঃ সপুনারের মতে 'Such resemblance as is now discernible between it and the modern temple will in this case be explainable by 'Amara' having copied the general style of the original when he rubuilt it (a very natural thing to do), whereas the minor differences will also be accounted for. This seems therefore quite a possible alternative.'

ডাঃ স্পুনারের মতে ইহাই সম্ভবতঃ ঠিক যে চীন পরিব্রাজক প্লাকে অঙ্কিত মন্দিরের প্রাচীনতর মূল জিনিসই দেখিয়াছিলেন। প্লাকখানা দ্বিতীয় শতাব্দের, ডাঃ স্পুনারের এই অনুমান মিঃ স্মিথ পরীক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণের সময় ৭ম শতাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরটি মৌলিক অবস্থায়ই ছিল; ইহা কোন প্রকারেই ঠিক নয়। ডাঃ স্পুনারের প্লাকের তারিখ ঠিক হউক বা না হউক, ইহা যে কুষাণ যুগের অথবা ২য় বা ৩য় শতাব্দের ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে চীন পরিব্রাজকের আগমন পর্য্যন্ত চারিশত বৎসর অতীত হইয়াছে; এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মূল মন্দিরের বহু পরিবর্ত্তন ও সংস্কার হইবার কথা। বোধগয়া মন্দিরের প্রতিলিপি এই প্লাকের আদর্শ হইয়া থাকিলে ঐ চারিশত বৎসর মধ্যে যে মন্দিরের চূড়া নাই কে বলিবে? এবং উহা সংস্কারের সময় স্তূপের পরিবর্ত্তে আমলকাকৃতিতে পরিণত নাই ইহাও অস্বীকার করা যায় না। মূল মন্দিরের অগ্রভাগ যে আমলকাকৃতি ছিল ইহারও সবিশেষ কোন প্রমাণ নাই। যে হিউয়েন সিয়াংএর বর্ণনায় মিঃ স্মিথ এতটা জোর দিয়া প্লাকের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে আর একটি অসামঞ্জস্য মন্দিরের পূর্ব্বদিকের তিনটি কক্ষকে অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। চীন পরিব্রাজকের বর্ণনা আমাদিগকে উড়িষ্যা মন্দিরের জটিল গঠনপ্রণালীর ভিতর আনিয়া ফেলে। ইহাতে চূড়া, জগমোহন ও কোন কোন স্থানে মন্দিরের উভয় পার্শ্বে বিভিন্ন কক্ষের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মিঃ স্মিথ এই কক্ষগুলিকে মূল মন্দির হইতে পৃথক্ ধরিয়া লইয়াছেন। এই স্বীকারোক্তিতেই তিনি তাঁহার নিজ মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। কক্ষগুলিকে মন্দির হইতে পৃথকভাবে ধরিয়া লওয়া সেই যুগের স্থাপত্যের সমসাময়িকতার পক্ষে কোন মতেই অনুকূল নহে। প্রকৃতপক্ষে এই কক্ষগুলি ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়া মূল মন্দিরের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে মন্দিরের মূল নক্সাতে এই কক্ষগুলির কোন স্থান ছিল না, কাজেই প্লাকে এই কক্ষের কোন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্লাক খানা পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্পুনার বলেন 'তীর্থের নিদর্শনস্বরূপ যাত্রিগণ বোধগয়া প্লাক যে বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। রাজধানী পাটলিপুত্রে যে এইরূপ প্লাক পাওয়া যাইত ইহা খুবই সম্ভবপর। এই সব কারণে আমার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তন করিবার কোনই কারণ দেখি না। তবে বোধিসত্বের ভূমিস্পর্শ মুদ্রা সম্বন্ধে মিঃ স্মিথ যে আপত্তি তুলিয়াছেন ইহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে।' পরবর্ত্তী যুগের স্থাপত্যের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বোধগয়ার স্থাপত্যে স্থান লাভ করিয়াছিল এবং মিঃ স্মিথের মতে ৭ম শতাব্দে এইরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন চীন পরিব্রাজকের বিবরণীতে দেখিতে পাইয়াছেন—ইহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে ইহাও সম্ভবপর যে ২য় কি ৩য় শতাব্দে এইরূপ মুদ্রার প্রচলন ছিল না, চারিশত বৎসরের মধ্যে ঐরূপ নূতন ভাব স্থাপত্যে স্থান পাইয়াছিল। যাহা হউক প্লাকে খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার যত দিন না হইতেছে ততদিন এই শেষ বিবরণীর মীমাংসা হইতে পারে না। *

দিব্য বিরহ।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

অসীমকে পাবার জন্য, ধরে' রাখবার জন্য অনুভব করবার জন্য প্রকৃতির ভিতরে যে একটা

---

* এই প্রবন্ধটী বিহার ও উড়িষ্যার Research Societyর জর্ণাল হইতে গৃহীত।

বিচিত্র ব্যাকুলতা আছে. সে নানা রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে' উঠে! সে কোনো সময় শিশিরপাতচ্ছলে মৃদু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, বর্ষাধারাপাতচ্ছলে আকুল ক্রন্দন করে, আবার কখনো বা উদ্দাম বিরাট আগ্রহে ঝঞ্ঝায় মাতিয়া উঠে। এই লীলা বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির এই ব্যাকুলতাটুকু দেখিতে, অনুভব করিতে অনন্তের বড় মধুর লাগে, তাই সে আপনাকে সমগ্ররূপে, স্পষ্টভাবে সহজে ধরা দিতে চায় না—ইঙ্গিতে, ভঙ্গিমায়, সঙ্কেতে একটু আভাস দেয় মাত্র।

এই বিচিত্র বিরহ-ব্যাকুলতার নানা রূপ। সে নিশায় গম্ভীর, প্রভাতে কমনীয়' মধ্যাহ্নে প্রখর, সন্ধ্যায় প্রশান্ত। সে বসন্তে শ্যামল, হেমন্তে মৃদু, শীতে শীর্ণ, নিদাঘে দীপ্ত, বর্ষায় আর্দ্র, শরতে প্রফুল্ল। সে জ্যোৎস্নায় সুন্দর, আঁধারে করাল, রৌদ্রে দৃপ্ত, ছায়ায় স্নিগ্ধ। আজিকার এই ঝড় দেখে মনে হচ্চে প্রকৃতি যেন প্রখরা হয়ে' মেতে উঠেচে। এটা লাভ করার আনন্দ নয়, না পাও-য়ার নৈরাশ্য নয়, এটা কেবল দীর্ঘ বিশ্রান্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষার অসহ-ব্যাকুলতা।

• মানুষ, মানুষের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করে, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, কিন্তু এই প্রকৃতির বিরহ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে তার সহানুভূতি নিবিড় হয়ে উঠচে না কেন? আজ এই বিরহ-ঝঞ্ঝায় বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ল, পাতা আপনাকে উড়িয়ে দিল, মাটি গলে' জল হয়ে গেল কিন্তু মানুষ কেবলি তার অভিমান-সঞ্চিত বিজ্ঞতায় হৃদয়-দুয়ার বন্ধ করিয়া অবাধে আপিস যাতায়াত ও কারখানার কাজ করিতেছে ও মোকদ্দমার তদ্বিরে ব্যস্ত।

আজ সকলের চেয়ে লোকহিতৈষী তাঁকে বলব যিনি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলবেন—"ও গো তোমরা দুয়ার খুলে দেখ, কান পেতে শোন, প্রাণ দিয়ে উপভোগ কর।" আজকে এমন দিনে, দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচার, স্থবিরের বহুদর্শিতা, আচারনিষ্ঠের গোঁড়ামী বিদ্যাভি-মানীর বিজ্ঞতা সব এর কাছে পরাজয় মানবে।

যা' আমরা সহজে পাচ্চি, তাকে যেন সহজ বলেই অবহেলা কচ্চি, তাকে পাচ্চি বলেই পাচ্চি না; তাকে ছাড়তে পারা যায় না বলেই যেন ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। আকাশ বাতাস যে কত বড় প্রয়োজনের, তা যে কত মনোহর, তার সঙ্গে যে আমাদের নিবিড় ঐক্য, তা মনেই থাকে না; কিন্তু এরচেয়ে নিজের হাতের গড়া ছোট পুতুল-টিকেই বেশি যত্ন কচ্চি। নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়ো-জনসিদ্ধি ছাড়া আকাশ বাতাসের আর একটা মহান্ সার্থকতার দিক আছে।

যাকে মোটে দেওয়া হয় নাই সে হতভাগ্য; কিন্তু তার চেয়েও বেশি হতভাগ্য সে-ই, যাকে দেওয়া হ'ল অথচ তার পাওয়া হ'চ্চে না,—যে নিতে পাচ্চে না। এই অবস্থাটাই আমাদের নয়কি? এতটা জিনিস দেওয়া হয়েছে অথচ সেগুলি পাওয়া হ'ল না। কিন্তু এগুলি আমরা চেয়েছি। অভি-মানে বৃথা বিজ্ঞতায় স্বীকার না করলেও বুঝতে পারছি যে আমরা এগুলো চেয়েছি।

মানুষ এই পৃথিবীর মানুষ। আজ লতাটি পাতাটি তৃণ গাছটি এই প্রকৃতির সঙ্গে একতানে সাড়া দিচ্চে, মানুষ তা পারচে না! এটা বিজ্ঞতা না অক্ষমতা? আজ কি তবে এই কথা মনে করলে অন্যায় হয় যে মানুষের চেয়ে তৃণ গাছটি বড়? আমি পর জন্মে বরং তৃণ হ'তে রাজি তবু এমন হৃদয়হীন মানুষ হব না। আজকে এমন দিনে ইচ্ছা হয় না কি সকল বিজ্ঞতা ছেড়ে স্রোতের মত বয়ে যেতে, গন্ধের মত ছড়িয়ে যেতে? ইচ্ছা হয় না কি মাটির মত গলে যেতে? ইচ্ছা হয় না কি গাছের মত নুয়ে' পড়তে, ফুলের মত ফুটে পড়তে, লতার মত ছিঁড়ে যেতে? মানুষের ভিতরেও এরূপ দিব্য বিরহ আছে। যখনি সে ঝড়ের মত প্রমত্ত বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তখনি তার বিরাট আগ্রহে হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলি টুটে লুটে পড়তে চায়। এই বিরহটাকে ক্রমেই ফেনায়ে তুলতে হবে; একে রুদ্ধ করলে আমাদের জিত মোটেই নহে, কেবলি হার। আপাততঃ এই ঝড়টাকে নিতান্ত আক-স্মিক বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এর জন্য কি প্রকৃ-তির ভিতরে আগেই কোন আয়োজন হচ্ছিল না! হচ্ছিল বৈ কি? ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রির নিস্তব্ধ-তার পরেই প্রভাতে এই ঝড়।

এই বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য মানুষের ভিতরেও এমন একটা অদৃশ্য আয়োজন

চলতে পারে। শেষে সহসা একদিন সুপ্রভাতে তা' উদ্দামবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। শৈল-গহ্বরের অন্ধকারময় নির্জ্জন প্রদেশে বহুদিন ধরে যে বারিধারা সঞ্চিত থাকে, তাই একদিন একসময়ে, ফুলিয়া, ফুঁপিয়া, গর্জ্জিয়া, মাতিয়া বাধাবাঁধন তুচ্ছ করে বাহির হয়, তখন তাকে কেউ রোধ করে রাখতে পারে না। সে আপনার ক্ষুব্ধ আবেগে ছুটিয়া যায়।

আজকে এই ঝড়ের দিন—মাতামাতির দিন। আজকে ভিতর বা'র এক করে দেবার মহামুহূর্ত্ত। আনন্দ তাকেই বলে যার গতিতে বাধা নাই, যার আদান প্রদানে সঙ্কোচ নাই। যার বন্ধনও মুক্তি। আজকে বিজ্ঞ গম্ভীর হয়ে' একা বসে' থাকলে চলবে না। আজ ছোট বড় সবারি সঙ্গে মিশতে হবে। আপনার চারিদিকে ধীরে ধীরে যে দেয়াল গড়ে তুলছি তাকে একেবারেই ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। এ যদি না পারো, এ যদি না শোনো, এ যদি না করো, তা হলে ওহে মানুষ, তুমি মানুষ নও—ধিক্ তোমার বিদ্যায়, ধিক্ তোমার বিচারে।

ব্রাহ্মসমাজ ও বক্তৃতা।

অন্য বিষয়ক বক্তৃতার কথা বলিতে পারি না, বঙ্গভাষায় অন্তত ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করা আরম্ভ হয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগে স্বদেশীয় ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার জন্মদাতা হইল ব্রাহ্মসমাজ, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এরূপ বক্তৃতার জন্মের কারণ কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রবাসে ধ্যানধারণার ফলে ঈশ্বরের সত্তা দ্বারা নিজের আত্মাকে পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। সেই আত্মদৃষ্টিই তাঁহাকে, তিনি যতটুকু ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই নিজের আত্মার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার পরিবর্ত্তে সমগ্র দেশে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিল। বাস্তবিক বক্তৃতা মাত্রেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, যে বিষয়ে বক্তা যেটুকু প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণ্যে প্রচার করা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রাদি হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া যে একেশ্বরবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি শাস্ত্রাদি প্রকাশ প্রভৃতি নানা উপায়ে প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তিনিও শাস্ত্রাদি পাঠ প্রভৃতি উপায়ে রামমোহন রায়প্রদর্শিত একেশ্বরবাদেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত, তিনি সেই একেশ্বরবাদের মূল লক্ষ্য পরব্রহ্মের সত্তা দ্বারা আত্মাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে fullness of the heart বলে, সেই অন্তরের পূর্ণতা হইতে তিনি আর বসিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে গ্রন্থরচনার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষকে ক্রমাগত তর্ক-সংগ্রামে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলেন না, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যবাণী সকল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেই সকল বক্তৃতাবদ্ধ উপদেশ সমগ্র দেশকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্বীয় হৃদয়ে সেই পূর্ণ পুরুষের ভাব এতই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সত্তার বিরুদ্ধে তর্ককে তিনি অনেকটা ভীতির চক্ষে দেখিতেন, আমরা ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনের সেই প্রথম অবস্থায় যখন তাঁহার পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে পান কি না, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশ্নকর্ত্তা সম্মুখস্থ দেওয়াল যতটুকু প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তদপেক্ষা তিনি ঈশ্বরকে অনেক অধিক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ধর্ম্মসাধনের ফল এবং তাহার উদ্দেশ্য আত্মপ্রচার নহে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার। আমাদের বিশ্বাস যে যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হইবে, তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা স্বতই প্রকাশিত হইবে, এবং সে বক্তৃতার মধ্যে কোন প্রকার অতিরঞ্জন থাকিবে না, আত্মঘোষণা থাকিবে না, পরনিন্দা থাকিবে না, অথবা মিথ্যামিথ্যা ফেনাইয়া বাড়াইয়া বলিবার চেষ্টাও থাকিবে না। ঋষিদিগের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল, তাঁহারা পরব্রহ্মকে করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই

তাঁহাদের বেদবেদান্তনিহিত এক একটী উক্তি শত দীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আমাদের হৃদয়-গুহা আলোকিত করিয়া তুলে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথপ্রমুখ মহাত্মাগণের বক্তৃতার ফলে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে কিন্তু বক্তৃতারই কারণে ব্রাহ্মসমাজ নিজের উচ্চ আসন হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া অনেকের ধারণা। কথাটী একটু প্রহেলিকার মত বোধ হইলেও তাহার মধ্যে যে সত্য একেবারেই নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে সুদীর্ঘ বক্তৃতা একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই এখন ব্রাহ্মসমাজের 'হাটে ঘাটে বাটে' বক্তা পাওয়া আবশ্যক। এইরূপ যথাতথালব্ধ বক্তাগণের বক্তৃতা প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের ফল আর হইতে পারে না; অধিকাংশ স্থলেই পাঠদ্দশায় পঠিত গ্রন্থসমূহের অথবা কর্ণে শ্রুত কথাসমূহের চর্ব্বিতচর্ব্বণ হয় মাত্র—তাহাতে না থাকে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সরসতা, আর না থাকে তাহাতে শ্রোতৃবর্গের প্রাণস্পর্শ করিবার ক্ষমতা। বলিতে কি, অনেক স্থলেই এই সকল বক্তৃতা সত্যসত্যই শ্রোতৃবর্গের নিকট তিক্ত বোধ হইয়া থাকে, অথচ তাঁহারা কেবলমাত্র সভ্যতা ও ভদ্রতার খাতিরে সভা ছাড়িয়া উঠিতেও ইচ্ছা করেন না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের নিকটে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। বলা বাহুল্য যে ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাল বিষয়কে নষ্ট করিবার পক্ষে উপহাসের ন্যায় মারাত্মক বস্তু আর দ্বিতীয় নাই।

আমাদের ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা যে ধারণা পোষণ করিতেছি, তাহা আমাদের ন্যায় আরও অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। সেই কারণে তাহা এখানে প্রকাশ করিয়া বলা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। সে ধারণাটী এই যে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই আচার্য্যের পদ অধিকার করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র এবং বক্তৃতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেই নিজেকে বড়ই সুখী মনে করেন। এরূপ ভাবের মূল প্রাণ হইল বিনয়ের অভাব এবং অহঙ্কারের মাত্রাধিক্য। বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বেই অহমিকতা বক্তাকে অধিকার করিয়া বসে। সাধারণত দেখিতে পাই যে আজকাল বক্তাদের মুখে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা থাকিলেও অন্তরে অহমিকতার ভাণ্ডার পূর্ণ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে এম এ উপাধি যেই লাভ করিলাম, অমনি আমি গর্ব্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ বক্তা, অন্যান্য সকলের অপেক্ষা উন্নত এবং কাজেই বেদীগ্রহণ করিয়া আচার্য্য পদের উপযুক্ত বলিয়া ধারণা করিলাম। তারপর, বক্তৃতার সময় দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অথবা নিজের কথাগুলিকে অলঙ্কারে ও নানাবিধ ছন্দে ব্যক্ত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে অনুপম বক্তৃতা করিয়াছি এবং বক্তৃতা শেষ হইলে শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম যে বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইয়া গিয়াছেন কি না। শ্রোতৃবর্গও আমার সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে বড়ই সুন্দর হইয়াছে—আমি তাহা শুনিয়া আরও গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমার পশ্চাতে যে কি বলিলেন, তাহা শুনিবার অবসর পাইলাম না। ইহাই হইল সাধারণত বর্ত্তমান বক্তাগণের চিত্র। আজ অনেক বৎসর হইল কোন ধর্ম্মবক্তা লেখককে মুখে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার, আমরা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তাদিগকে বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেও শুনিয়াছি যে বক্তৃতা কেমন লাগিল। ধর্ম্মবক্তাদের এই প্রকার তীব্র অহমিকা আমাদের হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলে। আমাদের মনে হয় যে এই প্রকার অহমিকাপূর্ণ ধর্ম্মবক্তাদের বক্তৃতা শত উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা অন্তঃসারশূন্য, কারণ তাহা আত্মার অভিজ্ঞতা হইতে বাহির হয় না।

প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটা বয়সে অহমিকা উপকারী হয় বটে। যৌবনের প্রথম উন্মেষে এই অহমিকাই মনুষ্যকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে এবং অবস্থাবিশেষে সেই অহমিকা

পরিত্যক্ত হইতে না থাকিলে তাহাই আবার মনুষ্যকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজেরও প্রথম অবস্থায় সকল বক্তারই হৃদয় যে অহমিকা হইতে বিমুক্ত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ইহা বলিতে পারা যায় যে তখন সেই অহমিকা ব্রাহ্মসমাজের মতপ্রচারে সহায়কের কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অহমিকা পরিত্যক্ত না হইলে তাহার পতন অনিবার্য্য। প্রকৃত ধর্ম্মকামী ব্যক্তিগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অহমিকা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার অন্তরায়, ধর্ম্মসাধনের কঠোরতম বিঘ্ন। এই কারণে অহমিকাপূর্ণ হৃদয়ে ধর্ম্মবক্তা হইবার আমরা বিরোধী। আমাদের মনে হয় যে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পথে, অনন্ত প্রেমের পথে যিনি যতই অগ্রসর হইবেন, তিনি ততই মৌনী হইয়া পড়িবেন। তিনি মৌনীর ভেক গ্রহণ করিবেন না বটে, কিন্তু বাহিরের প্রশংসালাভের প্রার্থী হইয়া নিজের জ্ঞান, নিজের প্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না—তাঁহার অন্তরে ভগবদ্ বিষয়ক আলোচনা গভীর হইতে গভীরতর খাদ কাটিতে থাকিবে। এই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়াই মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা সার আইজাক নিউটন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যে তিনি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া দুই চারিটী লোষ্ট্রখণ্ড কুড়াইয়াছিলেন মাত্র। এই ভাবেরই অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদের নিজেকে শিক্ষার্থী বলিয়াই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা প্রত্যেক জ্ঞানীর কাছে, প্রত্যেক ভক্তের চরণে, প্রত্যেক মনুষ্যের নিকটে শিক্ষা করিব। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে আমার প্রভুর হস্ত, মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব প্রত্যক্ষ দেখিতে শিক্ষা করিব, ইহাই আমাদের প্রাণের ইচ্ছা হওয়া উচিত। জ্ঞানালোচনার ফলে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার ফলে যদি কোন সত্য লাভ করি, তাহা বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগের আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতে হইবে বলিয়া বক্তৃতা করিবার সম্পূর্ণ বিরোধী।

সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক অপ্রিয় কথা বলিতে হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে রোগীর জীবনরক্ষার জন্য অপ্রিয় সত্য না বলিয়া উপায় নাই। আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজকেও বক্তৃতা সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য শুনাইবার সময় আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে অহমিকার বিনাশই হইল প্রথম সাধনসোপান, ইহা সকল সাধকের একবাক্যে স্বীকৃত। ব্রাহ্মসমাজে অহমিকার প্রবেশের কারণে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অভাব ঘটিতেছে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে যে বৃথা বাক্যের আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আকর্ষণও করিতে পারিতেছে না। প্রত্যুত, এই কারণে জনসাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা এখানে উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

অহমিকার সহিত প্রকৃত সাধনের সম্বন্ধ ভগবদ্গীতার একটী শ্লোকে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

সকল প্রাণীগণের যাহা রাত্রি, তাহাই সংযমী পুরুষের জাগরণকাল, এবং সকল প্রাণীগণের যাহা জাগরণের অবস্থা, তাহাই আত্মদর্শী মুনির পক্ষে রাত্রি।

চারিদিকে যখন কোলাহল কলরব, অহমিকার লীলাখেলা অবিশ্রাম চলিতেছে, একমুহূর্ত্ত যখন প্রাণীগণের চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না, তখন বাহিরে বাহিরে দেখিলে মনে হয় বটে যে সমগ্র বিশ্ব বুঝি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাই তো প্রকৃত সাধকের পক্ষে মহাসর্ব্বনাশকর অবস্থা। মৎস্য যেমন মাটিতে উত্তোলিত হইলে ছটফট করিতে থাকে, সাধকও সেইরূপ এই অবস্থায় নিপতিত হইলে নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সাধক জাগ্রত হয়েন কখন্? যখন সকল প্রাণী নিদ্রিত, বিশ্বজগতে যখন এতটুকু কোলাহল কলরব নাই, চন্দ্রতারকা যখন নীরব পদক্ষেপে অনন্তের আহ্বান শুনিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করে, নীরবতার কারণেই অহমিকা যে অবস্থাকে হেয়চক্ষে দৃষ্টি করে, তাহাই তো সাধকের জাগরণের সময়। আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রাণারাম পরমেশ্বরের সহিত কথোপকথনের তাহাই তো উপযুক্ত সময় ও অবস্থা।

বক্তৃতা করিবার ও কেবলই বক্তৃতা শুনিবার বাসনা এবং অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া যতদিন না ব্রাহ্মসমাজ গীতোক্ত এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া নীরব সাধনায় মনোনিবেশ করিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের শ্রেয় নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য যে শত বক্তৃতায় যে সংশয় ছিন্ন হয় নাই, সাধু মহাপুরুষদিগের একটী মাত্র ইঙ্গিতে সে সংশয় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের নিজেকেও যেমন সাধনপথে অগ্রসর করিতে হইবে, আমাদের সন্তানসন্ততিগণকেও সেইরূপ নীরব সাধনাপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে, ভক্তিবিনম্র করিতে হইবে। ঈশ্বরে প্রীতির সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেও তৎপর হইবার শিক্ষা দিতে হইবে। এই যে ব্রাহ্মসমাজে কথায় কথায় নিরাশার কথা শোনা যায়, বক্তৃতার অতিমাত্র আধিক্য, অহমিকার অতিমাত্র প্রভাব এবং সুতরাং সাধনার একান্ত অভাবই নিরাশার অন্যতর জন্মদাতা বলিতে পারি। যে নীরব সাধনার উপকারিতা পাশ্চাত্য জগত আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ যদি কিছুকাল বক্তৃতা প্রভৃতি ছাড়িয়া সেই নীরব সাধনার পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের নূতন শক্তি নূতন তেজ দেখিয়া আমরা নিজেরাই অবাক হইয়া যাইব।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহার পর, পূর্ব্বলিখিত অনুসারে শ্বশুর মহাশয় "করবীর" তীর্থস্থানে যাইবার পর, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার পিঠে এক ফোড়া হইল। তাঁহার মধুমেহ রোগ থাকায় দুই এক বৎসর হইতে এইরূপ ফোড়া হইয়া তিনি দুই এক মাস পীড়িত থাকেন এবং তাহার দরুণ তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা হয়। সেইরূপ, এই সময়েও পিঠে ফোড়া হওয়ায় করবীরের বহুদর্শী সিভিল সর্জ্জন, এবং শ্বশুর মহাশয়কে যিনি নিত্য ঔষধাদি দিতেন সেই ডাঃ সিংক্লেয়ারের ঔষধ-উপচার সুরু হইল। প্রথম এক পক্ষ অতীত হইলেও রোগের প্রকোপ কমে নাই—এইরূপ পুণা হইতে পত্র আসিল। তখন আমার স্বামী একমাসের ছুটি লইয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে গিয়া থাকিবেন এবং ঔষধোপচার নিজ হাতে করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া এক মাসের ছুটি লইলেন ও কোল্হাপুরে যাইয়া রাত্রিজাগরণ ও ঔষধোপচার করিলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় এক-পা অন্তিমের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ দেখা গেল। এই নিমিত্ত, ডাঃ সিংক্লেয়ারের পরামর্শ গ্রহণ করা হইল। তিনিও একটু নৈরাশ্য প্রকাশ করিলেন; এবং রোগ আরও দীর্ঘকাল চলিবে এইজন্য আরো এক মাসের ছুটি বাড়াইতে হইবে, এই কথা বলিলেন। কারণ পৃষ্ঠের আর এক ভাগে এক ফোড়া বাহির হইয়াছে ও তাহাও বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ সিংক্লেয়ার প্রতিদিন আসিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া বাঁধিতেন। ঔষধ ও পথ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা আমার স্বামী নিজেই করিতেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। এইরূপ করিতে করিতে ছুটির দ্বিতীয় মাসটাও কাটিয়া গেল। এক্ষণে আমার স্বামী পুণায় আসিয়া কর্ম্মে হাজির হইয়া পুনর্ব্বার ছুটির দরখাস্ত না করিলে ছুটি মঞ্জুর হইবে না, এইরূপ অবগত হইলেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের পীড়া দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয়কে ছাড়িয়া আমার স্বামী পুণায় যাইতে ভরসা পাইলেন না। তাছাড়া ছুটি বাড়াইবার জন্য আমার স্বামীর যাওয়া আবশ্যক, এইকথা আমার শ্বশুর মহাশয় শুনিয়া ছোট ছেলের মত কাঁদিতে লাগিলেন, এবং "আমাকে ছেড়ে যেও না" এই কথা বলিলেন। এইরূপে, ছুটির মেয়াদ পূর্ণ হইতে আর দুই তিন দিন বাকি রহিল। এই সময় রেলগাড়ী না থাকায় ডাকের টোঙ্গা গাড়িতে চড়িয়া পুণায় যাইতে ৩৬ ঘণ্টা লাগিত। এই মনে করিয়া, ডাঃ সিংক্লেয়ারকে ডাকাইয়া আনাইয়া আমার স্বামী এই সমস্ত বাধার কথা জানাইলেন, আর বলিলেন যে, তিনি শ্বশুর মহাশয়ের পাশ হইতে নড়েন এরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ইচ্ছা নয়। "তিনি আমাকে যাইতে দিতেছেন না, আর আমি না গেলেও ছুটি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আপনার যদি বিশ্বাস থাকে তবে আপনি তাঁহাকে সাহস দিন ও বুঝাইয়া দিন। তাহা হইলে তিনি আমাকে যাইতে দিবেন।" এই কথায়, ডাক্তার বলিলেন, "তাতে আর বাধা কি আছে? ৭।৮ দিনের যাওয়া আসায় কোনও হানি হইবে না। এই রোগ সারিবার আশা খুব কমই কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল চলিবে, এবং কষ্ট যন্ত্রনার দরুণ তাঁহার ভাগিদও বিলক্ষণ আছে। তাই, পুণায় যাইয়া এক মাসের ছুটি: বাড়াইয়া লইয়া ফিরিতে হইবে।" এইরূপ বলিয়া তিনি শ্বশুর মহাশয়ের ঘরে গেলেন এবং তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন যে, "বিশেষ চিন্তিত হইবার মত আপনার শারীরিক অবস্থা নহে। আপনি মিঃ রাণাডেকে যাইবার অনুমতি দিবেন; চার দিনের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া

আসিবেন। তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন দুইবার ও আবশ্যক বিবেচনা করিলে তিনবারও আসিয়া দেখিয়া যাইব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।” এই কথা বলিবার পর, আমার শ্বশুর মহাশয় স্বামীকে পুণায় যাইতে অনুমতি দিলেন। দ্বিতীয় দিনে যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইলে পর, আমার স্বামীকে কাছে ডাকাইয়া ও হাত ধরিয়া খুব আবেগের সহিত অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন যে, “মাধবরাও, ডাক্তার সাহেব আমাকে সাহস দিয়াছেন কিন্তু আমি ভরসা পাই না! শীঘ্র যদি ফিরে এস ত ভালই হয়, নতুবা আর সাক্ষাৎ হবে না—এই মাত্র—তাছাড়া আমার আর কোন ভাবনা নাই। সে-সব ব্যবস্থা তুমি ঠিক্ করবে এরূপ আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার মাথার সমস্ত বোঝা এখন তোমার মাথার উপর এসেছে এটা মনে আছে ত?” এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী তখনই বলিলেন যে, “আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি পুত্রধর্ম্ম ছাড়িব না।” এই কথা শুনিয়া শ্বশুর মহাশয়ের মনে একটা স্নেহের আবেগ উপস্থিত হইল। তিনি আমার স্বামীকে কাছে লইয়া পিঠের উপর হাত বুলাইয়া পুণায় যাইবার অনুমতি দিলেন। পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও ঘরের লোকের নিকট বিদায় লইয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া টঙ্গাগাড়ীতে উঠিবার সময়, আমার স্বামী আমার ননদ ও মোরু মামাকে (শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ভাই) একত্র ডাকাইয়া বলিলেন যে, “ভাউসাহেবের ব্যামোটা বাড়িয়াছে তোমরা ত দেখতেই পাচ্ছ; কিন্তু মায়ের উদ্বেগের কথাই আমি বিশেষ করে’ ভাবছি। তাঁর ছেলেরা এখন ছোট। তাঁর খুব যত্ন কোরো। কপিল তীর্থের দিকে পিছনের দরজায় কুলুপ লাগাবে ও মায়ের উপর খুব নজর রাখবে” ইত্যাদি বলিয়া টাঙ্গায় চড়িয়া চলিয়া গেলেন। পুণায় আসিবার পর ছুটি মঞ্জুর হইতে ছয় দিন লাগিল। সেই পর্য্যন্ত শ্বশুর মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার কথা ডাক্তার সাহেব প্রতিদিন আমার স্বামীকে তার-যোগে জানাইতে থাকিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। তদনুসারে জানান হইত। ছুটি মঞ্জুর হইবার পর, তারে খবর আসিল, ব্যামো একটু বাড়িয়াছে। সেই দ্বিপ্রহরেই তিনি কোল্হাপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও টাঙ্গাগাড়ীতে আসবাব-আদিও উঠাইলেন। ইতিমধ্যে আর এক তার আসিল। তাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইলেন এবং কোল্হাপুরে যাইবার মৎলব রহিত করিলেন। পরে দুই এক দিনের মধ্যেই, এই সংবাদ কেরোপন্ত নানা-ছত্রে, কৃষ্ণশাস্ত্রী চিপড়ুনকর প্রভৃতির গোচরে আসিল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোল্হাপুরে যাইবার কথা ছিল, এখানে রহিলেন কেন?” তখন আমার স্বামী বলিলেন, “সেখানে আমার ভগিনী, দুর্গা দিদি, বালভট্জী, মোরুমামা ও তাঁর মা আছেন। তাঁরা সব ব্যবস্থা করবেন। এখন—পরে যে সব ব্যাপার হবে তা আমি দেখতে পারব না, আমি সইতে পারব না; এবং তা নিবারণ করাও আমার সাধ্য নয়। তাই আমার যাওয়া হল না। কেবল সংবাদ জানা অপেক্ষা, সেখানকার বাসা উঠিয়ে দিয়ে, সমস্ত পরিবারবর্গেকে এখানে আনাব মনে করেছি। অর্থাৎ দুই স্থানের ভাবনা-চিন্তা করা ঠিক নয়।” এই বিষয় লইয়া ১৫ দিন কাটিয়া গেলে কোল্হাপুরের বাসা ভাঙ্গিয়া ও শ্বশুর মহাশয়ের দেনার মধ্যে যে দুই হাজার টাকার দেনা পরিশোধ করা হয় নাই, সুদ সমেত তাহার হিসেব নিকাশ করিয়া, বাকী টাকা পরিশোধ করিবে ও কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবে এইরূপ পত্র লিখিয়া এক হুণ্ডী পাঠাইয়া দিলেন। শ্বশুর-মহাশয়ের কিরূপ“খোর্চ্চে” স্বভাব ছিল তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কোন কোন সময়ে (আমার স্বামী) টাকা পাঠাইয়া তাঁহার কর্জ্জ পরিশোধ করিয়া দিলেও তিনি কোন আত্মীয়ের প্রার্থনায় আবার কর্জ্জ করিয়া তাহাকে টাকা ধার দিয়াছেন—এরূপও হইয়াছে। দুই একবার এইরূপ হইতে দেখিয়া খুচরা দেনা ও বড় রকমের দেনার মধ্যে অধিকাংশ দিয়া ফেলিয়া, শুধু শ্বশুর মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত এক মহাজনের ২০০০৲ টাকা দেনা বাকী রাখা হইবে আমার স্বামী এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। তাহার পরিণাম ভালই হইয়াছিল। তাহার প্রথম-দেনা হওয়ায় শ্বশুর মহাশয় তাহার নিকট নূতন কর্জ্জ আর করেন নাই। সে যাক্। এইরূপ পত্র ও হুণ্ডি যাইবার পর, পত্রের লেখা অনুসারে বলভট্জী বাপুটবে ও মোরু মামা ইঁহারা দেনা পরিশোধের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ও বাসা উঠাইয়া সেখানকার ছেলেপিলে ও চাকর-বাকর-সহ পুণায় আসিলেন। শাশুড়ী ঠাকরুণ যে দিন পুণায় আসিলেন সেই দিন হইতে আমার স্বামী এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, সন্ধ্যাকালের আহারের পূর্ব্বে এক ঘণ্টা শাশুড়ী ঠাকরুণের কামরায় বসিয়া তাঁহার সহিত ও ছেলেদের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। তাঁহার অত্যন্ত শোক হওয়ায়, যাহাতে তাঁহার সান্ত্বনা হয় এরূপ কোন রকমের কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পর তিনি খাইতে উঠিতেন। এইরূপ নিত্য নিয়ম শেষ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। অন্য গ্রামে যাওয়া ব্যতীত এই নিয়মের কখন ব্যতিক্রম হয় নাই।

তদনুসারে দুই ছেলে (অর্থাৎ “আবা”, “বাবা”) শাশুড়ী ঠাকরুণের সহিত পুণায় আসিবার পর হইতে

আমার স্বামী সেই দুই ছেলের ও আমার পাঠাভ্যাসের দিকে বেশী লক্ষ্য ও সময় দিতে লাগিলেন। আমার ও এই দুই ছেলের (ভাই) বয়সের অনুক্রম প্রায় দুই বৎসরের অন্তর হওয়ায় এবং আমার উপর আমার স্বামীর পুরাপুরি নজর থাকায়, আমরা তিনজনই আপনার ভাই বোনের মত, আনন্দে, প্রেমে, মিলিয়া-জুলিয়া কাজ করিতাম। ঘরের বয়স্ক লোকেরা, যে যতই বলুক না কেন, আমাদের জোট ভাঙ্গিত না। এই সময়ে, আমার পাঠাভ্যাস মারাঠি ৫ম ইয়ত্তা (standard) শেষ করিয়া আমি লিখিতে, পড়িতে ও হিসাব করিতে শিখিতেছিলাম এবং উভয়কেই "ভাউজী" হাই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ইংরেজি প্রথম ইয়ত্তা শেষ করিয়া এই সময় তাঁহারা দ্বিতীয় ইয়ত্তা ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া আমারও ইংরেজি শিখিতে খুব ইচ্ছা হইল এবং সেইজন্য একদিন আমার স্বামীর কাছে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়িলাম। ইংরেজি শিখিবার কথা আমাকে বলিতে দেখিয়া, আমার স্বামী বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত এবং সেই সঙ্গে খুসীও হইলেন। আমাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে ইংরেজি নিশ্চয়ই শিখাইব। কিছুদিন হইতেই আমি এই কথা মনে করিয়াছি। কিন্তু তোমার মারাঠি শিক্ষা শেষ হইলে তবে ত!" এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক;—আমাদের বাড়ীতে, পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ভালবাসিতেন বলিয়া আমার শ্বশুরমহাশয় নিজে আমার ননদ ও শাশুড়ী ঠাকরুণকে লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব পুরাপুরি শিখাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা দুজনেই লেখাপড়া শেখা একটা অলঙ্কার ও একটা অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের বাড়ীর পুরুষেরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো পছন্দ করিতেন এবং আমার ননদ ও শাশুড়ীঠাকরুণ একথা জানিতেন শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের নিজেদের এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহা সত্ত্বেও কেবল আমার শিখিবার সময় তাঁহাদের সহানুভূতি ত ছিলই না, উল্টা আরো তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন ও টিট্‌কারী দিতেন। মনে হইত যেন আমার ননদ ও শাশুড়ী একেবারেই প্রাচীনতন্ত্রের লোক, যেন তাঁহাদের লেখাপড়ার গন্ধমাত্র নাই। এই সময়ে আমাদের বাড়ীতে স্বামীর দূরসম্পর্কীয় আট নয় জন মেয়ে ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে আমার সমান একজনও ছিল না। সেই জন্য তাহাদের এক পৃথক দল ছিল। রোজ রাত্রে আমি দোতালার উপর গেলে পর, পড়া আরম্ভ হইত। এই সময় দক্ষিণা-প্রাইজকমিটির পুস্তক ও অন্যান্য মারাঠী পুস্তক আমার পাঠ্য হওয়ায়, যে সকল পুস্তক গদ্যাত্মক তাহা সহজে পড়িতে পারিতাম। কিন্তু পদ্যাত্মক পুস্তক হইলে তাহা পড়িতে আমার সংকোচ বোধ হইত। কারণ,—পদ, আর্য্যা, শ্লোক প্রভৃতি কিছু থাকিলে উচ্চস্বরে পড়িতে হইত। সেরকম করিয়া পাঠ করিলে, সংকোচের সহিত আস্তে আস্তে পাঠ করিলেও আমার স্বামী রাগ করিতেন; আবার যদি উচ্চ স্বরে পড়িতাম, তাহলে উপরি-উক্ত মেয়েদের মধ্যে কেহ না কেহ সিঁড়ির কাছে বা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত। ইহারা, এক দিন রাত্রে, আমার পড়িবার ধরণ অথবা কবিতা সুর করিয়া পাঠ করিবার ধরণ বড় মেয়েদের নিকট নকল করিয়া দেখাইত, আমাকে খোঁচা দিয়া কথা বলিত, আমাকে লজ্জা দিত। কেহ কিছু বলিলেও আমি কাহকেও উত্তর দিতাম না। কেহ কিছু বলিলে, সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, আমি কেবল শুনিয়া যাইতাম ও চুপ করিয়া সহিয়া থাকিতাম। কখন কখন এই সব মেয়েরা বিজ্ঞতা ও সহানুভূতির ভান করিয়া, ও আমার নিকট বসিয়া আমাকে বলিত—"এই লেখা পড়ার দরুণ বড় মেয়েদের কাছ থেকে তুমি কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়েছ, আমাদেরও খারাপ লাগে, কিন্তু উপায় কি? দেখ, পুরুষদের যদি ভাল লাগে, এক আধবার পড়বে। কিন্তু এতে ঘরের গুরুজনদের অপমান হয় না কি? পুরুষেরা এ সব কি বোঝে? মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের সমস্ত সময় কাটাতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের কতই বা সম্বন্ধ? ওরা একবার নয় দশবার বলবে। আমরা সে কথা না শুন্‌লেই হ'ল। বিরক্ত হয়ে আপনা হতেই ছেড়ে দেবে। করা না করা কি আমাদের হাতে নেই?" সুবিধা পাইলেই, উহারা এই সব কথা আমাকে শিখাইত। তারা যে এই রকম করত—ভিতরে ভিতরে বড় মেয়েদেরও তাতে যোগ ছিল, বড় মেয়েরা তাদের পৃষ্ঠবল ছিল;—এই কথা আমার জানা থাকায় তাহাদিগকে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল উত্তর আমি কখনই দিই নাই। আমার যাহা করিবার তাহা আমি নীরবে করিতাম। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেলে, আমার মারাঠী পাঠাভ্যাস শেষ হইলে, আমার স্বামী ইংরেজি শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য আগেকার মত কেবল রাত্রে ও প্রভাতে আমার স্বামীর নিকট বসিয়া পাঠাভ্যাস করায় যথেষ্ট হইত না। শব্দ পাঠ করিবার জন্য, দিবসেই এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সময় দিতে হইত। তথাপি, নীচের ঘরে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করার সুবিধা হইত না, তাই দোতলার ঘরেই বসিতে হইত। এইজন্য আমাদের বড় মেয়েদের বড়ই গায়ের জ্বালা হইল। তাহাদের রাগ খুব বাড়িয়া উঠিল। এবং একদিন তাহারা স্পষ্ট বলিল, "দোতালায় যা ইচ্ছে তাই কর কিন্তু

আমাদের অমর্য্যাদা করলে আমরা একেবারেই সহ্য করব না।” ক্রমশঃ।

রঙ্গপুরের একখানি প্রাচীন পুথি।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ।

(শ্রীগিরিজাকান্ত ঘোষ)

এক সময়ে রঙ্গপুর-কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী ৺কাশী-চন্দ্র রায়চৌধুরী ও কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ও কাকিনার ভূম্যধিকারী ৺শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের বহুপ্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। * ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে কুণ্ডীতে “রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ” এবং ১৮৬০ খৃঃ অব্দে কাকিনায় “রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ” প্রকাশিত হয়। এই সময়ে রঙ্গপুরে বহু গ্রন্থ প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৺তারাশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ের “কমল দত্তাহরণ” কাব্যও এ সময়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ রঙ্গপুরের সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগ চিরস্মরণীয়—আমরা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একমাত্র শম্ভুচন্দ্রের “আনন্দ-সভারঞ্জন” চম্পূ গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিব। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, রঙ্গপুরের আধুনিক সাহিত্যের এই প্রথম যুগের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে; আমরা আজ সে চেষ্টা করিব না।

শম্ভুচন্দ্র শুধু লক্ষ্মীর বরপুত্র বা ফাঁকা সাহিত্যসেবী নহেন। তিনি তত্ত্ববিষয়ে কবি ও লেখক। তাঁহার “আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূই” আমাদের এ কথার সাক্ষ্যপ্রদান করিবে। প্রায় ৬২ বৎসর কাল পূর্ব্বে ১৭৭৭ শকে] ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের সাহিত্যিক স্মৃতি-রক্ষার প্রয়াসী, আশা করি, তাঁহারা ইহার পুনঃপ্রচারে সচেষ্ট হইবেন।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূকাব্য; ইহাতে কএকটী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দু কবিতা এবং বাঙ্গালায় দুইটী প্রস্তাব আছে। রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার নিকট আনন্দ-সভার সম্পাদকের প্রেরিত বিজ্ঞাপন বা প্রস্তাবটী অন্যত্র উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালা-অক্ষরে উর্দ্দু-প্রচলনের প্রস্তাবটী আপাততঃ উদ্ধৃত হইল না। এক্ষণে এ বিষয়ে কোন কোন মুসলমান লেখকেরও সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। † তাঁহারা শম্ভুচন্দ্রের এই প্রবন্ধটী সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিতে পারেন।

আজকাল কোন কোন রাজা বা মহারাজকেও সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতেছি; কিন্তু ৬২ বৎসর পূর্ব্বে কাকিনার মত এরূপ বিস্তীর্ণ জমিদারীর স্বত্বাধিকারী শম্ভুচন্দ্র তিনটী ভাষায় স্বচ্ছন্দক্রমে লেখনী সঞ্চালন করিয়া গিয়াছেন, এ কথা মনে করিতেও আনন্দ হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে (coverএ)

গ্রন্থ-পরিচয় — আমরা এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ পরিচয় পাইতেছি:—

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ।
শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক
কলিকাতা।
তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত
ভাদ্র, ১৭৭৭।

গ্রন্থখানির আকার ক্রাউন, অষ্টাংশিত, ১১০ পৃষ্ঠা। সম্ভবতঃ শম্ভুচন্দ্রের পূর্ব্বে, মফঃস্বলের আর কোনও ভূম্যধিকারী সাহিত্যে তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

এই প্রাচীন গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত

বর্ণনীয় বিষয় — হইয়াছে, কোন কোন পাঠকের তাহা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। ইঁহাদের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এস্থলে আমরা ইহার বিষয়-সূচী তুলিয়া দিলাম।

বিষয়-সূচী।

---

* ‘নাটুকে’ রামনারায়ণ তর্করত্নের “কুলীন, কুল-সর্ব্বস্ব” নাটক (কাহারও কাহারও মতে, ইহাই বাঙ্গালা-ভাষার আদি নাটক) কালীচন্দ্রের প্ররোচনায় লিখিত ও মুদ্রিত। ইঁহারই প্রস্তাবে রঙ্গলালের “পদ্মিনীর উপাখ্যানের”ও সৃষ্টি।

† ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকির প্রবন্ধ—“বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালী (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চৈত্র, ১৩২০।)

৪০—৫৫	শচীন্দ্র কাব্য
৫৫—৬০	অথ বারাণসী দেওয়ালী
৬৩—৮৭	আগরার তাজমহল রৌজা
৮৭—৮৮	যমুনার নহরের সংক্ষেপ
৮৮—৯২	রুড়কী ও হরিদ্বারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৯৩—	আত্মপ্রসাদ ১ পাঠ
৯৪—৯৫	,, ২ পাঠ জনজলে থাঁ
৯৫	উর্দ্দূ সায়ের ১ পাঠ
৯৬	ঐ ২ পাঠ
৯৬	গায়ের দোহরা
৯৬—৯৯	সংস্কৃত বসন্ত কাশিকা
৯৯—১০১	অথ শরৎ কাশিকা
১০১—১০৩	রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি সভায় আনন্দ সভা সম্পাদকের প্রশ্ন
১০৩—১০৬	সাধারণের মহদুপকারক বিজ্ঞাপন।
১০৬—১১০	অথ তত্ত্বসঙ্গীত।"

শম্ভুচন্দ্র স্বয়ং লেখক ছিলেন; সুতরাং সাহিত্যে তাঁহার এই স্বাভাবিকী অনুরক্তির ফলে তিনি নয় জন প্রতিভাশালী লেখককে লইয়া একটী "নব-রত্ন-সভার" সৃষ্টি করেন। এই সকল লেখকদের প্রায় সকলেই নানা গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে 'কজ্জলাক্ষ কাব্য' 'কমল দত্তাহরণ কাব্য, 'বোধেলা রহস্য' নাটক প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এখন ইঁহাদিগকে ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছি।

গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় — এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ বংশ-পরিচয় রহিয়াছে:—

"জেলা রঙ্গপুর অতি রঙ্গপুরধাম।
তার অন্তর্গত গ্রাম কাকিনীয়া নাম॥
তথায় ভূম্যধিকারী নাম রুদ্র রায়।
ছিলেন ধার্ম্মিক তিনি মহাতপস্যায়॥
তাঁহার প্রথম পক্ষে তৃতীয় কুমার।
ঈশ্বর ভৈরবচন্দ্র ঈশ্বর প্রচার॥
শিবলোকে গেলা তিনি রাখি সুতদ্বয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীল কালীচন্দ্র রায় মহাশয়॥
কনিষ্ঠ শ্রীশম্ভুচন্দ্র রসজ্ঞ নায়ক।
ঈশ্বর ইচ্ছায় যার রচিত পুস্তক॥"

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য — এই গ্রন্থখানি কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে, কোন কোন পাঠক তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নেরও উত্তর আলোচ্য গ্রন্থে রহিয়াছে। যথা—

"আনন্দ-সভার সন্তোষ কারণ
শম্ভুনগরীতে শম্ভুর রচন।" (৫৪ পৃঃ)

এই আনন্দ-সভা ছিল—৺বারাণসী ধামে; শম্ভুনগরী সম্ভবতঃ—কাকিনার নামান্তর।

প্রার্থনা — গ্রন্থকারের রাজভক্তি প্রশংসনীয়। তিনি লিখিয়াছেন—

"জয় হোক, কোম্পানীর রাজ্য হোক অবিনাশী,
সুখে প্রজা হোক বাসী আমি এই অভিলাষী,"
(৮৮ পৃঃ)।

এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে, এই ভূম্যধিকারী-কবি একটী পংক্তিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেমন সন্ধান দিয়াছেন, পাঠক তাহা শুনিয়া রাখুন।

'যে তুমি সে' আমি ভূমা একাকার' (৯৫ পৃঃ) ইহাতে উপনিষদের "যো বৈ ভুমা, তৎসুখম্, নাল্পে সুখমস্তি" কথাটা স্মরণ হয় না কি ?

এক্ষণে শম্ভুচন্দ্রের গদ্য-রচনার নমুনা দেখাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বারান্তরে আমরা শম্ভুচন্দ্রের সংস্কৃত ও উর্দ্দূ কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব।

রঙ্গপুর-ভূম্যধিকারী সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও এক বৎসরের বয়ো জ্যেষ্ঠ। শম্ভুচন্দ্র * ইহার অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বারাণসীর আনন্দ-সভারও সম্পাদক ছিলেন। আনন্দ-সভার সম্পাদকরূপে তিনি রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ রঙ্গপুরে কএকটী নূতন শ্রম-শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহাতে তিনি তাঁহার বৈষয়িক সূক্ষ্মবুদ্ধিরও কিরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

* রঙ্গপুর জমিদার-সভার সভাপতি ছিলেন—কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজমোহন রায়চৌধুরী। কালীচন্দ্র ও কালীচন্দ্র তাঁহারই বংশধর। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সভার বেতনভোগী সম্পাদক ছিলেন। সভার ব্যয়ে সম্পাদক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কএকখানা গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল।

আনন্দ-সভারঞ্জন চম্পূ

বিজ্ঞাপন।

"স্বদেশের উন্নতি ও সাধারণের মহদুপকার-কল্পে যে সকল আলোচনা হয় তন্মধ্যে দুইটী প্রস্তাব উত্তম যাহা রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় প্রশ্নপঞ্চকরূপে ও সাধারণের মহদুপকারক বিজ্ঞাপন নামে পরিণ্যস্ত হইয়াছে।

১ প্রশ্ন—উক্ত সভার উদ্যোগে অত্র কাশীধাম হইতে কথকগুলিন ছত্র তারাশ অর্থাৎ পাতরের কারিগরকে স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে স্বদেশে বাটি ঘর করিয়া দিয়া স্থায়ী করান যায় ও তাহাদিগের বংশপরম্পরা স্ব ব্যবসায় ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে না পারে এ বিষয়ে মনোযোগ রাখা যায়, এবং নৈকট্য কড়ইবাড়ি গোয়ালপাড়া প্রভৃতির পর্ব্বত হইতে প্রস্তর আনয়নের বাধ রহিতের বিশেষ এক নিয়ম ধার্য্য করিয়া যদ্যপি অবিরোধ প্রস্তর আনয়ন করা যায় তাহা হইলে শীল পাটা চন্দন পাটা খোরাখুরি খাদা পরতঃ পর এমারৎ তৈয়ারির বিবিধ সরঞ্জাম অর্থাৎ ঢাকা কোমরবন্দি উভক তরঞ্জীব স্তম্ভ রেল তকীয়া বরঙ্গা সীল্লি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া দেশের মঙ্গল হইতে পারে কিনা।

২ প্রশ্ন—ঐ উদ্‌যোগে কাশ্যাদি অঞ্চল হইতে কথকগুলিন কারচবি জেলাহা অর্থাৎ জরির কারিকরকে উক্ত নিয়মে স্বদেশে যদি বশতী করান যায় ও এথা হইতে বিশেষ নিয়ম দ্বারা সল্‌মা চুম্‌কি বাদ্‌লা ছেতার কলাবতু প্রভৃতি অবিরোধে তথায় পৌছার বিশেষ এক নিয়ম হয় তবে দেশের উপকার দর্শিতে পারে কি না।

৩ প্রশ্ন—ঐ উদ্যোগে ঐ প্রকারে যদি এ প্রদেশ হইতে কথকগুলিন গড়রিয়া অর্থাৎ কম্বল প্রস্তুতের কারিকরকে কথিত নিয়মে স্বদেশে বশতী করান যায় ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কথকগুলিন দীর্ঘপুচ্ছ ভেড়ি প্রেরিত ও প্রতিপালিত হইতে থাকে তাহা হইলে নানা প্রকার কম্বল প্রচুররূপে প্রস্তুত হইয়া সাধারণের উপকার হইয়া দেশের মঙ্গল দর্শিতে পারে কিনা।

৪ প্রশ্ন—ঐ উদ্যোগে স্বদেশ হইতে রাঢ়ি বারেন্দ্র মৈথিল শ্রেণীর কতিপয় ব্রাহ্মণ বালককে গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ এক নিয়ম পূর্ব্বক এথা হইতে বেদান্ত ও উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাইয়া যদি স্বদেশে নীত হয়, তবে অবিদ্যা বিনাশ হইয়া অন্যান্য বিদ্যার পোষকতা হইতে পারে কিনা।

৫ম প্রশ্ন—রঙ্গপুর ভূম্যধিকারি মহাশয়দিগের মধ্যে অবয়প্রাপ্ত ভূম্যধিকারিদিগের বয়প্রাপ্ত পর্য্যন্ত সেই সেই ভূমি বিত্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত অন্য কোন নিয়ম অর্থাৎ অবোধ স্ত্রীলোকের হস্তে নিঃক্ষেপ কিম্বা লিখনি জীবিকা বিশিষ্ট দেওয়ান মোক্তার প্রভৃতি এক ব্যক্তি মাত্রকে কদিম চাকর জ্ঞানে উছি অন্থে বিত্তের নানা বিশৃঙ্খলতার বীজ রোপণ না করিয়া এবং কোন ভূম্যাধিকারি ঋণ পরিশোধ বা অন্য কোন কারণ বশতঃ আপন ভূমি বিত্ত যাহারা অপরকে ইজারা বা অন্য কোন নিয়মে গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, তাহারা তাহা না করিয়া যদি উক্ত সভার সভ্যগণের প্রকাশ্য শাসনাধীনে রাখেন তাহা হইলে পরস্পর বান্ধবতা ও আত্মিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের বিদ্বেষভাব দূর হইয়া সৌভাগ্য জন্মিতে পারে কি না।"

প্রশ্নকর্ত্তা এই প্রশ্নপঞ্চকের কোন উত্তর পাইয়াছিলেন কি না অথবা ইহাতে কোন ফল দাঁড়াইয়াছিল কি না, আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রঙ্গপুরের একজন ভূম্যধিকারী কি কি বিষয়ে রঙ্গপুরের অভাব অনুভব করিয়াছেন, পাঠক ইহাতে তাহারও আভাস পাইবেন।

আমরা বারান্তরে শম্ভুচন্দ্রের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সম্যক্ কাব্য-পরিচয় এবং সেই সময়ের রঙ্গপুরের সাহিত্যের বিশেষতঃ কাকিনার সাহিত্যের বিবরণ প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

কর্ম্ম জিজ্ঞাসা।

"কিং কর্ম্ম কি মকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতা।"*

গীতা ৩. ১৬.

ভগবদ্‌গীতার আরম্ভে, ধর্ম্মের দুই পরস্পর-বিরুদ্ধ কাঁইটার মধ্যে আসিয়া পড়ায় কর্ত্তব্যবিমূঢ়

* কর্ম্ম কোন্‌টি এবং অকর্ম্ম কোন্‌টি এই সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগেরও মোহ হইয়া থাকে।" এই স্থলে অকর্ম্ম শব্দ 'কর্ম্মের অভাব' ও 'মন্দ কর্ম্ম' এই দুই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। মূল শ্লোক সম্বন্ধে আমার টীকা দেখ।

অর্জ্জুনের মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, যাহারা আত্মম্ভরী, সেই সব লোকের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সমাজে থাকিয়া যে সকল শ্রদ্ধাভাজন ধীর কর্ত্তাপুরুষ, স্বকীয় সাংসারিক কর্ত্তব্য সকল যথা-ধর্ম্ম ও যথানীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনেও এইরূপ চিন্তা অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ যুদ্ধারম্ভে হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠিরেরও এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। ঐ মোহ নিবৃত্তি করিবার জন্যই 'শান্তিপর্ব্ব' কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মাকর্ম্ম-সংশয়ের এইরূপ প্রসঙ্গ খুঁজিয়া বাহির করিয়া কিংবা কল্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড় কবিরা সুরস কাব্য বা উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্সপীয়রের হেম্‌লেট-নামক নাটক। ডেন্‌মার্ক দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হেমলেটের খুল্লতাত, আপন ভাইকে—ডেন্‌মার্কের রাজাকে অর্থাৎ হেম্‌লেটের পিতাকে—খুন করিয়া ও হেমলেটের মাতার সহিত পুনর্ব্বিবাহ করিয়া, সিংহাসন পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইরূপ পাপাচারী খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া পুত্রধর্ম্মানুসারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবে, কিম্বা মায়ের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকারী রাজা বলিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে, এই সংশয়-মোহে পড়িয়া তরুণ হেমলেটের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যোগ্য পথপ্রদর্শক ও পৃষ্ঠপোষক কেহ না থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে "বাঁচিয়া থাকা, কি না থাকা" এইরূপ বিচার বিবেচনার পর হেম্‌লেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে তাহার চিত্র উৎকৃষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। 'কোরায়লেনস্' নামক আর-এক নাটকেও এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্সপীয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। কোরায়লেনস্ নামক বীরপুরুষ, এক রোমক সর্দ্দারকে রোম-নগরের লোকেরা নগর হইতে নির্ব্বাসিত করায়, সেই রোমক বীর রোমনগরের শত্রুদিগের সহিত গিয়া মিলিয়াছিলেন, এবং "তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না" এইরূপ তিনি তাহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করেন। কিয়ৎকাল পরে এই শত্রুদিগের সাহায্যে রোমান্ লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে অবশেষে একেবারে রোম নগরের দরজার সামনে তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন। তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য কি সেই বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন এবং রোমান-লোকদিগের শত্রুর সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়া দিলেন! কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সংশয়-মোহে পতিত হইবার এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা অর্ব্বাচীন ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এত দূরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। গ্রন্থারম্ভে ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস "সূক্ষ্মার্থ ন্যায় যুক্ত," "অনেকসময়ান্বিত," তাহার এইরূপ বিশেষণ দিয়া, তাহাতে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ও মোক্ষশাস্ত্র আছে শুধু নয়,—এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎক্বচিৎ"—ইহাতে যাহা আছে তাহা অন্যত্রও আছে, এবং ইহাতে যাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই (আ. ৬২, ৫৩)—এইরূপ মহাভারতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ প্রাচীন মহাত্মা পুরুষেরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সুবোধ্য কাহিনীর আকারে, সামান্য লোকদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে, ভারত 'মহা-ভারতে' পরিণত হইয়াছে। নচেৎ কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংবা 'জয়' নামক ইতিহাসের বর্ণনা করিবার জন্য আঠারো পর্ব্ববিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথা ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তোমার-আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার দরকারটা কি? মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা আপন-আপন গ্রন্থে, মনুষ্যেরা সংসারে কিরূপভাবে

চলিবে এই বিষয়ে স্পষ্ট নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই কি? কাহারো হিংসা করিবে না, প্রাণনাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজনদিগকে সম্মান করিবে, চুরি কিংবা ব্যভিচার করিবে না, প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মের সাধারণ নিয়মগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহা হইলে তোমার এই গোলযোগের মধ্যে পড়িবার কারণ কি? কিন্তু উল্টা এইরূপ বিচার করা যাইতেও পারে যে, জগতের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত না এই নিয়মানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সজ্জনেরা সদা-চরণের দ্বারা দুষ্ট লোকদিগের জালে আপনাদিগকে জড়াইয়া ফেলিবেন, না, তাহার প্রতিকারার্থ যে প্রকারেই হউক আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন? তাছাড়া, এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলেও, অনেক সময় কর্ত্তাপুরুষের সম্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে যে স্থলে এই সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে দুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে আমরা প্রাপ্ত হই। এবং তখন "এ-টা করিব কি ও-টা করিব" এইরূপ বিচারের মধ্যে পড়িয়া মানুষ পাগল হইয়া যায়। অর্জ্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল।

কিন্তু অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে,—এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্ম্মস্পর্শী বিচার আলোচনা আছে। তাহার দৃষ্টান্ত—মনু, সর্ব্ববর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়া যাহা বলিয়াছেন "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ"—অহিংসা সত্য, অস্তেয়, কায়মনোবাক্যের শুদ্ধতা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (মনু ১০-৬৩) এই সনাতন নীতিধর্ম্মগুলির মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্। "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মঃ" (সভা, আ, ১১, ১৩) এই তত্ত্বটি আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের মধ্যে নাই, কিন্তু অন্য সকল ধর্ম্মের মধ্যেই ইহা মুখ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল আদেশ আছে তন্মধ্যে "হিংসা করিবে না," এই আদেশ বচনটিকে মনুর মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা অর্থাৎ শুধু জীব-হত্যা নহে,—অন্য প্রাণীদের মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। সুতরাং অহিংসা অর্থে, কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার দুঃখ না দেওয়া বুঝায়। পিতৃ-হত্যা, মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের হিংসা হওয়ায়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্নী বা কন্যার উপর বলাৎকার করিবার জন্য, অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত এবং নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই নাই, তখন এইরূপ 'আততায়ী' মনুষ্যকে আমরা কি "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব? না—এই দুষ্ট লোককে—সাম-উপচারের কথা যদি না শুনে—যথাশক্তি শাসন করিব? মনু বলেন—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥

"এইরূপ আততায়ী অর্থাৎ দুষ্ট মনুষ্যকে—সে গুরুই হউক, মা-ই হউক, ছেলেই হউক, বা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিশ্চয়ই বধ করিবে!" কারণ, এইরূপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততায়ী নিজের অধর্ম্মাচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শাস্ত্রকারেরা বলেন (মনু ৮, ৩৫০)। শুধু মনু নহে, অর্ব্বাচীন ফৌজদারী আইনও আত্মরক্ষণ অধিকারের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া ইহা স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে, অহিংসা অপেক্ষা আত্মসংরক্ষণের ঔচিত্যই সমধিক বুঝিতে হইবে। ভ্রূণ-হত্যা সকলেই অতি গর্হিত বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু গর্ভে আট্‌কাইয়া গেলে উহা কাটিয়া বাহির করা হয় না কি? যজ্ঞে পশুবধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মনু ৫-৩১); তথাপি পিষ্ট পশু নির্ম্মাণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা যায় (সভা, শাং, ৩৩৭) কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্ব্বস্থান ছোট ছোট ক্ষুদ্র জীবে যে ভরিয়া আছে, তাহাদের হত্যা কিরূপে বন্ধ হইবে? মহাভারতে (শাং ৭৫, ১৬) অর্জ্জুন বলিতেছেন ঃ—

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্য্যয়ঃ॥

"চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইরূপ সূক্ষ্ম জীবে জগৎ এতটা ভরিয়া আছে যে, আমরা আমাদের চোখের পাতা ফেলিলেও এই সকল জীবের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়!" অতএব হিংসা করিবে না, এই কথা শুধু মুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইরূপ সারাসার বিচার করিয়া মৃগয়ার অনুশাসন পর্ব্বে (অনু, ১১৬) ইহারই সমর্থন করা হইয়াছে। বনপর্ব্বে এইরূপ কাহিনী আছে যে, এক ব্রাহ্মণ ক্রোধের দ্বারা কোন পতিব্রতা রমণীকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইয়া যখন নিষ্ফলপ্রযত্ন হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন; তাহার পর, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইবার জন্য ঐ রমণী উক্ত ব্রাহ্মণকে এক ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। ঐ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃ ভক্ত ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত হইল। তখন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিল! জগতের মধ্যে কে কাকে না খায়? "জীবো জীবস্য জীবনম্" (ভাগ, ১, ১৩, ৪৬) এই ব্যবহার নিত্য চলিতেছে; আপৎকালে "প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বম্"—ইহা শুধু স্মৃতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মনু ৫, ১৮; সভা, শাং ১৫, ২১), ইহা উপনিষদের মধ্যেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (বেসু, ৩, ৪, ১৮; ছাং ৫, ১, ১; বৃ, ৬, ১, ১৪)। সকলেই হিংসা ছাড়িয়া দিলে ক্ষাত্রধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম চলিয়া গেলে প্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ ঘটিয়া, যে-যাহাকে-ইচ্ছা খাইয়া ফেলিবে, এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে। সার-কথা, নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সব সময়ে কর্ম্মের বিভাগ হয় না; নীতিশাস্ত্রের মুখ্য নিয়ম যে অহিংসার নিয়ম সেই অহিংসার নিয়মেতেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের তারতম্যের বিচার বর্জ্জিত হয় না।

যেমন অহিংসা ধর্ম্ম তেমনি ক্ষমা, শান্তি দয়া—এই সকল গুণও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব স্থানে এই শান্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে? নিয়ত যাহারা শান্তি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদিকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্যভাবে নিশ্চয়ই হরণ করে—এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন নাতিকে অর্থাৎ বলিকে—এইরূপ বলিতেছেন:—

ন শ্রেয়ো সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।

* * *

তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা॥

অর্থাৎ নিয়ত তেজস্বিতা ও নিয়ত ক্ষমা শ্রেয়স্কর হয় না। এইজন্যই জ্ঞানীরা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন" (বন, ২৮, ৬৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগ্য কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহ্লাদ বিবৃত করিলেন। তথাপি, যোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অপবাদের প্রসঙ্গেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহার তত্ত্বটি বুঝিয়া লওয়া খুবই আবশ্যক।

সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্ত্বটিকে সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করে—সেটি 'সত্য'। সত্যের মাহাত্ম্য কি আর বর্ণনা করিব? সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে 'ঋত' ও 'সত্য' উৎপন্ন হয়। সেই সত্যেতেই আকাশ, পৃথ্বী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূতও আবৃত ও ধৃত হইয়া আছে,—এইরূপ দেবতারা সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। "ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত" (ঋ, ১০, ১৯০, ১), "সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ" (ঋ, ১০, ১৮৫, ১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখ। 'সত্য' এই শব্দের ধাত্বর্থও 'হওয়া' অর্থাৎ "কখনই বিনাশ হইবার নহে" অথবা "যাহা ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে"—এইরূপ; সুতরাং "সত্যপরতা নাহি ধর্ম্ম। সত্য তেঁচি পরব্রহ্ম।" (সত্যপরতা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই, সত্যই পরব্রহ্ম) এইরূপ সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। "নাস্তি সত্যাৎপরোধর্ম্মঃ" (শাং, ১৬২, ২৪), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং এইরূপ কথিত হইয়াছে যে—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

"হাজার অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলব্ধি হয়"—(আ, ৭৪, ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে।

সত্য কথা বলিবার সম্বন্ধে মনু বিশেষ করিয়া আরও এই কথা বলেন :—

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্‌মূলা বাগ্‌বিনিঃসৃতাঃ।
তাং তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্ব স্তেয়কৃন্নরঃ॥

"মনুষ্য মাত্রেরই সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। পরস্পরের বিচার আলোচনা পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীয় সাধন নাই। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের আশ্রয়ীভূত বাক্যের যে মূল উৎস তাহাকে যে ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে ব্যক্তি চোর বই আর কিছুই নহে।" অতএব "সত্যপূতাং বদেদ্বাচং" (মনু ৬, ৪৬) সত্যের দ্বারা পবিত্র হইয়াছে এইরূপ বাক্যই বলিবে— এইরূপ মনু বলিয়াছেন। উপনিষদেও "সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর।" (তৈ, ১, ১১, ১) এইরূপে অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে "সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলং" এইরূপ সকল ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া সর্ব্বশেষে এক সত্যকেই পালন করিতে বলিয়াছেন (সভা, অনু, ১৬৮, ৫০)। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মেও এই ধর্ম্মেরই অনুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকারে সর্ব্বোপরি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের কোন অপবাদ হইতে পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু দুষ্টলোকে পূর্ণ এই জগতের ব্যবহার বড়ই কঠিন! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্যুহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়া আছে; পরে তরবার হস্তে সেই ডাকাত "সেই ব্যক্তি কোথায়" বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না, সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ বাঁচাইবে? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা নিবারণ করা ইহা শাস্ত্রানুসারে সত্যেরই ন্যায় মহৎ ধর্ম্ম। মনু বলেন, "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ" (ম, ২, ১১০; সভা, শাং, ২৮৭, ৩৪,)—জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত কথা কহিবে না, এবং অন্যায় পূর্ব্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার উত্তর দিবে না; জানা থাকিলেও পাগলের মত কেবল হুঁ হুঁ করিয়াই কালক্ষেপ করিবে—"জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।" ঠিক্ কথা। কিন্তু 'হুঁ হুঁ' বলা ও মিথ্যা বলা পর্য্যায়ক্রমে একই নহে কি? "ন ব্যাজেন চরেদ্ধর্ম্মং",—ধর্ম্মের সহিত প্রতারণা করিয়া মনকে বুঝাইও না—তাহাতে ধর্ম্ম প্রতারিত হয় না, তুমিই প্রতারিত হইবে; এইরূপ মহাভারতেরও অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। (সভা, আ, ২১৫, ৩৪)। কিন্তু হুঁ হুঁ করিয়া কালক্ষেপ করিবার মতও যদি অবস্থা না হয়? দস্যু হাতে তরবার লইয়া, তোমার বুকের উপর বসিয়া, ধন রত্ন কোথায় আছে বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং উত্তর না দিলে তোমার প্রাণ যাইবে,—এই অবস্থায় তুমি কি বলিবে? সকল ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ণ পর্ব্বে অর্জ্জুনকে (ক, ৬৯, ৬১), এবং পরে, শান্তিপর্ব্বে, সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯, ১৫, ১৬) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছেন :—

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথংচন।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্বাপ্যকূজনাৎ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্॥

"না বলিলে যদি মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই বলিবে না; বলা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বলা অধিক প্রশস্ত, বিচারে এইরূপ স্থির হইয়াছে।" কারণ, সত্য ধর্ম্ম কেবল শব্দোচ্চারণ নিঃসৃত বাক্য নহে, কিন্তু যে ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অযথার্থ হইয়াছে বলিয়া গর্হিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় তাহা সত্য নহে অহিংসাও নহে :—

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূত হিতমত্যন্তং এতৎসত্যং মতং মম॥

"সত্য বলা প্রশস্ত বটে; কিন্তু সত্য অপেক্ষাও সর্ব্বভূতের যাহাতে হিত হয় সেইরূপ বাক্যই বলিবে কারণ, সর্ব্বভূতের যাহা অত্যন্ত হিত তাহাই আমার মতে প্রকৃত সত্য"—এইরূপ শান্তিপর্ব্বে (শাং,

৩২৯, ১৩; ২৮৭, ১৯) সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ শুককে বলিয়াছেন। "যদ্ভূত হিতং" এই পদার্থটি দেখিয়া, আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী স্মরণে আসায় কোন ব্যক্তি এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, এই বচনটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধ-সম্বাদে, দুই-দুইবার আসিয়াছে, তন্মধ্যে একস্থানে "অহিংসা সত্য বচনং সর্ব্বভূত হিতং পরং (বন, ১০৬, ৭৩) এবং আর এক স্থানে যদ্ভূতহিতত্যন্তং তৎসত্যমিতি ধারণা" (বন, ২০৮, ৪), এইরূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দ্রোণকে "নরো বা কুঞ্জরো বা"—অশ্বত্থামা হত ইতি গজ—এইরূপ উত্তর দিয়া যে সংশয়-মোহ উৎপাদন করিয়াছিলেন,—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ; তৎসদৃশ অন্য বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। হত্যাকারী মনুষ্যের প্রাণ মিথ্যা বলিয়া বাঁচাইবে আমাদের শাস্ত্র একথা বলে না। কারণ, শাস্ত্রেই হত্যাকারী মনুষ্যের দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বধদণ্ড কথিত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত মনুষ্য দণ্ড্যই কিংবা বধ্য। এই প্রসঙ্গে কিংবা ইহার ন্যায় অন্য প্রসঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতা মনুষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্ব্বপুরুষ ও সে ব্যক্তি স্বয়ং নরকগামী হয়,—ইহা সকল শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মনু, ৮, ৮৯—৯৯; সভা, আ, ৭, ৩)। কিন্তু কর্ণপর্ব্বে উপরি-উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত কথা অনুসারে, যদি সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ মনুষ্যের প্রাণ, বিনা কারণ বিনষ্ট হয়—তখন কি করা যাইবে? গ্রীন নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় "নীতি শাস্ত্রের উপোদ্ঘাত" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে সমস্ত নীতিশাস্ত্র নিরুত্তর ও নীরব, এইরূপ বলিয়াছেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ প্রসঙ্গকে সত্যাপবাদের মধ্যে পরিগণিত করেন সত্য; কিন্তু এইরূপ গণনা তাঁহাদের মতে সাধারণতঃ গৌণ—তাই—

তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ॥

এইরূপ শেষে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ২, ৮৩; মনু, ৮, ১০৪-১০৬),।

অহিংসার অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের নীচে নামাইয়া রাখিবার প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তাই, প্রামাণিক খৃষ্টান ধর্ম্মোপদেশক ও নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এইখানে বলিতেছি। "আমি মিথ্যা বলিলে, প্রভুর সত্যের মহিমা যদি অধিক বর্দ্ধিত হয় (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের অধিক প্রচার হয়) তাহা হইলে আমাকে কিরূপে পাপী বলিয়া স্থির করিবে? (রোম, ৩, ৭) এইরূপ খৃষ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের নূতন অঙ্গীকারের মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে; প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক কতবার এই অনুসারে কাজ করিয়াছেন—খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসকার "মিল্‌মন" বলিয়াছেন। কাহাকে ভোগা দেওয়া কিংবা ভুল বুঝানো—ইহা বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্র প্রায়ই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করে না। তথাপি, সত্যধর্ম্মনীতি একেবারে নিরপবাদ এ কথা তাঁহারাও বলেন না। যে সিজ্বিক্ নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। সিজ্বিক্, এই কর্ম্মাকর্ম্মসংশয় স্থলে, "অধিক তম লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং ঐ কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াই, তিনি শেষে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ প্রসঙ্গে,—"ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি (সত্য বলিলে যদি তাঁহার শরীর খারাপ হয়) নিজের শত্রু, চোর—ইহাদের নিকট এবং অন্যায়পূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, কিংবা উকীলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,—মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নহে।"* মিলের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই অপবাদের কথা অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথা আছে।† এই অপবাদ ব্যতীত সিজ্বিক্ নিজ গ্রন্থে আরও এ কথা লিখিয়াছেন যে, "সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইরূপ যদিও আমরা বলি, তথাপি যে রাজকীয় পুরুষকে নিজ কাজকর্ম্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন

* Sidgwick's Methods of Ethics, Book III. Chap. XI § 6. P. 355 (7th Ed). Also see PP. 315-317 (Same ed.)

† Mill's Utilitarianism, Chap II, PP. 33-34.

এ কথা আমরা বলি না।"* আর এক স্থানে, এই প্রকার নিজের সুবিধা মত কাজ করা পাদ্রি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা যায়,—এইরূপ তিনি বলেন।

আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যিনি নীতিশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা করিয়াছেন সেই লেস্লি-ষ্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ দিয়া শেষে এইরূপ লিখিতেছেন যে, "আমার মতে, কোন কার্য্যের পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার নীতিমত্তা স্থির করা আবশ্যক। মিথ্যা বলিলে যদি সর্ব্ব সমেত অধিক কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য বলিবার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করিব না। এবং এই প্রকার বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ আমি বুঝিব।"† যিনি অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নীতি শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্রীন সাহেব ‡ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশাস্ত্রে মনুষ্যের সংশয় নিবৃত্তি করিতে পারে না, এইরূপ স্পষ্ট বলিতেছেন; এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিয়াই পালন করিতে হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই; সাধারণতঃ তাহার পালনে আমার শ্রেয় হইবে এই টুকুই নীতিশাস্ত্রের কথা। কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখিয়া থাকি," নীতিশাস্ত্রবেত্তা বেন্, হেবেল্ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগেরও মত এইরূপ।

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলির তুলনা করিলে সত্য সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে :—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহ কালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

"ঠাট্টা করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, এবং সঞ্চিত ধন বাঁচাইবার জন্য—সর্ব্ব-সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বলায় পাতক নাই" (সভা, আ, ৮২. ১৬; তদনুসারে শাং, ১০৯ ও মনু ৮, ১১০ দেখ)। এইরূপ আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার অর্থ স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্যা বলিবে এরূপ নহে; সিজ্‌ৱিক্ সাহেব যে অর্থে "ছোট ছেলে, পাগল, কিংবা রুগ্ন" ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহিয়াছেন সেই অর্থই মহাভারতের অভিপ্রেত। কিন্তু পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে যাঁহারা গুটাইয়া রাখিয়াছেন, সেই ইংরেজ গ্রন্থকারেরা আরো বেশী দূর গিয়া, ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত নিজের লাভের জন্য মিথ্যা বলিতে পারে—এই যে কথা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাই কেবল আমাদের শাস্ত্রকারেরা কখনই মান্য করেন নাই। কেবল সত্যশব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং সর্ব্বভূতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই দুয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হয় সেই স্থলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে, অপরিহার্য্য বলিয়া অসত্য কহিয়া কার্য্য সিদ্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন সত্য। তথাপি সত্যাদি নীতিধর্ম্ম তাঁহাদিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বকালে সমান অবাধিত; সুতরাং পারলৌকিক দৃষ্টিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিয়া তজ্জন্য তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শূন্যগর্ভ, এই কথা কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্রকারেরাই বলিবেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন তাঁহাদিগের ধারণা কিংবা যাদের জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে তাদের ধারণা সেরূপ না হওয়ায়, উভয়েই উক্ত সত্যাপবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

* Sidgwick's Methods of Ethics Book IV. Chap III. § 7 P. 454 (7th Ed) & Book II Chap V § 3. P. 169.

† Leslie Stephen's Science of Ethics Chap IX § 29. P. 369 (2. Ed). "and the certamty may be of such a kind as to make me think it a duty to lie."

‡ Green's Prologomena to Ethics. § 315. P. 379 (5th cheaper edition) § Bain's Mental and Moral Science. P. 445 (Ed 1875), † Whewell's Element of Morality Book II.

উদাহরণ যথা—যুধিষ্ঠির "নরো বা কুঞ্জরো বা" এইরূপ কঠিন সমস্যার স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়া বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার দরুণ, পূর্ব্বে তাঁহার যে রথ জমি হইতে চারি আঙ্গুল উপরে অন্তরীক্ষে চলিত, সেই রথ পরে অন্য লোকের রথের ন্যায় জমির উপর দিয়া চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ ঘণ্টা খানেকের জন্যও নরক-লোকে তাঁহাকে বাস করিতে হইল—এইরূপ মহাভারতেই কথিত হইয়াছে (দ্রোণ, ১৯১, ৫৭, ৫৮ ও স্বর্গ ৩, ১৫)। সেইরূপ, ভীষ্মের বধ ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে—কিন্তু শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া—সাধন করিবার দরুণ, অর্জ্জুনের আপন পুত্র বভ্রু-বাহনের হাতে অর্জ্জুন পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (সভা, অশ্ব, ৮১, ১০)। এই সম্বন্ধে, প্রসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি উক্ত অপবাদ মুখ্য ও প্রামাণিক না হওয়ায়, মহাদেব পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে—

আত্মহেতোঃ পরার্থেবা নর্মহাস্যাশ্রয়াত্তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

"স্বার্থের জন্য, পরহিতের জন্য, কিংবা ঠাট্টা করিয়া যে সকল ব্যক্তি এই জগতে কখন মিথ্যা বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয়।" (সভা, অনু, ১৪৪, ১৯)—এইরূপ আমাদিগের শাস্ত্রকারদিগের চূড়ান্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আপন বাক্য বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অন্তর্ভূত। "হিমাচল বিচলিত হইতে পারে, কিংবা অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্তু আপন মুখের কথা অন্যথা হইবার নহে।" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম বলিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরিও সৎ পুরুষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা:—

তেজস্বিনঃ সুখমসূনপি সন্ত্যজন্তি।
সত্যব্রত ব্যসনিনো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্॥

"সত্যব্রত তেজস্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করেন না" (নীতি শ, ১১০)। সেইরূপ "দ্বিঃ দারং নাভি সন্ধত্তে রামো দ্বির্নাভিভাষতে" (সুভাষিত) এইরূপ দাশরথী রামচন্দ্রের একপত্নীব্রতের মতই একবাণী ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি হইয়াছে; এবং হরিশ্চন্দ্র স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য করিবার জন্য ডোমের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কথা আছে। কিন্তু উল্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদি দেবতারাও বৃত্রের ন্যায় স্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কিংবা তাহার মধ্যেও পলাইবার কোন রাস্তা বাহির করিয়া বৃত্রের বধসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ঐ ধরণে পুরাণেও হিরণ্যকশিপুবধের কথা আছে। তদ্ব্যতীত আই-নের ভিতরেও এমন কতকগুলা কড়ার দেখা যায় যাহা ন্যায়বিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্জ্জুন সম্বন্ধে এই-রূপ একটা বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, "'তুমি আপন হাতের গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দেও'" এই কথা যে কেহ আমাকে বলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেদ করিব।" অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিলে পর, যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে "তোমার গাণ্ডীবে আমাদের কি কাজ হইল? উহা হাত হইতে ফেলিয়া দেও" এইরূপ অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া যখন নৈরাশ্যজনিত স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসোক্তি মুখ দিয়া বাহির হইল, তখন অর্জ্জুন হাতে তরবার লইয়া যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় নিকটে থাকায়, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, তত্ত্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহার মার্ম্মিক বিচার করিয়া, "তুমি মূঢ়, সূক্ষ্ম ধর্ম্ম এখনও তুমি জান না, তা বৃদ্ধদের নিকট তোমার শিক্ষা করা আবশ্যক, "ন বৃদ্ধাঃ সেবিতা-স্ত্বয়া"—তুমি বৃদ্ধদের সেবা কর নাই, তোমার প্রতিজ্ঞা যদি রাখিতে হয় তবে তুমি যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা কর, কারণ মানী ব্যক্তির পক্ষে ভর্ৎসনা বধেরই তুল্য," ইত্যাদি প্রকারে তিনি অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এবং অবিচারক্রমে তাঁহার হাতে সংঘটিত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃহত্যারূপ পাতক হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। কর্ণপর্ব্বে এইরূপ এক কথা আছে। (সভা, কর্ণ, ৬৯)। শ্রীকৃষ্ণ এই সময়ে সত্যানৃতের বিচার করিয়া অর্জ্জুনকে এবং পরে শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন (শাং, ১০৯); এবং ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই বিষয়ে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তথাপি এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ কি করিয়া নির্ণয় করা যাইবে, ইহা বলা কঠিন। কারণ, ভ্রাতৃধর্ম্ম এই স্থলে

সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও গীতার কথিত প্রসঙ্গ ইহার উল্টা হওয়ায়, ভ্রাতৃপ্রেমাপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ম্ম তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে।

(ক্রমশঃ)

ভোজরাজ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

ভোজরাজের নাম পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে কত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা পর্য্যাপ্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে তিনি যে স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, শিল্প, বৈদ্যক, শব্দানুশাসন প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রবিষয়ক নানাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে ঐ সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা কতদূর প্রবল ছিল, ইহাতে তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাতঞ্জলদর্শনের রাজমার্ত্তণ্ড নামক বৃত্তির উপক্রমে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে,—তিনি "শব্দানুশাসন" পাতঞ্জলদর্শনের "বৃত্তি" এবং "রাজমৃগাঙ্ক" নামক বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। "কামধেনু" নামক তদীয় বৃহত্তর স্মৃতিনিবন্ধের প্রমাণাবলী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি এবং জীমূতবাহন প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদেয় গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার সুধীসমাজে এতই শ্রদ্ধাস্পদ যে, যাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ সেরূপ অনেক বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে "কামধেনু" গ্রন্থ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার "কামধেনুকে" অতীব প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সময়েও বাঙ্গালাদেশে "কামধেনু" নিবন্ধের পুথি দেখিতে পাওয়া যাইত কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। সম্প্রতি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কাশ্মীরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে "কামধেনু" নিবন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইহা সত্য হইলে, গ্রন্থখানি মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্যকৃত "কালমাধব" নামক স্মৃতিনিবন্ধে ভোজদেবের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে ভোজরাজ সমস্ত শৈবাগমের সারভূত অর্থ আর্য্যাচ্ছন্দে নিবন্ধ করিয়াছিলেন। ভোজদেবকৃত "রাজমার্ত্তণ্ড" নামক জ্যোতির্নিবন্ধ অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ভোজদেবের অনেক বচন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রভৃতির বিবিধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের নাম কথিত হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের মধ্যে "ভোজচম্পূ" গ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" নামক বৃহত্তম অলঙ্কার গ্রন্থও ভোজদেবের বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "দশরূপক" নামক গ্রন্থে তিনি নাট্যজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থও বর্ত্তমান আছে। আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম যুক্তিকল্পতরু। ইহা একখানি উপাদেয় নিবন্ধ। ইহাতে তাঁহার নীতিশাস্ত্রপারদর্শিতা এবং শিল্পজ্ঞানকুশলতা বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

পাতঞ্জল বৃত্তির উপক্রমে তিনি নিজেকে "রণরঙ্গমল্ল" নামে অভিহিত করিয়া উপসংহারে "ভোজ মহীপতি" সমাখ্যায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সমাপ্তিপ্রতিপাদক চূর্ণিকা পাঠে জানা যায়, ধারানগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। জীমূতবাহন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও তাঁহাকে "ধারেশ্বর" বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন।

বোম্বে নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত সাহিত্যদর্পণের ভূমিকায় ভোজদেবের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; এবং সময় নির্ণয়ের উপযোগী একখানা দানপত্রের সংক্ষিপ্তাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জানা যায় যে ভোজরাজ ১০৭৮ শকাব্দে (১১৫৬ খৃঃ অঃ) ধারানগরীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য দানপত্রের সংক্ষেপ অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"জয়তি ব্যোমকেশোঽসৌ যঃ সর্গায় বিভর্ত্তি তাম্।
ঐন্দবীং শিরসা লেখাং জগদ্বীজাঙ্কুরাকৃতিম্॥

পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীসীয়কদেবপাদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ পর-

মেশ্বর-শ্রীবাক্‌পতিরাজদেবপাদানুধ্যাত পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীসিন্ধুরাজদেবপাদানুধ্যাত—পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীভোজদেবঃ কুশলী নাগদ্রহপশ্চিমপথকান্তঃপাতিবীরাণকে সমুপগতান্ সমস্তরাজপুরুষান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ প্রতিনিবাসি পট্টকিলজনপদাদীংশ্চ সমাদিশতি—অস্তু বঃ সংবিদিতম্, যথা অতীতাষ্টসপ্তত্যধিক সাহস্রিক-সংবৎসরে মাঘাসিততৃতীয়ায়াং রবাবুদগয়নপর্ব্বণি কল্পিতহলানাং লেখ্যে শ্রীমদ্ধারায়া মবস্থিতৈ রস্মাভিঃ স্নাত্বা চরাচরগুরুং ভগবন্তং ভবানীপতিং সমভ্যর্চ্চ্য সংসারস্যাসারতাং দৃষ্ট্বা—

> বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্য-
> মাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
> প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাং
> ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে॥

ইতি জগতো বিনশ্বরং স্বরূপমাকলয্য উপরিলিখিতগ্রামঃ স্বসীমাতৃণগোচরযূতিপর্য্যন্তঃ সহিরণ্যভাগভোগঃ সোপরিকরঃ সর্ব্বাদায়সমেতঃ ব্রাহ্মণধনপতিভট্টায় ভট্টগোবিন্দসুতায় বহ্বৃচাশ্বলায়নশাখায় ত্রিপ্রবরায় বেল্লবল্লপ্রতিবদ্ধ শ্রীবাদাবিনির্গতরাধস্থর সঙ্গকর্ণাটায় মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে অদৃষ্টফলমঙ্গীকৃত্য আচন্দ্রার্কার্ণবক্ষিতিসমকালং যাবৎ পরম্পরয়া ভক্ত্যা শাসনেনোদকপূর্ব্বং প্রতিপাদিত ইতি মত্বা যথাদীয়মানভাগভোগকর-হিরণ্যাদিকমাজ্ঞাশ্রবণ বিধেয়ৈ ভূর্ত্বা সর্ব্বমস্মৈ সমুপনেতব্যম্। সামান্যঞ্চৈতৎ ফলং বুদ্ধ্বাস্মদ্বংশজৈরন্যৈরপি ভাবিভোক্তৃভিরস্মৎপ্রদত্তধর্ম্মাদায়োয়ং অনুমন্তব্যঃ পালনীয়শ্চেতি। সংবৎ ১০৭৮ চৈত্রসুদি ১৪ স্বয়মাজ্ঞামঙ্গলং মহাশ্রীঃ। স্বহস্তোয়ং শ্রীভোজদেবস্য।"

বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ ভোজনৃপতির কীর্ত্তিস্বরূপ তদীয় গ্রন্থগুলির মর্ম্মার্থ সঙ্কলন করিতে পারিলে মধ্যযুগের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে—তদীয় গ্রন্থ-কলাপের মধ্যে অনেক গুলিই অধুনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সুতরাং যাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

যুক্তিকল্পতরু।

এই গ্রন্থ কতিপয় শাস্ত্রের সমন্বয়ে বিরচিত হইয়াছিল। ইহাতে নীতি এবং শিল্পশাস্ত্রই বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার উপক্রমে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়াছেন। ইহার রচনায় শ্লেষাত্মক কাব্যকৌশল প্রকটিত হইয়াছে। যথা—

> "কংসানন্দ মকুর্ব্বাণঃ কং সানন্দং করোতি যঃ।
> তং দেববৃন্দৈ রারাধ্য মনারাধ্য মহং ভজে॥"

ইহার অর্থ—যিনি কংসাসুরের আনন্দ (সম্পাদন) করেন না, অথচ "কং সানন্দ" করেন, (কং ব্রহ্মাণং সানন্দং আনন্দান্বিতং করোতি, অসুর বিনাশের দ্বারা ব্রহ্মার আনন্দোৎপাদন করেন), যিনি দেববৃন্দের আরাধ্য অথচ "অনারাধ্য", সেই বিষ্ণুকে আমি ভজনা করি। অনারাধ্য শব্দের অর্থ—যাঁহার আরাধনীয় অন্য কেহ নাই, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেশ্বর।

গ্রন্থকার শাস্ত্রকারদিগের চরণবন্দন পূর্ব্বক বক্তব্য গ্রন্থের মূলীভূত মুনিনিবন্ধের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ এবং অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

> "নমামি শাস্ত্র কর্ত্তৃণাং চরণানি মুহুর্ম্মুহুঃ।
> যেষাং বাচঃ পাবয়ন্তি শ্রবণেনৈব সজ্জনান্॥
> নানামুনিনিবন্ধানাং সারমাকৃষ্য যত্নতঃ।
> তনুতে ভোজনৃপতি র্যুক্তিকল্পতরুং মুদে॥
> বিবুধা তীষ্টদমমুং কল্পবৃক্ষং সমাশ্রিতঃ।
> প্রাপ্নোতীষ্টতমাং সিদ্ধিং বুধৈঃ সংসেব্যতাময়ম্॥"

অনন্তর কথিত হইয়াছে যে—দণ্ডনীতি যাহার মূল, জ্যোতিঃশাস্ত্র যাহার প্রকাণ্ড, দৃষ্টফলজনক "ইতর" বিদ্যা যাহার শাখা, অন্যান্য বিদ্যা যাহার পুষ্প, অদৃষ্ট অর্থাৎ সৌভাগ্যসম্পাদন যাহার ফল, এবং যাহার রস সজ্জনের পক্ষে অমৃত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই "কল্পতরু" রাজমন্ত্রীদিগের উপাসনীয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য। অনন্তর নীতিশাস্ত্রের প্রশংসা এবং রাজাদিগের পক্ষে নীতিজ্ঞানের আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে,—বক্তব্য গ্রন্থের প্রথমেই যে নীতি নিবদ্ধ হইতেছে, উহা বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতিশাস্ত্র এবং ঔশনসী নীতির অর্থাৎ শুক্রনীতির অবিরুদ্ধ।

অতঃপর গুরু পুরোহিত অমাত্য মন্ত্রী দূত লেখক জ্যোতির্ব্বিদ্ অন্তঃপুরাধ্যক্ষ প্রভৃতির লক্ষণ এবং পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। এই স্থলে "অমাত্য" এবং "মন্ত্রী" সমানার্থক এই দুইটি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়,—"অমাত্য" শব্দে প্রধান মন্ত্রী এবং "মন্ত্রী" শব্দে সাধারণ মন্ত্রী অভিপ্রেত হইয়াছে।

ইহাও বলা আবশ্যক যে,—এই স্থলে পরীক্ষণীয় বর্গের প্রথমেই যে গুরুর নাম কথিত হইয়াছে, উহা তান্ত্রিক মন্ত্রদাতা গুরু বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে গুরুর যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, এইস্থলেও তাহারই সম্পূর্ণ সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর চতুর্ব্বিধ বল কথিত হইয়াছে। তৎপরে চতুর্ব্বিধ যানের নামমাত্র কথিত হইয়াছে। অনন্তর যুদ্ধের স্থান, তৎপর চরবিবরণ, অনন্তর আসন, তৎপর দ্বৈধ, তৎপর আশ্রয়, তৎপর দণ্ডমন্ত্রণা—নীতিযুক্তি নামক প্রকরণে এই কয়টি বিষয় বিবেচিত হইয়াছে।

অনন্তর দুর্গযুক্তি। ইহাতে নানা প্রকার দুর্গের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকরণে নীতিশাস্ত্র এবং অন্য গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। যথা গর্গ ভোজ।

অনন্তর নগর নির্ম্মাণের কাল প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যোত্তর পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অনন্তর বসতিলক্ষণ। অতঃপর বাস্তুযুক্তি নামক প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে বাস্তুর জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাণপ্রসঙ্গে এই কয়টি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে—বাস্তুকুণ্ডলী, ভোজপরাশর।

অতঃপর জলাশয়ের বিবরণ। তৎপর বাস্তুর দিগ্ বিশেষে বৃক্ষস্থাপন ব্যবস্থা, বৃক্ষের দোষগুণ বিবেচনা, গৃহের স্থান প্রভৃতি বিবেচনা।

গৃহযুক্তি প্রকরণের পর আসনযুক্তি প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে সিংহাসনের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর খট্বার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর পীঠ নিরূপণপ্রকরণ, ইহাতে পীঠের অর্থাৎ পীঁড়ীর অতি বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়।

অতঃপর ছত্রযুক্তি প্রকরণ। ইহাতে ছত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। অনন্তর ধ্বজযুক্তি প্রকরণ। ইহাতে নানা প্রকার ধ্বজের লক্ষণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধ্বজপ্রসঙ্গে পতাকার বিবরণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর নবপ্রকার রাজোপকরণ কথিত হইয়াছে। যথা—

> "চামরঞ্চাথ ভৃঙ্গার স্তবকশ্চ প্রসাধনী।
> বিতানঞ্চাথ শয্যাচ ব্যজনং দর্পণাম্বরম্॥
> এতন্নবকমুদ্দিষ্টং রাজোপকরণাখ্যয়া।"

উক্ত নয়টি উপকরণের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষণ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপকরণযুক্তির পর অলঙ্কারযুক্তি প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অষ্টপ্রকার প্রধান অলঙ্কারের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

> "শিরস্ত্রং মুকুটং হারঃ কুণ্ডলঞ্চাঙ্গদন্তথা।
> কঙ্কণং বালকঞ্চৈব মেখলাষ্টাবিতি ক্রমাৎ॥
> প্রধানভূষণান্যেষু যথা স্বং মণিনিশ্চয়ঃ।"

অলঙ্কারের প্রসঙ্গে মণিপ্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে হীরক প্রভৃতি মণির অতি বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মণিস্বরূপনির্ণয়ের উপযোগী প্রমাণাবলী গরুড়পুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর অস্ত্রযুক্তি প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ এই কয়টি অস্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুঃ, বাণ, শল্য, ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র, নারাচ, শক্তি, যষ্টি, পরশু, চক্র, শূল এবং পরিঘ ইত্যাদি। এই সকল অস্ত্র ভোজমহীপতিসম্মত। বাৎস্যের মতে অস্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কতকগুলি নির্ম্মায় নামে পরিচিত, অপরগুলি মায়িক বলিয়া সমাখ্যাত। খড়্গ প্রভৃতি নির্ম্মায় অস্ত্র এবং দহন প্রভৃতি মায়িক অস্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অগ্নি, জল, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, শব্দ প্রভৃতি এবং তপ্ত তৈলাদি মায়িক নামে অভিহিত হইয়াছে।

কাষ্ঠ, চর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা কবচ প্রস্তুত হইত। কোন কোন নিপুণ ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং লৌহ এই চারিপ্রকার ধাতুর দ্বারা কবচ নির্ম্মাণ করিতেন।

অতঃপর খড়্গপরীক্ষা প্রকরণে খড়্গের অতি বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে এই কয়টি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়— লৌহদীপ, লৌহপ্রদীপ, শার্ঙ্গধর, নাগার্জ্জুন মুনি, পদ্মপুরাণ, লৌহার্ণব। এই সমস্ত গ্রন্থের নামমাত্র শ্রবণে মনে হয় ভোজদেবের সময় পর্য্যন্ত লৌহ প্রভৃতি ধাতুপরীক্ষার নানাপ্রকার গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল।

অতঃপর বাণ প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে। অনন্তর রাজার যাত্রাপ্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে অশ্ব প্রভৃতির বিস্তৃত নীরাজনপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর অশ্বপরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে অশ্বসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জানিতে পারা যায়।

অতঃপর গজ পরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। এই প্রকরণে হস্তীর গুণাগুণ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর চতুষ্পদপরীক্ষা প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে গো মহিষ মৃগ কুক্কুর ও ছাগ এই কয় প্রকার জন্তুর শুভাশুভ লক্ষণ কথনানন্তর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর লক্ষণ অশ্বলক্ষণের ন্যায় বুঝিতে হইবে, এইরূপ বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে গার্গ্য শঙ্খ ও ভরদ্বাজ এই কয়জন গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর দ্বিপদযান প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। এই দ্বিপদযান মানুষ, পক্ষী এবং অন্যান্য দ্বিপদের দ্বারা চালিত হইত বলিয়া উহার অনেক প্রকার ভেদ বিবেচিত হইয়াছে। দ্বিপদযান সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তম্মধ্যে দোলা প্রভৃতি সামান্য দ্বিপদযানরূপে কথিত হইয়াছে। এই প্রকরণে দোলার অনেক প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর নিষ্পদযানপ্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। ইহাতে নৌকার বিবরণ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

শোক-সংবাদ।

৺নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস—৺নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। গত কয়েক মাস ধরিয়া তিনি রোগের যাতনা নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার অনেক দিনের যোগ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ এক সময় ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছে। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের অনেক অধ্যক্ষ ছিলেন। কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন; মাইকেল মধুসূদনের সমাধির উপরে যে প্রস্তরফলক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ও পরলোকগত শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যম ও চেষ্টার ফল। প্রতিবর্ষে মধুসূদনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য নকুড় বাবুই বিশেষভাবে তাঁহার সমাধিপার্শ্বে সকলকে আহ্বান করিতেন। পঠন ও পাঠনে তাঁহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে। তিনি কর্ম্মী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

৺মৃণালিনী বিশ্বাসজায়া—গত ২৯শে চৈত্র, ইংরাজি ১১ই এপ্রেল, বুধবার শেষ রাত্রে ভদ্রেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী বিশ্বাসজায়ার দেহান্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিসুখ বিধান করুন।
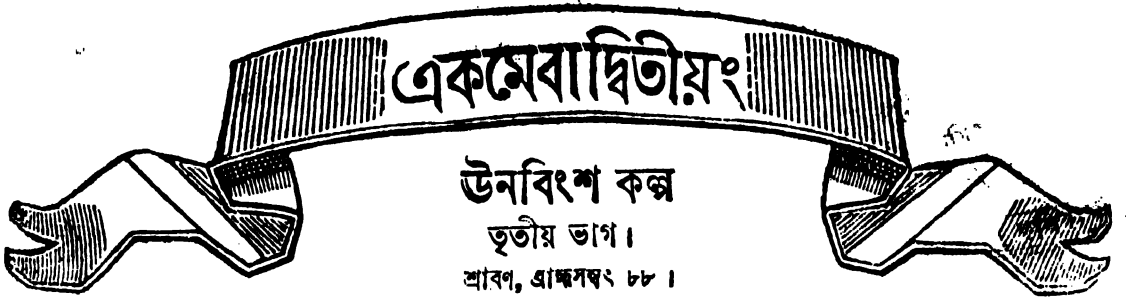
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

দিয়েছ ধরা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
যাহা কিছু ছিল মম, সবি দিয়া আমি
বেঁধেছি আমার সাথে, ওগো মোর স্বামী।

মূল্য যার নাহি কোন—ভক্তিধন দিয়া
আটক করেছি তোমা' দরিদ্রের হিয়া'।
মুক্তি ভুক্তি কোন কিছু নাহি চাহি আমি—
তোমা সনে বাঁধা রব—চাহি দিনযামি।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর প্রাণসখা, এই অধিকারে
বাঁধিয়া প্রাণের মাঝে রাখিব তোমারে।

দুরু দুরু মৃদুধ্বনি শুনিতে শুনিতে
চিরতরে রবে হৃদে—নারিবে ছাড়িতে।
নীরবে চরণ প্রভু পূজি' হব ধন্য—
সফল কর এ কাম—নাহি কাম অন্য।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
তুমি মোর রাজরাজ, আমি প্রজা তব—
প্রতিদিন গাব আমি জয়গীত নব।

যে যেথায় আছে সারা জগতের প্রাণী
আসিবে সমুখে তব শুনিবারে বাণী।
তোমার গৌরবে মম আনন্দ সাগরে
উঠিবে তরঙ্গ কত থরে থরে থরে।

আপনার নহ তুমি—তুমি যে আমার—
আপনি দিয়েছ ধরা স্বেচ্ছায় তোমার।
আমারো জীবন সব, যত ভালবাসা
সঁপেছি তোমারি পদে যত সুখ আশা।

আমার বলিয়া কিছু না চাহি রাখিতে—
লহ লহ সবি মম, থাক মম চিতে।
লাগাও সেবায় তব জীবন আমার—
উঠুক সেথায় তব নিত্য জয়কার।

গতি।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা সত্য সত্যই যে চলিতেছি, একথা অস্বী-কার করিবার যো নাই। সচলতাই জীবনের লক্ষণ, নিশ্চেষ্টতাই মৃত্যুর প্রতিরূপ। আমরা নানা কারণে রুদ্ধবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনের গতি মন্থরভাবে চলিতেছিল, তাহার পরে যখন হইতে

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম উৎসবে গত ১ই [illegible] দিবসে বিবৃত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার খরতর আলোক এদেশে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ব্যাপকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা চলিয়াছে, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সভ্যতার আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে নিপতিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে নড়িতে আরম্ভ করিয়াছি; প্রাচীন ধারা আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আমরা চলিষ্ণু হইয়াছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত স্থিতিশীল, তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, তাঁহারাও নড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই নড়াচড়া জীবনী শক্তির পরিচায়ক হইলেও সর্ব্ববিধ নড়াচড়া উন্নতি লাভের অনুকূল কি না, তাহাই বিবেচ্য। এই নড়াচড়াই বল, আর গতিই বল, যখন কোন নিয়মের অধীন হইয়া সৎ উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তথনই তাহা হইতে সুফল প্রসূত হয়, ইহা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু যখন কোন সৎ উদ্দেশ্য না মানিয়া, কোন নিয়ম না ধরিয়া উহা চলে, তখন সুফলের আশা করা যায় না। উহা উচ্ছৃ-ঙ্খলতাতে পর্য্যবসিত হয়।

আমাদের কণ্ঠস্বরের একটি গতি আছে। সঙ্গী-তের উদ্দেশ্য শ্রোতার হৃদয়ে বিভিন্ন সুন্দরভাবের উদ্রেক সাধন। কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত বাহির করিতে হইলে, কণ্ঠস্বরের গতি, সপ্ত-স্বরের ভিতর দিয়া যাওয়া চাই, রাগ-রাগিণী তালের নিয়ম মানিয়া চলা চাই, তবেই তাহা সঙ্গীত হইবে। উদ্দামভাবে চীৎকার কস্মিনকালে সঙ্গীতে পরিণত হইতে পারে না।

আমাদের কর্ম্মচেষ্টার ভিতরে হস্তপদ সঞ্চা-লনের যে গতি অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সঙ্কোচ ও প্রসারণ রহিয়াছে, তাহা কর্ম্মঠ সকল মনুষ্যের মধ্যে একই ভাবের। ক্রিয়াসিদ্ধি তখনই সম্ভবপর, যখন পেশীর সঞ্চালন নিয়মে চলিতে থাকে। অপো-গণ্ড শিশু বা বাতুল হস্তপদে গতিবেগ আনয়ন করে বটে, কিন্তু তাহারা কোন উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে না, তাই কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

বালক বা যুবা যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তখন তাহার চিন্তার গতি ত আরম্ভ হইয়াছে, সে ত চিন্তা করিতে শিখিয়াছে; কিন্তু তাহার চিন্তার গতি "শিক্ষা করিব" এই উদ্দেশ্য লইয়া যদি পাঠ্য পুস্ত-কের ভিতরে বা শিক্ষকের উপদেশের দিকে না যায়, তবে তাহার সমস্ত চিন্তার গতি নিষ্ফল। সদুদ্দেশ্য মানিয়া না চলিলে তাহার চিন্তার সেই গতি তাহাকে ক্রীড়ার দিকে, বিলাসের দিকে, জীবনের নিষ্ফলতার দিকে লইয়া যাইবে।

মানুষ যে সকল শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করি-য়াছে, সে ইচ্ছা করিলে তাহার সমস্ত শক্তির গতিকে সুপথে লইয়া যাইতে পারে। মানুষের ইহাই অনন্য-সাধারণ অধিকার। অন্য কোন জীব এই প্রসারণ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। তাই মনুষ্যজীবন এত অমূল্য। তাহার কণ্ঠস্বরের গতি সঙ্গীতে এতই গমক ও মূর্চ্ছনা আনিয়া দেয়, যে শ্রোতার দল মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে। হস্তের পেশী সঞ্চালনের গতি চিত্রাঙ্কনে, মূর্ত্তিগঠনে, বিবিধ শিল্প-সামগ্রী নির্ম্মাণে, কৃষিকার্য্যে এতই পটুত্ব আনিয়া দেয়, যে তাহা হইতে সভ্যতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে। তাহার মানসিক চিন্তার গতি কাব্যে, পদার্থ বিদ্যায়, দর্শনে, রসায়নে, জ্যোতিষে, ইতিহাসে প্রবল হইয়া মর্ত্ত্যলোকে যে জ্ঞানের মন্দাকিনীর সৃষ্টি করে, তাহাতে ধরণীর মুখশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে; আবার আধ্যাত্মিক ব্যাপারে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতার বিকাশ-ক্ষেত্রে মানবাত্মার নিভৃত নিলয়ে যে একটি গতি রহিয়াছে, তাহা পরম লক্ষ্যে পৌঁছিলে মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে।

মনুষ্যের এই যে সক্রিয় বা সবলভাব, তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিধান, আমাদেরই হস্তে। তাই এক কথায় মানুষ স্বাধীন। কিন্তু তাহার স্বাধীনতার তখনই মূল্য থাকে, যখন সে আপনার দায়ীত্বের কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে চায়। তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লক্ষ্যহারা হইতে পারে না। তাহাকে লক্ষ্য মানিয়া চলিতে হইবেই হইবে। তাহার স্বাধীনতাকে তাহার গতিচেষ্টাকে লক্ষ্যের অধীন করিয়া লইতেই হইবে।

মানুষ্যের চিন্তাশক্তি যখন ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে কার্য্য করে, সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন যখন জ্ঞানের আলোচনা লইয়া বসিয়া থাকে, অধিকাংশ লোক যখন নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীন ধারা লইয়া রোমন্থন করিতে থাকে, অনেক সময়ে অর্থহীন আচারের

অনুবর্ত্তনে যখন জীবন ক্ষয় হইতে থাকে; তখন স্বাধীন চিন্তার গতিবেগ এতই মন্দীভূত হইয়া যায়, যে তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া আর বড় পাওয়া যায় না। যখন এই অবস্থা নিতান্ত নিবিড় হইয়া উঠে, তখনই ভগবানের মঙ্গল বিধানে জ্ঞানের ও সমুচ্চ আদর্শের তোরণ দ্বার উৎঘাটিত করিয়া মহাপুরুষের বা সমুন্নত মতের আবির্ভাব হয় এবং তাহা হইতে যে ভেরী নিনাদ বহির্গত হয়, তাহাতে জন-সমাজের প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে। সে সাড়ায় সকলেই জাগিয়া উঠে, এবং মনুষ্যের চিন্তা পূর্ব্ব ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করিয়া চারিদিকে বিস্ফারিত হইতে থাকে। বর্ষার আগমনে মৃতা নদীর রুদ্ধ জল যেমন বালুকার বেষ্টনীকে আর মানিতে যায় না, তেমনি স্বাধীন চিন্তার আগমন মানুষকে অতিরিক্ত মাত্রায় বিচলিত করিয়া তোলে। নদীর সমুন্নত পাড়ের মত বহুকালের বিধিবদ্ধ সমাজশৃঙ্খলাকে সে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া যায়।

একেশ্বরবাদ, বেদের প্রাণের কথা হইলেও যখন যাগযজ্ঞের বাহুল্য সেই একেশ্বরবাদকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, উপনিষদ-যুগের স্বাধীন চিন্তার গতি প্রবল হইয়া চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" যজ্ঞরূপ ভেলার সাহায্যে পরব্রহ্মে কখনই পৌঁছিতে পারা যায় না। জ্ঞানোন্নত ও সাধন-নিষ্ঠ ঋষিগণ সে কথা নীরবে মানিয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে সকাম ধর্ম্মানুষ্ঠান যখন দারুণ হইয়া উঠিয়াছিল, ফলকামনাই যখন জনসাধারণকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দান করিতেছিল, গীতার বাণী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিল, যদি ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পন্ন কর, তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যে ফল কামনার কলঙ্ক স্পর্শ না করুক। ধর্ম্ম-কার্য্যে ফল-কামনারাহিত্যই প্রকৃত যোগ। এই যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ বা গতি, তাহা অদ্যাপিও বিশাল হিন্দু-সমাজকে ছাড়িতে পারে নাই। প্রাণী হত্যা লইয়া দুইটি বিভিন্ন যুগে; দুইটী স্বাধীন চিন্তার ধারা এদেশে পরিলক্ষিত হয়। "সদয়ঃ দর্শিত পশুঘাতঃ" বুদ্ধদেব এবং বহুকাল পরে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব পশু-হননের বিপক্ষে যে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। তাই হিন্দু জাতির প্রাণ এত কোমল, তাহার হৃদয় এত সরস। তাই এই বিশাল ধরণীর মধ্যে এই পবিত্র ভারতবর্ষ এখনও অগণ্য অসংখ্য নিরামিষাশীকে স্বীয় বক্ষে স্থান দিতে পারিয়াছে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

রাজা রামমোহন রায় কোন্ দিকে আমাদের চিন্তার ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন? একটুকু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক যখন প্রথমে এদেশে নিপতিত হইল, তাহার দর্শন-বিজ্ঞান, রসায়ন-জ্যোতিস্তত্ত্ব, আমাদের কোন কোন ধারণাকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, তাহার আড়ম্বরহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদিগকে অশান্ত করিয়া তুলিল, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যখন এদেশে তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সেই সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় বিপুল জ্ঞান, অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রভৃত ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও অজেয় শক্তি লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কীটনিষ্কুষিত বেদান্ত উপনিষদের জীর্ণ পুঁথি হইতে মূর্ত্তিহীন ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়া দিলেন এবং উপনিষদ প্রতিপাদ্য আড়ম্বর-বিহীন ধর্ম্ম-সাধনার সরল ধর্ম্ম জন সাধারণের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিলেন। যাহা আমাদের দেশের ধর্ম্মের চিরন্তন মর্ম্ম কথা, যাহা সনাতন সত্য, তাহা প্রচার করিতে গিয়াও তাঁহাকে সামান্য লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার সেই বাণী ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত মণ্ডলীর অন্তরে স্থান লাভ করিতেছে এবং পিপাসু ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি ধারা বর্ষণ করিতেছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন জাতি নির্ব্বিশেষে প্রদত্ত হইতেছে, জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মের পিপাসাও, যখন সকল জাতির ভিতরে বেগবতী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন কোন জাতিবিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যখন রাশি রাশি ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশিত হইয়া সকল জাতির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তখন অন্য বিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া সকল জাতির ভিতরে নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত করিয়া দেওয়াই ধর্ম্ম-প্রচারকগণের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে চিন্তার গতি বহুদিকে ছুটিতেছে। সমাজসংস্কার, রাজ্যশাসনে অধিকার লাভ, সাম্য বিস্তার লইয়া চারিদিকে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু চিন্তার ধারা বহুমুখী বা সর্ব্বতোমুখী হইলেও আমাদের সাধনার ধারাকে বিশেষভাবে সেই পরম লক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভই ভারতের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন। ধর্ম্মলাভ ঈশ্বর লাভকে মুখ্য করিয়া তাহারই সন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ঈশ্বরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সমদর্শন আপনা হইতেই অভ্যস্ত হইবে, জনসমাজে ধর্ম্মকে বিকশিত করিতে পারিলেই বিবাদ বিসম্বাদ বিদূরিত হইবে। জ্ঞানের বর্ত্তিকাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ কুসংস্কার আপনা হইতে দূরে পলায়ন করিবে। তাহার জন্য পৃথক আয়াসের বড় প্রয়োজন হইবে না।

আমরা পরিবর্ত্তনের যুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। স্বাধীন চিন্তা আমাদিগকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে। ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব, যাহা কিছু গৌরবের, ভয় হয় পাছে সংস্কারের নামে সে সমস্ত হারাইয়া বসি। রক্ষণশীলতার দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু নবভাব প্রবর্ত্তন চেষ্টার ভিতরে যে একটি অস্থিরতা আসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে আমাদের মত ভাব-প্রধান জাতির অন্তঃসারশূন্য হইবার আশঙ্কা রহিয়া যায়।

ত্যাগের উপরেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অভ্যাস-যোগেই ধর্ম্ম জীবনে বদ্ধমূল হয়। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপে, আত্মীয় স্বজনের আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে, দরিদ্র সেবায়, হৃদয়ের যে সদ্ভাবের বিনিময় হইত, যে ত্যাগের ধর্ম্ম সহজে অভ্যস্ত হইত, আমাদের ভিতরে সে অবসর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ত্যাগের স্থানে বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়া বসিতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতরে থাকিয়া যে স্বার্থত্যাগ সহজে অভ্যস্ত হইত, যে সাম্যভাবের শিক্ষা মিলিত, শিক্ষিতের মধ্যে তাহাও লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। আভিজাত্যের ভিতরে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মুর্খের বিচার ছিল না। এখন ধন-ঐশ্বর্য্য নব-আভিজাত্যের সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের ভিতরে হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে জাতি-নিরপেক্ষ যে একটি সদ্ভাব ও বাধ্যতার বন্ধন ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আমরা সংস্কার চাই ঠিক, কিন্তু সংস্কার কার্য্য ধীরগতিতে সদয়ভাবে সুসম্পন্ন হইলে জনসাধারণ তাহাতে সত্য সত্যই লাভবান হয়। বিচ্ছেদজনিত শুষ্কতা কাহাকেও অনুভব করিতে হয় না।

আমরা গতিবেগে চলিয়াছি কিন্তু স্মরণে রাখিতে হইবে তিনিই আমাদের পরম গতি। তাঁহাকে জানাই তাঁহাকে পাওয়া; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" ব্রহ্মবিৎই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। আমরা যতই কেন মান ঐশ্বর্য্য প্রভৃত সম্পত্তি লাভ করি না, আমরা চির-দরিদ্র যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে লাভ করি; কেন না তিনিই আমাদের পরম সম্পদ। তাঁহাকে পাইলেই আমাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি। শূন্য সে গৃহ, শূন্য সে পরিবার, যেখানে তাঁহার স্থান নাই। শূন্য সে হৃদয়, যেখানে তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই; নিরানন্দময় সে জীবন, উৎসবহীন সে প্রাণ, যাহার বীণার তারে তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত না হয়। অর্থহীন সে সংস্কার, যাহা আমাদিগকে তাঁহার পথের পথিক করিয়া না দেয়, তাঁহার দ্বারের ভিখারী করিয়া না তোলে। ব্যর্থ সে সংস্কার, যাহা এদেশের উজ্জ্বল অতীতের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সে সংস্কার চাহি না, যাহা ধর্ম্মকে জীবনে ভাসা-ভাসা করিয়া তোলে, এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গ করিতে চায়। আমরা নিবিড় প্রেমের পক্ষপাতী। তাঁহার নামে আজ আমাদের এই উৎসব; ব্রাহ্মসমাজের নামে আমাদের এই আয়োজন; একেশ্বরবাদের নামে আমাদের এই সম্মিলন। আজ তাঁহার বিশেষ কৃপা আমাদের উপর অবতীর্ণ হউক। আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুক। তাঁহার সহিত আমাদের হৃদয়ের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হউক। হোমশিখার ন্যায় আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি, নিষ্ঠা-প্রেমের ধারা তাঁহার প্রতি অচঞ্চল হউক, জীবনের গতি আমাদিগকে তাঁহারই সমীপস্থ করুক, ইহাই আজ আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

গীতা-রহস্য।

কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

অহিংসা ও সত্য—ইহাদের সম্বন্ধেই যদি এত বাদানুবাদ, তবে যে তৃতীয় সাধারণ তত্ত্ব অস্তেয়, তাহার সম্বন্ধেও যে এই যুক্তি প্রয়োগ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? একজনের ন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি অন্যেরা যদি অবাধে চুরী বা লুট করিতে পায়, তাহা হইলে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়া সকলেরই ক্ষতি হইবে,—ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ,—মূল্য দিয়া, মজুরী করিয়া, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না—এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে পর, যদি কেহ চুরী করিয়া আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি পাপী ঠাওরাইবে? ১২ বৎসর ধরিয়া অকাল পড়ায়, বিশ্বামিত্রের নিকট এইরূপ এক কঠিন প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুক্কুর-মাংসের ঠ্যাং চুরী করিয়া সেই অভক্ষ্য অন্নে স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। "পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" (মনু, ৫,১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা করিয়া অভক্ষ্যভক্ষণ—ও তাহা চুরি করিয়া ভক্ষণ—না করিবার জন্য, শাস্ত্রপ্রমাণের উপর ভর করিয়া অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু—

পিবন্ত্যেবোদকং গাবো মণ্ডুকেষু রুবৎস্বপি।
ন তেঽধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ॥

"ওরে! ভেকেরা ডাকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপ কর্! আমাকে ধর্ম্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে" এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্র তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন। "জীবিতং মরণাৎশ্রেয়ো জীবন্ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ"—"বাঁচিলে তবে ধর্ম্ম লাভ হয়, অতএব জীবন মরণাপেক্ষা শ্রেয়"—এই কথা বিশ্বামিত্র এই সময় বলিয়াছেন; এবং কেবল বিশ্বামিত্র নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ত্ত, বামদেব প্রভৃতি অপর অনেক ঋষিও এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনু উদাহরণ দিয়াছেন (মনু ১০, ১০৫, ১০৮)। হবস্ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ বলেন যে, "দুর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরী বা ডাকাতী করে তবে তাহার সে অপরাধ সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়।" † এবং মিল্‌ও লিখিয়াছেন এই অবস্থায় চুরী করিয়াও আপনার প্রাণ রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য!

"মরণ অপেক্ষা জীবন শ্রেয়" বিশ্বামিত্রের এই তত্ত্বটি কি সর্ব্বথা অব্যভিচারী? এই জগতে বাঁচিয়া থাকাটা কিছুই পুরুষার্থ নহে। বলি খাইয়া কাকেরাও অনেক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। তাই, বীরপত্নী বিদুলা আপন পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, শয্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া থাকা অপেক্ষা কিংবা গৃহে শতবৎসর ধুঁয়াইতে থাকা অপেক্ষা, মুহূর্ত্তকালের জন্য জ্বলিয়া উঠাও শ্রেয়—"মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরং" (সভা, উ, ১৩২, ১৫)। আজ নহে কাল, অন্তত শত বৎসরের মধ্যেও মৃত্যু যদি কাহাকেও না ভোলে, তবে তাহার জন্য ভীতি কিংবা আক্রোশ, ভয় কিংবা কান্না কেন? অধ্যাত্মশাস্ত্রানুসারে দেখিলে আত্মা নিত্য, তাহার কখনই মৃত্যু হয় না। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত যে শরীর সেই শরীরের কি হয়—এই প্রশ্নটার মীমাংসা বাকী থাকিয়া যায়। চলা-বলা করি-

* কুক্কুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর ৫টা নখ আছে, এইরূপ প্রাণীর মধ্যে (যাদের গায়ে কণ্টক আছে সেই) সজারু, শল্লক (সজারুর এক জাত) গোধা, কূর্ম্ম, শশক, এই পাঁচ প্রাণীর মাংস ভক্ষ্য—(এইরূপ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য) বলিয়াছেন (মনু ৫. ১৮.; যাজ্ঞ. ১ ১৭৭)। ইহা ব্যতীত মনু খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডারেরও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিকল্প আছে—এইরূপ টীকাকার বলেন। এই বিকল্প ছাড়িয়া দিলে, পাঁচ প্রাণীই থাকিয়া যায় এবং তাহাদের মাংসই ভক্ষ্য—এইরূপ "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"র—অর্থ। তথাপি মাংস খাইবার যাহার অনুমতি আছে, সে উল্লিখিত প্রাণীর মাংস ছাড়া অপর পাঁচনখী প্রাণীর মাংস খাইবেক না, এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে. উহাদের মাংস খাইবেই এরূপ বিধান নাই,—মীমাংসক ইহার এইরূপ অর্থ করেন। এই পারিভাষিক অর্থকে তিনি "পরিসংখ্যা" এই নাম দিয়াছেন। "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ"—ইহাই এই পরিসংখ্যার মুখ্য উদাহরণ। মাংস খাওয়াটাই যদি নিষিদ্ধ বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে।

† Hobbes' Leviathan, Part II Chap XXVII. P. 139 (Morley's Universal Library Edition)—"Thus, to save a life, it may not only be allowable but a duty to steal &c."

তেছে এই যে শরীর ইহা নশ্বর, কিন্তু আত্মার কল্যাণার্থ যাঁহা কিছু এজগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার এক সাধন; তাই মনুও বলিয়াছেন,—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" ধন, দারা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে সতত রক্ষা করিবে। (মনু ৭, ২১৩)। তথাপি এই দুর্লভ অথচ নশ্বর মানবদেহ বিসর্জ্জন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক শাশ্বত কোন বস্তু যদি কখন লাভ করিতে হয় তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, কিংবা দাবী বজায় রাখিবার জন্য, মানের জন্য, যশের জন্য অথবা সর্ব্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহাত্মাই অনেক প্রসঙ্গেই এই তীব্র কর্ত্তব্যবহ্নিতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত আহুতি দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেনু সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন দেহকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত দিলীপ—"আমার ন্যায় পুরুষদিগের পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়া থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়া দেখ্"—(রঘু, ২, ৫৭), এই কথা সিংহকে বলিয়াছিলেন, রঘুবংশে আছে; এবং সর্পের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জীমূতবাহন গরুড়কে আপনার দেহ অর্পণ করিবার কথা কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০, ২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন:—

> ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ।
> বিশুদ্ধস্য হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমঃ কিল॥

"আমি মরণে ভীত নহি; কেবল যশ দূষিত হইয়াছে এই জন্যই আমি দুঃখিত। বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুত্রজন্মজনিত উৎসবের তুল্য।" এই তত্ত্ব সম্বন্ধে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের রক্ষণার্থ, শ্যেন পক্ষীর রূপধারী উক্ত কপোতের অনুধাবক ধর্ম্মকে নিজ শরীরের মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শত্রু যে বৃত্র—তাহাকে মারিবার জন্য দধীচি ঋষির অস্থি হইতে এক বজ্র পাইবার কথা ছিল,—তাই, সকল দেবতারা উক্ত ঋষির নিকট গিয়া—"শরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কর্ত্তুম অর্হতি"—"মহর্ষি, সর্ব্বলোকের কল্যাণার্থ আপনার দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পর, দধীচি ঋষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং দেবতাদিগকে আপন অস্থিদান করিলেন।

এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে (বন, ১০০.১৩১; শাং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজাত কবচ কুণ্ডল হরণ করিবার জন্য ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া দানশূর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুণ্ডল কাহাকে দান না করা হয়, সূর্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, "তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর কীর্ত্তি আছে, তথাপি কবচ-কুণ্ডল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহা কাহাকেও দিবি না।" কারণ মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি-কাজে লাগিবে? "মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং"? সূর্য্যের এই কথা শুনিয়া—"জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তৎবিদ্ধি মে ব্রতম্"—প্রাণ গেলেও কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে। কর্ণ তাঁহাকে এইরূপ খট্‌খটে জবাব দিয়াছিলেন (সভা, বন, ২৯৯.৩৮)। অধিক-কি, মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি ক্ষাত্রধর্ম্ম (গী, ২.৩৭) কিংবা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" (গী, ৩.৩৮) এই সিদ্ধান্তও ঐ তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আছে; এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই "কীর্ত্তি পাহোঁ জাতাঁ সুখ নাহি। সুখ পাহ তাঁ কীর্ত্তি নাহি॥" অর্থাৎ কীর্ত্তি দেখিয়া চলিলে সুখ নাই, সুখ দেখিলে কীর্ত্তি নাই। (দাস.১২,১০.১৮. ১০-২৫)। তাই, "দেহ ত্যাগিতাঁ কীর্ত্তি মাগে উরাবী। মনা সজ্জনা হেচি ক্রিয়া করাবী"॥ অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করিবার সময় কীর্ত্তি সম্মুখে রাখিবে, রে মন! সজ্জনদিগের এইরূপই আচরণ জানিবে। এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর উপদেশ আছে। কিন্তু পরোপকারের দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জিত হয় এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া গেলে কীর্ত্তি কি কাজে লাগিবে? অথবা মানী পুরুষেরা দুষ্কীর্ত্তি অপেক্ষা (গী,২.৩৪), কিংবা জীবন অপেক্ষা

পরোপকার অধিক প্রিয়—কেন মনে করিবে? এই প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিতে হইলে, অন্তরাত্মার আত্মবিচারক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই, এবং উত্তর দিলেও তথাপি কোন্ প্রসঙ্গে জীবের সম্বন্ধে উদার হওয়া উচিত, কোন্ প্রসঙ্গে অনুচিত তাহা বুঝিবার জন্য সেই সঙ্গে কর্ম্ম-অকর্ম্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রের বিচার করা আবশ্যক হয়। নচেৎ জীবের উপর উদার হইবার যশোলাভ দূরের কথা, মূর্খতা করিয়া আত্মহত্যা পাপের কোঠায় আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি বন্দ্য ও পূজ্য পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সেবা করা—ইহাও সাধারণ ও সর্ব্বমান্য ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুম্বদিগের, গুরুকুলের কিংবা সমস্ত সমাজেরও ঠিক্ ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই শুধু স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নহে, উপনিষদের "সত্যং বদ ধর্ম্মং চর" এইরূপ বলিয়া তাহার পর আছে "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।" এইরূপ শিষ্যের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেলে পর প্রত্যেক গুরু তাহাকে উপদেশ করিতেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ, ১.১১.১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ আখ্যানের ইহাই তাৎপর্য্য (বন.২১৩)।

কিন্তু ধর্ম্মেতেও কতকগুলি অকল্পিত, কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে—

উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্যঃ আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রং তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥

অর্থাৎ "দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য, শত আচার্য্য অপেক্ষা পিতা ও সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক" এইরূপ মনু বলেন (২.১৪৫)। তথাপি মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরশুরাম তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথা প্রসিদ্ধ আছে (বন, ১১৬.১৪); এবং শান্তিপর্ব্বে চিরকারিকোপাখ্যানে (শাং,২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা শ্রেয়স্কর কিংবা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা শ্রেয়স্কর—ইহার তারতম্যের অনেক সাধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে এইরূপ সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ-সমূহের নীতি নীতিশাস্ত্রদৃষ্টিতে মীমাংসা করিবা র প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। পিতার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাঁহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্তু উপরে মাতা সম্বন্ধে যে নীতি কথিত হইল, তাহা পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন প্রযুক্ত হইবার সময় আসিতে পারে। তাহার উদাহরণ যথা—পুত্র আপন পরাক্রমে রাজা হইলে পর, পিতার অপরাধের বিচার নিষ্পত্তির জন্য তাহার সম্মুখে আসিল, তখন রাজা এই সূত্রে তাহার বাপকে শাসন করিবে কিংবা বাপ বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? মনু বলেন:—

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে নতিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ—"পিতা আচার্য্য, মিত্র, মাতা, পত্নী, পুত্র কিংবা পুরোহিত যেই হউক না কেন, যদি সে আপন ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে অদণ্ড্য নহে, অর্থাৎ উচিত শাসন করা রাজার কর্ত্তব্য" (মনু, ৮. ৩৩৫; সভা, শাং, ১২১, ৬০)। কারণ, এইস্থলে পুত্রধর্ম্মাপেক্ষা রাজধর্ম্মের ঔচিত্য অধিক। এই নীতি অনুসারে মহাপরাক্রমী সূর্য্যবংশীয় সগর রাজা, আপন দুরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজাবর্গকে কষ্ট দিতেছে দেখিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (সভা, ব, ১০৭; রামা, ১,৩৮)। মনুস্মৃতিতেও এইরূপ এক কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক ঋষির অল্প বয়সে উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মামা, প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; তখন অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গুরু প্রায়ই যাহা বলিয়া থাকেন সেইরূপ কোন এক প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে তাঁহাদিগের উদ্দেশে "পুত্রগণ" এই শব্দটা সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।—"পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্।" কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল বৃদ্ধেরা অতিশয় রুষ্ট হইয়া, "ছোঁড়াটার

ভারী দেমাক্ হইয়াছে” ঠাওরাইলেন। এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট নালিস করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া “আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছে তাহা ন্যায্য”—এইরূপ বিচার-নিষ্পত্তি করিলেন। কারণ—

> ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
> যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

অর্থাৎ চুল পাকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুবা হইয়াও যে অধীয়ান্ তাহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন” (মনু, ২. ১৫৬; সেইরূপ সভা, বন, ১৩৩, ১১; শল্য, ৫১. ৪৭ দেখ) শুধু মনু ও ব্যাস নহে বুদ্ধদেবও এই তত্ত্ব মান্য করিয়াছিলেন। কারণ, মনুসংহিতার উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ ‘ধম্মপদ’ * নামে প্রসিদ্ধ নীতিপর পালী বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে (ধর্ম্মপদ ২৬০); পরে ঐ গ্রন্থে,—“কেবল বয়সেই যে পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন ব্যর্থ এবং প্রকৃত ধার্ম্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংসা ইত্যাদি সদগুণ নিতান্তই আবশ্যক” এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং ‘চুল্লবগ্‌গ’ নামক অপর গ্রন্থে, ধর্ম্মনিদর্শনকারী ভিক্ষু তরুণবয়স্ক হইলেও স্বতঃ উচ্চ আসনে বসিয়া, আপনার পূর্ব্বে দীক্ষিত বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এইরূপ বুদ্ধেরা অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্য ৬, ১৩০ দেখ) প্রহ্লাদ আপন পিতা যে হিরণ্যকশিপু তাহার অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন—এই পৌরাণিক কথা সর্ব্ববিশ্রুত আছে; এবং সেই সম্বন্ধে শুধু ছোট বড় বয়সের হিসাবে নহে, পরন্তু পিতাপুত্রের সর্ব্বমান্য সম্বন্ধেতেই কখন কখন আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া পিতৃ পুত্র সম্বন্ধ ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে হয়—এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হইলেও, এই নিয়ম যথাসম্ভব উপস্থিতক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কোন ছোট ছেলে আপন বাপকে যদি গালি দেয় তবে আমরা সেই ছেলেকে পশুর মধ্যে গণনা করি না কি? “গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ” (শাং, ১০৮, ১৭) মা বাপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। কিন্তু “মরুত্ত” রাজার গুরু “লোভী” স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিলে পর মরুত্ত—

> গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
> উৎপথপ্রতিপন্নস্য ন্যায্যং ভবতি শাসনম্॥

“কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায়সঙ্গত” এইরূপ উচ্ছ্বাসবাক্য বাহির করিয়াছেন, এইরূপ মহাভারতে কথিত হইয়াছে। মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে (সভা, আ. ১৪২. ৫২. ৩; ১৭৮, ২৪; শাং, ৫৭, ৭; ১৪০, ৪৮)। তন্মধ্যে প্রথম স্থানের পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থলে চতুর্থ চরণ বাদে “দণ্ডী ভবতি, শাশ্বতঃ” কিংবা “পরিত্যাগো বিধীয়তে”—এইরূপ পাঠান্তর আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের যে স্থানে (রামা, ২, ২১. ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একই অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাওয়া যায় বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছি। ভীষ্ম পরশুরামের সহিত এবং অর্জ্জুন দ্রোণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা এই তত্ত্বেরই বনিয়াদে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রহ্লাদের গুরু যখন প্রহ্লাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন তখন এই তত্ত্বের বনিয়াদেই প্রহ্লাদ তাঁহাকে নিষেধ করেন। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম স্বতই শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিতেছেন যে, গুরু পূজ্য সত্য, কিন্তু তাঁহারও নীতির মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য; নচেৎ—

> সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
> নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ঃ স হি ধর্ম্মবিৎ॥

“হে কেশব, মর্য্যাদা, নীতি, কিংবা শিষ্টাচার যাহারা পালন করে না সেই লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহা-

---

* “ধম্মপদ” এই গ্রন্থের ইংরাজী ভাষান্তর Sacred Books of the East (প্রাচ্য ধর্ম্মপুস্তকমালা) Vol X—ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে · চুল্লবগ্‌গার ইংরেজি ভাষান্তর-মালার Vol XVII ও XX এর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মারাঠী:তে ও.রা, রা, যাদব রাও বাবা:দের ধম্মপদের ভাষান্তর করিয়াছেন—তাহা কোহ্লাপুরের গ্রন্থমালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। ধম্মপদের পালী শ্লোকটী নিয়ে দিতেছি :—

> ন তেন থেরো হোতি যেনস্স পলিতং সিরঃ।
> পরিপক্কো বয়ো তস্স মোঘজিন্নো তি বুচ্চতি॥

“থের” এই শব্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়—উহা সংস্কৃত ‘স্থবিরের’ অপভ্রংশ।

দিগকে বধ করে তাহারা ধর্ম্মজ্ঞ।" (শাং, ৫৫, ১৬)। সেইরূপ, তৈত্তিরীয়োপনিষদেও "আচার্য্য-দেবো ভব" এইরূপ প্রথম বলিবার পর, পরে তৎক্ষণাৎ—আমাদের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অনুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ করিবে—"যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়ো পাস্যানি। নো ইতরাণি।"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ, ১, ১১, ২)। এই সম্বন্ধে, পিতৃদেব কিংবা আচার্য্যদেব হইলেও, বাপ কিংবা গুরু সুরা পান করেন বলিয়া তুমি সুরা পান করিও না, কারণ, নীতিমর্য্যাদার কিংবা ধর্ম্মের অধিকার,—মা বাপ গুরু, প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান এইরূপ উপনিষদের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। "ধর্ম্ম পালন কর, ধর্ম্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, ধর্ম্ম তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না"। মনু এইরূপ যে সকল বিধান করিয়াছেন, তাহার অন্তর্নিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮,১৪-১৬)। রাজা ত গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—একরূপ দেবতা (মনু, ৭,৮, ও সভা, শাং, ৬৮, ৪০)। কিন্তু তাঁহাকেও ধর্ম্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হন এইরূপ মনুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে বেন ও খনীনেত্র এই দুই রাজার আখ্যানে এই অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭,৪১ ও ৮, ১২৮; সভা, শাং, ৫৯.৯২,১০০, ও অশ্ব, ৪ দেখ)।

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়—ইহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহও সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে (মনু, ১০,৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ এই সমস্ত মনুষ্যের শত্রু হওয়ায়, প্রত্যেকে উহা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে তাহার কিংবা সমাজেরও কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ সকল শাস্ত্রেই আছে; বিদুরনীতি ও ভগবদ্গীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

অর্থাৎ—"কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় উহাদিগকে ত্যাগ করিবেক" (গীতা, ১৬.২১; সভা. উ,৩২,৭০)। কিন্তু গীতাতেও ভগবান্ "ধর্ম্মাঽবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ"—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, প্রাণী-দিগের মধ্যে, ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭, ১১) এইরূপ আপন স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মের বিরুদ্ধ যে কাম সে নরকেরই দ্বার, উহা ব্যতীত অন্য প্রকারের কাম ভগবানের নিকট মান্য এইরূপ এই সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মনুও "পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জিতৌ"—অর্থাৎ ধর্ম্মবর্জ্জিত যে অর্থ কাম তাহা পরিত্যাগ করিবে—এইরূপ বলিয়াছেন। (মনু, ৪,১৭৬)। সর্ব্ব প্রাণী কল্য যদি কাম-মহারাজকে একেবারে ছুটি দিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে ৫০ বৎসর কিংবা খুব বেশী ১০০ বৎসরের মধ্যেই সমস্ত জীবসৃষ্টির লয় হইয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, এবং যে সৃষ্টি উৎসন্ন না হয় বলিয়া সময়-মত ভগবান্ অবতার ধারণ করেন, স্বল্পকালের মধ্যেই সেই সৃষ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কাম ও ক্রোধ এ দুই শত্রু বটে, কিন্তু কখন্? সংযত করিয়া না রাখিলে তবেই। সৃষ্টির ক্রমগতির উচিত সীমার মধ্যে উহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে, এই বিষয়ে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগেরও সম্মতি আছে (মনু, ৫,৫৬)। এই প্রবল দুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে রাখিলে, উহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

অর্থাৎ—"এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না; উহা মনুষ্যের স্বভাবতই হইয়া থাকে। এই তিনের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহাদিগকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংযত করিয়া, সুব্যবস্থিত করিবে; এই কারণেই, বিবাহ, সোম যাগ ও সৌত্রামনী যজ্ঞ—ইহাদের অনুক্রম শাস্ত্রকারেরা যোজনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও "নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম আচরণই ইষ্ট হয়"—এইরূপ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১,৫,১১)। 'নিবৃত্তি' এই শব্দের, পঞ্চমী-অন্ত পদের সহিত সম্বন্ধ থাকায় "অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম সর্ব্বথা ত্যাগ করা" এইরূপ যদি অর্থ হয় তথাপি কর্ম্ম যোগে 'নিবৃত্ত' এই বিশেষণ কর্ম্মের সম্বন্ধেই

প্রয়োগ হওয়ায় 'নিবৃত্ত কর্ম্ম' অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম—এইরূপ এই পদের অর্থ ইহা যেন এইখানে মনে রাখা হয়; এবং ঐরূপ অর্থ মনুস্মৃতি ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ১২,৮৯; ভাগ, ১১,১০,১ ও ৭,১৫,৪৭ দেখ)। ক্রোধ সম্বন্ধে বলিবার সময় ভারবি কিরাত কাব্যে এইরূপ বলিতেছেন—

অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ॥

অর্থাৎ—অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই বা কি, দ্বেষই বা কি—দুই সমান! ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে দেখিতে গেলে—

এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী।
ক্ষমাবান্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥

অর্থাৎ—"অন্যায় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহ্য হয় সেই পুরুষ; যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। এইরূপ বিদুল বিবৃত করিয়াছেন (সভা, উ, ১৬২, ৩৩)। জগতের ব্যবহারে, সব-সময় ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সব সময় ক্ষমাও উপযোগী নহে—ইহাই উপরে কথিত হইয়াছে। লোভের সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ, সন্ন্যাসী হইলেও মোক্ষের বাসনা সে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে মোক্ষলাভ করিতেই হয়!

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণের পরস্পর-বিরোধ ব্যতীত দেশ-কালাদির সীমাও তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, এইরূপ ব্যাস, মহাভারতের অনেক স্থানে বিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে কোন সদ্‌গুণই হউক না কেন, উহা সর্ব্বপ্রসঙ্গেই উপযোগী হইবে এরূপ নহে। ভর্তৃহরি বলেন—

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।

অর্থাৎ "বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার সময়) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌর্য্য—ইহাই সদ্‌গুণ" (নীতি,৩৬)। শান্তির সময় উত্তরার মত বড় বড় করিয়া বকিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু গৃহে স্ত্রীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অধিক থাকিলেও রণাঙ্গনে প্রকৃত ধনুর্ধর বীর দুই একজনই বাহির হয়! ধৈর্য্যাদি গুণ, উপরি উক্ত সময়ে শোভা পায়; শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ছাড়া তাঁহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। ক্ষণিকের নর্ম্মসুহৃৎ অনেক আছে; কিন্তু "নিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ"—সঙ্কটকালই তাহাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি-পাথর। 'প্রসঙ্গ' এই শব্দের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রাদি বিষয়েরও সমাবেশ হয়। সমতা অপেক্ষা অন্য কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নহে। "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—ইহা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, এইরূপ ভগবদ্‌গীতা স্পষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু সমতার অর্থ কি? কোন ব্যক্তি, যোগ্যতা না দেখিয়া সকলকেই সমান দান করিতে থাকিলে আমরা তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্ব্বোধ বলিব? ভগবদ্‌গীতাতেই "দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ—দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয় তাহাই সাত্ত্বিক দান (গীতা ১৭,২০) এইরূপে এই প্রশ্নের নির্ণয় করা হইয়াছে। কালের সীমা শুধু বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তই, এরূপ নহে। কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্ম্মেতেও পার্থক্য আসিয়া পড়ে, এবং তাহার দরুণ কোন প্রাচীনকালের বিষয়ের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে হইলে, তৎকালীন ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ধারণার বিচার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

"যুগ-মান অনুসারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি ইহাদের ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে," এইরূপ মনু (১,৮৫) ও ব্যাস বলিয়াছেন (সভা, শাং, ২৫৯,৮)। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সীমা না থাকায় তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও অসংযত হইত, কিন্তু পরে এই আচারের দুষ্পরিণাম নজরে আসিলে পর, শ্বেতকেতু বিবাহের সীমা স্থাপন করিলেন (সভা, আ, ১২২) এবং সুরাপান সম্বন্ধে নিষেধ শুক্রাচার্য্য প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, এইরূপ কথা মহাভারতেও বর্ণিত হইয়াছে (সভা, আ, ৭৬)। সুতরাং এই নির্ব্বন্ধ যে সময়ে আমলে আইসে নাই সেই সময়কার ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার পরবর্ত্তীকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীতিতে করা আবশ্যক; বর্ত্তমানকালের ধর্ম্ম যদি পরে বদল

হয় তবে সেই অনুসারে ভবিষ্যৎকালের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনাও বিভিন্ন ধরণে করা যাইবে। কালমান অনুসারে দেশাচার, কুলাচার কিংবা জাতিধর্ম্মও এই বিষয়ে ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে হয়; কারণ, আচারই সর্ববধর্ম্মের মূল। তথাপি আচার বিচারাদির মধ্যেও মিল না থাকায়—

> ন হি সর্ব্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
> তেনৈবান্যঃ প্রভবতি সোঽপরং বাধতে পুনঃ॥

সকলের সব সময়ে এক রকমই হিতকর—এরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। "এক আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তাহা আবার তৃতীয়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে" (শাং, ২৮৯, ১৭, ১৮), এইরূপ আচার-ভেদের বর্ণনা করিয়া আচার অনাচারের মধ্যেও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ ভীষ্ম বলিয়াছেন।

সে যাক্। কর্ম্মাকর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত সংসারের সমস্ত সমস্যা এইরূপে সমাধান করিতে বসিলে দ্বিতীয় মহাভারত লিখিতে হয়। গীতার আরম্ভে ক্ষাত্রধর্ম্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই দুয়ের মধ্যে জুঝাযুঝি করিয়া অর্জ্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা অ-লোকসাধারণ অবস্থা নহে, ঐরূপ অবস্থা সংসারে কর্তৃপুরুষদিগের ও মহাত্মা ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার পর কখন অহিংসা ও আত্মরক্ষণ, কখন সত্য ও সর্ব্বভূতহিত, কখন দেহসংরক্ষণ ও যশ, কখন বা ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধসূত্রে উপস্থিত কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত সাধারণ ও সর্ব্বমান্য নীতি নিয়মের দ্বারা কর্ম্মের বিভাগ না হওয়ায়, উহাদিগের অনেক অপবাদ বা ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়; এবং সাধারণ মনুষ্যের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও এইরূপ স্থলে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি—অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নির্ণয় করিবার কোন স্থায়ী পদ্ধতি কিংবা যুক্তি আছে কি নাই ইহা জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতই হইয়া থাকে—এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য উপরি লিখিত বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের মত সঙ্কটকালে 'আপদ্ধর্ম্ম' বলিয়া শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথা বলা হইয়াছে সত্য। দৃষ্টান্ত যথা—আপৎকালে ব্রাহ্মণ যে-কোনস্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন তাহাতে দোষ বর্ত্তে না এইরূপ স্মৃতিকারেরা বলিয়াছেন। উষস্তি চাক্রায়ণ তদনুসারে আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ৩, ৪১; ছাং ১, ১০)। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ ও উপরের প্রসঙ্গ এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। দুষ্কালের মত প্রসঙ্গে শাস্ত্রধর্ম্ম ও ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া ইন্দ্রিয়গণ একদিকে ও শাস্ত্রধর্ম্ম অন্যদিকে টানিয়া থাকে। কিন্তু উপরে যে সকল প্রসঙ্গ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই। শাস্ত্রবিহিত এইরূপ দুই ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ ঘটিলে, ইহা করিব কি উহা করিব—তাহার সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক হয়; এবং ইহার মধ্যে কোন বিষয়ের নির্ণয়, পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু পুরুষেরা এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে সাধারণ মনুষ্যের নিজ বুদ্ধিতে করিবার মত হইলেও অন্য প্রসঙ্গে বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। কারণ, যতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক নিষ্পন্ন হইয়া শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হইয়া পড়ে; এবং যোগ্য নির্ণয় না হইলে, আমাদের দ্বারা অধর্ম্ম কিংবা অপরাধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনাই এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া উহা ন্যায়, ব্যাকরণাপেক্ষাও গভীর, এইরূপ মনে হয়। 'নীতিশাস্ত্র' এই শব্দ পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয়; তাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শাস্ত্রকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলাই প্রাচীন পদ্ধতি। কিন্তু 'নীতি' এই শব্দে কর্ত্তব্য কিংবা সদাচরণ এই অর্থও গৃহীত হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের এই বিচার আলোচনাকে 'নীতিশাস্ত্র' এইরূপ এই গ্রন্থে আমি বলিয়াছি। নীতি, কর্ম্মাকর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সংক্রান্ত এই শাস্ত্র অতি গভীর, ইহা দেখাইবার জন্যই "সূক্ষ্মাগতির্হি ধর্ম্মস্য"—ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক নীতিধর্ম্মের স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম—এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পঞ্চপাণ্ডব এক দ্রৌপদীর সহিত বিবাহ কেমন করিয়া

করিলেন ? দ্রোপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভীষ্ম দ্রোণাদি শূন্যহৃদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বসিয়া রহিলেন ? কিংবা দুষ্ট দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময় ভীষ্ম দ্রোণাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ"—পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে (সভা, ভী, ৪৩, ৩৫) এই তত্ত্বটি ঠিক্ না ভুল ? যখনই হোক্ না কেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা" (মনু, ৪০৬) সেবাধর্ম্ম যদি কুক্কুরবৃত্তির ন্যায় গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত হয় তবে অর্থের দাস না হইয়া ভীষ্মাদি কৌরবেরা দুর্য্যোধনের সেবাও কেন পরিত্যাগ করেন নাই ?—ইত্যাদি প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কারণ, এইরূপ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য প্রসঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান কিংবা নির্ণয় করিয়া থাকে। "সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য" (সভা, অনু, ১০, ৭০) ধর্ম্মের তত্ত্ব সূক্ষ্ম, শুধু তাহাই নহে, পরে "বহুশাখা হ্যনন্তিকা"—তাহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা বাহির হওয়ায়, তাহা হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন হইয়া থাকে,—এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (বন, ২০৮, ২)। তুলাধার-জাজলি সংবাদে তুলাধারও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করিবার সময়, "সূক্ষ্মত্বান্ন স বিজ্ঞাতুং শক্যতে বহুনিহ্নবঃ"—ধর্ম্ম সূক্ষ্ম ও অতীব জটিল হওয়ায় অনেক সময় জানা যায় না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (শাং, ২৬১, ৩৭)। মহাভারতকার এই সূক্ষ্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকায়, এইরূপ প্রসঙ্গে প্রাচীন মহাত্মারা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার জন্যই মহাভারতে বিভিন্ন উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র-রীতি-অনুসারে সমস্ত বিষয়ের বিচার করিয়া তাহার সাধারণ মর্ম্ম মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থে কোথাও না কোথাও বলা আবশ্যক হইয়াছিল। এই মর্ম্ম, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যমোহ অপসারিত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতায় প্রতিপাদিত করিয়াছেন ; এবং তাহার দরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে এবং মহাভারতও গীতাপ্রতিপাদিত মূলভূত কর্ম্মতত্ত্বসমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। গীতাগ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ যাঁহারা করেন, তাঁহারা আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। অধিক কি, গীতা-গ্রন্থের যদি কিছু অপূর্ব্বতা অর্থাৎ বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই। কারণ, শুধু মোক্ষশাস্ত্রের অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদক উপনিষদাদি এবং অহিংসাদি সদাচরণের শুধু নিয়ম-উপদেষ্টা স্মৃতিশাস্ত্রাদি অনেক থাকিলেও বেদান্তের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের বনিয়াদে, 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি' প্রবর্ত্তক গীতার ন্যায় অপর প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্ত্তমানে সংস্কৃত বাঙ্ময়ে (সাহিত্যে) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতি' এই শব্দ আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহা গীতাতেই আছে (গীতা, ১৬, ২৪),—এ কথা গীতাভক্ত-দিগকে বলা বাহুল্য। ভগবদ্গীতার ন্যায় যোগ-বাশিষ্ঠেও, বশিষ্ঠ রামকে জ্ঞানমূলক প্রবৃত্তি-মার্গের চরম উপদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু গীতার পরে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বা অনুকরণ করা হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার যে অপূর্ব্বতা উপরে উক্ত হইয়াছে তাহার কোন বাধা হয় না। ইতি—কর্ম্মজিজ্ঞাসা সমাপ্ত।

প্রভাতী উপাসনা।

ভৈরবী—একতালা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

আজি এ মধুর প্রভাতবেলার
এ পূজা যাবেনা বিফলে ;
আকাশে বাতাসে কাননে সলিলে
তাহারি আভাস উছলে।

মন্দ সমীরে কুসুম গন্ধ
আসিছে বহিয়া একি আনন্দ
বিহগের গীতে ললিত ছন্দ
অন্ধ-আবেগে উথলে।

একিরে দিব্য আলোক হাসি
একি অসহ্য পুলক রাশি
মোহজড়তাতন্দ্রা বিনাশি'
পূর্ব্ব গগনে উজলে।

ইঙ্গিত কার উদ্ভাসি উঠে
সঙ্কেত কার শিহরিয়া ফুটে
একি তরঙ্গ উছলি ছুটে
পরাণ-প্রবাহ অতলে।

সার্থক আজি আয়োজন যত
সুন্দর আজি জীবন-ব্রত
আজিকে পূর্ণ যত মনোরথ
প্রণমি চরণ কমলে।

সারনাথ।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

সারনাথ বৌদ্ধতীর্থ; ইহা কাশী হইতে চারি মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে বৌদ্ধদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। বুদ্ধদেব গয়ায় বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নবধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। সন্তপ্ত নরনারী চতুর্দ্দিক হইতে আকুল প্রাণে ছুটিয়া আসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া নির্ব্বাণসুধা পান করিয়া হৃদয় মন সুশীতল করিয়াছিল। সারনাথ বৌদ্ধ মহাতীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। এখানে কাশীর পুরাতন বৌদ্ধ শিল্পকলারীতির যে সকল অনিন্দ্যসুন্দর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিবার জন্য বিগত ১৩২০ সালের ১৯শে আশ্বিন রবিবার দ্বিপ্রহর ২টার সময় গোধূলিয়ার গাড়ীর আড্ডা হইতে একখানি এক্কাগাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হই। চলিতে চলিতে সারনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে একটি মুণ্ডিতশীর্ষ স্তূপ দেখিতে পাইলাম। ইহাই বিখ্যাত ধামেকস্তূপ। * * * * এখানে একটি মন্দিরে হিন্দুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সারনাথ মহাদেব দেখিতে চলিলাম। একটি উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর সুন্দর একটি শিবমন্দির; মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গরূপী মহাদেব স্থাপিত। সম্ভবতঃ সারনাথে বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্য হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরসংলগ্ন সুবৃহৎ 'সারঙ্গ তলাও' জলাশয় সারনাথ অঞ্চলে দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতর। এই স্থানের নির্ব্বাক্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে এক্কাওয়ালা আমাকে ধামেকস্তূপের নিকটবর্ত্তী একটি মাঠের ধারে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। মাঠ অতিক্রম করিয়া ধামেকস্তূপ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের সুবৃহৎ প্রাঙ্গনের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। এই স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দ্দিক একদিন বৌদ্ধধর্ম্মের বিশ্ববিজয়-গৌরব ও মহিমার ছটায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই স্বর্ণযুগের যাহা কিছু সম্পৎ সকলি গিয়াছে, বিস্মৃতির অতলগর্ভে সকলি ডুবিয়া গিয়াছে. অতীতের শ্লাঘাময়ী স্মৃতির শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূগর্ভে সমগ্র বৌদ্ধ সহরটি বসিয়া গিয়াছিল, আজ সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতার বহু পুরাতন লীলাভূমি, বহুযুগের বহু বিপ্লবের চিতাভস্মাচ্ছন্ন মহাশ্মশান পাশ্চাত্য সুধীমণ্ডলীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে সারনাথের প্রাচীন নাম 'ঋষিপত্তন মৃগদাব' (ইতিপতন মিগদায়) উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, মৃগদাবে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এখানে তিনি পূর্ব্বজন্মে মৃগদিগের রাজা রূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্ভবত ইহা হইতেই এই স্থানের নাম মৃগদাব বা মৃগদিগের বন বলিয়া কথিত হইয়াছে। চীনদেশের সাহিত্যে ও দিব্যাবদানে 'ঋষিবদন' বলা হইয়াছে। ইচিঙ্গ (It-sing) ঋষিপত্তনকে ঋষির পতনরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ফাহিয়ান্ লিখিয়াছেন যে পঞ্চ প্রত্যেক বুদ্ধ (পঞ্চ পচ্চেক বুদ্ধে) 'ঋষিপতন' এই নামের প্রণেতা। ফরাসী পণ্ডিত সেনারের (E. Senart) মতে সারনাথের নাম ঋষিপত্তন ছিল, কালক্রমে তাহা অপভ্রষ্ট হইয়া ঋষিপতন হইয়াছে। মহাবস্তুতে আছে 'ঋষিবদনস্মিং', আবার ইহাতে ঋষিপত্তনেরও উল্লেখ আছে যথা,—'মৃগাণাং দায়ো দিন্ন মৃগদায়েতি ঋষিপত্তনো' অর্থাৎ মৃগদিগকে দান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম 'মৃগদায় ঋষিপত্তন।' ইচিঙ্গ প্রভৃতি চীন দেশীয় লেখকগণ মৃগদায়ের অনুবাদ করিয়াছেন, 'শি-লুয়ে' বা শিলুলিন' অর্থাৎ মৃগদিগকে প্রদত্ত বনভূমি।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সারনাথের বর্ত্তমান খননক্রিয়া

আরম্ভ হয়। এই কার্য্যের দ্বারা বিলুপ্ত বৌদ্ধস্তূপ, মন্দির, মঠ, মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৭৯৪খৃষ্টাব্দে কাশীর রাজা চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ একটি বাজার (বর্ত্তমান জগৎগঞ্জ মহল্লা) নির্ম্মাণ করিবার জন্য ধামেকস্তূপ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত পশ্চিমে একটি স্থান খনন করাইয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক প্রভৃতি বাহির হয়। ইহাই হইল খননের সূত্রপাত। এইস্থানে একখানি প্রস্তর-ফলক পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত ফলকে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে গৌড়রাজ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে (৯৪৯ শক) বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূর এই পালবংশের শেষ রাজাকে পরাভূত করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ এদিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল সি, মেকেঞ্জী এই সব ভগ্নাবশেষ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি প্রতিকৃতি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীকে উপহার দেন। ইহার পর জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বহু অর্থ ব্যয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খননক্রিয়া আরম্ভ করিয়া ধামেকস্তূপ, চৌখণ্ডী, মধ্যযুগের কতকগুলি মঠ, দেবমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করেন। কানিংহামের পর ১৮৪৮-৫২ খৃষ্টাব্দে মেজর কিটো (Major Kittoe) ধামেকস্তূপের চতুর্দ্দিকে বহুস্থান খনন করিয়া নানা মূর্ত্তি, স্তম্ভ প্রভৃতি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হর্ণ (Mr. C. Horn) এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর, কারনাক (Mr. R. Carnac) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও কিয়ৎপরিমাণে খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের আবিষ্কৃত মূর্ত্তি, স্তম্ভ, কতকগুলি কলিকাতা মিউজিয়ামে, কতকগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে এবং কতকগুলি কাশীর কুইনস্ কলেজে বিশৃঙ্খলভাবে রক্ষিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মাননীয় লর্ড কার্জ্জনের আদেশে পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ অরটেল (Mr F. O. Oertel) ও তাঁহার সহকারী কাশীর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরলোকগত রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে সারনাথের বহুস্থানে নিয়মমত খননক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইঁহাদের আশ্চর্য্য প্রতিভা ও গবেষণার ফলে অশোকস্তম্ভ এবং স্তম্ভোপরি চারিটি সিংহমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

আমি একজন সঙ্গী লইয়া ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলাম। কত প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তর নয়নগোচর হইল। একস্থানে দেখিলাম, একখানা ছোট চালাঘরের নীচে অর্দ্ধ-ভগ্ন একটি স্তম্ভ মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। ইহাই অশোক-স্তম্ভ। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারকাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক ইহা খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ অব্দে স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্তম্ভের নিম্নাংশ দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট এবং সমগ্র স্তম্ভটি ৫০ ফিট। এই স্তম্ভের উপরে চারিটি সিংহ * মূর্ত্তি। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র † চারিটি সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত। ইহার শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। 'কেহ কেহ বলেন, স্তম্ভগুলি পারস্য স্থাপত্যের অনুকৃতি; তাঁহাদের মতে মৌর্য্যযুগে ভারতের সভ্যতা পারস্য প্রভাবান্বিত ছিল। একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ, স্তম্ভশীর্ষে পশুর প্রতিকৃতি স্থাপন বা অঙ্কন প্রভৃতি আকেমেনি সাম্রাজ্যের পারসী অনুকরণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কিন্তু সারনাথ স্তম্ভ পারস্যের স্তম্ভ অপেক্ষা সুন্দর এবং সমধিক শিল্পনৈপুণ্য-পরিপূর্ণ। ভারতীয় স্থাপত্য কিসের আদর্শে গঠিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, গ্রীক অনুকরণে বৌদ্ধশিল্প গৌরবান্বিত। কিন্তু তাহাও ঠিক নয়। শুধু একটি অনুমান সাহায্যে ভারতশিল্পের প্রকৃত ধারণা হইতে পারে না। * * * * আমাদিগের বিশ্বাস

* বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ মার্শাল বলেন,—'They are wonderfully vigorous and true to nature and are treated with that simplicity and reserve which is the key note of all great master-pieces of plastic art.'

† 'এই ধর্ম্মচক্রের কারুকার্য্য এমন সুন্দর ও মনোরম যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা অনুভব করা যায় না। ইহার সমগ্র অংশ মসৃণ প্রস্তরে প্রস্তুত। অনেকটা দেখিতে ঠিক যেন মার্ব্বেল প্রস্তরের ন্যায়। কিন্তু বর্ণ শ্বেত নহে, ঈষৎ হরিদ্রাভ। তাহা আবার কৃষ্ণ বিন্দুতে পরিপূর্ণ। এমন মনোহর প্রস্তর অত্যল্পই দৃষ্ট হয়। * * ইহার গঠন প্রণালী ভূমণ্ডলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হালিকারনেসাস (Halicarnasus) নামক স্থানে যে প্রকার সিংহের কেশর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এই স্থানের সিংহের কেশরেও তদ্রূপ শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।' শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদের লিখিত 'ইসিপত্তন-মিগদাব' (ভারতবর্ষ—১৩২০, অগ্রহায়ণ সংখ্যা) প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

ভারতশিল্প বিদেশীয় প্রভাবের নিকট কোন প্রকারে ঋণী নহে।' *

মহারাজ অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ হইতে ২৩২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি ধর্ম্মসংঘের একত্ব রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের কিউরেটর (curator) মিঃ দয়ারাম সাহনী এম, এ সারনাথ-লিপির একটী সংস্কৃত পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই পাঠ ও অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। দেবা নাং পিয়ে পিয়দসি লাজা অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা।

২। এল এইরূপ আদেশ করিতেছেন।

৩। পাট লিপুতে যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চুংখো অর্থাৎ পাটলিপুত্রে সংঘমধ্যে কেহও ভেদ সংঘটন করিবে না।

৪। (ভিখু বা ভিখুনি বা) সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুস নি সংনংধাপয়িয়া আনাবাসসি (প)।

৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখু-সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে॥

(৪) ও (৫) অর্থাৎ ভিক্ষুই হউন বা ভিক্ষুণী হউন, যে কেহ সংঘে ভেদ আনয়ন করে, তাহাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইবে এবং ভিক্ষুনিবাস হইতে অন্যস্থানে বাস করাইবে। আমার এই শাসন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী-সংঘকে বিজ্ঞাপিত করিবে।

৬। হেবং দেবানাং পিয়ে আহা॥ হেদিসা চ ইকা লিপি তুফাকং তিকাং হুবা তি সংসলনসি লিখিতা॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তিকং লিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং চ যাবু।

৮। এতমেব সাসনং বিশ্বংসয়িতবে॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাত্তেপোসথায়ে।

৯। যাতি এতং এব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ॥ আবতকো চ তুফাকং আহালে।

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ং জনেন॥ হেমেব-সবেসু কোট-বিসবেসু এতেন।

১১। বিয়ং জনেন বিবাসাপয়াথা॥

অর্থাৎ—দেবগণের প্রিয় এইরূপে বলিতেছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন (লিপি), তোমাদের নিকটে থাকুক্—এই জন্য (তোমাদের) মিলিত হইবার স্থানে লিখিত (উৎকীর্ণ) হইয়াছে। (তোমরা) এই প্রকারই এক অনুশাসন উপাসকদিগের নিকট (নিমিত্ত) লিখাও (উৎকীর্ণ করাও), এবং উপাসকগণ এই লিপির মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রতি পর্ব্বদিবসে আসুক্; এবং প্রত্যেক পর্ব্বদিবসে মহামাত্রগণ প্রত্যেকেই নিয়মিতরূপে পর্ব্ব (উপোসথ) পালন জন্য এবং শাসনের মর্ম্ম গ্রহণ করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য আসিবেন।

তোমাদের অধিকার যতদূর (বিস্তৃত), ততদূর (এই আদেশ) ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য (অনুসারে) প্রচার করিবে। এবং প্রত্যেক দুর্গ ও প্রদেশ মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার করাইবে। *

হিউএন স্যাঙ্ ৭ম শতাব্দে এই অশোকস্তম্ভ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেল,—'অশোকস্তূপের নিকট জেড্ নামক মূল্যবান্ মর্ম্মর প্রস্তরের আভাযুক্ত ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে; উহার ভিতর হইতে অত্যুজ্জ্বল আলো বাহির হইয়া থাকে। যে কেহ ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত এ স্থানে প্রার্থনা করে, সে নিজ অভীষ্টানুরূপ ফল এই স্তম্ভগাত্রে দেখে। এই স্থানে বুদ্ধদেব জ্ঞানালোক লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন।' এই স্তম্ভ খনন করিবার সময় একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ছত্রদণ্ড, ছত্র ও একটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে ইহা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই ছত্রটী নূতন যাদুঘরে দেখিতে পাই।

ধামেকস্তূপ—প্রথমেই ধামেকস্তূপটী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখি। এই স্তূপ মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উপরিভাগ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টকগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই স্তূপ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে লিখিত আছে—'This stupa is a solid structure rising to a height of 104 feet above

* শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত অশোক পৃঃ ১৯২।

* অনুবাদটী 'অশোক-অনুশাসন' হইতে গৃহীত।

the paved terrace of the Jaina temple adjoining it, or 143 feet, if we include the foundations which lie buried underground. The lower part or basement is 93 feet in diameter and solidly built, the stones being secured together with iron cramps to a height of 37 feet above the terrace of the Jaina temple. The upper part of the structure is made of brickwork which was possibly originally faced with stone.' এই স্তূপটী ৪৩ ফুট্ উচ্চ পর্য্যন্ত চুনার প্রস্তরে গ্রথিত। ভূমি হইতে ২৪ ফুট্ উচ্চে স্তূপের চারিদিকে ৬ ফুট্ প্রশস্ত কারুকার্য্যময় ৮টী ফলক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ সিংহ এই ধামেকস্তূপের নিম্নাংশের কতক অংশ ভাঙ্গিয়াছিলেন। স্তূপের অভ্যন্তরে কোনরূপ ভস্মাধার প্রোথিত আছে কিনা দেখিবার জন্য জেনারেল কানিংহাম এই স্তূপের উপরিভাগ হইতে খনন করান, কিন্তু তিনি একখানি প্রস্তর ফলক ভিন্ন কিছুই পান নাই।

চৌখণ্ডী স্তূপ—ধামেকস্তূপের দক্ষিণ দিকে অৰ্দ্ধ মাইল দূরে চৌখণ্ডী স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এক্কাওয়ালা কিছুতেই এখানে গাড়ী থামাইবে না। সে বলিতে লাগিল 'দাদা, ওস্‌মে কুচ নেই হ্যায়, দাঁও নেই হ্যায়।' আমি ধমক দিতেই সে গাড়ী থামাইল। এক্কাওয়ালা গম্ভীরভাবে বলিল 'ওতো সীতাজীকা রসুয়া হ্যায়।' আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এই চৌখণ্ডী অষ্টকোণাকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ। উহার উচ্চতা ৮২ ফুট। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নবজ্ঞান লাভ করিয়া কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পূর্ব্ব পরিত্যক্ত পঞ্চ শিষ্যকে এখানে দীক্ষিত করেন। এই শিষ্যত্ব গ্রহণ ব্যাপারে যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাই চৌখণ্ডী স্তূপ নামে খ্যাত। খোদিত পারস্য লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে হুমায়ুন বাদশাহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবর সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই স্মৃতিগৃহ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আকবরের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে যে এই স্তূপ বিদ্যমান ছিল তাহা হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে। সম্ভবতঃ আকবর বাদশাহ উক্ত স্তূপের চূড়াটী মুসলমানী ধরণে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখানে উঠিলে চতুর্দ্দিকের অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন পথে প্রতিভাত হয়।

জৈন মন্দির—উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত জৈন মন্দির ধামেকস্তূপের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহা একাদশ জৈনাচার্য্য শ্রীঅমশানাথের নামে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

পুরাতন যাদুঘর—ধ্বংসাবশেষ ও খনন কার্য্যের শেষচিহ্ন বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া আমরা জৈনমন্দিরের পশ্চিমে পুরাতন যাদুঘরে আসিয়া উপস্থিত হই। এই গৃহটী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অর্টেল সাহেব সারনাথে আবিষ্কৃত দ্রব্যসম্ভার সুরক্ষিত করিবার জন্য নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে মাত্র ব্রাহ্মণ্য ও জৈন মূর্ত্তিগুলি এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এখানে নবগ্রহের মূর্ত্তি ও যমুনার মূর্ত্তিই দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

নূতন যাদুঘর—পুরাতন যাদুঘর হইতে বাহির হইয়া আমারা রাস্তার উপর আসি। এখান হইতে অপর পার্শ্বেই নূতন যাদুঘর। এই যাদুঘরটী ভারত-গভর্ণমেণ্টের Consulting Architect মিঃ জেমস্ র‍্যানসম কর্ত্তৃক বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে পরিকল্পিত। এখানে ৫ঠি কুঠরী। উত্তরাংশের কুঠরীতে মাটীর হাঁড়িকুড়ি, বড় বড় তিনটি 'জালা' এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ ইট সুরক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ 'হলে' প্রবেশ করিয়া দেখি সম্মুখেই অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগাত্রে লেখা রহিয়াছে—'Lion Capula of Asoka Pillar' (Circa 250 B. C.)

২। শিবের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি—Unfinished image of Siva, Circa 1000 A. D.

৩। বোধিসত্ত্বের খণ্ডীকৃত ছত্র,—ইহার ব্যাস দশ ফুট।

৪। বেদীযুক্ত দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের এক সুবিশাল মূর্ত্তি। Dedicated by Friar Bala in the 3rd yaer of the reign of Kaniksha (1st Century A. D.) ইহা হেমন্ত ঋতুর তৃতীয়

মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে মহারাজা কনিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। একটী মস্তক শূন্য বুদ্ধমূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসিয়া আছেন। এই মূর্ত্তি একখানা লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। (Kushan period 1-300 A. D.) এই প্রকার বহু মূর্ত্তি আছে।

সারনাথের অতীত কীর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মনে হইল জগতের ইতিহাসে অনেক দেশ নানা বিষয়ের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষ বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের জন্য যেরূপ প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, সেরূপ অতি অল্প দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বর্ণযুগে অমর ভাস্করগণ যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিরাশির শেষচিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও, তাহা আজ সভ্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই পুণ্যদেশে ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়া ভাস্কর্য্য বিদ্যার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

কি করিয়া এবং কোন্ সময়ে সারনাথের বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ লোপ পাইয়াছিল তাহা এখনও ঠিক করিয়া জানা যায় নাই। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত সারনাথে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিওয়েনসাংএর বর্ণনা পাঠে সারনাথের সমৃদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই পুণ্যতীর্থের কীর্ত্তিচিহ্ন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু কি করিয়া যে এত বড় একটি বহুজনসঙ্কুল সহর লোকলোচনের অদৃশ্য হইল সে কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সম্যক্ জানিবার উপায় নাই, তবে বহু অনুসন্ধানের ফলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ নির্ণয় করিয়াছেন যে 'সারনাথের অকাল লোপসাধন সম্ভবতঃ অত্যন্ত বর্ব্বরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রাণভয়ে পলায়নপর শ্রমণদিগের কঙ্কাল হইতে জানা যায় যে কোন বিধর্ম্মীর অত্যাচারে এই স্থানের এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। শ্রমণ, মন্দির, দেবদেবীর মূর্ত্তি অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত ও দগ্ধ করা হইয়াছিল। আবিষ্কৃত বিহারের কক্ষের স্থানে স্থানে দগ্ধ অস্থি, কাষ্ঠ, রুটি ও ডাল, দ্রবীভূত ধাতুপাত্র এবং অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হয় যে শ্রমণগণ অন্নপাক আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বিধর্ম্মীর অত্যাচারভয়ে তাহারা পলাইয়াছিলেন।' সম্প্রতি 'বেনারস গেজেটিয়ারে' প্রকাশিত মত হইতে জানা যায় যে সহাবুদ্দিন ঘোরী প্রেরিত কুতুবুদ্দিনের নৃশংস অত্যাচারের ফলে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল।

সম্মুখে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি, এ)

পিছন পানে চাইবো নাকো
চল্‌বো পথে চল্‌বো পথে,
লাগুক্ ধূলা ফুটুক কাঁটা
ফিরবো না তো কোন মতে।
চল্‌তে গেলেই লাগবে ধূলা
আস্‌বে বাধা নূতন নয়,
তাই বলে কি নদীরা সব
পথের পাশে বসেই রয়?
চল্‌তে হবে চল্‌তে হবে
নামটী নিয়ে চল্‌তে হবে,
বুকের বলে ভর করে ভাই
চল্‌তে হবে কঠিন ভবে!
থামলে পরে চল্‌বে না
দাঁড়ালেই তো বিপদ নানা,
এগিয়ে চল—যা হবে হোক্
বাধা সে তো আছেই জানা!
রাখিস্ মনে মিলন যাত্রী
অমৃত তোর হবেই কেনা,
অতল সুধা পাবি যেথায়
সেথা শুন্‌বি কিরে পাওনা দেনা!
ওরে সুধার তলে ভুল্‌বি যে সব
লাগ্‌বে প্রাণে গীতোৎসব,
হিসাব কি রে থাকবে মনে
পেয়ে অসীম রতন ধনে!
মৃত্যু সে তো কিছুই নয়
দেহ অবসান মাত্র হয়,
অসীম পথে যাওয়ার মুখে
একটি সেতু পেরোতে রয়!

মন রে আমার করিস্ নে ভয়
এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্,
ফুট্‌বে কাঁটা টুট্‌বে বাধা
কাছেই আছে শান্তিজল।
তাঁরি উপর মুখ তুলে চা'
কোনই বাধা লাগবে না পায়
সমুখ পানে যাওয়ার মুখে,—
হিসাব তখন কেই বা চায়॥

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা। *

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া কন্যার আধিক্য একটী গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দু-সমাজের অন্যান্য নানা সম্প্রদায়েরও ভিতরে যে অনূঢ়া কন্যার আধিক্য নাই অথবা তাহা যে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে নাই, সে কথা আমরা বলিতেছি না। তবে, একটী কথা আমাদের মনে হয় যে অন্যান্য সম্প্রদায়ে কন্যার অনূঢ়া নাম ঘুচাইবার প্রয়োজন হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্কা বালিকাকেও অভিভাবকগণ নিতান্ত বয়োবৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরলও নহে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নানা কারণে এরূপ ঘটনা এক-প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে বলিলেও বলিতে পারি।

যে সকল কারণে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পুত্র ও কন্যাদিগকে সমসূত্রে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অন্যতর প্রধান কারণ। কন্যাকে পুত্রের সহিত সমানভাবে শিক্ষা দেওয়াকে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধি একটী মূল-মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে ব্রাহ্ম-সমাজে স্ত্রীশিক্ষা খরবেগে চলিয়াছে। এখন, যে পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে ভালরকম লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছেন, সে পিতামাতা সেই শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহের অযোগ্য এক বৃদ্ধের বা অশিক্ষিতের হস্তে কোনপ্রকারেই সমর্পণ করিতে পারেন না। কোন কারণে পিতামাতা সেরূপ অসঙ্গত কার্য্যে অগ্রসর হইলে কন্যা তাহাতে নিশ্চয়ই অস-ম্মতি প্রকাশ করিবে এবং সেরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার আছে। কাজেই বিদ্যা-শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে। আবার, অনূঢ়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতর কারণ। বয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কাজ আর কি আছে? এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা ও অনূঢ়াবৃদ্ধি, পরস্পর পরস্পরের সহায়কের কার্য্য করে।

ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতার প্রাবল্যকে অনূঢ়া-বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরোপকারিতার এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে স্বার্থপরতা ও সুখভোগের প্রবল ইচ্ছা তাহার স্থান অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যে পরোপকারিতা একে-বারেই নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, কারণ পরোপকারিতার সম্পূর্ণ অভাব হইলে ব্রাহ্মসমাজের কেন, কোন সমাজেরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে কি না সন্দেহ। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল-তর বেগ ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি বিধ্বস্ত করি-বার উপক্রম করিতেছে। ইহার ফলে ক্রমশ দাঁড়াইতেছে এই যে ব্রাহ্মদিগের অনেকেই দরিদ্র ব্রাহ্মের কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ কন্যার অভিভাবকগণ বরের সুখভোগের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার উপযুক্ত ধনরত্ন প্রদানে অসমর্থ। ব্রাহ্মসমাজে প্রকৃত ধনী ব্রাহ্ম অপেক্ষা নির্ধন মধ্য-বিত্ত ব্রাহ্মের সংখ্যাই অধিক, সে কথা আর কাহা-কেও বলিয়া দিতে হইবে না। উপযুক্ত ধনরত্ন না পাওয়াতে ছেলেরা বিবাহ করিতে অসম্মত হইবার কারণে ব্রাহ্মসমাজেও প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে ক্রমশ পণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইবেন। অগত্যা নির্ধন ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশেরই কন্যাগণ অনূঢ়া থাকিয়া যাইতেছে। ইহার পরিণামে সমাজে যে ভীষণ অমঙ্গলরাশি প্রবেশ করিতে পারে, এমন কি, তাহার অস্তিত্ব বিলোপেরও সম্ভাবনা, সে কথা

---

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা কোন সভ্য আমাদিগকে এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। নানা কারণে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই বিষয়ের সমাধান করিবার যত্ন পাইয়াছি। মতভেদ থাকিলেও এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্ম-সমাজ হিতৈষীর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। তং বোং সং।

ব্রাহ্ম যুবকেরা একবার ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ।

অপরের সুখদুঃখের প্রতি, সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার সুখভোগের ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিব, এই ভাবেরই আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে প্রধানত বিলাতফেরত ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা ফ্যাসন উঠিয়াছে—পাশ্চাত্য স্ত্রী-পুরুষের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া। যাঁহারা এই সকল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিবাহের সন্ধান রাখেন তাঁহারাই জানেন যে সুখভোগের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই দুঃখে কষ্টে অশান্তিতে অবনিবনাতে চিরজীবন নষ্ট করিয়া চলিতে হইয়াছে। তাঁহাদের কেহই মুখে কষ্ট দেখাইতে চাহেন না, কিন্তু প্রত্যেকে বুকফাটা কষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। দুঃখের বিষয় যে নব্যতন্ত্রের স্বদেশীয়গণ বাহিরের চাকচিক্য দেখিয়া দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং সুবিধা পাইলেই পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের সহিত বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার জন্য ধাবিত হয়েন।

হার্বাট স্পেন্সর একস্থানে বলিয়াছেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগণের মধ্যে বিবাহবন্ধন মঙ্গলজনক নহে। আমাদেরও বিশ্বাস যে ইহা দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় না। প্রথমেই তো দেখা যায় যে ইহা দ্বারা আমাদের দেশের দাম্পত্য আদর্শ বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন ও দাম্পত্যের আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। প্রাচ্য পুরুষের আদর্শ হইল একটী বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা হইয়া সেই পরিবার প্রতিপালন করা। পরিবার যতই বৃহৎ হইবে, এবং সেই পরিবার যতই সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইবে, প্রাচ্য পুরুষ ততই সুখবোধ করিবেন ও পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রাচ্য রমণীর আদর্শ হইল মাতৃত্ব—মাতৃত্বেই তাহার সুখ। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে বলিতে গেলে মাতৃত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট করাতেই প্রাচ্য রমণীর সমগ্র জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রাচ্য পুরুষ ও রমণীর জীবনের আদর্শ উপরোক্ত প্রকার হইবার কারণে প্রাচ্য দাম্পত্যেরও আদর্শ হইল দম্পতীর একাত্মীকরণ। তাই প্রাচ্য বিবাহের অন্যতর মন্ত্রই হইল "তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক।" এই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রাচ্য রমণী প্রত্যেক মানবের পরম প্রিয় স্বাধীনতারত্ন স্বামীর চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে আনন্দ বোধ করে এবং প্রাচ্য পুরুষ স্বীয় পরিবারের মঙ্গলকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়া সুখী হয়। অপরদিকে, পাশ্চাত্য, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেরই আদর্শ হইতেছে ব্যক্তিগত সুখ, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করা। পাশ্চাত্য পুরুষ আপনাকেই বিশেষরূপে চিনে। বহুকাল পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে একবার গ্ল্যাডষ্টোনের গৃহে তাঁহার পুত্র বা জামাতা আসিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন। আহারের পর গ্ল্যাডষ্টোন আগন্তুককে প্রদত্ত আহার্য্যাদির একটী বিল দেওয়াইয়া তাঁহার নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় মূল্য আদায় করিয়াছিলেন। লেখকের কোন ইংরাজ বন্ধুর পুত্র বারম্বার ম্যালেরিয়া ভোগ করিবার কারণে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের জীবিকা সংস্থান করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন তাহার পিতা তাহাকে অন্নধ্বংস করিবার অপবাদ দিয়া বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। পুত্রটী মনের দুঃখে সুদূর অষ্ট্রেলিয়ায় মৃত্যু পণ করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ কার্য্য ভাল বা মন্দ তাহা এখানে বিচার করিতেছি না। কিন্তু ইহা ঠিক যে কোন প্রাচ্য পুরুষ এরূপ কার্য্য করিতে পারিত না। সাধারণত পাশ্চাত্য পুরুষের ন্যায় পাশ্চাত্য রমণীও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার কাহারও হস্তে উঠাইয়া দিতে সম্মত নহে। নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকেই মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দাম্পত্যও ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার অধিকারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই ফলে পাশ্চাত্য দেশেই দাম্পত্য অধিকারের পুনঃস্থাপনের জন্য আদালতে নালিশ উপস্থিত করা সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য আদর্শের কারণেই পাশ্চাত্য বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিবার প্রথা প্রচলিত হইতে পারিয়াছে, কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে শত সহস্র যুগেও এদেশে বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিবার প্রথার কোনই প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। যাই হৌক, পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার নষ্ট হইবার ভয়ে যেমন স্ত্রী-

পুরুষের অনেকে ক্লব-গত জীবনকে বিবাহ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিতে অসম্মত হয়, আমাদের দেশেও, পাশ্চাত্য আদর্শ যাঁহাদের মাথার মণি, তাঁহারাও সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া সহজে বিবাহের "শৃঙ্খলে" আবদ্ধ না হইয়া শৃঙ্খলের বাহিরে বিচরণ করিতে ভাল বাসেন। নীতির অবনতি, চরিত্রের পবিত্রতার বিনাশ, এ সকল বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিবার অবসরই প্রাপ্ত হন না।

আরও একটী কারণে আমরা পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হওয়া অন্যায় মনে করি। আমরা মনে করি, যে সকল স্বদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষ পাশ্চাত্য পুরুষ বা রমণীর সহিত বিবাহে সম্মত হয়েন তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগকে অপমানিত করেন। হইতে পারে, তোমার উচ্চতম আদর্শের অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রী স্বদেশে পাও নাই। ইহা স্বীকার করিলেও আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সে প্রকার পাত্রপাত্রী কে কবে পাইয়াছে? যদি তুমি বল যে তোমার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী এদেশে দেখিতে পাও নাই, তবে সে কথাকে দেশের বিরুদ্ধে "লাইবেল" বলিয়া মনে করি। তোমরা কথায় কথায় দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা উঠাও। কিন্তু তোমরা যদি দেশের মানুষে সন্তুষ্ট থাকিতে না পার, বিলাতের বিলাসপুষ্ট মানুষের সহিত সম্প্রীতি করিতে যাও, তবে তোমরা যে দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিবে সে কথা অসম্ভব—কপটাচার মাত্র।

পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে "বিশ্বজনীন প্রেম" "প্রকৃত প্রেম কোন বাধা মানে না" ইত্যাদি বাঁধি-বুলি-মূলক নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ বিষয় একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই সকল যুক্তির অসারতা দেখিতে পাইবেন। সেই সকল যুক্তি যদি ঠিকই হয়, তবে "স্বদেশী" ভাব দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? বিশ্বজনীন প্রেম প্রভৃতি খুব ভাল বটে। কিন্তু তাহা আত্মকেন্দ্রক হওয়া উচিত। আত্মকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইলে সেই বিশ্বজনীন প্রেম কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায় বিলয়প্রাপ্ত হয়। সেই উদারতা ধ্বংসেরই নামান্তর মাত্র। এই যে "স্বদেশী" ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা, ইহা সমগ্র দেশের আত্মকেন্দ্র খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিবার চেষ্টা মাত্র। এখনও আমরা অনেকটা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া আছি বলিয়াই আমরা "স্বদেশী" ভাবকে যেমনটী ইচ্ছা করি, তেমনটী দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। বৃথা যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিবাহের ফলে সাধারণতঃ সুখশান্তির বিশেষ অভাবই দেখা যায়। কিন্তু এখনও আমরা যে মোহমদিরার মধ্যে ডুবিয়া আছি, তাহার ফলে আমাদের অনেকেই পাশ্চাত্যদিগের সহিত বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারিলে আপনাদিগকে পরম সুখী দেখিবার স্বপ্ন দেখিতে ছাড়ি না। অবান্তরভাবে ইহাও ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়াবৃদ্ধির কারণে নানাবিধ ভীষণ অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। আপাতত ইহার কারণে বিলাসিতার স্রোত ব্রাহ্মসমাজে ভীষণবেগে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। একথা বলিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিতে যাইও না যে অন্যান্য সমাজেও বিলাসিতা আছে। তোমরা আদর্শ দেখাইবার কথা ঘোষণা করিয়া থাক, উচ্চতম আদর্শকে তোমাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। তখন তোমাদের সমাজে যাহা কিছু দোষ বা গ্লানি আছে তাহা অবিলম্বে দূর করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একটী প্রবাদ আছে যে আলস্য সকল দোষের মূল। আমরা বলিতে চাহি যে বিলাসিতাও সকল দোষের মূল। সেই বিলাসিতা সমাজে বাড়িবার কারণ কি? প্রত্যেক অনূঢ়া কন্যার মাতা কন্যাকে অলঙ্কার এবং বিদেশী লেস-মণ্ডিত স্বচ্ছাতিস্বচ্ছ বস্ত্র প্রভৃতি বিলাস-সম্ভারে বিভূষিত করিয়া বাহির করিতে চাহেন। অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা যতই অধিক হইবে ততই এবিষয়ে প্রতিযোগিতা বাড়িতে থাকিবে, এবং কাজেই সমাজের মধ্যে বিলাসিতা ক্রমশ অতিমাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিবে। বিলাসিতার ফলে হৃদয় হইতে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িতে

চায়। একথা আমরা বলিতে বাধ্য যে ব্রাহ্ম-সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মভাব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই যে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসব হইয়া থাকে, সেই উৎসবেই এই বিলাসিতা বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মভাব হ্রাসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যে বিবাহের উৎসব নহে, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব যে বৃথা আমোদের উৎসব নহে, সে কথা অতি অল্প সংখ্যক পিতামাতাই ভাবিয়া থাকেন। ইহা যে সাজসজ্জা দেখাইবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্র নহে, সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখাইবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্র নহে, সে কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে উৎসবের সময়ে পিতামাতা পুত্রকন্যাদিগকে পবিত্র বেশে সজ্জিত করিবার পরিবর্ত্তে রাশি রাশি বিলাসসজ্জাতেই ভূষিত করিয়া বাহির করেন এবং পুত্র-কন্যাগণও অন্তরের সদ্‌গুণ অপেক্ষা বাহিরের শোভাপ্রদর্শন করিতেই অধিক শিক্ষা পায়। যেখানে এই বিষয়ের প্রতিযোগিতা, সেখানে এরূপ হওয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্বাভাবিক।

আমাদিগের এখন দেখা কর্ত্তব্য যে এই সকলের প্রতীকার হয় কিসে? আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে কন্যাদিগকে ভালরূপে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অনূঢ়াবৃদ্ধির অন্যতর কারণ। এই লেখাপড়া অর্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত লেখাপড়াই ধরিয়াছি। শৈশবে বি-এল-এ-ব্লে শিখিতে আরম্ভ হয় এবং জীবনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইবার সময়ে সেক্সপীয়রের হত্যা প্রভৃতি পাপমূলক, ব্রহ্মচর্য্যের মূলচ্ছেদক নাটকগুলি এবং হৃদয়ের উদ্বেজনার উত্তেজক কবিতা ও উপন্যাস প্রভৃতি অভ্যাস করিতে করিতে শিক্ষার্থীগণ বলিতে গেলে নিজেদের জীবনের শিরায় শিরায় সেই সকলের মন্দভাবগুলি মিশাইয়া লইতে অভ্যস্ত হয়েন। এই শিক্ষা ক্ষণেকেরও জন্য মাতৃত্বের দিক দিয়া যায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা জানি যে এই সকল কথা নব্যতন্ত্রীদিগের ভাল লাগিবে না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও আর উপায় নাই। যে কোন সমাজে, অনূঢ়া কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভীষণ হইতে ভীষণতর অমঙ্গল আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই কারণে যে কোন উপায়ে প্রত্যেক সমাজেরই উচিত অনূঢ়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ করা। এই প্রতিরোধের একটী উপায় হইতেছে প্রত্যেক কন্যার হৃদয়ে মাতৃত্ব জাগ্রত করিয়া দেওয়া। ভারতের বৃদ্ধ ঋষি মনু তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে মাতৃত্বের কারণেই রমণীগণ পূজার্হ বলিয়া এবং উপযুক্তরূপ সমাজব্যবস্থা করিয়া সমগ্র সমাজেরই হৃদয়ে মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋষিদিগের ব্যবস্থার যথাযুক্ত ভাব লইয়া আমাদেরও ব্রাহ্মসমাজে এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য যাহার ফলে আমাদের কন্যাদের হৃদয়ে মাতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা এমন কথা বলি না যে প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহের জন্য উৎসাহ দিয়া পাগল করিয়া তুলিতে হইবে। বরঞ্চ তাহার বিপরীত বলিতে চাহি। আমাদের মতে সমস্ত শিক্ষাকে ধর্ম্মকেন্দ্রক ও ব্রহ্মচর্য্যমূলক করিলে কন্যাদিগের স্বাভাবিক ভাব মাতৃত্ব স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে যথাযুক্ত সময়ে শিশুদিগের সেবাকার্য্য, রন্ধন কার্য্য প্রভৃতি মাতৃত্ব-সহায়ক কার্য্য সকলও শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ শিক্ষার ফলে পিতামাতাগণ যেমন কন্যাগণকে সহজে অযোগ্য পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেও পারিবেন না, সেইরূপ বর্ত্তমানে শিক্ষিতা কন্যাগণ যেমন কথায় কথায় কতকটা লোক-দেখাইবার জন্য বিবাহের নামে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, সেটা আর তাঁহারা করিবেন না।

রন্ধন কার্য্য কন্যাদিগের মাতৃত্ব পরিস্ফুটনের একটী প্রধান সহায়। বিদ্যালয়ে আজকাল রন্ধন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া প্রবর্ত্তিত হইতেছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। কিন্তু কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে চলিবে না। গৃহে পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক কন্যাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহার স্বহস্তে রাঁধা ভোজ্য সকল আহার করিয়া যখন পরিবারের তৃপ্তিসাধন হয়, সেই তৃপ্তির ফলে কন্যার হৃদয়ে যে নিষ্কলঙ্ক আনন্দ হয়, সেই আনন্দের মধ্য হইতে কন্যার মাতৃত্ব ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকে। আর, ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বলে

জীবমাত্রেই আপনাপন উদর পূর্ত্তির জন্য ছুটাছুটি করিয়া থাকে। মানুষও সে নিয়মের অতীত নহে। এখন, কোন লোক যদি কোন শিক্ষিতা বালিকাকে বিবাহ করিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী বড় বড় কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে, কিন্তু গৃহ-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অপটু এবং সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর গৃহে যদি দুমুটো সুপক্ক অন্নব্যঞ্জন নিজের পেটে দিতে না পারে, তাহা হইলে কাজেই সে বিবাহের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং বন্ধুবান্ধবের নিকট নিজের দৃষ্টান্ত সবিস্তার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকেও বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা জানা কথা। নূতন বিবাহের পর নবদম্পতী দুই চারিদিন কবিতার সুধারস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু চিরকাল তাহা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাহে অনিচ্ছার ইহাই একটী প্রধান কারণ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। পক্ষান্তরে যদি স্বামী গৃহে আসিয়া দেখে যে তাহার স্ত্রী গৃহের সকলই সুশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়াছে, অন্নব্যঞ্জন সুন্দর রাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইলে এমন স্বামী নাই যে আপনার দৃষ্টান্তে অপরকেও না বিবাহে উৎসাহ দিবে। এই জন্য বলিতেছি যে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার ভিতর হইতে যে কোন গ্রন্থে "নবেলীয়ানা"র এতটুকু গন্ধও আছে, সে গ্রন্থ শিক্ষণীয়-তালিকা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে রন্ধনাদি মাতৃত্বের উদ্বোধক শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক পরিবারে ধর্ম্মকেন্দ্রক, ব্রহ্মচর্য্যমূলক এবং মাতৃত্বের পরিপোষক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্যের নামে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ যথাযুক্ত সময়ে যথাযুক্ত ইন্দ্রিয়াদির যথাযুক্ত পরিচালনা, —ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নহে। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের কথামত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ফলে অনূঢ়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মসমাজে স্বার্থপরতা কি প্রকারে প্রতিরুদ্ধ করা যাইতে পারে। এ বিষয় নানাস্থানে নানাভাবে আলোচনা চলিতেছে, সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কথা বলিতে যাওয়া অনাবশ্যক। তবে দুইটী উপায় আমাদের মনে হইতেছে। একটী এই যে, সুবিধা পাইলেই ধনী নির্ধন, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে একত্র হইয়া পান ভোজন করা উচিত। একথা আমি কোন মুখপত্রে ইঙ্গিতব্যক্ত দেখিয়াছি। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে এই যে প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষ শৈশবাবধিই পরিবারের বালকবালিকাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থপর হইতে শিক্ষা দিবেন এবং যাহাতে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পণপ্রথাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হয়, কন্যাপক্ষের নিকট হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যাহাতে কন্যার অভিভাবকগণের নিকটে আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর একটী কড়াও না লয় তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দিবেন। শৈশব অবধি ছেলেমেয়েকে ব্রহ্মচর্য্যের পথে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতে হইবে। গৃহে বিলাসিতার সংস্পর্শও আসিতে দিবে না। আমরা দেখিয়াছি যে স্বামীর মত হয়তো দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলা, কিন্তু বাড়ীর গৃহিণী প্রভৃতির জেদের কারণে স্বামী পুত্রকন্যাদিগকে বিদেশীয় বিলাসসজ্জায় ভূষিত করিবার পক্ষে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ করিলে চলিবে না। স্বামীস্ত্রী একমত হইয়া বিলাস বর্জ্জন করিলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে শান্তি সুনিশ্চল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিলাস বর্জ্জন করিলে অতি অল্প খরচে সংসার চলিবে, কাজেই তখন দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহই যথাবয়সে বিবাহ করিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করিবে না বলিয়া আমরা মনে করি।

বিষয়টী ব্রাহ্মসমাজকে বড়ই কঠোরভাবে আঘাত করিতেছে। তাই আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনামত এসম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলিলাম। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজহিতৈষীর এই বিষয় আলোচনা করিয়া নিজের সাধ্যমত অনূঢ়াবৃদ্ধির প্রতীকারের চেষ্টা করা উচিত।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইরূপ করিবার তাহারা একটা উপলক্ষ্য পাইয়াছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, সকল মেয়েরাই পিছনের উঠানে

বসিয়াছিল, আমি রান্নাঘরের ধূলা ঝাঁট দিতেছিলাম। আধা-আধি ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে, সেই জঞ্জালের মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্রের একটা টুক্‌রো পাওয়া গেল। প্রথমেই আমার ছেলেমানুষির দরুণ,—কোন এক বিষয় আরম্ভ না করিয়াও তাহা করিতে আমি সমর্থ এইরূপ মনে করিয়া তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটাটা নীচে রাখিয়া সেই কাগজের টুক্‌রোটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। প্রথম বই আরম্ভ করিয়া পুরা পনেরো দিনও হয় নাই, ইহারই মধ্যে কি আমি ইংরাজী পড়িতে পারি? কিন্তু কেবল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অক্ষরগুলিই দেখিতে লাগিলাম। আমি যে নীচের ঘরে আছি তাহা আমার মনেই ছিল না। এই সময়ে আমার উপর আমার দিদি-শাশুড়ীর নজর পড়িল। তিনি নিকটে আসিয়া চুপি চুপি মেয়েদের ইসারা করিবামাত্র দুই তিন জন দরজার কাছে আসিয়া আমাকে দেখিল; কিন্তু আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারি নাই। আমার নিজের খেয়ালেই ঐরূপ নিমগ্ন আছি দেখিয়া আমার ননদের খুবই রাগ হইল এবং সে চড়া গলায় আমাকে বলিল—"তোমার আপিস দোতালায়। সেখানে গিয়ে তুমি পাঠ কর, কি নাট কর—যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু খবরদার আমাদের অপমান কোরো না! আমাদের প্রথম বৌদিদি কি ছিল না? তাকে দাদা লেখা পড়া সব শিখিয়েছিলেন। সে আমাদের এক-বয়সী ছিল, তবু সে আমাদের সামনে এমন কি এক অক্ষরও পড়েনি। তাকে ইংরেজি শেখাবার জন্য দাদা খুবই চেষ্টা করে-ছিলেন, কিন্তু সে বেচারীর সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে ত তাঁরই স্ত্রী ছিল। তাকে কোন বিষয় দশবার বললে, তবে সে একবার করত। কিন্তু হাজার বললেও সে এ রকম বেহায়ামী করত না।" পদে পদে এই রকমের বোলচাল চলিত। এইজন্য, ইংরেজি শিক্ষা কেন আরম্ভ করিলাম এইরূপে মনে করিয়া সময়ে সময়ে আমার কান্না আসিত ও কখন কখন খুব বেশী হইলে একান্তে গিয়া কাঁদিতাম, কিন্তু এ কথা আমার স্বামীর কাছে একটুও বলি নাই। কারণ আমি যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসি তখন বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে এই উপদেশ দিয়েছিলেন "দেখ্, তুই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিস। আপনার সপত্নী, কুটুম্ব সম্পর্কের দশরকম মানুষ আছে। তুই আমার মেয়ে। যতই কষ্ট হোক না, নিজ কুলীন বংশের যোগ্য আচরণ করে সব সহ্য করবি। এমন কি চাকর-বাকরদের কথাতেও পাল্টা জবাব দিবিনে। এই এক কথা, আর এক কথা মনের কষ্ট অসহ্য হলেও, কারও নামে লাগিয়ে স্বামীর কাছে বলতে যাসনে। লাগালাগি করাতে শুধু পরিবার কেন—রাজ্যও বিনষ্ট হয়। এইজন্য আমি বলচি, এই দুই ব্রত পালন করলে তোর কখনই কোন অভাব হবে না। তুই ভাগ্য-বতী। সদ্‌গুণ থাকলে তোর মূল্য আরও বাড়বে ও আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ করা তোর সার্থক হবে। আমার এই কথাগুলি মনে রাখিস। এর উল্টো যদি কিছু করেছিস শুনতে পাই, তাহলে আর কখনই তোকে আমার বাড়ী নিয়ে আসব না।" আমার পিতা বড়ই কড়াকড় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস থাকায় তাঁর কথাগুলি আমার মনে খুব বসিয়াছিল। তাই এই দুই ব্রতই আমি পালন করিব বলিয়া স্থির করিলাম। ইহার দরুণ আমার খুব কষ্ট করিতে হইয়াছিল।

এই ব্রত পালনের দরুণ আমার কান্না ও শুষ্ক মুখ যাতে আমার স্বামীর নজরে না আসে এইজন্য খুব সহ্য করে থাকতে হত। তবু তাঁর নজরে আসিত। মানুষের যাতনা বা কষ্ট বেশীমাত্রায় হইলে, কাহারও কাছে তাহা ব্যক্ত করিয়া বলা ভিন্ন মন হাল্‌কা হয় না, এইরূপ উপ-লব্ধি হয়। কিন্তু সেরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার সুযোগ না হওয়ায়, সমস্ত দিনের কষ্টে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যেন ফোড়া-কাটার মত বোধ হত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, রাত্রে দোতালার ঘরে গেলে পর, এই সব কথা আমি একেবারেই বিস্মৃত হইতাম। যেন সমস্ত দিন কোন কষ্টই হয় নাই। যাক্। "আজ অমুক সময়ে তোমাকে ওরকম কেন দেখা যাচ্ছিল? কেউ কিছু কি বলেছে? যেন কাঁদছিলে এই রকম মনে হচ্ছিল" এরূপ অনেক কথা আমার স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেও, "আমার ছোট ভাই-বোনদের মনে পড়েছে, মাকে মনে পড়েছে" এই রকম কোন কিছু বলিতাম। কারণ, একবার যদি অল্প কিছুও বলি, তাহা হইলে তিনি সেই সূত্র ধরিয়া সব কথা বাহির করিয়া লইবেন, অথবা আমার মুখ হইতেই সহজে বাহির হইয়া পড়িবে। যাহাই হউক না কেন, ইহার দ্বারা আমার নিয়মভঙ্গ হইবে; তাহাড়া আমা-দের প্রকৃত সুখশান্তির সময়টা এই সব কথায় যতটা অতিবাহিত হইবে, ততটাই আমাদের সুখের হ্রাস হইবে; আর ত কোন লাভ নাই, এইরূপ আমার ধারণা হইয়া-ছিল। তথাপি, আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের স্বভাব আমার স্বামীর ভাল রকম জানা থাকায়. আসল ব্যাপারটা কি, তখন তাহা অনুমান করিয়া লইতেন এবং তদনু-সারে আমায় বুঝাইতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহার সেই প্রীতিপূর্ণ শান্তিপ্রদ কথাগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার মনের উপর এরূপ কাজ করিত যে, সমস্ত দিনের কষ্ট ভুলিয়া গিয়া, আমার মত সুখী কেহই নাই এই-রূপ মনে করিয়া সকাল পর্য্যন্ত আনন্দে থাকিতাম। সকালে, নীচে যাইবার সময় আবার আমার আতঙ্ক

হইত। তখন আমার স্বামী আমাকে সাহস দিয়া বলিতেন যে, "একটু সহ্য করতে শিখবে; উত্তর না দিলেই হইল। আমি কি তোমাকে তিরস্কার করে কখন কোন কথা বলি? আর কেউ কিছু বল্‌লে তুমি কেঁদো না।" এই রকম সাহস দিবার পর, সমস্ত দিনটা বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইত। এই উপদেশ অনুসারে আমাদের বাড়ীর সব মেয়েদের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বাক্যযন্ত্রণা সমস্তই সহ্য করিতাম, কিন্তু পাঠাভ্যাস ছাড়ি নাই। এই সমস্ত যখন সহ্য করিতাম, আমার দুই দেবর, এই কষ্ট যন্ত্রণার মাঝে, আমার প্রতি মমতা ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাকে বলিত,—"বড় মেয়েরা যখন রাগ করবে তখন তুমি ভয় পেয়ো না।" এই বলিয়া তাহারা আমাকে সাহস দিত ও আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট নানা কথা বলিত। আমি যে সমস্ত সহ্য করিতাম, আমার স্বামীপ্রদত্ত প্রীতিপূর্ণ গম্ভীর উপদেশই তাহার মূলীভূত কারণ। এইরূপ না হইলে, এবম্বিধ কষ্ট যন্ত্রণা, আমার মত অল্পবয়স্কা ও অল্প-বুদ্ধি মেয়ে কখনই সহ্য করিতে পারিত না; অথবা গৃহে বাস করিবার মত সুখশান্তি থাকিত না। কারণ, আমার মন ক্রমাগত কষ্ট পাইয়া সর্ব্বদাই উদাস থাকিত। বাহিরের লোক যতই সহানুভূতি করুক, বা না করুক,—ভালবাসার লোকেরা পরস্পরকে যেমন সহজে ও ভাল রকমে চিনিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই হয় না। তাই, আমার স্বামীরও খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার মনের শান্তি কমিয়া গিয়াছিল। এবং এইরূপ ভাবে যদি আরো কিছু দিন চলিত, তাহা হইলে, এই ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা বিভ্রাট ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু পুণ্যবল ছিল বলিয়া, সেরূপ কোন বিভ্রাট না ঘটিয়া, শীঘ্রই "নাসিকে" আমাদের বদলী হইল। কিন্তু এই বদলীর দরুণ, আমার স্বামীর ও পুণানগরস্থ মিত্র-মণ্ডলীর মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাঁহাদের ভাল লাগিল, কি খারাপ লাগিল; এই এক বদলী করবার দরুণ সরকার-বাহাদুরের কত উলট-পালট করিতে হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় আমার কল্পনাতেও আসে নাই। আমাদের বদলী নাসিকে হইয়াছে, এখন আমরা সেইখানে যাইব। সেখানে আমি এইরূপ করিব, ঐরূপ করিব প্রভৃতি ভাবী আনন্দের কল্পনায় দুই এক সপ্তাহ মগ্ন হইয়া ছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমরা দুজন, ও "আবা"-ভাই আমরা নাসিকে গেলাম। ইচ্ছা করিয়াই বড় মেয়েদিগের কাহাকেও সঙ্গে লওয়া হইল না। তাহার দরুণ আমার স্বামীরও শিখাইবার উৎসাহ বেশী হইল, এবং আমাদের উভয়েরই আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নাসিকে যাইবার পূর্ব্বে পুণার কিছু বৃত্তান্ত দিতেছি।

১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে পুণায় সার্ব্বজনিক আন্দোলনের একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটিয়াছিল। মল্হার রাও গায়কবাড়ের বিষপ্রয়োগ মোকদ্দমায়, মোকদ্দমা চালাইবার খরচা সংস্থান (State) মঞ্জুর করে নাই, তথাপি এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত খরচ দিবার জন্য পুণা প্রস্তুত। মহারাজা শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা, চালাইবেন, এই মর্ম্মে, পুণার লোকেরা বড়োদায় তার পাঠাইলে, এই বিষয়ের উপর সরকারের কড়া নজর পড়িল। বলা বাহুল্য, এই সময় সর রিচার্ড টেম্পলের শাসন-কাল ছিল। এই সমস্ত আন্দোলনের মূলে কেহ আছে ভাবিয়া কোন বরিষ্ঠ কর্ম্মচারী জেলিয়ার ন্যায় জাল ফেলিয়া চারিদিকে সন্ধান করিতেছিলেন। কোন উপায়েই স্পষ্ট সন্ধান না পাওয়ায়, কোন বিশেষ মণ্ডলীকে সরকার-বাহাদুর সংশয়দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। এবং পুণার এই সমস্ত আন্দোলন থামাইবার জন্য পুণা হইতে কোন বিশিষ্ট মণ্ডলীকে উঠাইয়া লইতে হইবে এইরূপ মৎলব করিয়া, এখান হইতে আমাদিগকে বদলী করিবার জন্য, তিন বা পাঁচ বৎসরের পর একই সব্‌-জজ্‌ একই জায়গায় থাকিবে না—বোম্বাই এলাকা সংক্রান্ত এই নূতন আইন প্রয়োগ করিয়া, তদনুযায়ী আমাদিগকে বদলী করা হইল। এই বদলী হইবার চারি মাস আগে কোন এক বিদেশী গৃহস্থ মুশাফেরের ভাব করিয়া পুণায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুণার ছোট বড় বিদ্বান অবিদ্বান প্রাচীন ও নব্য অনেক লোকের সহিত পরিচয় করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—বাহ্যত এইরূপই দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহার অন্তরে কি অভিসন্ধি ছিল সে তিনিই জানিতেন। তিনি যে বাসায় ছিলেন, তাহারই এক কামরায় পান সুপারীর থালা, পানের খিলী, চুরোট, দশ পঁচিশ, "গঞ্জিফা"-তাস, দাবা, বেজিক্, ও সেতার এই সমস্ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। আমাদের পুণার মণ্ডলী এই বিষয়ে একটু বেশী আসক্ত সত্য। ইহার দরুণ তাঁহার বেশ সুযোগ হইল। তাহাদের মধ্যে একজন মধুমক্ষিকার ন্যায় সেখানে একেবারে লাগিয়াই থাকিত। ইহাকে অনুসরণ করিয়া কতকগুলি লোক সকাল সন্ধ্যায় ঐ গৃহস্থের ঘরে আড্ডা করিল। এই সব লোক কোন-না-কোন খেলায় একেবারে নিমগ্ন থাকিত। এই মণ্ডলীর মধ্যে সীতারাম-হরি চিপড়ুনকরের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছিল। তিনি এই সময় সার্ব্বজনিক সভার সেক্রেটারী ছিলেন, এবং সভার ত্রৈমাসিকের প্রবন্ধ লিখিয়া লইবার জন্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ী আসিতেন। কিন্তু আজ কাল ঠিক সময়ে আসিতেন না, দেরীতে আসিতেন। কাজ কর্ম্মে

তাঁহার খুব দৃঢ়তা ছিল, কখন ক্লান্ত হইতেন না। কিন্তু আজকাল একটু আলস্য করিতে দেখিয়া, ও রাগাইয়া দিবার জন্য, আমার স্বামী সীতারামপন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকাল তোমার কি-রকম ভাব-গতিক?" তখন, তিনি এই ভদ্রলোকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। কিন্তু আমার স্বামী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আমার স্বামী নিজেই তাহার খোঁজ খবর লইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং "আমাকে না জানাইয়া সেই ব্যক্তির সহিত সার্ব্বজনিক সভা সম্বন্ধে কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না, নিরর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবে। ঐ ব্যক্তি একজন গোয়েন্দা এইরূপ আমার অনুমান হয় ও তাই ঠিক"—এইরূপ আমার স্বামী বলিলেন। একদিন, কতকগুলি লোক আমাদের বাড়ী আসিলে, তাঁহারা এই নবাগত ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"এই আগন্তুক ভদ্রলোকটি ভারী সৌখীন, সদানন্দ, মিশুক ও বিদ্বান।" তখন আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহার নাম ধাম কি? কোথায় থাকেন? এখন কি কাজ করেন? লেখাপড়া কতটা জানেন? এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাদের জানা আছে কি?" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল—"লোকটি ভারী লাজুক ও মুখচোরা। নাম, ধাম, ব্যবসায়, ও কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা হয়েছে, এ সমস্ত তিনি কিছুই বলেন না, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কেবল হাসেন, আর বলেন—আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার নাম ধাম জেনে তোমাদের কি হবে? এইরূপ বলে' তিনি হেসেই উড়িয়ে দেন; কিন্তু কিছুই বলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী বলিয়া আমাদের এই প্রশ্নগুলি তাঁর ভাল লাগে না। কিন্তু তিনি যে ভাল বংশের লোক ও বিদ্বান তা বেশ মনে হয়।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন—"তোমাদের অনুমান অনুসারে ঐ ভদ্রলোকটি সজ্জন ও বিদ্বান; কিন্তু আমি বলি, তোমরা যা বলচ তা ঠিক কি না, আগে অনুসন্ধান করে আমাকে বল, তারপর অন্য কাজ কর; কিন্তু ইনি কে, তোমরা খোঁজ করে জানবে। কাল সকালে উঠেই ইঁহার ডাকের পত্রাদির খোঁজ নিও। পত্রের উপর কোন্ গ্রামের ছাপ থাকে, এবং ইনি যে পত্র পাঠান, তাহা কোন্ গ্রামে যায় এই সমস্ত ভাল করে দেখে, দুই একদিনের মধ্যে এখানে এসে আমাকে জানাবে।" তাঁহারা "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তৃতীয় দিনে সকাল বেলায় সীতারামপন্ত চিপলুনকর আসিয়া বলিলেন—"পরশু ও কাল আমি ডাক-পত্রের সমস্ত খোঁজ নিয়েছি। সেই ভদ্রলোকের ডাকের চিঠি ডাকহরকরার হাত দিয়ে আসে না। তিনি প্রভাতে উঠে বেড়াতে যাচ্ছি বলে বাহিরে যান। তিনি প্রথমে এক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে, তারপর আর একটা বাঁকা রাস্তা ধরে শেষে জেনেরাল পোষ্ট আফিসে যান—সেখানে গিয়ে ডাকের চিঠি নিজের হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দেন। কাল আমি অনেকটা অন্তর থেকে, তাঁর পিছনে পিছনে চলেছিলুম। তাই, যেতে যেতে পথের মধ্যে তাঁর এক ছেঁড়া পত্রের মোড়ক কুড়িয়ে পেলুম। মোড়কের উপর সিমলার ছাপ আছে। সমস্ত বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার যে সংশয় হয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে—আমাদেরও এখন মনে হচ্ছে। তাছাড়া, আমার এক পোষ্ট আফিসের বন্ধু আমাকে এখনই বল্লেন, "এই ভদ্রলোকটির পত্রব্যবহার, কলিকাতা ও সিমলার গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীর সঙ্গে চলছে এইরূপ মনে হয়। কারণ, তাঁর নামে এঁর অনেক চিঠিই যায়।" এতটা হইবার পর, এই সব কথা আমাদের সমস্ত লোকের কানে আসায়, সকাল বেলায় ও সকাল হইতে পর দিনের সন্ধ্যাকালে এই ভদ্রলোকটির ঘরে পুণার যে সব লোক আসিয়া জমিত, তাহাদের সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহা হইতে লোকেরা সরিয়া পড়ায়, তিনি অনুমান করিলেন, তাঁহার আসল স্বরূপটা বুঝি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মনে করিয়া, পাছে তাঁর অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, "বিদেশী মুসাফেরের" ছদ্মবেশী এই ভদ্রলোকটি কাহাকেও না জানাইয়া তৃতীয় দিনের রাত্রে বোচকা বুচ্‌কি লইয়া পিট্টান দিলেন।

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

দয়ানন্দ সরস্বতীর পুণায় আগমন।

(১৮৭৫ খৃঃ)

লাহোর হইতে স্বামীজীর পুণায় আসা অবধি, "বুধবার" অঞ্চলে বেল্‌বাগের সম্মুখস্থ "ভিড়" মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিদিন বক্তৃতা হইত। আমার স্বামীর, সায়াহ্নের আড়াই ঘণ্টা কাল এই বক্তৃতা শ্রবণ করিতে ও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেই অতিবাহিত হইত। বক্তৃতা শেষ হইলে, দয়ানন্দজী স্বস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, তাঁহার সম্মানার্থ একটা মিছিল বাহির করা যাইবে, এইরূপ একদিন আমাদের গৃহে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া স্থির করিলেন। এবং ইহা দুই তিন দিন পূর্ব্বে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ইহা জানিবার পর বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা ইহা লইয়া খুব ঘোঁট করিতে লাগিল। এই সময়ে বিরুদ্ধপক্ষ অর্থাৎ রাংদীক্ষিত আপ্‌টে শাস্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান হওয়ায় তাঁহার সহিত

গ্রামস্থ অনেক লোক ছিল। এই সুযোগ পাইয়া আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম জিনিসটা কি—এসম্বন্ধে কোন চিন্তা পর্য্যন্ত যাহাদের মনে আদৌ প্রবেশ করে নাই এরূপ কতক-গুলি লোক এই সময়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত মিলিয়া দয়ানন্দজীর ও তাঁহার পক্ষের মানহানি ও বিড়ম্বনা যাহাতে কোনরকমে হয় সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শেষে তাহাদের বুদ্ধি অনুসারে তাহারা শকুনী মামার মত এক মৎলব আঁটিল। সেই মৎলবটা সবার খুব পছন্দ হইলে পর, তাহার পরদিন উহা আমলে আনিবে বলিয়া সকলে স্থির করিল। এইরূপ উত্তমরূপে দয়ানন্দজীকে অপমান করিবার যুক্তি স্থির হইলে, ঐ সকল লোকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাল কখন্ রাত পোহাইবে, কখন্ এই যুক্তি আমলে আনিবে সেই চিন্তাতেই তাহারা মগ্ন ছিল। এদিকে অপর পক্ষের লোকেরা আমাদের বাড়ীতে একত্র হইয়া, কালই মিছিল—বাহির করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পরদিন সকালে ৬টার পূর্ব্বে, বরাবর ব্যাণ্ড ও ২০।২৫ জন গোঁয়ার লোকের ঠাটসহ সুসজ্জিত "গর্দ্দভানন্দাচার্য্যের সোয়ারী" কালো পাথরের জলের-হাউজ হইতে যাত্রা করিয়া সহরের ভিতর দিয়া বাহির হইল। যেখানে সেখানে ঠাট্টা তামাসা ও হাসাহাসি সুরু হইল। প্রায় সাড়ে ৬টা কিংবা সাতটার সময় এই খবর আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। যাহারা চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছে এইরূপ কতকগুলি লোক এই সমারোহ ব্যাপারের উত্তমরূপে বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া এই সমস্ত লোকেরও খুব হাস্যোদ্রেক হইল। অবশ্য ইহাতে বিরুদ্ধপক্ষের বিশেষ উদ্যোগ চেষ্টা আছে। তখন যাহাতে দয়ানন্দের উপর কোনরূপ আক্রমণ না হয় তার জন্য বেশী রকম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, এইরূপ স্থির হইল। একদল পুলিস আনাইবার জন্য গঙ্গারাম ভাউ প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইবামাত্র তিনি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিলেন। এদিকে গর্দ্দভানন্দের মিছিল যাহা সকালে ৬টা হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সায়াহ্নে ৬টা পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে চলিতেছিল। যে সকল লোক মিছিলের সঙ্গে ছিল তাহারা "শ্রীরামানন্দ স্বামী কি জয়" এইরূপ জোর গলায় প্রত্যেক ৩।৪ পদ অন্তর জয়ধ্বনি করিতেছিল। শোভাযাত্রার অনুগামী লোকেরা ইহা গর্দ্দভানন্দের মিছিল বলিয়া কতদূর জানিত কে জানে। পরদিন দয়ানন্দ স্বামীজী আসন পাতিলেন, কি সমাধিতে বসিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন, জানা গেল না। এই রকমে চারিটা বাজিল, ৪৷৷০টা হইল, সবাই "ভিড়" মহাশয়ের বাড়ীতে নিত্য রীতি-অনুসারে বক্তৃতা শুনিতে সমবেত হইল। স্বামী দয়ানন্দজী এক-জন উত্তম সরস বক্তা ছিলেন। তাঁহার বাণী গম্ভীর ছিল, তাঁহার ভাষণপদ্ধতি খুব মর্ম্মস্পর্শী ও কখন কখন অলঙ্কারিক হইত। তাহার দরুণ, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাহারা আসিত তাহারা একেবারে তল্লীন হইয়া যাইত। স্বামী দয়ানন্দজী স্বীয় অঙ্গীকৃত বক্তৃতা শেষ করিয়া কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং এতদিন তাঁহার বক্তৃতা সকলে মন দিয়া যে শুনিয়াছে ও তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছে তজ্জন্য তিনি অল্প কথায়, আলঙ্কারিক ও বিনোদী ভাষায়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পান সুপারী মাল্য প্রভৃতি স্বামীজীকে অর্পণ করিবার পর, স্বামীসহ সমবেত মণ্ডলী নীচে নামিয়া আসিলেন। রাস্তার উপর হাতী, পাল্কী প্রভৃতির ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। সেই পাল্কীর মধ্যে গ্রন্থ রাখিয়া ইঁহারা দয়ানন্দজীকে হাতীর উপর বসাইলেন এবং মিছিল আরম্ভ হইবামাত্র উপরি উক্ত বিরুদ্ধপক্ষের লোকেরা এই সমারোহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ও ভীড় করিয়া আবল-তাবল যা তা বলিতে লাগিল ও চেঁচামেচি আরম্ভ করিল। এই পক্ষের উৎসাহদাতা জঘন্য ও কুটীল লোকেরা সভ্যতার খোলস পরিয়া কিছু দূরে, স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল; এবং আত্মপক্ষকে দাঙ্গা করিবার জন্য উৎসাহ দিতেছিল। সেই দিন খুব বৃষ্টি পড়ায়, রাস্তায় কিছু কাদা হইয়াছিল। এই দাঙ্গার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, কিংবা কোন প্রকার প্রতিকার না করিয়া, এই মিছিল ঢিমা চালে চলিতেছে দেখিয়া ঐ সব গ্রাম্য গুণ্ডারা নিরাশ হইয়া চটিয়া উঠিল। স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান প্রতিনিধিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠায়, যার হাতে যা' ছিল তাহাই শোভাযাত্রার লোকের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যাহাদের হাতে কিছু ছিল না, রাস্তার উপর, নীচে নুইয়া, কাদার গোলা তৈরী করিয়া, তাহাও ঐ সকল লোকের পিঠের উপর দমাদ্দম মারিতে সুরু করিল। মিছিলে আমাদের পক্ষের লোক এত ঢিমা চালে চলিতেছিল যে, কাদার গোলা পিঠের উপর ও পায়ের উপর ধপাধপ পড়িতেছে তবু কেহ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মিছিলেথ লোকেরা শান্তভাবে চলিতে লাগিল। পুলিসের লোক যাহারা ছিল তাহাদিগকে এরূপ বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে তাহাদিগকে না বলিলে যেন তাহারা ইহার ভিতরে না আসে, মিছিলের সহিত শুধু মিছিলের দলই থাকিবে। দশ পনেরো মিনিট ধরিয়া কাদামাটি ফেলিবার পর, "আদিত বারের" চৌকা হইতে "দারুওয়ালা"র পুল পর্য্যন্ত মিছিলের ঠাট পৌঁছন পর্য্যন্ত এই কর্দ্দম নিক্ষেপকারী লোকদিগের মধ্যে কেহ

কেহ কেহ কাঠি ও পাথর ফেলিতে সুরু করিল। তাহার দরুণ যদিও কোন প্রধান লোকের অনিষ্ট হয় নাই তথাপি শুধু পাঁচ ছয় জন গরিব লোকের গায়ে আঘাত লাগিয়াছিল ও তাহারা জখমও হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া পুলিস আসিয়া পড়ায় এই গুণ্ডালোকেরা পলাতক হইল এবং তাহার পর এই শোভাযাত্রা শান্ত-ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঔষধোপচার করিবার জন্য জখমী লোকদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইল। তাহার পর, আমার স্বামী বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কাপড় চোপড় কাদার গোলায় স্থানে স্থানে ভরিয়া গিয়াছে; তখন সমস্ত কাপড় ফেলিয়া দিয়া অন্য কাপড় পরিলেন। কাপড় ছাড়িবার পর নিকটস্থ ঘরের লোকেরা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুলিস বরাবর সঙ্গে ছিল তবু তাঁর কাপড়ে কাদা লাগিল কি করিয়া? তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কেন লাগিল? সকলের মধ্যে আমি যখন ছিলুম, তখন আমার গায়ে লাগবে না কেন? দলাদলির কাজে এই-রূপই হয়ে থাকে। অপর পক্ষের লোকেরা ছোটই হোক্ কি বড়ই হোক্, তারা কি কারও পরোয়া রাখে? এই সময়ে মান-অপমানের বিচার আমাদের মনেই বা আস্‌বে কেন? এই সব বিষয় এই রকম করেই চালাতে হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

সাগরের প্রতি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বার-অ্যাট-ল)

হে জলধি! কার তরে, কর হা হুতাশ?
কার তরে নিরন্তর ফেল দীর্ঘশ্বাস?
হে নীলাম্বু! কারে তুমি ডাক সকাতরে?
কারে তুমি খোঁজ যুগ-যুগান্তর ধরে?
কি রত্ন খুঁজিছ বল ওহে রত্নাকর!
প্রসারি সহস্র বাহু সৈকত উপর?
হারায়েছ কি কমলা কমল-নয়না?
বুঝিছি হে সিন্ধু তব মরম বেদনা॥

আয় ব্যয়।

১৮৩৯ শকের বৈশাখ অবধি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আয় ও ব্যয় আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	২০৪১॥৶৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৸১১
সমষ্টি	... ...	২০৪৫।৶৫
ব্যয়	... ...	২০৪৫॥৩
স্থিত	... ...	৶২

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৭০২॥৶০
বণ্ডেড্ ওয়ার হাউস	৫০৲
কাগজের সুদ	৫০৸৬
মাসিক দান	৬০০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৫॥৬
হাওলাত আদায়	২০॥৶৬
গচ্ছিত আদায়	৮০০৸৩
হাওলাত জমা	১২৮।/০

একাকালীন দান।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	:৲
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
,, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	১৲
শ্রীযুক্ত শৈলেন চন্দ্র সেন	১৲
,, চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	১॥০
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	২৲
,, তমুজা দেবী	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲
	১৫॥০

বাৎসরিক দান।

শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	১০৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৪৲
	১৭০২॥৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৬।৶০

পত্রিকার মূল্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকর ১৮৩৮ শক	৬৲
,, প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কলেজ ,,	৩৲
,, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ,,	৩৲
,, যোগেশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ,,	৩৲
,, নৃত্যগোপাল গোস্বামী ১৮৩৭ ও ১৮৩৮শক	৪৶০
ডি, আর, ঘোষ স্কোয়ার ১৮৩৮	৩৲
সম্পাদক কণ্টাই ব্রাহ্মসমাজ ,,	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ,,	৩৲

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন	১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক	৬
,, জয়কালী দত্ত	১৮৩৭	৩
,, নলিনী নাথ দাস গুপ্ত	১৮৩৮	৩
রায় বাহাদুর বসন্তকৃষ্ণ বসু	১৮৩৮	৩
শ্রীযুক্ত তুলসী দাস দত্ত	,,	৩
,, শ্রীদয়াল রায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
,, সুকুমার হালদার	১৮৩৯	৩
,, প্রকাশচন্দ্র দেব	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
মহাশয় রামচন্দ্র রায়	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯	১২
শ্রীযুক্ত হিরণ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৮৩৯	১॥০
,, শিশিরকুমার দত্ত	,,	১॥০
রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯	১১॥/০
রায় বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু	১৮৩৯	৩
শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী	,,	১॥০
,, বেহারীলাল মল্লিক	,,	৩
,, কিশোরীলাল দত্ত	,,	৩
,, সন্তোষকুমার লাহিড়ী	,,	৩
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৩৮ ও ১৮৩৯	৬
,, কাশীনাথ রুদ্র সরকার	১৮৩৯	২
,, কনকচন্দ্র বড়াল	,,	২
মাননীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	,,	৩
শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়	,,	৩
,, ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী	,,	২
ডাক্তার চূণীলাল বসু রায় বাহাদুর	,,	৩
		১১৮৸৵০
ডাকমাশুল		৬।০
নগদ বিক্রয়		১।০
		১২৬৷৵০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	...	৪।৶০
গচ্ছিত পুস্তক	...	৪১।০
কমিশন	...	৵৬
মাশুল	...	৩।৵০
সমষ্টি		৪৯৶৬

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৭৩
কাগজের মূল্য	৮৫॥০
দপ্তরী	৫
সমষ্টি	১৬৩॥০
মোট	২০৪১॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	২১৩
ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্	১৬॥০
সরঞ্জামী	২॥/০
ট্যাক্স	৫১৸৶৬
লাইসেন্স	১২৲
পায়খানা তৈয়ারী	৯০
পূর্ত্তকার্য্য	১৫৸৶৬
সসপেন্স	৯৫
কোম্পানির কাগজ	১৩৮৸৵০
অন্যান্য	৫৩৶৩
গচ্ছিত	৭০৭॥০
সমষ্টি	১৩৯৬॥/৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

কাগজ	৭৩৸/৩
প্রবন্ধ	৪৭/০
মাশুল	১৭৻৬
কর্ম্মচারীর বেতন	২৫
সমষ্টি	১৬২৸৵৯

পুস্তকালয়।

পুস্তকক্রয়	৸০
গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	২৫॥০
ডাকমাশুল	৩৻৩
কমিশন	৶০
বিবিধ	॥৬
সমষ্টি	২৯৸৶৯

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	২৬২/০
ছাপার কাগজ	১২১৸৶৩
কালী	৪।৵০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৩২৸৬
অন্যান্য	৩৻৸/৯
সমষ্টি	৪৫৬৻৬
মোট	২০৪৫॥৩
সেভিংস ব্যাঙ্ক	১॥৶২
১ কেতা ১৭৬৩৬৬ নং	২০০
১ কেতা ১৬১৮০৯ নং	২০০
১ কেতা ২২৩১৭৯ নং	১০০
১ কেতা ২৮১৭৮০ নং	১০০
১ কেতা ২২৮৮৪৩ নং	১০০
১ কেতা ২২৯৩৩৬ নং	১০০
কোম্পানীর কাগজ ১ কেতা ২৩১১৫২ নং	১০০৲
১ কেতা ২৩২১৪১ নং	১০০
	১০০০
ওয়ার লোন	১০০

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৮৯ সংখ্যা   ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"
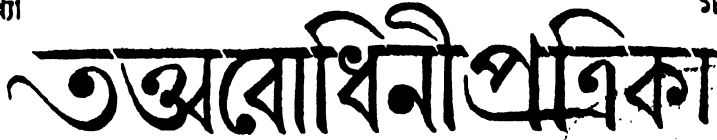
কেন বসে ?

কেন তুমি বসে আছ মলিন হৃদয়ে
অন্ধকার গৃহকোণে যেন কত ভয়ে ?
চারিদিকে দেখ চেয়ে ফুটে ফুলরাশ
হাসি হাসি বিথারিছে মোহন সুবাস ;
তুমি কেন নিরানন্দ কাঁদিছ ফুকারি—
হানিছে কিসের দুঃখ বুকেতে তোমারি ?
ঘাসের পাতায় প্রতি প্রভাত-শিশির
বিশুভ্র হাসির মত দোলে ঝির ঝির ;
ঘাসের সুগন্ধ কিবা মোহিছে পরাণ—
তোমারি পরাণে কেন নাহি জাগে গান ?
গোলাপ কুসুম যত নিজ রক্ত দিয়া
রঞ্জিছে সুরাগে কত জগতের হিয়া ;
আনন্দের মহাগান সাগর ভেদিয়া
উঠিতেছে অবিরাম শোন কান দিয়া ;
তুমি কেন ফেল একা প্রতপ্ত নিশ্বাস—
কল্পনায় পুষ্ট শুধু প্রাণের হুতাশ ?
তোমারি হৃদয়বীণা উঠেনাকো কেন
ঝঙ্কারি বিশ্বের গানে—সাড়াহীন যেন ?
ছেড়ে দাও মলিনতা, ফেলিওনা শ্বাস—
আনন্দ ছেয়েছে বিশ্ব—হয়ো না হতাশ।
রবির কিরণ শত আনন্দ পুলকে
নাচে খেলে পাতে ফুলে পলকে পলকে ;
বনের ভিতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে
লুকোচুরি খেলা করে—কবি মুগ্ধ হেরে।
তুমি কেন বসে যেন শ্রান্ত প্রাণ লয়ে—
চিন্তার পাষাণ ভারে অবনত হয়ে ?
সাগরের উপকূলে কত মেয়ে ছেলে
আনন্দে তরঙ্গ সাথে ছুটে ছুটে খেলে ;
সিন্ধুপৃষ্ঠ হতে আসে হুহু করে বায়—
আনন্দে ফেনিল ঢেয়ে লুটোপুটি খায়।
তুমি কেন নাহি শুধু ভুলিয়া আপন
বিশ্বের আনন্দ মাঝে হও নিগমন ?
এত প্রেম আনন্দের তুফানের মাঝে
কেন না হৃদয় তব দিবানিশি বাজে ?
আনন্দের মূল যিনি তাঁরে হৃদে ধর—
পরাণে জ্বলিছে যাহা আগুন প্রখর,
পরশমণির স্পর্শে করগো নির্ব্বাণ ;—
লভিয়া জীবনী সুধা, কর বিশ্বে দান।

ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাউণ্ট ওকুমার উক্তি।

ভারত-জাপানী সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ জাপানী মন্ত্রীবর কাউণ্ট ওকুমা ভারতের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দু একটি কথা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তিনি বলেন যে 'ভারতবাসীগণ কেবল স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। ভারতবাসীরা যদি

প্রকৃতই স্বাধীনতা লাভ করিতে অভিলাষী হয়, তবে "সর্ব্বাগ্রে তাহারা নিজেদের অমঙ্গলজনক আচার ব্যবহার সকল নির্ম্মূল করুক, এবং চরিত্রে, নীতিবলে ও জ্ঞানে ইংরাজদিগের সহিত সমসূত্রে আপনাদিগকে উন্নতির সোপানে অগ্রসর করুক; তখন তাহাদিগকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা বলিয়া মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন হইবে না, কারণ তখন স্বাধীনতা আপনিই তাহাদিগের হস্তগত হইবে। কিন্তু যদি তাহারা সকল বিষয়ে কেবল পরের ঘাড়েই দোষ চাপাইতে ব্যস্ত থাকিয়া নিজেদের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে ভারতের সৌভাগ্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইবে—পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনাও থাকিবে না।"

কথাটা কেবল ঠিক নহে—অতি ঠিক। তুমি নিজে স্বরচিত অন্ধকার গৃহে আপনাকে কঠোর লৌহনিগড়ে আবদ্ধ করিয়া যদি চীৎকার কর যে প্রতিবেশী কেহ তোমাকে নিগড়মুক্ত করিতেছে না, তাহা কি বাতুলের চীৎকার হইবে না? আবার যদি তুমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখ যে তোমার সেই গৃহের নিকটে কোন প্রতিবেশী পৌঁছিতেও পারিবে না, তবে তুমি সেই অন্ধকার গৃহে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলে প্রতিবেশীকে নিশ্চয়ই তাহার জন্য দোষী করিতে পার না। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি যে কত কুপ্রথা আমাদের সমাজে ঘুণের মত অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন করিয়া দিতেছে, তবুতো সেই সকল কুপ্রথা আমরা পরিত্যাগ করিতে সাহস করি না। কেবল তাহাই নহে, সেই সকল কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইলেও আমরা তাহাতে বাধা দিই এবং কুপ্রথা সকল স্থায়ী রাখিতে পারিলে আমরা নিজেদের জয়জয়কার করিয়া কত না উৎফুল্ল হই।

বাল্যবিবাহের বিষয় দেখ না কেন। আমরা দেখিতেছি, বুঝিতেছি যে বাল্যবিবাহে আমাদের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তবু তো আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহি না। এই বিষয়ক শাস্ত্রোক্তির ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দোহাই দিয়া তাহারই আশ্রয়ে শান্তিময় সুখস্বপ্নের মোহে নিমগ্ন থাকিতে চাহি। সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া, গভর্ণমেণ্ট যখন সম্মতি-আইন বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কত না বাধা কত-না বিঘ্ন আমরা তাঁহাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলাম। গভর্ণমেণ্ট যদি স্বার্থপর হইয়া নিজেদের স্বার্থের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন করিতে গিয়া একটা বৃহৎ আন্দোলনের ঝড় উপস্থিত করিতেন না, বরঞ্চ বাল্যবিবাহ রক্ষা করিবার পক্ষপাতী হইতেন, কারণ বাল্যবিবাহের ফলে নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য জাতিকে শাসন করিতে তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা সত্যসত্যই বাল্যবিবাহকে মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা উহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে আমরা তত দোষাবহ মনে করি না। কিন্তু যাঁহারা বাল্যবিবাহের অপকারিতা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যে সমাজে একটা নাড়াচাড়া আসিবার ভয়ে অথবা শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে, শাস্ত্রবিপরীত কার্য্য হইবে এই আশঙ্কামাত্র করিয়া বাল্যবিবাহের রক্ষাকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েন, সেইটুকুই দুঃখের বিষয়। সম্মতি আইনের আন্দোলনফলে বুঝিয়াছি যে দেশে এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই বেশী।

শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দোহাই দিবার কথা আমরা উপরে বলিয়া আসিলাম। আমরা শাস্ত্রের কিরূপ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহার একটি হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতফেরত স্থির করিলেন যে সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহার নিজের "জাতে" উঠা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামের একস্থানে তাঁহার স্ব শ্রেণীর অনেক "ঘর" বাস করিতেন। তাঁহার কোন বন্ধু সেই মণ্ডলীর সকলকেই এ বিষয়ে সম্মত করাইতে পারিলেন, কিন্তু একটী মোড়ল-গোছের বৃদ্ধের সম্মতি কিছুতেই পাইলেন না। বৃদ্ধ সম্মতি না দিলে অন্যান্য লোকেরা প্রকাশ্যে সম্মতি দিতে পারিতেছেন না। কাজেই এই অবস্থায় বন্ধুটী সেই বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি প্রতিদিনই সেই বৃদ্ধের সঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, একবার বিলাতফেরতকে জাতে উঠাইলে সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। একদিন কথায় কথায়

বন্ধুটী তাঁহাকে বলিলেন যে যখন শাস্ত্রেই আছে যে কলিতে সমস্ত একাকার হইবে, তখন সেই একাকার হইবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মোচিত কার্য্য হইবে। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধটীরও চমক ভাঙ্গিল। তখন তিনি মহাবিজ্ঞের ন্যায় বলিলেন যে "তাও তো বটে—যখন শাস্ত্রেই আছে যে কলিতে সকলই একাকার হইবে, তখন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পরিবর্ত্তে তাহার সমর্থন করা উচিত।" এইরূপ বলিয়া তিনি জাতে উঠিবার পক্ষে সম্মতি দিলেন, বিলাতফেরত ব্যক্তিও জাতে উঠিলেন।

বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধকে কোলাহল কলরবের উৎস করিতে চাহি না। তবে, সোজাসুজি হিসাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে তাহার ফলে গৃহে দুর্ভিক্ষ ও অনাশনের করাল ছায়া আসিয়া দেখা দেয়। বালকবালিকার বাল্যবিবাহ হইয়া গেল। বালিকা যৌবনে পদক্ষেপ করা অবধি বন্যার মত "বর্ষে বর্ষে পুত্রকন্যা" প্রসূত হইতে লাগিল। তাহার ফলে নবদম্পতী নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার এবং সন্তান লালনপালনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার অনেক পূর্ব্বেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে ও অসম্মতিতেই সন্তান পালনের গুরুতর পাষাণভার মস্তকে লইয়া বসিয়া রহিল। কাজেই তখন বাল-পিতা হা চাকরী যো চাকরী করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘুরিতে লাগিল। যাঁহারাই চাকরী করিয়াছেন—সে চাকরী যতই ছোট হউক, আর যতই বড় হউক,—তাঁহারাই মুখে স্বীকার না করিলেও মনে স্বীকার করিবেন যে চাকরীর মত হৃদয়ের বলবীর্য্য, আত্মার স্বাধীনতা নষ্ট করিবার দ্বিতীয় উপায় দেখা যায় না। যদি বা সামান্য বেতনের একটা চাকরী জুটিল, তাহাতে বালদম্পতী ছেলেপিলেদের মানুষ করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সেই চাকুরে স্বামী নানাবিধ অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে গিয়া দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইল, অথবা অনশন প্রভৃতি নানা উপায়ে স্বীয় জীবনধ্বংসে অগ্রসর হইল। একবার আমাদের খ্যাতনামা কোন বন্ধু তাঁহার একটী আত্মীয়কে আমাদের নিকট চাকরীর জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের অধীনে কোন পদ খালি না থাকাতে একটী পত্রসহ আমরা সেই লোকটীকে ফেরত পাঠাইলাম। তদুত্তরে আমাদের বন্ধুটী তাঁহার আত্মীয়কে অন্তত একটী চাপরাশীর পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার কারণ লিখিলেন এই যে, আত্মীয়টী বাল্যবিবাহের ফলে অনেকগুলি পুত্রকন্যার পিতা হইয়া পড়িয়াছে, এবং এক্ষণে চাকরী না পাইলে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত। এরূপ একটী নহে, অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার কালে বাল্যবিবাহ লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এদেশপ্রচলিত কুপ্রথাসমূহের মধ্যে বাল্যবিবাহের বিষয়ই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কুপ্রথা আমাদের সমাজে ক্ষয়রোগের ন্যায় ধ্বংস সাধন করিতেছে, সেই সকল কুপ্রথার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যে আমরা কিপ্রকার অম্লানবদনে সেগুলি সহ্য করিতে পারি তাহারই আরো দু একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বাল্যবিবাহের উপকারিতা অপকারিতা লইয়া মতভেদ আছে। ভাল, বাল্যবিবাহের কথা ছাড়িয়া দাও। যে বিষয়ে মতভেদ নাই এমন একটী বিষয় ধরা যাক। বিবাহে পণ লইবার প্রথা যে আমাদের সমাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই পণপ্রথার যজ্ঞে স্নেহলতাপ্রমুখ কতগুলি বালিকা যে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে, কয়জন তাহা গণনা করিয়াছে? কলিকাতা ও কলিকাতার ন্যায় বড় বড় সহরে যে সকল বালিকা বিশেষভাবে পণপ্রথার কারণে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ্যে ঘোষিত হইয়াছে, সেইরূপ দুই চারিটী আত্মহত্যার কথা আমরা জানিতে পারি। তাহাও আমরা জানিতে পারি, যখন কোন বালিকা নূতন প্রথামতে কেরোসিনে আত্মহত্যা করে। পল্লীগ্রামে এবং বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত প্রথামতে অহিফেন প্রভৃতি সেবনে যে সকল বালিকা পণপ্রথার যজ্ঞে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে, তাহাদের বিষয় কয়জনই বা খোঁজ রাখিয়াছে—সংখ্যা করা তো দূরের কথা।

এই পণপ্রথা লইয়া কত বক্তৃতা, কত সভা, কত লেখালেখি, কত শপথগ্রহণ হইয়া গেল, কিন্তু সমাজকে বুকে হাত দিয়া ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতে বল দিকিন যে, সমাজের কয়জন সত্যসত্য স্বস্ব পরিবারের বিবাহকার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে পণ বলিয়া না হউক, পাকেপ্রকারে নানাবিধ কৌশল অবলম্বনে পণগ্রহণে ক্ষান্ত আছেন? দেখিবে যে সুবৃহৎ হিন্দুসমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত কেহই বোধ হয় পণগ্রহণ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে দিন একটী সংবাদ-পত্রে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, যে স্নেহলতা সর্ব্বপ্রকার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া কেরোসিনের ভয়াবহ অগ্নিতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভগবানের চরণে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য পরলোকে প্রস্থান করিলেন, যে স্নেহলতা পিতাকে পণপ্রথার হস্ত হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না, সেই স্নেহলতার কোন পরমাত্মীয় নাকি নিজের পুত্রের বিবাহে অকুণ্ঠিতচিত্তে রীতিমত পণ আদায় করিয়াছেন! "মর্ম্মাহত" অপেক্ষা যদি আর কোন কঠোরতর শব্দ বঙ্গভাষায় থাকে, তবে তাহা দ্বারাও আমাদের মনের ভাব সম্যক ব্যক্ত হয় কি না সন্দেহ। আশা করি এসংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে কোন বঙ্গবাসী, বিশেষত স্নেহলতার আত্মীয়, কন্যাপক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পণগ্রহণে উদ্যত হয়েন, করুণাময়ী স্নেহলতার মূর্ত্তি কি সেই সময়ে পুত্রের পিতার সম্মুখে আবির্ভূত হয় না? যাহারা পণগ্রহণ করিয়া মাতৃস্থানীয়া বালিকাগণের বধ সাধনের উপায় হয়, তাহাদের মত স্নেহহীন লজ্জাহীন পাষাণপ্রাণ মনুষ্যও আবার সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া অকুতোভয়ে বিচরণ করে! সমাজ যে এত অত্যাচার কিরূপে সহ্য করে ইহাই আশ্চর্য্য! এই সেদিন শুনিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী খ্যাতনামা কোন ব্যক্তি তাঁহার পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে অম্লানবদনে "দেড়েমুষে" পণ আদায় করিয়া লইয়াছেন। এমন সমাজের প্রতি কাহার আস্থা থাকিতে পারে? এমন সমাজ যত শীঘ্র অন্তর্হিত হইয়া নবতর সমাজের জন্মদান করে ততই মঙ্গল। পণপ্রথা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে গেলে আমরা নানাবিধ ভীষণ হইতে ভীষণতর সামাজিক পাপোৎপত্তির যে প্রকার সহায়তা করিতেছি, তাহাতে ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে এরূপ সমাজ চিরকাল অটুট থাকিতে পারে না, এবং অটুট থাকা বাঞ্ছনীয়ও নহে। আমাদের পুণ্যযশা পিতৃপিতামহগণ তর্পণকালে আমাদের প্রদত্ত জল নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন না—আমরা তো প্রকৃত পক্ষে অনাচরণীয় জাতি হইয়া পড়িয়াছি। বৈদিক সম্প্রদায় প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় এই পণপ্রথার আবর্ত্তের বাহিরে ছিল, সর্প কর্ত্তৃক যেমন ভেক আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই ভীষণ সত্রে সেই সকল সম্প্রদায়ও অল্পে অল্পে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিতে পাই।

সমাজের আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে পণপ্রথার অনুরূপ অমঙ্গলোৎপাদক কত যে ভীষণ প্রথা দেখা যাইবে তাহার বোধ হয় সংখ্যা হয় না। বঙ্গদেশে, প্রধানত পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে, কতকগুলি শ্রেণী আছে; সেই সকল শ্রেণীস্থ অনেকে বিধবা হইলেই পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে বৈষ্ণবী করিয়া দিয়া গৃহ হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। ইহা বাড়িতে বাড়িতে প্রায় প্রথায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। বৈষ্ণবী করিয়া দিবার অর্থ ও পরিণাম কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। সেই সকল গৃহ-বিতাড়িত নরক-কুণ্ডে বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত স্ত্রীলোকের চক্ষের জল, মর্ম্মোত্থিত অভিসম্পাত কি আমাদের সমাজের উপরে অগ্নি বর্ষণ করিবে না? তাহারা যে মমন্তুদ আঘাত সহ্য করিবে, সেই সকল আঘাতের প্রতিঘাত কি ততই ভীষণ হইবে না? সেই প্রতিঘাতের উত্তাল তরঙ্গরাজির সম্মুখে কি সমাজ, জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, জীবিত থাকিবে বলিয়া আশা হয়? যে কেহ একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই প্রকার কদাচারসমূহকে প্রশ্রয় দিবার ফলে সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের কিরূপ অভাব হইতে থাকে, এবং ব্রহ্মচর্য্যের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা হীনবীর্য্য হওয়াতে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসরই হইতে পারে না, প্রত্যুত মরণেরই পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের

জন্য যে স্ফূর্ত্তি চাই, যে দৃঢ়তা চাই, বিলাসিতার প্রতি যে অবজ্ঞা চাই, হীনবীর্য্য চঞ্চলচিত্ত লোকদিগের নিকটে সে স্ফূর্ত্তি, সে দৃঢ়তা, বিলাসিতার প্রতি সে অবজ্ঞা দেখিবার আশা কোথায় ?

আমরা কাউণ্ট ওকুমার সহিত একহৃদয়ে বারম্বার বলিব যে আমরা দেশের অমঙ্গলপ্রসূ আচার ব্যবহার নির্ম্মূল করিলে স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া আমাদের নিকটে ধরা দিবে।

আমরা স্বাধীনতা চাই—কেন ? স্বাধীনতালাভের পরিণামে সুখ পাইব এই আশায়। আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"

পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ এবং আত্মবশ হওয়াই সুখের কারণ। ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইলে আমার শরীরই যখন নষ্ট হইল, শরীর বিষয়েই যখন আমি প্রত্যেক পদে আমার আত্মীয়স্বজন চিকিৎসক প্রভৃতির পরাধীন হইয়া পড়িলাম, তখন তো আমার প্রতিপদেই দুঃখ। পথে চলিবার জন্য আমার গাড়ীঘোড়া চাই, কারণ আমার আর পূর্ব্বের মত চলিবার শক্তি নাই। প্রতিপদে আমার ঔষধ সেবন করা চাই, কারণ আমার আর পূর্ব্বের মত পরিপাক করিবার শক্তি নাই। এইরূপে দেখি যে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবার কারণে প্রতি পদক্ষেপে আমি পরবশ হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় আমার স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করা বৃথা। স্বাধীনতার অর্থ যদি আত্মবশ হওয়া হয়, তবে তাহার মূল উৎস হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রথমেই তো বিলাসের প্রতি অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে। এইখানেই তো আমি এতটা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে সে স্বাধীনতার পরিমাণ কল্পনাও করিতে পারিব না। ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইতে পারিলে তোমার বিলাতী দ্রব্যকে বয়কট করিবার জন্য বিরোধবিবাদমূলক এত চেষ্টাও করিতে হইবে না—তখন যে স্বদেশী মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তোমার আনন্দ স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।

ব্রহ্মচর্য্যের উপর না দাঁড়াইয়া আমরা বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম বলিয়া আমাদের সে উদ্যম অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইল—নিষ্ফল হইবারই যে কথা। আমরা জানি ও নিত্যই দেখিতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁহারা বিলাতী জিনিস বয়কট করিবার মন্ত্রপ্রদানে বড় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া বিলাতী বিলাসদ্রব্য ভারে ভারে ক্রয় ও ব্যবহার করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত সুখী বোধ করেন। আমরা বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিবার সপক্ষে যে বলিতেছি, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। বরঞ্চ আমরা বয়কট প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইতে না পারিলে আমরা বিলাস বর্জ্জন করিতে পারিব না, এবং কাজেই তাহার ফলে কেবল বিলাতের কাছে কেন, সমগ্র জগতের দ্বারে আমাদিগকে ভিখারীর বেশে হাত পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের উপর দাঁড়াইলে যেখানে দুই পয়সায় চলিতে পারে, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সেখানে কুড়ি কেন, দুই শত টাকাতেও পোষায় কি না সন্দেহ।

ভগবান এমন সোনার ভারতবর্ষে আমাদের জন্ম দিয়াছেন, যেখানে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিলেও বলিতে ইচ্ছা হয় যে "এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি"। ইচ্ছা করিলে এই জন্মভূমি জননীর কাছে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সর্ব্বপ্রকার ধনরত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার পাইতে পারি। কিন্তু আমরা নিতান্তই হতভাগ্য যে, আমরা সে ভাণ্ডারের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না—দেশের হীরক ছাড়িয়া বিদেশের কাচে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। যে অন্তর্দৃষ্টির বলে মানুষ উন্নত হয়, আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া নিজের অবনতির কারণ সকল দূর করিতে সমর্থ হয়, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সেই অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব হয়, এবং তখন আমাদের কিসে উন্নতি হয়, আর কিসে অবনতি হয়, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না—স্বদেশ, স্বাধীনতা, এ সকল কথার কোনই অর্থ তখন আমাদের নিকটে প্রকাশ পায় না।

কাউণ্ট ওকুমা যথার্থই বলিয়াছেন যে "অন্তর্দৃষ্টির মাত্রা অনুসারেই একটা জাতির উন্নতি বা

অবনতি প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা হিন্দুদিগের মধ্যে কথোপকথনের জন্য পরম উপাদেয় বিষয়। ইংরাজ-জাতির অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কিছু অন্যায় নহে, এবং তাহা শুনিতে বলিতেও লাগে ভাল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা স্বপ্নের বিষয়মাত্র—নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। যে জাতি নিজের কদাচার সকল বিদূরিত করিয়াছে, এবং নিজের চরিত্র উন্নত করিয়া অপরাপর ক্ষমতাশালী ও উত্থানশীল জাতির সহিত সমধর্ম্মী হইয়াছে, সেই জাতির পক্ষেই স্বাধীনতার কথা বলা শোভা পায়।”

কাউণ্ট ওকুমা আর একটী অত্যন্ত সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে একটা মহাদেশের বিনাশ আসলে তাহার বাহির হইতে আসে না, ভিতর হইতেই আসে। “কাষ্ঠখণ্ড কীটদষ্ট হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে ‘পচ’ ধরিয়া থাকে। পুরাকাল অবধি ভারতবর্ষ অনেক বিদেশী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর স্পেন, পর্ত্তুগাল, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক আক্রমণের ফলে ভারতের অগাধ ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে তাহার শিল্প, কলাবিদ্যা ও সাহিত্যের অবনতি সম্পূর্ণ হইল। এই সকলের জন্য কে দায়ী? আমি বলিতেছি যে ইহার জন্য ঐ সকল আক্রমণকারী জাতিগণের কোনটাই দায়ী নহে, ভারতবর্ষ আপনাকেই আপনি নষ্ট করিয়াছে।”

ওকুমা একটী চিরন্তন সত্য অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। “কাষ্ঠখণ্ড কীটদষ্ট হইবার পূর্ব্বেই পচিয়া যায়।” কাষ্ঠখণ্ড পচিয়া না গেলে তাহাতে সহজে কীট প্রবেশ করিতে পারে না; পচিয়া যাইবার পরই তাহাতে সহস্র প্রকার কীট প্রবেশ করিয়া আপনাপন বাসা নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং পরিণামে কাষ্ঠখণ্ড স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার পথে অগ্রসর হয়। ভারতসমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বোধ হয় খুবই খাটে। এক সময়ে যখন ভারতের আর্য্যদের মধ্যে একতা ছিল, যখন প্রতিদিন প্রভাতে ভারতের অরণ্য সকল ঋষিদের বেদগানে মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন কোন্ জাতি বাহির হইতে আসিয়া ভারতভূমিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? একটী জাতিও নহে। ভারতসমাজের সকল ভেদের মূল, সকল অবনতির মূল জন্মগত জাতিভেদের নিষ্ঠুর গণ্ডী তখন তো সমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই—এক কথায়, তখনও সমাজে ‘পচ’ ধরে নাই। সমাজের উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্গে নানা বিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে নাই, কারণ তখনও কর্ম্মের বিভাগই সেই বিভাগসমূহের সেই জাতিভেদের মূল ছিল। অবশেষে সেই বিভাগের ফলে সমাজের কয়েকটী অঙ্গ যখন অর্থে ও ক্ষমতায় অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইল, তখন তাহারা আপনাদিগের মানমর্য্যাদা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থিরতর রাখিবার উদ্দেশ্যে সেই বিভাগ বা জাতিভেদকে জন্মগত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল। হয় তাহারা বুঝিতে পারে নাই, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বুঝিতে চাহে নাই যে, জাতিভেদকে জন্মগত করিবার ফলে, আত্মবিভাগ বা গৃহবিচ্ছেদকে চিরকালের জন্য স্থিরতর রাখিবার ফলে, সমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—সমাজে পচ ধরিবে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে তাহার ফলে সমাজে রীতিমত পচ ধরিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। সত্যযুগের বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের সমরবার্ত্তায়, ত্রেতাযুগে শূদ্রকমুনির শিরশ্ছেদনে এবং পরশুরামের ধরণীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার সম্বাদে এবং দ্বাপরযুগে মহাভারতোক্ত নানা ঘটনায়, জন্মগত জাতিভেদের ফলে সমাজে পচ ধরিবার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভারতের যুদ্ধের পর অবধি ভারতের সমাজে আত্মবিচ্ছেদ ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং তখনই বাহির হইতে গ্রীক, মুসলমান প্রভৃতি বহিঃশত্রুগণ আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সাহস করিয়াছিল। জন্মগত জাতিভেদের কারণে সমাজ যেভাবে বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কখনই মঙ্গলের আশা করা যায় না। সমাজ ‘চটকস্য মাংসং শতধা বিভক্তং’ হইয়া টুকরো টুকরো হইলে কি প্রকারে মঙ্গলজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে? এই জাতিভেদের কুফল তো আমরা প্রতিপদেই উপলব্ধি করিতেছি, তবু কত যুক্তি দেখাইয়া আমরা তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করি? জাপানে এক সময় এই প্রকার বিষময় জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল,

কিন্তু জাপানবাসীগণ যখনি তাহার কুফল বুঝিতে পারিল. তৎক্ষণাৎ তাহাকে জাপান হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিয়া মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। তাহার ফলে আজ দুই হস্ত পরিমিত জাপান দেশ সমস্ত জগতের নমস্য হইয়া উঠিয়াছে। জন্মগত জাতিভেদ আমাদের দেশে যেভাবে চলিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের সমাজে যে প্রকার ছুঁই-ছুঁই-ভাব চলে, তাহাতে কোন ভাল কাজ কি আমরা পরস্পর প্রাণ দিয়া মিলিয়া মিশিয়া করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারি? মনে কর, দেশের জন্য ৫৬টি জাতির এক একটী লোক লইয়া একটী সৈন্যদল সংগঠিত হইল। যদি এই ৫৬টী লোক একসঙ্গে আহারাদি না করে, যদি তাহারা প্রত্যেকে এক একটী পৃথক "চুলা"র বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের কাছে দেশরক্ষার আশা খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না। তাহারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে অথবা নিজের নিজের আহারের বন্দোবস্তেই মনোনিবেশ করিবে? আমাদের দেশে একটী প্রবাদই প্রচলিত আছে—বারো রাজপুত তেরো চুল্লী। কেবল তাহাই নহে। এই ৫৬টী জাতির আবার কত উপবিভাগ আছে। আমরা দেখিয়াছি যে কুলীন প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও—বিভিন্ন জাতির কথা দূরে থাক—অনেকস্থলে আহারাদি চলে না। জাতিভেদ উঠিয়া গেলে ভাবিয়া দেখ যে সকল বিষয়েই কি একটা মহান্ ক্ষেত্র খুলিয়া যায়!

এই প্রকারে আমরা দেখিতেছি যে আমরা এত হীনবীর্য্য যে, কদাচারসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যে স্বাধীনতাটুকু আনিবার ক্ষমতা আমাদের হাতের মধ্যে আছে, সেই স্বাধীনতাটুকুও আনিতে আমরা সাহস করি না, অথচ স্বাধীনতা দাও বলিয়া ভিক্ষার বিকট চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হই না। আমরা কাউণ্ট ওকুমার সহিত একবাক্যে শতবার বলিব যে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে আমাদের দেশ হইতে আমাদের সমাজ হইতে সর্ব্বপ্রকার কদাচার দুর্নীতি বিদূরিত করা এবং চরিত্রে, নীতিতে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে আপনাদিগকে এবং সেই সঙ্গে সকল দেশবাসীকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিবার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে যদি আমরা প্রাণপণে যত্ন করি, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হই—কেনই বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইব না, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর যে তখন আমাদের পরম সহায় হইবেন—তখন স্বাধীনতাধন তো হস্তগত হই-বে নহে—হইয়া-ছে।

তন্ত্রের দার্শনিক মত।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বিবিধ শাস্ত্রের উর্ব্বর ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কত-প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা সাধারণ দার্শনিক সমাজেও এপর্য্যন্ত সুপরিচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের সুধীসমাজে অনুশীলনীয় যে সমস্ত শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কাব্যে নাটকে দর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে, ব্যাকরণের অনেক স্থান দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, জ্যোতিষে দর্শনের কথা আছে, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিতো দার্শনিক রহস্যে পরিপূর্ণ প্রতিভাত হয়।

এ ত গেল সাধারণের অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রের কথা। গুরুগম্য রহস্যপূর্ণ মন্ত্রবিদ্যা বা বিপুল তন্ত্রশাস্ত্রও দর্শনের সমুদ্র বলিয়া উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রের মৌলিকত্বে যে সকল দর্শন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই স্থলে আমরা সেই গুলিরই আলোচনা করিব।

কুলার্ণব রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রের অনেক স্থলেই ষড়্‌দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। * এই সকল তন্ত্র সমস্বরে ষড়্‌দর্শনকে মহাকূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। ইহাতে পাঠকের মনে আপাততঃ একপ্রকার প্রশ্নের আবির্ভাব হইতে পারে যে—ষড়্‌দর্শন ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর অবলম্বনীয় দর্শন আর থাকে কি? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে, ভারতে দর্শনের ইয়ত্তা নাই। বিবিধ শাস্ত্র অনুশীলন করিলে অনেক নূতন নূতন দর্শনের মত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, সাধারণের নিকট পরিচিত যে ষড়্‌দর্শন, ষড়্‌দর্শন শব্দে এতদতিরিক্ত ষড়্‌দর্শনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। স্বগৃ-

---

* ষড়্‌দর্শনমহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিযন্ত্রিতাঃ।
[কুলার্ণবতন্ত্র ১ম পটল]

হীতনামা মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যে অন্য প্রকার ষড়্দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ষড়্দর্শন পুরাণসম্মত। পুরাণসার নামক গ্রন্থ হইতে উহাদের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। যথা—

"শৈবঞ্চ বৈষ্ণবং শাক্তং সৌরং বৈনায়কন্তথা।
স্কান্দঞ্চ ভক্তিমার্গস্য দর্শনানি ষড়েবহি॥"

ইহার অর্থ—শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সৌর বৈনায়ক অর্থাৎ গাণপত্য ও স্কান্দ, ভক্তিমার্গের এই ছয় প্রকার দর্শন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তন্ত্রশাস্ত্রে যে ষড়্দর্শনের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানের মোক্ষসাধনতা-প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ সাংখ্যাদি দর্শন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তির মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপ্রধান পৌরাণিক দর্শনের সহিত তান্ত্রিক দর্শনের সর্ব্বথা বিরোধ সম্ভবপর হয় না। পুরাণশাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। তন্ত্রেও এই মতই সমীচীন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তন্ত্র ও পুরাণ এই উভয়ের অনেক বিষয়েই ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তান্ত্রিক দর্শনে অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এতদুভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে অধুনা দৃশ্যমান তন্ত্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতেরই যেন অধিকতর আভাস পাওয়া যায়। আমরা ক্রমে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

তান্ত্রিক দর্শনসম্মত কতকগুলি পদার্থ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি বেদান্তসম্মত, এবং অনেকগুলি উহার নিজস্ব বলিয়া উল্লেখযোগ্য। উহার মতে তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থগত সংখ্যার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—শৈবতত্ত্বের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ, বৈষ্ণব তত্ত্বের সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ, মৈত্র অর্থাৎ সাংখ্যতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি, প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির তত্ত্ব দশ এবং ত্রিপুরসুন্দরীর তত্ত্বসংখ্যা সপ্ত *। ক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রদর্শিত হইবে।

শিবই সৃষ্টির মূলীভূত কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছেন। তিনি সগুণ এবং নির্গুণ এই দুইপ্রকারে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতির অন্য অর্থাৎ অবিদ্যাসম্বন্ধরহিত শিব নির্গুণ এবং মায়াবচ্ছিন্ন শিব সকল বা সগুণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ ও নির্গুণ শিব নামে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেক তন্ত্রে শিব শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মশব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সগুণ শিব মায়াবচ্ছিন্ন এবং সচ্চিদানন্দযুক্ত। ইঁহা হইতেই প্রথমতঃ শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর এই শক্তি হইতে নাদ, এবং নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপ। উহা আবার বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিন্দু শিবস্বরূপ, বীজ শক্তিস্বরূপ এবং এতদুভয়ের পরস্পর মিশ্রণের নাম নাদ।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা এবং বীজ হইতে বামা, এই ত্রিশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই ত্রিশক্তি হইতে যথাক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত ত্রিমূর্ত্তি যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ। এবং ইঁহারাই অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যস্বরূপ।

সৃষ্টির প্রাক্কালে শক্তির বা প্রকৃতির ক্ষোভ অর্থাৎ স্পন্দন উপস্থিত হয়, এই স্পন্দমানশক্তির অবস্থান্তরের নাম পরবিন্দু বা প্রথমবিন্দু। এই বিন্দু হইতে অব্যক্তস্বরূপ রব উৎপন্ন হইয়াছে। আগমশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই অব্যক্ত রবকেই শব্দব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বা শব্দ নামে অভিহিত করেন। শারদাতিলকরচয়িতা লক্ষ্মণ দেশিক বলেন যে, সর্ব্বভূতগত চৈতন্যই শব্দব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই প্রাণিবর্গের দেহ মধ্যে কুণ্ডলীরূপে অবস্থান করেন ও কণ্ঠ তালু প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইয়া গদ্যপদ্যাদিভেদে আবির্ভূত হন। বিন্দুরূপে পরিণত, মায়াবচ্ছিন্ন কালসহায় (কাল যাহার সহকারী) নাদস্বরূপ শম্ভু হইতে জগতের সাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছেন। সদাশিব হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা, এইক্রমে

---

* ষট্‌ত্রিংশচ্ছৈবতত্ত্বানি দ্বাত্রিংশদ্বৈষ্ণবানিতু।
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি মৈত্রাণি প্রকৃতেঃ পুনঃ॥
উক্তানি দশতত্ত্বানি সপ্তচ ত্রিপদাত্মনঃ।
[শারদাতিলক ৫ম পটল]

সাংখ্যের (পুরুষ ভিন্ন) চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তন্ত্রেও গৃহীত হইয়াছে।

উৎপত্তি হইয়াছে। জগতের মূলস্বরূপ সদাশিব বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে গুণাত্মক এবং অন্তঃকরণাত্মক মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শৈবাগম মতে মায়া এবং চৈতন্যাত্মক সদাশিবের অভেদ অভিপ্রেত হইয়াছে; সুতরাং সদাশিবের বিকৃতি শব্দে মায়াংশের বা প্রকৃতিরই বিকৃতি বুঝিতে হইবে। কারণ, সদাশিবের সহিত মায়ার সংপৃক্তভাব সর্ব্বদাই রহিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত মায়া বা প্রকৃতি কোথাও বা বিমর্শ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। বিকৃত সদাশিব হইতে যে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, শৈবাগম মতে উহা বুদ্ধিতত্ত্বেরই নামান্তর। উক্ত মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির ভেদসম্পাদক ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কার সাত্ত্বিক, তৈজস অহঙ্কার রাজস, এবং ভূতাদি অহঙ্কার তামস। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও ব্রহ্মা এই দশটি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। তৈজস অহঙ্কার হইতে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ তন্মাত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞা সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রেও উহার ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং উহা কাহার নিজস্ব তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে অগ্নি, রসতন্মাত্র হইতে জল, এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই উৎপত্তিপ্রক্রিয়া সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হইলেও এইস্থলে তান্ত্রিকদর্শনের অনেকটা স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাংখ্য পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্র আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা এই পাঁচটি কলা অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যথাক্রমে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছে।

নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা শারদাতিলকে "নাদদেহসমুদ্ভব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। টীকাকার রাঘব ভট্ট বায়বীয় সংহিতার প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ শান্ত্যতীতা শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। শান্ত্যতীতা হইতে শান্তি, শান্তি হইতে বিদ্যা, বিদ্যা হইতে প্রতিষ্ঠা, ও প্রতিষ্ঠা হইতে নিবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরনির্ম্মিত সৃষ্টির এই ক্রম। ইহাদের আনুলোম্যে সৃষ্টি এবং প্রাতিলোম্যে সংহার হইয়া থাকে। উক্ত পঞ্চপ্রকার সৃষ্টির অতিরিক্ত আর সৃষ্টি নাই, যেহেতু এই পঞ্চবিধ কলার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

"নাদদেহসমুদ্ভবাঃ" এই পদের অর্থ বড়ই জটিল ইহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায় এবং ইহার সহিত তান্ত্রিক দর্শনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। নাদ হইতে যাহার দেহ অর্থাৎ উৎপত্তি সে নাদদেহ বিন্দু; তাহা হইতে সমুদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছে যাহাদের তাহারাই "নাদদেহ সমুদ্ভব"—সুতরাং সাক্ষাৎ বিন্দু হইতে উৎপন্ন। অথবা নাদ হকার, নাদের (ধ্বনির) দেহ (উৎপত্তি) হয় যাহা হইতে, এই নিরুক্তি অনুসারে "নাদদেহ" শব্দের অর্থ বায়ু অর্থাৎ বায়ুবীজ যকার। ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করিয়া দেহ শব্দের উৎপত্তিরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। মারুত অর্থাৎ বায়ু বক্ষঃস্থলে বিচরণ করিয়া মন্ত্রধ্বনি উৎপাদন করে। "মারুত স্থুরসি চরন্ মন্ত্রং জনয়তি ধ্বনিম্" এই উক্তি হইতে বায়ুবীজ যকারের নাদদেহত্ব অর্থাৎ নাদজনকত্ব জানা যায়। সমুদ্দীপ্যমানা অর্থাৎ দেদীপ্যমানা ভা (দীপ্তি) আছে যাহার, সেই "সমুদ্ভ", এই পদের অর্থ অগ্নি অর্থাৎ বহ্নিবীজ র, এবং "ব" শব্দে বকারই গৃহীত হইয়াছে। ক্রমে হ য র ব ল এই পঞ্চবর্ণের গ্রহণ কর্ত্তব্য হইলেও চারিটি বর্ণের গ্রহণ দেখা যায়, ইহাতে লকারের গ্রহণও বুঝিতে হইবে। ইহারা বিলোমে অর্থাৎ বিপরীতভাবে পঞ্চতন্মাত্রের বীজ। যথা—লকার পৃথিবীর বীজ, বকার জলের বীজ, র বহ্নির বীজ, যকার বায়ুর বীজ এবং হকার আকাশের বীজ। প্রথমতঃ নাদের উল্লেখ হওয়ায় এই সকল বর্ণে বিন্দুযোগও বুঝিতে হইবে। সুতরাং লং বং রং যং হং এই পঞ্চবীজ গৃহীত হইয়াছে।

অথবা নাদ হকার, তাহার দেহ অর্থাৎ স্বরূপ তাহাতে সমুদ্ভব অর্থাৎ স্থিতি আছে যাহার, ঈদৃশ

"আ" অর্থাৎ "আকারাদি দীর্ঘস্বরসমূহ" আ ঈ ঊ ঐ ঔ এই সকল বর্ণে বিন্দুর যোগ বুঝিতে হইবে। ত্রিকোণোত্তর গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, "নাদনামক যে পর (উৎকৃষ্ট) বীজ তাহা সর্ব্বভূতেই অবস্থিত, তাহা মূর্ত্তিদাতা, পরম দিব্য সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, শান্ত সর্ব্বগত শূন্য এবং মাত্রাপঞ্চকে (পঞ্চতন্মাত্রে) অবস্থিত। যদিও এই প্রমাণে বিন্দুর স্পষ্টত উল্লেখ নাই, তথাপি নাদের সহিত বিন্দুর অব্যভিচারি-সম্বন্ধ নিবন্ধন নাদের উল্লেখেই বিন্দুর গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কেহ বলেন যে এই স্থলে দীর্ঘস্বরে ক্রমে ল ব র য হকারের যোগ বুঝিতে হইবে, সুতরাং হ্লাং হ্বাং হ্রূং হৈং হৌং এই সকল বীজ অভিপ্রেত হইয়াছে। এই গুলি পঞ্চীকৃত ভূতের বীজ; এই সকল বীজই ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ নিবৃত্তি প্রভৃতি দেবতার বীজ অর্থাৎ এই সকল বীজকে তাঁহারা নিজের দেহ বলিয়া মনে করেন।

তান্ত্রিক দর্শন শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, সুতরাং বর্ণগুলি বীজ নামে কথিত হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই এক একটি মণ্ডল কথিত হইয়াছে। মণ্ডল শব্দের অর্থ অবস্থানজনিত আকৃতি বিশেষ; অর্থাৎ স্ব স্ব আধারে ইহারা যেভাবে অবস্থিত আছে, তাহাতেই ইহাদের কক্ষের এক একটি আকৃতি হইয়াছে। আকাশের মণ্ডল বৃত্তাকার, বায়ুর মণ্ডল ষড়্বিন্দু চিহ্নযুক্ত বৃত্ত, বহ্নির মণ্ডল স্বস্তিকচিহ্নযুক্ত ত্রিকোণ, জলের মণ্ডল উভয়দিকে পদ্মযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং পৃথিবীর মণ্ডল বজ্রচিহ্নযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার।

তন্ত্র এই পঞ্চভূতের বর্ণবিষয়েও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আকাশ স্বচ্ছ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, অগ্নি রক্তবর্ণ, জল শুভ্রবর্ণ, পৃথিবী পীতবর্ণ। এইস্থলে শারদাতিলকের টীকাকার রাঘব ভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আকাশের এবং বায়ুর পরমার্থতঃ কোনও বর্ণ নাই, কিন্তু ইহাদের উপাসনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে শুভ্র প্রভৃতি বর্ণ কল্পিত হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চভূত এক এক আধারে অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে আকাশ স্বাধার অর্থাৎ স্বশক্তিতেই অবস্থিত, উহার অন্য আধার নাই। বায়ুর আধার আকাশ, তেজের আধার বায়ু, জলের আধার তেজ, এবং পৃথিবীর আধার জল। শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ যথাক্রমে পঞ্চভূতের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সহজ হ'।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আকাশের আলোর সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'
কাননের ফুলের সাথে মিল্‌বি যদি
সহজ হ'!
তরুমর্ম্মর পবন দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে, সেই দোলাতে
দুলবি যদি সহজ হ'!
আমি স্‌নে তোর ঘরের কথা
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ'!
দেখ্‌ রে চেয়ে আকাশ পানে
বিশ্বভুবন ভরা গানে
সেই গানের তালে হৃদয় মেলে
সহজ হ'॥

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের পূর্ব্বের সম্বন্ধজ্‌ রা-ব-বিষ্ণু মো-ভিড়ে আপনার নাশিকস্থ বাগান যখন বেচিতে চাহিলেন, তখন ঐ

---

* মৈত্র শব্দে সাংখ্য এবং ত্রিপদাত্মন্ ত্রিপুরাদেবী, এই উভয়ার্থের সমর্থক রায়বীয় সংহিতার প্রমাণ রাঘবভট্টের টীকা হইতে উদ্ধৃত হইল। মৈত্রাণি সাংখ্যানি। তদুক্তং বায়বীয় সংহিতায়াং— "পৌরাণানিচ তত্ত্বানি ত্রিপুরায়াশ্চ কানিচিৎ সাংখ্যযোগপ্রসিদ্ধানি তত্ত্বান্যপিচ কানিচিৎ" শিবশাস্ত্র প্রসিদ্ধানি ততোহন্যান্যপি কৃৎস্নশঃ ইতি। ত্রিপদাত্মনঃ ত্রিপুরায়াঃ। রাঘবভট্ট।

সারদা তিলকের প্রামাণ্য সম্বন্ধে হিন্দুসম্প্রদায়ের কোনও সন্দেহ নাই। টীকাকার রাঘব ভট্টও নিরতিশয় বিশ্বাসভাজন বলিয়া পরিচিত।

বাগান আমরা কিনিলাম। এই বাগানটি আমাদের কাজের ও আমোদের আর একটি স্থান বেশী হইল। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বাগানে গিয়া লোকজনের কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ও তাহাদের কৃত কর্ম্মের তদারক করা—এই নিয়ম করিয়াছিলাম। সকালে আমি একলাই বাগানে হাঁটিয়া যাইতাম। কিন্তু "উনি" সন্ধ্যাকালে কোর্ট হইতে গৃহে আসিলে পর আমরা দুজন ও আমার দেবর ভাউজী আমরা টাঙ্গা করিয়া বাগানের দিকে বেড়াইতে যাইতাম। সেখানে দুই এক ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় বেড়িয়া বেড়াইয়া আনন্দে গল্প-স্বল্প করিয়া, ও সকাল হইতে লোকজনেরা কি কি কাজ করিল, উনি তাহার জিজ্ঞাসাবাদ করিলে পর আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতাম। গৃহে আসিয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম-অনুসারে আমার ইংরেজি পাঠ পড়িয়া লইয়া নূতন পাঠের শব্দ বলিতে বলিতে তখনই এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। পরে, খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে প্রায় দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত আমাকে দিয়া উনি মারাঠী পড়া পড়াইয়া লইলে পর আমরা ঘুমাইতে যাইতাম। তাহার পর প্রভাতে নিত্যনিয়মানুসারে চারিটার সময় উঠিয়া সকাল বেলায় আমি একলাই সিপাই সঙ্গে লইয়া বাগান যাইতাম, তাই "উনি" এক ঘণ্টা আমার "পড়া লইয়া" তাহার পর পাঁচটা বাজিলে আমাকে বলিতেন—"তোমার বাগানে যাবার সময় হয়েছে তুমি যাও।" আমি আমাদের বেতনভোগী বুড়া সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম। পরে উনি ভাউজিকে উঠাইয়া তাহাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন ও ছয়টা বাজিলে তাহাকে অনুলিপি (Copy) লিখিতে বসাইয়া দিয়া "উনি" আপনার নিত্যক্রম আরম্ভ করিতেন। এখন, আমি বাগানে যাইবার সময় সখারাম নামে যে সিপাইকে সঙ্গে লইতাম, তাহার "বারকরী" সম্প্রদায়ের সাধুসন্তের অনেক কথা জানা ছিল এবং সে অনেক "অভঙ্গ"ও আবৃত্তি করিত। প্রথম প্রথম রাস্তায় চলিতে চলিতে সে আপন মনেই গুন্-গুন্ করিত। আমি না বলিলে, সে আপনা হইতে কোন কথা কহিত না। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতাম তাহারই উত্তর দিত। কিন্তু মুখে কি একটা আস্তে আস্তে কথা বলিত। বোধ হয় কোন অভঙ্গ আবৃত্তি করিত। কিন্তু আদব-কায়দার খাতিরে সে উচ্চস্বরে আওড়াইত না—এইরূপ আমার মনে হওয়ায় আমি তাহাকে বলিলাম—"সখারাম, "অভঙ্গ" আবৃত্তি করা যদি তোমার নিত্যনিয়ম হয়, তুমি উচ্চস্বরে আবৃত্তি কর না কেন। আমি শুধু শুনিতে পাই এইরকম ভাবে আবৃত্তি করলেই চলবে। অভঙ্গ আমার বড় ভাল লাগে।" এই কথায়, সে নম্রভাবে রাম-রাম করিয়া বলিল "আচ্ছা ঠাকরুণ। অনেকে এটা বেয়াদবী মনে করে ও আমাদের মতো বুড়াদের বড়র-বড়র বকা অনেকের ভাল লাগে না। তাই আমি ভীত হয়েছিলুম।" এইরূপে, বাগানে যাইবার সময় প্রভাত হওয়ায় আত্মবিনোদনের প্রয়োজন অনুভব করিতাম, তখন সে কোন একটা অভঙ্গ বলিত; ও নিজের বুদ্ধি অনুসারে তাহার অর্থও করিত। আমি কেবল হুঁ হুঁ করিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার হাসি পাইত। কারণ, ভক্তলোকদের সম্বন্ধে কতকগুলি মজার কথা প্রচলিত আছে; আবার তাহাতে মূল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্য, অথবা পাঠে যেরূপ কবিতার পদ থাকে ঠিক সেইরূপ অক্ষরশ গ্রহণ করিয়া, ভক্তেরা সেই সমস্তের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যথা,—"'হিরণ্যকশ্যপুচা পোটি প্রহ্লাদ বাল জন্মলে'" (অর্থাৎ, হিরণ্যকশিপুর ঔরসে প্রহ্লাদ বালক জন্মগ্রহণ করিল) এই পাঠের স্থানে "হরিণ কাসবাচে পোটি পরলাত বাল জন্মলে" (অর্থাৎ হরিণ কচ্ছপের পেটে মাটির থালা হইয়া জন্মাইল)—এইরূপ উহারা বলিয়া থাকে এবং তাহার এরূপ ব্যাখ্যা করে যে, দেবতাদের আমরা দশ অবতারের কথাই শুনিয়াছি কিন্তু ভক্তের জন্য দেবতাকে অনেক অবতার গ্রহণ করিতে হয়। ইহার প্রমাণ এই যে, হরিণের পেটে কচ্ছপের পেটে জন্ম লইয়া শেষে মাটির থালা হইয়াও জন্মাইতে হইল। অতএব দেখ, ভক্তবৎসল দেবতাকে কত ভাল ভাল অবতার লইতে হয়।'—ইত্যাদি উহারা খুব ভক্তিভাবে বলিয়া থাকে। এই অর্থ ও বাক্যের যে মিল নাই এই কল্পনা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করে না। এবং আর কেহ এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাহাদের সহ্য হয় না। ইহাতে তাঁহাদিগের দোষ নাই, বরং ভক্তির বলই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এই মণ্ডলীর লোকেরা পরস্পরের প্রতি অন্ধভাবে ও ভক্তির ভাবে দৃঢ় আসক্ত। বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখে না—এই যা। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু গল্প আমাদের সিপাইয়ের জানা ছিল। কখন কখন সে কোন ভগবদ্-ভক্তের গল্প বলিতে বলিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহার অর্থ বলিবার সময় উপরি-কথিত-অনুসারে সে কোন-না-কোন প্রকারে অর্থবিপর্য্যয় করিত। তবুও আমি তাহার গল্প মনোযোগ দিয়া শুনিতাম। কারণ, তাহার মতো ভক্ত বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিতে আমার ভাল লাগিত না। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আহারের সময় যখন "ওঁর" কাছে এই সব গল্প করিতাম তখন উনি খুব হাসিতেন। এই রকম রোজ সকালে হাঁটিয়া বাগানে যাওয়ায় আমার ব্যায়ামও হইত এবং টাট্‌কা শাকসবজী ও ফলও পাওয়া যাইত। শীতকালে প্রতিদিন চার-পাঁচশো গোলাপ ফুল ফুটিত এবং বেগুন ও লাউ দুই তিন ঝুড়ি ফলিত। তাহার

মধ্য হইতে, ঘরের খরচের মতন ভাল সুপারী (ঐ রকম গোলাপফুলের মধ্যে রাখা সুপারী "উনি" ভাল বাসিতেন এবং উহা রোজ করিতে হইত বলিয়া) তৈয়ারী করিবার মতন ফুল রাখিয়া দিয়া, বাকী ফুল চাকরদের দিয়া বেচিবার জন্য পাঠাইতাম; বেচিয়া যে পয়সা হইত তাহাও তরকারী বাগানের খাতায় জমা করিতাম। পাঁচ সাত দিন সব জিনিসই ঘরে রাখিয়া দিয়া বন্ধু ও আলাপী লোকদের নিকট অল্প স্বল্প তরকারী ও ফুল পাঠাইয়া দিবে এইরূপ উনি আমাকে বলিতেন, এবং তদনুসারে আমি কাজ করিতাম।

এই বৎসরে উনি, দেশমুখ, কেতকর, বাড প্রভৃতি মিত্রমণ্ডলীর সহায়তায় নাশিকে প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করেন। রা. ব. গোপালরাও হরী সেখানে জয়েণ্ট জজ্ ছিলেন। তাঁহার ছয় ছেলে ও দুই মেয়ে তখনকার হিসাবে খুবই শিক্ষিত ছিল। তাঁর পরিবারবর্গ প্রাচীন-তন্ত্রের লোক ছিলেন। পুরাণ শুনিবার ও পড়িবার দিকে তাঁহাদের খুব ঝোঁক ছিল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমস্ত ব্রত ও নিয়ম-ধর্ম্ম পালন করিতেন। এই নিমিত্ত বারম্বার সহরের মেয়েদিগকে "হল্‌দী কুঙ্কুমে" তাঁহারা ডাকিতেন। এই দরুণ আমারও তাঁহার গৃহে যাতায়াত হইতে থাকায় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় বেশী হইয়াছিল। রা. সা. দেশমুখ ও আমার স্বামী দুজনেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী বলিয়া,—নিজের মেয়েরা হল্‌দী কুঙ্কুমের উপলক্ষে হউক না কেন—সহরের মেয়েরা বারংবার এক স্থানে আসিয়া জমায়, সীতা সাবিত্রীর মতন প্রাচীন সাধ্বীদিগের চরিত্রকথা তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন ও শিক্ষার দিকে তাহাদের মন আকর্ষণ করিতেন। সেইরূপ, সহরের মেয়েদের স্কুল দেখিতে আসিয়া, তাহাদিগের উত্তেজনার জন্য অল্প স্বল্প পুরস্কার দেওয়া প্রভৃতির কাজও ভাল বাসিতেন। এবং এই সম্বন্ধে আমাদিগকে তাগাদা করিতেন। এই বিষয় সম্বন্ধে, বেশী দিন যাইতে না যাইতে এক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। ঠানার সেশন-জজ কাগলন্ সাহেব, সেশনের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নাশিকে আসিলেন। আট-দশ দিন তিনি নাশিকে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অল্প বয়স্কা শালী ও পত্নী ছিলেন। হিন্দু নারীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার ইচ্ছা হওয়ায়, সাহেবের শালী ও পত্নী পর দিন আপনা-হইতেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিলেন। কাজেকাজেই, আমরাও তাহার পর দিন, তাঁহাদের ওখানে প্রতিসাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেশমুখের দুই মেয়ে, আমি, মিসেস্ কাগলন্, তাঁহার ভগিনী—আমরা এক বয়সী হওয়ায়, দুইবার সাক্ষাতেই আমাদের মধ্যে খুবই ভাব হইয়া গেল। সকালে সন্ধ্যায় কখন আমাদের বাগানের দিকে, কখন শরণপুরের দিকে, কখন সুন্দর-নারায়ণের ঘাটের দিকে, আমরা বেড়াইতে যাইতাম। এই সময়ে গড্‌বোলে নামক ডেপুটি এড়ুকেশনল ইন্‌সপেক্টর সেখানে ইস্কুল তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে নাশিকে, দ্বারকানাথ রাঘোবা তরখড়কর নামক একটি ভদ্রলোক সেখানকার হাই-স্কুলের-হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার পত্নী সৌ. লক্ষ্মীবাই আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হইলেও বরাবরকার মিত্রাণীর মত হাসিয়া খেলিয়া বেশ মন খুলে' আমাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। পশমের সেলাই ও সাদাসিধা সিলাইয়ের কাজ তিনিই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। এই সময়ে আমার ছোট খুড়তুতো ননদ সখুবাই ঠোসর বোম্বাই হইতে নাশিকে মাতৃগৃহে থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি সম্পর্কে ননদ ছিলেন কিন্তু ব্যবহারে আপন ভগিনীর মত ছিলেন, ভগিনীর মত আমাকে ভাল বাসিতেন; সেই দরুন, আমরা দুই ননদ-ভাজ ও সৌ. লক্ষ্মীবাই—আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভগিনীর মত ভালবাসা জমিয়া উঠিল। তাই প্রতি দিন কোন এক সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা শুনা না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি আসিত না; হয় তাঁরা আমাদের এখানে আসিতেন, নয় আমরা তাঁহাদের ওখানে যাইতাম—এইরূপ নিত্য নিয়ম ছিল। তাঁহাদের ওখানে, সহজভাবের কথা বার্ত্তায় আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ হইত। মিসেস্ কাগলন্ সেখানে আসা অবধি আমাদের এইরূপ চলিত। উপরি কথিত অনুসারে. ডেপুটী ইনেস্পেক্টরের সমস্ত স্কুলের পরিদর্শন শেষ হইলে বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের সময় মিসেস্ কাগলন্ এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার হাত দিয়াই পুরস্কার দেওয়া হইবে এইরূপ পরামর্শ করিয়া তিনি ও রায়সাহেব দেশমুখ, এই সম্বন্ধে আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিনস্থির করিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিলেন। "উনি" দিন প্রভৃতি স্থির করিয়া দিলেন। এই পুরস্কার বিতরণ-সভায় মেয়ে যত বেশী জড়ো হইবে ততই সভার শোভাবৃদ্ধি হইবে। তখন, কি করিলে বেশী মেয়ে আসিয়া জমে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া এইরূপ স্থির হইল যে, কোন বনেদি ঘরের ও জায়গীরদার প্রভৃতির মেয়েরা শুধু আমন্ত্রণ চিঠিতে আসিবে না; এখান হইতে মেয়েরা গিয়া তাহাদিগকে মুখে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—তবে তাহারা আসিবে। আমাদের দুই ঘরের মেয়েরা এই কাজের ভার গ্রহণ করিলে পর, সহরের উকীল মণ্ডলীর ও অন্য কার্য্যকারীদিগের মেয়েরা যাহাতে আইসে তাহার তদ্বির আমি করিতেছি, এই কথা

ডেপুটি বলিয়া চলিয়া গেলেন। দেশমুখের দুই মেয়ে ও আমি—আমরা এই তিন জন বাড়ী গিয়া, ফর্দ্দে লেখা নাম অনুসারে নিমন্ত্রণ করিব এইরূপ স্থির করিয়া, দেশমুখও চলিয়া গেলেন। যেরূপ স্থির হইল তদনুসারে দুই এক দিনের মধ্যেই আমি ও দেশমুখের মেয়েরা, ঘরে ঘরে গিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তদনুসারে, পুরস্কার বিতরণের দিনে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়ে আসিয়া জমিয়াছিল। এই সংখ্যা তখন আমাদের খুব বেশী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কারণ নাশিকের স্ত্রী পুরুষের একত্র সম্মিলন এই প্রথম ঘটিয়াছিল। সহরের অন্য পুরুষ-মণ্ডলীর নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কিন্তু তাহার ভিতর স্ত্রীশিক্ষার প্রার্থী ও অগ্রণী এইরূপ ১০।১২ জন মাত্র ছিলেন। নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রম অনুসারে সমস্ত মণ্ডলী সমবেত হইলে মেয়েরা ঈশ্বর-স্তবমূলক ও স্বাগত-মূলক কবিতা আবৃত্তি করিল। ডেপুটী গত বৎসরের রিপোর্ট পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর, মিসেস্ কাগলনের হাত দিয়া পুরস্কার বিতরণ হইলে পর, মিসেস্ কাগলনের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও সমবেত বালিকাদিগের প্রতি উত্তেজনা ও উপদেশ আছে এইরূপ কিছু রচনা "উনি" লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেশমুখ-গৃহিণী উঠিয়া পাঠ করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু পাঠের সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পাঠ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় "উনি" আমাকে পাঠ করিতে বলিলেন। তদনুসারে ঐ কাগজ পড়িয়া শুনাইয়া, মিসেস্ কাগলন্ ও সমবেত মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমি নীচে বসিলাম। তখনি ডেপুটি মালা ও তোড়ার থালা আমার সম্মুখে আনিয়া রাখিলেন। আমি তাহা হইতে একটা মালা মিসেস্ কগলনের গলায় প্রথমে পরাইয়া, তাহার পর তাঁহার মাতা ও ভগিনীর গলায় পরাইয়া একটা মালা সেই থালায় নিক্ষেপ করিয়া থালাখানি ডেপুটীর সম্মুখে সরাইয়া দিলাম। এই মালা সাহেবের গলায় পরাইয়া দিতে হইবে এইরূপ ডেপুটি আমাকে খুব আস্তে আস্তে বলিলেন। আমি তখনই সাফ্ অস্বীকার করিলাম এবং তাঁহার উপর আমার রাগ হইল। রাওসাহেব দেশমুখ্ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। তিনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া একেবারে উঠিয়া গিয়া ডেপুটীর হস্তধৃত থালা হইতে মালা উঠাইয়া লইয়া কাগলন্ সাহেবের গলায় পরাইয়া দিলেন এবং ফুলের তোড়া ও আতর প্রভৃতিও দিলেন। এদিকে দেশমুখের দুই মেয়ে ও ছেলে, সমবেত সমস্ত মহিলাদিগকে হলুদ, কুঙ্কুম, পানের খিলি, ফুলের মালা, আতর গোলাব দিবার পর, সভাভঙ্গ হইল এবং আমরা আপন আপন গৃহে চলিয়া আসিলাম। রাত্রে শুইতে যাইবার সময়, 'উনি' একটু ঠাট্টার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সভার কাজ বেশ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হ'ল তো? কিন্তু মহিলাদের সম্বন্ধে এতটা পক্ষপাত কেন করা হল? সভার উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই ত পুরুষদের দ্বারাই হয়েছে। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে তুমি শুধু তিন জনের গলায় মালা পরাইয়া দিলে কিন্তু বেচারা কাগলন সাহেবকে কেন উপেক্ষা করলে?" আমি বলিলাম "আমি যদি হিন্দু না হতুম তাহলে আমি এ বিষয়ে কিছু মনে করতুম না। ডেপুটী হিন্দু ও একজন বিজ্ঞ লোক হয়েও সাহেবের গলায় মালা দিতে বল্লেন এতেই আমার আশ্চর্য্য মনে হল, রাগও হল।"

"কিন্তু তোমার পাশে দেশমুখ ছিলেন, তিনিই তোমাকে ত বাঁচিয়ে দিলেন?" আমি বলিলাম "তাঁর কথা কেন? তাঁর মহত্বের কথা ছেড়ে দেও, তিনি ত ওরকম অবিবেচক নন।" এই কথার পর "উনি" বলিলেন যে "তুমি ডেপুটীর উপর অনর্থক রাগ করেছ, তাঁর কোন খারাপ মৎলব ছিল না, তিনি সহজভাবে বলেছিলেন। অনেক সময়, এই বিষয় প্রথমে মনে আসে না; যাই হোক, এরকম ব্যবহার কম দেখা যায় বটে।" তার পর দিন, লক্ষ্মীবাই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে "কালকের সভাটা আমাদের বেশ হয়েছিল। কিন্তু ডেপুটির চালাকিটা তুমি চট্ করে ধরতে পেরেছিলে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমিও বড় মুস্কিলে পড়েছিলুম"—এইরূপ তিনি বলিলেন। ইহার পর, আমাদের তিন মিত্রাণীর মধ্যে আবার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। সৌ, সখু ননদ শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন, "ধুলে"তে হঠাৎ আমাদের বদ্‌লী হল। সৌ. লক্ষ্মীবাই নাশিকেই রহিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ, পরে, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মারা যান।

ইতি পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদের প্রথম অনুবাদ।

কাশীধাম হইতে ১৭৬৯ শকের মধ্যভাগে দেবেন্দ্রনাথের ফিরিয়া আসা অবধি আমরা দেখি যে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মনির্ণয় সংক্রান্ত একটা বিশাল কার্য্যস্রোত বহিয়াছিল। পিতামাতা যেমন বাল্যকালে সন্তানের শরীর রক্ষার প্রতিই সমধিক মনোযোগী

হয়েন, এবং তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক উন্নতিরও প্রতি দৃষ্টি করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজেরও প্রথমাবস্থায় পাঠশালা, বিদ্যালয়, মাসিক পত্র প্রভৃতির সাহায্যে লোকবৃদ্ধি দ্বারা তাহার বহিরঙ্গের পরিপুষ্টি সাধনে ব্রাহ্মগণ অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় প্রভৃতি উপায়ে তাহার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে এই ধর্ম্মনির্ণয়ের প্রথম সোপান হইয়াছিল ঋগ্বেদের অনুবাদ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে ১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশ "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" প্রভৃতি মানসিক স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৯ শকের আশ্বিনমাসে বিশেষভাবে বেদ আলোচনা করিবার জন্য কাশীধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে কাশীযাত্রার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যার তুলনায় বেদাদি শাস্ত্রসমূহের অশ্রেষ্ঠত্ব ও অনিত্যতা বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কাশীধামে গিয়া বেদ আলোচনা দ্বারা তাঁহার সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হইয়াছিল মাত্র।

বেদাদি আলোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকটী তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—(১) বেদের অনেকাংশ "অপরা বিদ্যা" এবং দেবতাদিগের যাগযজ্ঞমূলক; (২) অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, ইহাঁরা বেদের পুরাতন দেবতা এবং ইহাঁদের লইয়াই যাগযজ্ঞের মহা আড়ম্বর; (৩) ঋষিরা যে কেবল জড় চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নিকে উপাসনা করিতেন তাহা নহে—তাঁহারা সেই এক পরমেশ্বরকেই অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নানা প্রকারে উপাসনা করিতেন—একং রূপং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ। এই তিনটী তত্ত্বের যাথার্থ্য এবং সেই সঙ্গে তন্ত্রপুরাণের দেবতা ও বেদের দেবতাদিগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলেন—"তন্ত্রপুরাণের দেবতা আর বেদের দেবতা, ইহাঁদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে বেদের মধ্যেই কালী দুর্গাপূজার বিধি আছে।" তাঁহার ঋগ্বেদ অনুবাদের ইচ্ছা জাগ্রত হইবার আর একটী কারণ এই যে তাহা দ্বারা ভারতীয় আর্য্যগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানা সত্যতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা এবং সেই সকল তত্ত্ব প্রচারিত হইলে বেদের নিত্যতা ও অভ্রান্ততা বিষয়ে সাধারণের ভ্রান্ত সংস্কার আপনা হইতেই চলিয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সহায়তা হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি কাশীর এক পণ্ডিতের সাহায্যে ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই অনুবাদের ভূমিকা স্বরূপে যে সৌম্যভাব ও উদারতাপূর্ণ "ঋগ্বেদ অনুবাদকের উক্তি" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"যদিও বেদের মধ্যে পরব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিসকলই আমাদিগের মুখ্যরূপে আলোচনীয় কিন্তু সেই ব্রহ্মপর শ্রুতিসমুদয় বেদের কিয়দংশ মাত্র, এজন্য সমস্ত বেদের মর্ম্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রথমত ঋগ্বেদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার সমাপ্তি হইলে ক্রমে ক্রমে যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব বেদও এতদনুসারে প্রকাশিত হইতে পারিবেক। প্রতি বেদের দুই অংশ—সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ অনুবাদ আরম্ভ হইল। এই ঋগ্বেদের সংহিতাতে দশসহস্রেরও অধিক ঋক্ আছে, সুতরাং ইহাও অল্পদিনে ও অল্প পরিশ্রমে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নহে। সম্প্রতি আশাকে অবলম্বন করিয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম, ইহার শেষ করিবার ভার পরমেশ্বরের প্রতিই আছে।

"যিনি তাবৎ শুভাশুভের বিধানকর্ত্তা তাঁহার নিকট হইতে শুভবস্তু প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুদয় বেদের তাৎপর্য্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যে ক্রমাগত আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করাইবার জন্য সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বেদে বাহুল্যরূপে বিধান রহিয়াছে। সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে কোনও পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা, ইহাতে বৈদি-

কেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন। সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তর্যামী পুরুষ সূর্য্যদেবতা, বায়ুদেবতা প্রভৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে মন উদ্যত হয়। সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির অন্তর্যামী পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন নহে, কারণ তিনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব সূর্য্যদেবতা বা বায়ুদেবতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাতে পরমেশ্বরের প্রতিই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইল। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা পরমেশ্বরকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকাম উপাসনা করিতে তাবৎ বিধি আছে, যাবৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য অনন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ জানা না হয়। এই ঋগ্বেদের ঋক্ সকল প্রায় দেবতাদিগের স্তোত্র, এই ঋক্‌সকল ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে।"

ঋগ্বেদের পূর্ব্বার্দ্ধ মূল এবং কতকাংশ ভাষ্য তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হওয়াতে এই অনুবাদ কার্য্যে বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। ১৭৬৯ শকের ১লা ফাল্গুন তারিখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঋগ্বেদ সংহিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই দিবস ভারতের একটী স্মরণীয় দিবস সন্দেহ নাই। বেদ যে অনুবাদিত হইতে পারে এবং সত্য সত্যই অনুবাদিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে, ইহা সেকালে ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই অনুবাদই উত্তরকালের শাস্ত্রানুবাদ বিষয়ে যে পথপ্রদর্শক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। বেদ অনুবাদ করিবার কল্পনা দেবেন্দ্রনাথের সাহস ও প্রতিভা এবং দেবেন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগেই মানসিক স্বাধীনতার প্রভূত পরিচয় দিতেছে। এই অনুবাদ যে বর্ত্তমান কালের কি উপকার সাধন করিয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঋগ্বেদের অনুবাদ কতকটা অগ্রসর হইলে পর অধ্যাপক মোক্ষমূলর ঋগ্বেদ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করেন। অবশেষে মোক্ষমূলর যখন সমগ্র ঋগ্বেদ প্রায় প্রকাশিত করিয়াছেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ নিজের ঋগ্বেদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৭৯৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাদের তৃতীয় সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথের এই বিচার যে সুযুক্তিপূর্ণ হয় নাই তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আমরা ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মন্ত্রের প্রথম সূক্তের দেবেন্দ্রকৃত টীকা ও অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিলাম।

প্রথম মণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং।

গায়ত্রং ছন্দঃ মধুচ্ছন্দাঋষিঃ * অগ্নির্দ্দেবতা।

১। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং।

১। 'যজ্ঞস্য' 'পুরোহিতং' 'দেবং' 'ঋত্বিজং' 'হোতারং' হোতৃ নামকং ঋত্বিজং 'রত্নধাতমং' রত্নানি যাগফলরূপাণি তেষাং অতিশয়েন ধারয়িতারং 'অগ্নিং' 'ঈড়ে' স্তৌমি।

১। যজ্ঞের পুরোহিত, † দীপ্তি বিশিষ্ট, ‡ হোতা নামক ঋত্বিক, ‖ যাগ ফলের ধারয়িতা যে অগ্নি তাঁহাকে স্তব করি।

২। অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঋষিভিরীড্যোনূতনৈরুত।
সদেবাং এহবক্ষতি।

২। 'অগ্নিঃ' 'পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ' পূর্ব্বকালিকৈঃ ঋষিভিঃ 'নূতনৈঃ' ইদানীন্তনৈঃ 'উত' অপি 'ঈড্যঃ' স্তুত্যঃ। 'সঃ' অগ্নিঃ এহ আ ইহ 'ইহ' যজ্ঞে 'দেবাং' দেবান্ 'আ-বক্ষতি' আবক্ষতি আবহতু।

২। পূর্ব্বকালিক এবং ইদানীন্তন ঋষিদিগের দ্বারা অগ্নি স্তুত্য হয়েন। সেই অগ্নি এযজ্ঞে দেবতা সকলকে আহ্বান করুন।

৩। অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসম্বীরবত্তমং।

* মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্রের পুত্র।

† যে প্রকার পুরোহিত দ্বারা যজমানের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞের তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, এই হেতু অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত রূপে বেদে বলিয়াছেন।

‡ দেব শব্দের অর্থ দীপ্তি বিশিষ্ট এবং দানগুণবিশিষ্টও বটে; অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে পুণ্য লাভ হয় এ নিমিত্তে অগ্নি দানগুণবিশিষ্টরূপে বেদে উক্ত হইয়াছে।

‖ দেবতাদিগের যজ্ঞেতে হোতা নামক ঋত্বিক্ অগ্নি হয়েন। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি শ্রুতিঃ।

৩। 'যশসং' দানাদিনা যশোযুক্তং 'বীরবত্তমং' অতিশয়েন বীরপুরুষোপেতং 'দিবে দিবে' প্রতি দিনং 'পোষং এব' পুষ্যমাণতয়া বর্দ্ধমানং এব 'রয়িং' ধনং 'অগ্নিনা' 'অশ্নবৎ' প্রাপ্নোতি।

৩। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এমত যশোযুক্ত এবং বীরপুরুষ বিশিষ্ট যে ধন * তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

৪। অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
সইদ্দেবেষু গচ্ছতি।

৪। হে 'অগ্নে' ত্বং 'যং' 'অধ্বরং' হিংসারহিতং 'যজ্ঞং' 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বাসুদিক্ষু 'পরিভূঃ অসি' পরিতঃ প্রাপ্তবানসি 'সইৎ' স এব যজ্ঞঃ 'দেবেষু' তৃপ্তিং জনয়িতুং স্বর্গে 'গচ্ছতি'।

৪। হে অগ্নি যে হিংসারহিত যজ্ঞকে তুমি সম্যক প্রাপ্ত হও, সেই যজ্ঞ দেবতাদিগকে তৃপ্তি জন্মাইবার নিমিত্তে স্বর্গে গমন করেন।

৫। অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবোদেবেভিরাগমৎ।

৫। 'হোতা' হোমনিষ্পাদকঃ 'কবিক্রতুঃ' ক্রান্তকর্ম্মা 'সত্যঃ' অনৃতরহিতঃ 'চিত্রশ্রবস্তমঃ' অতিশয়েন চিত্র কীর্ত্তিযুতঃ 'অগ্নিঃ' 'দেবঃ' 'দেবেভিঃ' দেবৈঃ সহিতঃ 'আগমৎ' সমাগচ্ছতু অস্মিন্ যজ্ঞে।

৫। হোমনিষ্পাদক, ক্রান্তকর্ম্মা, মিথ্যারহিত, বিচিত্র কীর্ত্তিযুক্ত, অগ্নিদেবতা অন্য অন্য দেবতার সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। যদঙ্গদাশুষেত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎসত্যমঙ্গিরঃ।

৬। 'অঙ্গ' হে 'অগ্নে' 'দাশুষে' হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় 'ত্বং' 'যৎ' 'ভদ্রং' 'করিষ্যসি' 'তৎ' ভদ্রং 'তবইৎ' তবৈব 'অঙ্গিরঃ' অগ্নে। এতৎ 'সত্যং'।

৬। হে অগ্নি হবির্দাতা যজমানের যে কিছু কল্যাণ তুমি কর সে কল্যাণ তোমারই †, ইহা অতি সত্য।

৭। উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমোভরন্তএমসি।

৭। হে 'অগ্নে' 'দিবে দিবে' প্রতিদিনং 'দোষাবস্তঃ' রাত্রাবহনি চ 'ধিয়া' বুদ্ধ্যা 'বয়ং' 'নমঃ ভরন্তঃ' নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ 'উপ ত্বা' ত্বংসমীপে 'এমসি' এমঃ আগচ্ছামঃ।

৭। হে অগ্নি রাত্রি দিন বুদ্ধি পূর্ব্বক নমস্কার করত তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করি।

৮। রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্দ্ধমানং স্বেদমে।

৮। ত্বাং অগ্নিং কীদৃশং 'রাজন্তং' দীপ্যমানং 'অধ্বরাণাং' হিংসারহিতানাং যজ্ঞানং 'গোপাং' রক্ষকং 'ঋতস্য' অবশ্যম্ভাবিনাঃ কর্ম্মফলস্য 'দীদিবিং' পৌনঃপুন্যেন দ্যোতকং। 'স্বেদমে' স্বকীয়ে গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভিঃ 'বর্দ্ধমানং'।

৮। তুমি দীপ্যমান, তুমি হিংসারহিত যজ্ঞের রক্ষক, কর্ম্মফলের পুনঃ পুনঃ স্মারক এবং যজ্ঞশালাতে হবি দ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া থাক, তোমার নিকটে আমরা প্রত্যহ আগমন করি।

৯। সনঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নোভব।
সচস্বানঃ স্বস্তয়ে। ১।১।২

৯। হে 'অগ্নে' 'সঃ' ত্বং অগ্নিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পিতা ইব' 'সূনবে' পুত্রার্থং 'সূপায়নঃ' সুপ্রাপঃ 'ভব'। 'নঃ' অস্মাকং 'স্বস্তয়ে' কল্যাণায় 'সচস্ব' সচস্ব যুক্তোভব।

৯। হে অগ্নি, পুত্র যেমন পিতার সুপ্রাপ্য তদ্রূপ তুমি আমাদিগের সুপ্রাপ্য হও, আমাদিগের কল্যাণীয় হও। ১।১।২ ॥

---

* ধন দ্বারা যশ হয় এবং ধন দ্বারা সামর্থ্য হয় এ নিমিত্তে ধন যশোযুক্ত এবং বীরপুরুষবিশিষ্ট।

† যদি ফলাকাঙ্ক্ষী যজমানের কল্যাণ হয় তবেই তাহার নিকট হইতে অগ্নি পুনঃ পুনঃ হবি প্রাপ্ত হইতে পারেন, সুতরাং যজমানের মঙ্গলে অগ্নির মঙ্গল হয়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

তৃতীয় প্রকরণ।

কর্ম্মযোগ শাস্ত্র।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। *

কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ যদি কোন ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি শাস্ত্র শিক্ষার অনধিকারী হয়; এবং এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে শাস্ত্র বলা আর উল্টানো কলসে জল ভরা—একই কথা। শিষ্যের তাহা হইতে কোন ফল হয় না,—শুধু তাহা নহে, গুরুরও অকারণে শ্রম হয়; দুজনেরই সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। জৈমিনি ও বাদরায়ণের সূত্রের আরম্ভে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ও "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ সূত্র এই কারণেই স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোপদেশ যেরূপ মুমুক্ষুকে, ধর্ম্মোপদেশ যেরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসুকে দেওয়া উচিত, সেইরূপ, সংসারে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা কিংবা জিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে তাহাকেই কর্ম্মশাস্ত্রোপদেশ দেওয়া উচিত; এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে 'অথাতো' করিয়া, দ্বিতীয় প্রকরণে কর্ম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। অমুক স্থানে আমার আট্‌কাইতেছে এইরূপ প্রথমেই অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুক্তি-লাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতটা গুরুত্ব তাহা আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, কেবল মুখে আওড়ানো শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য, সদ্‌গুরু প্রথমত শিষ্যের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহাই দেখেন, যদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। গীতার কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা এই পদ্ধতি অনুসারেই করা হইয়াছে। যে যুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হইয়া সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগেও ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই সংশয় অর্জ্জুনের মনে উদয় হওয়ায় অর্জ্জুন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে যখন প্রস্তুত হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া পাগলামি ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, উল্টা তোমার শুধু দুষ্কীর্ত্তিই হইবে, এইরূপ সাধারণ ধরণের যুক্তিবাদে যখন তাহার সমাধান হইল না তখন "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—তুমি অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের লম্বা লম্বা কথা আমাকে বলিতেছ"—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ একটু উপহাসের ভাবে বলিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। অর্জ্জুনের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ায়, বড় বড় পণ্ডিতেরাও প্রসঙ্গ বিশেষে "কি করিবে, কি করিবে না" এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; যাহাতে জাগতিক কর্ম্মের লোপ না হইয়া, কেবলমাত্র কর্ম্মজনিত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই প্রকারের 'যোগ' অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়া লওয়া আবশ্যক; অতএব হে অর্জ্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর—তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব—ইহা অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বক্তব্য। এই 'যোগ'ই "কর্ম্মযোগশাস্ত্র"। এবং অর্জ্জুন যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সে সমস্যা-প্রসঙ্গ অলৌকিক না হওয়ায়, সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত হয়; অতএব, ভগবদ্‌গীতায় কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের যে বিচার করা হইয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে-কোন শাস্ত্র হউক না, তাহার প্রতিপাদনে প্রযুক্ত মুখ্য শব্দসমূহের অর্থ ঠিক্ বুঝিবার জন্য, ঐ সকল শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্র প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। নচেৎ পরে অনেক প্রকার বুঝিবার-ভুল কিংবা গণ্ডগোল

* অতএব তুমি যোগ অবলম্বন কর। কর্ম্ম করিবার যে শৈলী, চাতুর্য্য, কিংবা কুশলতা তাহাকেই যোগ বলে।

উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য এই সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে।

তন্মধ্যে, প্রথম শব্দ 'কর্ম্ম'। 'কর্ম্ম' শব্দ কৃ-ধাতু হইতে বাহির হওয়ায় তাহার অর্থ 'করা', 'ব্যাপার', 'আচরণ'—এইরূপ; এবং এই সাধারণ অর্থে ঐ শব্দ ভগবদ্গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বলিবার কারণ এই, মীমাংসাশাস্ত্র কিংবা অন্যত্র এই শব্দের যে সংকুচিত অর্থ আছে, তাহা মনে আনিয়া পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না হন। যে কোন ধর্ম্মই ধর না কেন, তাহাতে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, কোন একটা কিছু কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম অনুসারে বলিতে হইলে, যজ্ঞযাগই কর্ম্ম; এবং এই যজ্ঞযাগ কিরূপে করিবে এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থাদির স্থানে স্থানে যে অনেক বিরোধী বচন ও কথন কথন প্রতীয়মান বিরোধী বচন আছে তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে তাহা জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জৈমিনীয় মতানুসারে, এই বৈদিক কিংবা শ্রৌত যজ্ঞযাগের অনুষ্ঠান করাই মুখ্য প্রাচীন ধর্ম্ম।

মানুষ যাহা কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন পাইতে হইলে, যজ্ঞের জন্যই পাওয়া চাই। এবং ধান্য সংগ্রহ করিলেও তাহা যজ্ঞের জন্যই বুঝিতে হইবে (মভা. শাং. ২৬. ২৫)। যে হেতু, যজ্ঞ করিবে ইহাই দেবতাদিগের আদেশ, অতএব যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কর্ম্ম স্বতন্ত্ররূপে মনুষ্যের ফলদায়ক হয় না, তাহা যজ্ঞের সাধন, স্বতন্ত্র সাধ্য নহে। তাই, যজ্ঞ হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা যজ্ঞেরই অন্তর্ভূত; উহার অন্য পৃথক্ ফল নাই। কিন্তু যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত এই সকল কর্ম্ম স্বতন্ত্র ফলদায়ক না হইলেও শুধু যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রাপ্তি (অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের সুখপ্রাপ্তি) হয় ও সেই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই কর্ত্তাপুরুষ অনুরাগের সহিত যজ্ঞ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্মই পুরুষার্থ ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যে বস্তু সম্বন্ধে মনুষ্যের প্রীতি থাকে ও তাহা পাইবার ইচ্ছা হয় তাহাকেই পুরুষার্থ বলে (জৈ, সূ, ৪।১।১ ও ২) যজ্ঞের এক পর্য্যায় শব্দ—'ক্রতু'; তাই 'যজ্ঞার্থের বদলে "ক্রত্বর্থ" এই শব্দও ব্যবহৃত হয়। 'যজ্ঞার্থ' (ক্রত্বর্থ) অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে ফলদায়ক নহে বলিয়া অবন্ধক এবং পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের ফলদায়ক বলিয়া বন্ধক, এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম দুই বর্গে বিভক্ত হইয়া থাকে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে সমস্তই যাগযজ্ঞাদিরই বর্ণনা। ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের স্তুতিপর সূক্তি আছে সত্য; কিন্তু তাহাদের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্ত্তব্য হওয়ায় সমস্ত শ্রুতি গ্রন্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মেরই প্রতিপাদক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। বেদের অন্তর্ভূত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, নতুবা হয় না; অতএব ঐ যাগযজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ব্বক কর একই ফল—এইরূপ এই কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিক কিংবা নিছক্ কর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন। উপনিষদে এই যজ্ঞ গ্রাহ্য বলিয়া ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষা নিম্নপদবীর স্থির করিয়া যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" (গী. ২, ৪২) প্রভৃতি যে যাগ যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানে অনুষ্ঠিত উপরি উক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম। সেইরূপ "যজ্ঞার্থাৎকর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"—যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কর্ম্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গী, ৩, ৯), ইহাই মীমাংসকের মতের অনুবাদ। এই যাগযজ্ঞাদি বৈদিক অর্থাৎ শ্রৌত কর্ম্ম ব্যতীত, ধর্ম্মদৃষ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্ম্মও চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদে মনুস্মৃত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে,—যথা—ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি; এবং এই সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ স্মৃতিগ্রন্থাদিতেই পদ্ধতিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহাদিগকে 'স্মার্ত্তকর্ম্ম' কিংবা 'স্মার্ত্ত যজ্ঞ' এমনও বলা হইয়া থাকে। এই শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম ব্যতীত কতকগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম—যথা, ব্রত উপবাস প্রভৃতি—কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই প্রথমে সবিস্তার প্রতিপাদিত হওয়ায় উহাদিগের 'পৌরাণিক কর্ম্ম' এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে। এই সমস্ত কর্ম্মের

আবার নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এইরূপ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। নিত্য করা আবশ্যক যে স্নান সন্ধ্যাদি কর্ম্ম তাহাই নিত্য কর্ম্ম। ইহা করিলে কোন বিশেষ ফল কিংবা অর্থসিদ্ধি হয় না; কিন্তু না করিলেই দোষ হয়। নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন কারণ পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়ায় যাহা করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম্ম, যথা—অনিষ্ট-গ্রহ-শান্তি, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি। যে নিমিত্ত আমরা শান্তিস্বস্ত্যয়ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করি, সেই সব ঘটনা পূর্ব্বে না ঘটিয়া থাকিলে এই সকল কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা ব্যতীত কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমরা কত সময় শাস্ত্রানুসারে যে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্ম্ম, যথা—বৃষ্টির জন্য কিংবা পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করা। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—ইহা ব্যতীত কোন কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে। যথা—সুরাপান শাস্ত্রে একেবারেই ত্যাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন্‌টা নিত্যকর্ম্ম, কোন্‌টা নৈমিত্তিক, কোন্‌টা কাম্য এবং কোন্‌টাইবা নিষিদ্ধ, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে; এবং অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম্ম পাপজনক না পুণ্যপ্রদ? এইরূপ যদি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রশ্ন করা যায়, তবে সেই শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে উক্ত কর্ম্ম যজ্ঞার্থ বা পুরুষার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি বিচার করিয়া পরে আমার নিজের নির্ণয়টা বলিব। ভগবদ্গীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক—অধিক কি, উহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, অধিক কি, উহা বিহিত বলিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে; উদাহরণ যথা:—উপস্থিত প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম্ম অর্জ্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু এইরূপভাবে শাস্ত্র ধরিয়া ঐ সকল কর্ম্ম আমরা সর্ব্বদা করিব, ইহা সম্ভব হয় না, কিংবা করিলেও উহা সর্ব্বদাই যে শ্রেয়স্কর হইবে এরূপ ভরসাও নাই। তাছাড়া, শাস্ত্রের আদেশও কোন কোন প্রসঙ্গে পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এইরূপ অবস্থায়, মানুষ কোন্ মার্গ স্বীকার করিবে, তাহা স্থির করিবার কোন যুক্তি আছে কিনা এবং যদি থাকে ত সে যুক্তিটি কি,—ইহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রতিপাদন কার্য্যের যে ভেদ উপরে বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার কারণ নাই। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা চারি বর্ণের অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংসক যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা গীতা-প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কতটা প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য, মীমাংসকের উক্তি সকলও গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বিচার করা হইয়াছে ও শেষ অধ্যায়ে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্ত্তব্য, কি কর্ত্তব্য নয়, এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর কথিত হইয়াছে (গী, ১৮, ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা অপেক্ষা বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতা প্রতিপাদনে 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ কেবল শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম—এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থে না বুঝিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সারকথা, মানুষ যে-যে কাজ করে—মানুষের খাওয়া, পরা, খেলা, বসা, ওঠা, থাকা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, হাসা, কাঁদা, আঘ্রাণ করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, নেওয়া, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, মারা, লড়াই করা, মনন বা ধ্যান করা, আজ্ঞা কিংবা নিষেধ করা, দান করা, যাগযজ্ঞ করা, চাষ কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা ইত্যাদি ইত্যাদি—এই সমস্ত কর্ম্ম এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত; সেই সব কর্ম্ম কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, বা মানসিকই হউক (গীতা, ৫।৮।৯)। অধিক কি, বাঁচা মরা পর্য্যন্ত সমস্তই কর্ম্মের অন্তর্ভূত; এবং প্রসঙ্গ অনুসারে "বাঁচা কিংবা মরা" এই দুয়ের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার করা আবশ্যক হয়। এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, এই শব্দের 'কর্ত্তব্য কর্ম্ম' কিংবা 'বিহিত কর্ম্ম' এই অর্থও হইয়া থাকে (গী, ৪, ১৬)। মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল। ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার সম্বন্ধেও এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার বিচার পরে কর্ম্মবিপাক প্রকরণে করা যাইবে।

কর্ম্মাপেক্ষাও অধিক 'গোলমেলে' শব্দ হইতেছে—যোগ। এই শব্দের বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ

"প্রাণায়ামাদির সাধনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি কিংবা ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ করা" অথবা "পাতঞ্জলিক সূত্রোক্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ।" এই অর্থে এই শব্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬, ১১)। কিন্তু এই সঙ্কুচিত অর্থ ভগবদ্গীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক। 'যোগ' এই শব্দ 'যুজ্' অর্থাৎ যুড়িয়া দেওয়া এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে,সুতরাং উহার ধাত্বর্থ 'জোড়', জোড়া, মিলন, সঙ্গতি, একত্রাবস্থিতি—এইরূপ; এবং পরে, ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার 'উপায়, সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল' অর্থাৎ কর্ম্ম—এইরূপই অর্থ হয়। "যোগঃ সংহননোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" এই অর্থ অমরকোষেও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা অনিষ্ট জনক হইলে সেই গ্রহদিগের 'যোগ' ইষ্ট বা অনিষ্টজনক এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি; এবং 'যোগক্ষেম' এই শব্দে 'যোগ' অর্থাৎ প্রাপ্ত না হওয়া বস্তু প্রাপ্ত হওয়া এইরূপ অর্থ (গী, ৯. ২২)। মহাভারতীয় যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবার জন্য একই 'যোগ' (সাধন বা যুক্তি)—একোহি যোগোঽস্য ভবেদ্বধায়—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (সভা, দ্রো, ১৮১, ৩১); এবং ইতিপূর্ব্বে আমরা, জরাসন্ধাদি রাজাদিগকে পূর্ব্বে ধর্ম্ম রক্ষণার্থ 'যোগের দ্বারাই' কি করিয়া বধ করা হইল তাহার বর্ণনা করিয়াছি। ভীষ্ম অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করিলে পর অন্য রাজারা 'যোগ, যোগ' বলিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্ব্বে (অ, ১৭২) উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য স্থানেও মহাভারতে এই অর্থেই 'যোগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গীতাতে 'যোগ, যোগী' কিংবা যোগ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন সামাসিক শব্দ প্রায় ৮০ বার প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু, খুব যদি বেশী হয়, চারি পাঁচ (গী, ৬, ১২, ২০) স্থল ছাড়া 'পাতঞ্জল যোগ' এই অর্থ কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। 'যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া দেওয়া' এই অর্থই স্বল্পাধিক ভেদে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং গীতাশাস্ত্রান্তর্ভূত ব্যাপক শব্দগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। তথাপি যোগ অর্থে সাধন, কৌশল বা যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিলেও চলে না। কারণ, বক্তার ইচ্ছানুসারে এই সাধন,—সন্যাসের, কর্ম্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা—গীতাতেই দুই চারি স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিবার ঐশ্বরিক কৌশল কিংবা অদ্ভুত সামর্থ্যের সম্বন্ধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে (গী, ৭।২৫; ৮।৫; ১০।৭; ১১।৮)। এই অর্থেই ভগবানকে 'যোগেশ্বর' বলা হইয়াছে (গী, ১৮।৭৫)। কিন্তু গীতান্তর্ভূত যোগ শব্দের ইহা কিছু মুখ্যার্থ নহে। তাই গীতায় 'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায় ইহা বলিবার জন্য "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২।৫০) অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার কোন বিশেষ প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্য্য বা শৈলী—এইরূপ এই শব্দের ব্যাখ্যা স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে; এবং এই সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যেও "কর্ম্মসু কৌশলম্" এই পদের "কর্ম্মের যে স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহা বিনষ্ট করিবার যুক্তি" এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্ম্মের অনেক 'যোগ' কিংবা 'উপায়' হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সম্বন্ধেই 'যোগ' শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—ধনলাভ করিতে হইলে তাহা চুরি করিয়া, ঠকাইয়া, ভিক্ষা করিয়া, সেবা করিয়া, কর্জ্জ করিয়া, মেহনৎ করিয়া ইত্যাদি অনেক সাধনের দ্বারা করা যাইতে পারে; এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক সাধন সম্বন্ধে 'যোগ' শব্দ ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও "আপনার স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া, মেহনৎ করিয়া পয়সা রোজগার করা" এই উপায়ই মুখ্যরূপে 'ধনপ্রাপ্তি যোগ' এইরূপ বলা প্রচলিত আছে।

"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—কর্ম্ম করিবার এক প্রকার বিশেষ যুক্তি অর্থাৎ যোগ, এইরূপ স্বয়ং ভগবানও যদি গীতায় যোগ শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তবে, বস্তুত গীতায় এই শব্দের মুখ্য অর্থ কি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। কিন্তু ভগবানকৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গীতার অনেক টীকাকার এই শব্দকে

টানিয়া বুনিয়া নানাপ্রকারে গীতার মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন; তাই, ভুল-বুঝা দূর করিবার জন্য এইখানে 'যোগ' শব্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, সেই স্থানে উহার অর্থ কি তাহা স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ করা কেন কর্ত্তব্য, সাংখ্য মার্গানুসারে ইহার যুক্তি বিবৃত করিবার পর, এক্ষণে তোমাকে যোগশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতেছি (গী. ২, ৩৮) এইরূপ ভগবান আরম্ভ করিয়াছেন; প্রথম, যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেতে নিমগ্ন লোকদিগেরও বুদ্ধি, ফল-প্রত্যাশার দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হইয়া থাকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন (গী, ২, ৪১-৪৬)। তাহার পর, এতাদৃশ বুদ্ধিকে ব্যগ্র হইতে না দিয়া "আসক্তি ছাড়, কিন্তু কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না" এইরূপ বলিয়া, "যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর" (গী, ২, ৪৮) এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন; এবং সেই-থানেই "যোগ অর্থাৎ সিদ্ধি বা অসিদ্ধি এই বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি" এইরূপ 'যোগ' শব্দের অর্থ প্রথমে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পর, "ফল প্রত্যাশায় কর্ম্ম করা অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ" (গী, ২০, ৪৮), "বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্মের পাপ-পুণ্য বাধা কর্ত্তাকে স্পর্শ করে না অতএব তুমি এই 'যোগ' সম্পাদন কর", এইরূপ বলিয়া তখনই আবার "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২, ৫০) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাতে, কর্ম্মের পাপ কর্ত্তাকে স্পর্শ না করায় কর্ম্ম করিবার সমত্ব বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম 'কৌশল,' এবং এই কৌশলের দ্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 'যোগ' বলা হইয়াছে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। এই অর্থই পূর্ব্বে "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন" (গী, ৬, ৩৩) সমতার অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে বলিলে,—এই শ্লোকে অর্জ্জুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে কিরূপ-ভাবে চলিবেন তাহার এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্ব হইতে যে বৈদিক ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন সেই ধর্ম্মানুসারে—দুই মার্গ আছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে সর্ব্ব কর্ম্মের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা—এই এক মার্গ; এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, কর্ম্মের পাপ পুণ্য বাধা না স্পর্শ করে সেইরূপ যুক্তি অনুসারে আমরণ কর্ম্ম করিতে থাকিবে—এই অপর মার্গ। এই দুই মার্গের উদ্দেশেই গীতাতে পূর্ব্বে (গী, ৫।২) সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এইরূপ পূর্ণ নাম সং-যোজিত হইয়াছে। সন্ন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং যোগ অর্থাৎ জোড়া; সুতরাং কর্ম্মের ছাড়া-জোড়া-রই এই দুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। "সাংখ্য ও যোগ" (সাংখ্যযোগৌ) এইরূপ আর-একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও পূর্ব্বে (গী, ৫।১৪) এই দুই মার্গেরই অনুলক্ষণ সংযোজিত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করি-বার জন্য পাতঞ্জল যোগান্তর্ভূত আসনাদির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্তু তাহা কি জন্য? তপস্যা করিবার জন্য নহে, পরন্তু কর্ম্মযোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্মকারী মনুষ্যের এই সমতারূপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। নচেৎ "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী" এই বাক্যও সংলগ্ন হয় না। সেইরূপ আবার "তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন" (৬।৪৬) বলিয়া এই যে উপদেশ অধ্যা-য়ের শেষে আছে তাহার অর্থও "পাতঞ্জল যোগের অভ্যাসকারী তুমি হও" এইরূপ না হইয়া, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" (২।৪৮) অথবা তৎপূর্ব্বে "তস্মা-দ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী, ২. ৫০), কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে "যোগ-মাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" (৪।৪২) ইহার সহিত সমানার্থক অর্থাৎ "যুক্তির দ্বারা কর্ম্মকারী যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও—এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে দাঁড়াইয়া থাক" এ কথা বলা সম্ভবনায়ও নহে, শক্যও নহে। "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" (গী, ৩।৩) অর্থাৎ যোগী পুরুষ কর্ম্ম করিয়া থাকেন ইহা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। মহা-ভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্ম কিংবা ভাগবৎধর্ম্মের বিচার-আলোচনাতেও এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক আপ-নার কর্ম্ম না ছাড়িয়া তাহা যুক্তিপূর্ব্বক সাধন করিয়া (সুপ্রযুক্তেন কর্ম্মণা) পরমেশ্বরকে লাভ করে এইরূপ উক্ত হইয়াছে (সভা, শাং, ৩৪৮।

৫৬)। ইহাতে, যোগী ও কর্ম্মযোগী এই দুই শব্দ গীতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 'যুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মকারী' এইরূপ অর্থ স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি 'কর্ম্মযোগ' এই ঈষৎ দীর্ঘ শব্দ ব্যবহৃত না হইয়া 'যোগ' এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গীতাতে ও মহাভারতেও অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "আমি তোমাকে এই যে যোগের কথা বলিলাম তাহা পূর্ব্বে বিবস্বানকে বলিয়াছিলাম (গী, ৪।১); বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ যোগ ইতিপূর্ব্বে নষ্ট হওয়ায় আজ নূতন করিয়া ঐ যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল", ভগবান যখন এইরূপ 'যোগ' শব্দের তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন তখন পাতঞ্জল যোগ বিবক্ষিত হয় নাই;—"কর্ম্ম করিবার কোন এক প্রকারের বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন কিংবা মার্গ" এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা-অন্তর্গত কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন 'যোগ' শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন (গী, ১৮।৭৫) তখনও ঐ অর্থই অভিপ্রেত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিজে সন্ন্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্যের আরম্ভেই বৈদিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এইরূপ দুই ভেদ বলিয়া, 'যোগ' শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা-অনুসারে কখন 'সম্যগ্দর্শনোপায় কর্ম্মানুষ্ঠানম্' (গী, ৪।৪২), আবার কখন 'যোগযুক্তিঃ' (গী, ১০।৭) এইরূপ তিনি করিয়াছেন। সেইরূপ মহাভারতেও "প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ জ্ঞানং সন্ন্যাস লক্ষণম্"—যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গ এবং জ্ঞান অর্থাৎ সন্ন্যাস কিংবা নিবৃত্তিমার্গ (সভা, অশ্ব, ৪৩।২৫)—এইরূপ এই দুই শব্দের অর্থ অনুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় উপাখ্যানে সাংখ্য ও যোগ শব্দ এই অর্থেই অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে—এই দুই শব্দ সৃষ্টির আরম্ভেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে (সভা, শাং, ২৪০ ও ৩, ৪৮ দেখ)। এই নারায়ণী কিংবা ভাগবত ধর্ম্ম ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য, তাহা প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের বচনাদি হইতে প্রকাশ পায়। তাই সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, এইরূপ যে দুই শব্দের প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারায়ণী ধর্ম্মে আছে, তাহা গীতারও অভিপ্রেত এইরূপ বলা যাইতে পারে। এবং এই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" কিংবা "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" এই গীতার ব্যাখ্যার দ্বারা ও "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি উপরি উক্ত গীতা-বচনাদির দ্বারা ঐ সংশয়ের পূর্ণ নিরসন হইয়া, গীতাতে যোগশব্দ প্রবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ 'কর্ম্মযোগ' এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। শুধু বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থে নহে, পালী ও সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—প্রায় ২০০ শকে লিখিত মিলিন্দ প্রশ্ন নামক পালীগ্রন্থে 'পুব্বযোগো' (পূর্ব্বযোগ) এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় তাহার অর্থ 'পুব্বকম্ম' (পূর্ব্বকর্ম্ম) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ১।৪); এবং শালিবাহন শকের আরম্ভে আবির্ভূত অশ্বঘোষ কবির 'বুদ্ধ চরিত' নামক সংস্কৃত কাব্যের প্রথম সর্গের ৫০ শ্লোকে—

"আচার্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানামপ্রাপ্তমন্যৈর্জনকো জগাম।"

"ব্রাহ্মণদিগকে যোগবিধি শিখাইবার কাজে জনকরাজা আচার্য্য (উপদেষ্টা) হইয়াছিলেন, জনকের পূর্ব্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই" এইরূপ বর্ণনা আছে। এইস্থানে যোগবিধি অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বিধি এইরূপ অর্থই করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের ইহাই রহস্য এইরূপ গীতাদি গ্রন্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন; অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (৯।১৯। ও ২০) "গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষ কিরূপে সাধন করা যাইতে পারে" ইহা দেখাইবার জন্য জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। জনক প্রদর্শিত মার্গের নামও 'যোগ' ছিল। এইরূপ যোগ বৌদ্ধগ্রন্থাদিতেও যখন সিদ্ধ হইয়াছে তখন গীতার যোগ শব্দেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, জনকের মার্গও গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন (গী, ৩।২০)। সাংখ্য ও যোগ এই দুই মার্গ সম্বন্ধে বেশী বিচার-আলোচনা পরে করা যাইবে। কোন্ অর্থে গীতায় যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন।

যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ এবং যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী, এইরূপ গীতার এই দুই শব্দের মুখ্য অর্থ এই

অনুসারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্‌টি ইহা আর স্বতন্ত্ররূপে বলিতে হইবে না। ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে 'যোগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪। ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুন (গী, ৬। ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গী, ১৮। ৭৫) সঞ্জয়ও গীতোক্ত উপদেশের 'যোগ' এই নাম দিয়াছেন,—ইহা উপরে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার প্রত্যেক গীতাধ্যায়ের শেষ অধ্যায়ে সমাপ্তিপ্রদর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও 'যোগশাস্ত্র'ই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, এইরূপ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কল্পের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি বর্ত্তমানের টীকাকারদিগের মধ্যে কেহই মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু" এই আরম্ভের দুই পদ লিখিবার পর, এই সঙ্কল্পের মধ্যে "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এইরূপ দুই শব্দ আসিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই পদের অর্থ "ভগবান কর্ত্তৃক গীত উপনিষদে" এইরূপ হওয়ায়, পরবর্ত্তী দুই শব্দ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্র অর্থাৎ "কর্ম্মযোগশাস্ত্র" ব্রহ্মবিদ্যারই বিষয়, এইরূপ এক্ষণে স্পষ্ট অর্থ হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, ঐ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী পুরুষের নিকট দুই মার্গ খোলা হইয়া থাকে (গী, ৩।৩)—এক, সাংখ্য অথবা সন্ন্যাস-মার্গ—অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর, জাগতিক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিরাগীর মত থাকা এবং অপর, যোগ কিংবা কর্ম্মমার্গ—অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িয়া ঐ কর্ম্ম এরূপ যুক্তিপূর্ব্বক করা যাহাতে মোক্ষপ্রাপ্তির বাধা কখন না হয়। এই দুই মার্গের মধ্যে প্রথমটির 'জ্ঞাননিষ্ঠা' এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক ঋষি ও অপর গ্রন্থকারেরাও উহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্ম্মযোগের কিংবা যোগশাস্ত্রের তাত্ত্বিক উপাদান ভগবদ্গীতা ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। তাই, যিনি এই সঙ্কল্প প্রথম রচনা করিয়াছেন—এবং উহা গীতার সকল সংস্করণেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, গীতার কোন টীকা হইবার পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়, আগেই বলা হইয়াছে,—তিনি গীতাশাস্ত্রান্তর্গত বিষয়ের অপূর্ব্বতা কিরূপ তাহা দেখাইবার জন্যই "ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে" এই পদগুলি সেই সঙ্কল্পের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহা স্থাপন করিবার ভিত্তি আছে, হেতু আছে; উহা নিরর্থক বা মন-গড়াও নহে—তাহা এক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে; এবং গীতাসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টীকা হইবার পূর্ব্বে গীতার তাৎপর্য্য লোকে যেরূপ বুঝিত তাহাও উহার দ্বারা সহজে উপলব্ধি হয়। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগমার্গের প্রবর্ত্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর (যোগেশ্বর=যোগ+ঈশ্বর) যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ তিনি স্বয়ং কর্ম্মযোগ প্রতিপাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বলোকের হিতার্থ অর্জ্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। 'যোগ' ও 'যোগশাস্ত্র'—গীতার এই দুইটি শব্দ অপেক্ষা 'কর্ম্মযোগ' ও 'কর্ম্মযোগশাস্ত্র' এই দুই শব্দ একটু দীর্ঘধরণের সত্য, কিন্তু গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে এইজন্য এই গ্রন্থে ও প্রকরণে "কর্ম্মযোগশাস্ত্র" এই ঈষৎ দীর্ঘ ধরণের নাম আমি দিয়াছি।

একই কর্ম্ম করিবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা মার্গ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শুদ্ধ মার্গ কোন্‌টি, তাহা সর্ব্বদা আচরিত হয় কি হয় না, না হইলে তাহার অপবাদ বা ব্যতিক্রমস্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমরা ভাল মনে করি, তাহা কেন ভাল, কিংবা যাহাকে খারাপ বলি তাহা কেন খারাপ এবং এই ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়া স্থির করিবে কিংবা তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়,যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে পারে তাহাকে যোগশাস্ত্র কিংবা গীতান্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে 'যোগশাস্ত্র' বলা হইয়া থাকে। ভাল ও মন্দ এই দুই শব্দ "সামান্য" শব্দ; এবং সেই অর্থেই কখন শুভ কখন অশুভ, কখন হিতকর কখন অহিতকর, কখন শ্রেয়স্কর কখন অশ্রেয়স্কর, কখন পাপ কখন পুণ্য, বা কখন ধর্ম্ম্য কখন অধর্ম্ম্য, ঐ দুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কার্য্য বা অকার্য্য কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এবং ন্যায্য ও অন্যায্য, এই যুগল শব্দগুলিরও ঐ অর্থ। তথাপি এই শব্দব্যবহারকারীদিগের সৃষ্টিরচনা সম্বন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ায় 'কর্ম্মযোগ' শাস্ত্রের নিরূপণ-পন্থাও বিভিন্ন হইয়াছে।

যে কোন শাস্ত্রই ধর না কেন, তদন্তর্ভূত বিষয়ের চর্চ্চা সাধারণতঃ তিন প্রকারে করা যাইতে পারে— (১) জড়সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে আর কিছুই নাই,—এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; এবং ইহাকে আধিভৌতিক বিচার আলোচনা বলা হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া না মানিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক এক গোলা বলিয়া মানিয়া, উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, অন্তর, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্ম্মেরই যখন পরীক্ষা করা হয় তখন সেই সূর্য্য সম্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা করা হয়। আর একটা গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ডালপালা গজাইয়া উঠা প্রভৃতি ক্রিয়া কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা হইয়া থাকে ইহার বিচার না করিয়া, জমিতে বীজ লাগাইলেই অঙ্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি প্রকার কেবল বাহ্যদৃষ্টিতেই বিচার করিলে, ঐ গাছের আধিভৌতিক আলোচনা করা হয়। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বিদ্যুৎ-শাস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রকারেরই হইয়া থাকে। অধিক কি, এইরূপ প্রকারে কোন বস্তুর পরিদৃশ্যমান গুণের বিচার হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, ইহা অপেক্ষা সৃষ্টি পদার্থের বেশী বিচার আলোচনা করা নিষ্ফল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের মত। (২) এই দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল তাহাদের গুণধর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে কিংবা তাহাদের পিছনে অন্য কোন তত্ত্ব আছে, এইরূপ দৃষ্টিতে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক বিচারকে ছাড়াইয়া যাইতেই হয়। উদাহরণ যথা—পাঞ্চভৌতিক সূর্য্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সূর্য্য নামে এক দেবতা আছেন ও তিনিই জড় সূর্য্যের ব্যবহার চালাইয়া থাকেন এইরূপ যখন আমরা মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বলে। এই মতানুসারে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে ভিন্ন এরূপ অনেক দেবতা আছেন যাঁহারা উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাজ চালাইয়া থাকেন—এইরূপ বুঝা যায়। (৩) কিন্তু জড় সৃষ্টির অন্তর্গত সহস্র সহস্র জড়পদার্থের মধ্যে এইরূপ সহস্র সহস্র স্বতন্ত্র দেবতা না মানিয়া বাহ্যসৃষ্টির সর্ব্বকার্য্যপরিচালক এবং মনুষ্যের শরীরে আত্মস্বরূপ থাকিয়া, তাহাকে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান বিধান করিতেছেন এইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত একমাত্র চিৎশক্তি এই জগতের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছে—যে শক্তির দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে—এইরূপ যখন মানা হয়, তখন তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার এই নাম দেওয়া হয়। উদাহরণ যথা—সূর্য্যচন্দ্রাদির ক্রিয়া, অধিক কি, গাছের পাতাটি নড়া পর্য্যন্ত এই অচিন্ত্য শক্তিরই প্রেরণায় হইয়া থাকে, অন্যস্থানে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবতা নাই—এইরূপ অধ্যাত্মবাদীদিগের মত। যে কোন বিষয়েরই বিচার করা হউক না কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; উপনিষদ্ গ্রন্থাদিতেও তাহা অনুসৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহার বিচার চলিতে থাকায়, একবার ইন্দ্রিয়ের অগ্নি-আদি দেবতা ও একবার তাঁহাদের সূক্ষ্মস্বরূপ (অধ্যাত্ম) লইয়া বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে ইঁহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে (বৃ, ১।৫।২১ ও ২২; ছাং, ১২ ও ৩; কৌষী, ২।৮); এবং গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে ঈশ্বরস্বরূপের যে বিচার কথিত হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্" (গী, ১০। ৩২) এই বাক্য অনুসারে আধ্যাত্মিক আলোচনাকেও আমাদের শাস্ত্রকার অন্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু অর্ব্বাচীন কালে, উপরি উক্ত তিন শব্দের অর্থ একটু বদলাইয়া প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত "কোঁৎ" আধিভৌতিক প্রতিপাদনকেই সর্ব্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। *

* অগুস্ত কোঁৎ—ইনি ফ্রান্সদেশে, গত শতকে এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর এক বড় গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্ত্রীয়রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখাইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার আলোচনা প্রথম thrological, তাহার পর metaphysical পদ্ধতিতে হইয়া থাকে

তিনি এইরূপ বলেন যে, সৃষ্টির মূলে কি-তত্ত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় কোন লাভ নাই; এবং এই তত্ত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জানা সম্ভব নহে, সুতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করা উচিত বা সাধ্যায়ত্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর, জ্বালামুখী প্রভৃতি নড়াচড়া পদার্থ যখন প্রথম দেখিল তখন এই সমস্তই দেবতা এইরূপ ধর্ম্মান্ধতাবশত মনে করিতে লাগিল। কোঁতের মতে ইহাই আধিভৌতিক বিচার। কিন্তু পরে মানুষ শীঘ্রই এই কল্পনাটি ছাড়িয়া দিয়া, সকল পদার্থের মধ্যে কোন একপ্রকার আত্মতত্ত্ব পূর্ণ হইয়া আছে এইরূপ মনে করিতে লাগিল—কোঁতের মতে মানবীয় জ্ঞানের ইহাই দ্বিতীয় ভিত্তি; এবং এই ভিত্তিকে তিনি আধ্যাত্মিক এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই মার্গ ধরিয়া সৃষ্টির বিচার করিয়াও প্রত্যক্ষ-উপযোগী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের যখন কোন বৃদ্ধি হয় না, তখন মানুষ শেষে সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থসমূহের গুণধর্ম্মেরই বেশী অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার দরুণ এক্ষণে আগ-গাড়ী, তারাযন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় কৌশল অবলম্বনে বাহ্য সৃষ্টির উপর মানুষের অধিক আধিপত্য হইল। কোঁৎ ইহার আধিভৌতিক মার্গ এই নাম দিয়াছেন; এবং যে-কোন শাস্ত্রের কিংবা বিষয়ের বিচার আলোচনা করিবার সময় এই মার্গই অন্যান্য মার্গ অপেক্ষা অধিক লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ—ইহাই তিনি স্থির করিয়াছেন। কোঁতের মতে, সমাজ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিংবা কর্ম্মযোগ শাস্ত্র সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিভূমিকেই স্বীকার করিতে হইবে; এবং তাহা স্বীকার করিয়া, ইতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক এই পণ্ডিত সকল ব্যবহার শাস্ত্রের এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপর প্রেম স্থাপন করিয়া সতত সর্ব্বলোকের কল্যাণার্থ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্ম্ম। মিল, স্পেন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত এই মতের অগ্রণী বলিলেও চলে। উল্টাপক্ষে, কাণ্ট, হেগেল, শোপেন্‌হোয়ের প্রভৃতি জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি নীতিশাস্ত্রের বিচার পক্ষে অপূর্ণ স্থির করিয়া আমাদের বেদান্ত অনুসারে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা নীতি সমর্থনকারী মার্গ অধুনা স্থাপন করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে অধিক জ্ঞাতব্য কথা পরে বলা যাইবে। (ক্রমশঃ)

এবং শেষে তাহার positive স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়—এইরূপ অনেক শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া ইনি স্থির করিয়াছেন। এই তিন পদ্ধতির অনুক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই প্রাচীন নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি; কোঁৎ এই পদ্ধতি নূতন বাহির করেন নাই, উহা পুরাতনই। কিন্তু উহাদিগের ঐতিহাসিক ক্রমটি তাঁহার নূতন রচনা। সর্ব্বাপেক্ষা positive (আধিভৌতিক) পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ ইহাই তাঁহার নূতন কথা। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার প্রধান গ্রন্থের ভাষান্তর হইয়াছে।

ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায়।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের স্বাভাবিক। মানুষ স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক; তাহার ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় চেষ্টা করিয়া। ধার্ম্মিক হওয়ার অর্থ এই যে মানুষ স্বভাবতঃ যাহা আছে তাহাই থাকিবে। যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে ব্যক্তি ইহা যখনই ভুলিয়াছে তখনই সে ধর্ম্মে "পতিত" হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই তিনটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্ম, সরস, সহজ এবং মঙ্গলপ্রদ। যাঁহারা কেবল একচোখো বিচার অনুসারে, শুধু আপনাদিগকে বড় করিবার জন্যই অধিকারি-ভেদে ধর্ম্মশিক্ষাদানের দোহাই দিয়া মানুষে মানুষে একান্ত ভেদের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম জিনিসটাকে কেবল একটা কঠোর, দুর্ব্বোধ্য, শুষ্ক, এবং কৃচ্ছ্রলভ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা ভগবানকেও যেন কেবল পাতকীর শাস্তিদাতা—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"রূপে দেখিয়াছেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইল যে একদল লোকে ভাবিল যে ধর্ম্ম কেবল স্বার্থসাধনের উপায়; কেহ ভাবিল ধর্ম্ম একটা পোষাকের মত, কেহ ভাবিল ধর্ম্ম একটা দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ্য, দুঃসাধ্য বস্তু মাত্র।

ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ চিরদিন নিজেকে ছোটো ভাবিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিবেই না। আজ কাল সক-

লের মনেই এ কথা জাগিতেছে যে, অন্য সকল বিষয়ে ভেদ থাকুক, তাহা না হয় ঠেকিয়াই সহিব, কিন্তু ধর্ম্মজগতেও আমরা চিরদিন ছোটো হইয়া চলিব এ একটা কেমন কথা? আমরা যতই কেননা চেষ্টা করি, এই যে ধর্ম্মজগতের নব-জাগরণ, ইহাকে কখনই আর বাধা দিতে পারিব না। কারণ মানুষের ভিতরের আসল মানুষটা জাগিয়া উঠিয়া যখন কিছু দাবী করে তখন আর তাহাকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে নারদ দাসীপুত্র হইয়াও দেবর্ষি, ব্যাসদেব ধীবরীর গর্ভজাত হইয়াও পুরাণ-প্রণেতা, জবালার পুত্র সত্যকাম অজ্ঞাতকুলশীল হইয়াও শ্রদ্ধাভাজন, ধর্ম্মব্যাধ নিষাদ হইয়াও নমস্য, সে দেশে ইহা সহিবে কেন?

অনেক উৎপীড়নের পরে মানুষ যখন চেতিয়া উঠে, তখন তাহার গতিবিধি একান্ত উচ্ছৃঙ্খল, ও অনিয়মিত হইয়া উঠে। তখন তাহার সত্য লাভ করার চেয়ে উৎপীড়নের উপর আঘাত করিবার ঝোঁকটাই প্রবল হয়। কারণ তাহার হৃদ্গত আক্রোশে সে অন্ধবেগে চলিয়াছে, খাঁটি জিনিসটা চোখের সামনে থাকিলেও তাহার চোখে পড়ে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মজগতে যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে, তাহাদের এখন এই অবস্থা।

এখন প্রধান সমস্যা এই দাঁড়াইয়াছে যে ধর্ম্মকে সহজে সর্ব্ব-সাধারণের ভিতরে প্রচার করিবার উপায় কি?

প্রধান উপায়—ধর্ম্মশাস্ত্রের জটিল, নীরস, তথ্যগুলি খুব সরল এবং সরস ভাবে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রচার করিতে হইবে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কথকতা দ্বারা এই প্রকারে ধর্ম্ম প্রচারের খুব সুবিধা ছিল। কালক্রমে এখন কথকতাটা যেন একটু সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতগণের অনেকেই এই মহামঙ্গলপ্রদ বিষয়টির মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা কতকটা কথকগণের দোষেও হইয়াছে বটে। দেশে ভালো কথক প্রস্তুত হওয়া দরকার। পরন্তু ধনীমানী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আবার কথকের উপরে সহানুভূতি থাকাও দরকার। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কথকতা করা বড় কঠিন কার্য্য, কথক হওয়া বহু সাধন-সাপেক্ষ। কথকতার ভিতরে অভিনয়, সঙ্গীত, বক্তৃতা, তত্ত্বমীমাংসা, সকলই আছে। একজন কথক হইতে হইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত, ভাবুক, ভক্ত এবং রসিক হইতে হইবে।

সেকালের বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের অনেকেই নিরক্ষর হইয়াও ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে পারিতেন। এ সকল তাঁহারা প্রধানত কথকতা শুনিয়াই শিক্ষা করিতেন। 'সেকেলে' বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় সমস্ত রাজগণের এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বংশাবলীর ইতিহাস উত্তমরূপে জানিতেন। এখন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের পিতার নাম জানি না, কিন্তু Henry নামক রাজার পূর্ব্ব পুরুষের নাম বলিতে পারি! সে একদিন গিয়াছে, যখন অনাড়ম্বর শ্যামস্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন পল্লীগৃহের আঙিনায়, শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যায়, স্নেহময়ী, পুণ্য-প্রতিমা "দিদিমা"গণ মৃণ্ময়-প্রদীপের সম্মুখে পা ছড়াইয়া ভূম্যাসনে বসিতেন, আর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সরল, মুক্ত-প্রাণ বালক বালিকাগণ বসিয়া সীতার বনবাসদুঃখে কাঁদিত, শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগে বিস্মিত হইত, লক্ষ্মণের বীরত্বে উত্তেজিত হইত, এবং হনুমানের ভক্তিতে আর্দ্র হইত!

উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু উপদেশে, এবং কয়েকটী দুর্ব্বোধ্য জটিলসূত্রবিশেষ বারম্বার আওড়াইলেই কোনো ফল হয় না। তত্ত্ববোধিনী কলাবিদ্যারও প্রয়োজন। নতুবা সহজে তত্ত্ববোধ হইবে না। যদি কেবল শুষ্ক উপদেশেই কাজ চলিত, তবে আমরা দেখিতে পাই যে শিশুপাঠ্য বাল্যশিক্ষা নামক গ্রন্থেই তো "ক—চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়" অবধি "স্ত—হস্তীরও পদস্খলন হয়" ইত্যাদি অনেক উপদেশই তো রহিয়াছে। কিন্তু কেবল বাল্যশিক্ষার উপদেশেই ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। দৃষ্টান্তের প্রভাবই অধিক ইহা আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বথা দেখিতে পাই।

এই দৃষ্টান্তগুলি একটু সরস হইলে ভালো হয়; এবং সত্যিকার জীবনচরিত হইতে দেখাইলে আরো ভালো হয়। যাঁহার জীবনী হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাইবে, তিনি যদি পরিচিত ব্যক্তি হন, অথবা এমন মানুষ হন, যাঁহার চরণে বহুকাল অবধি বহুলোকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া আসিতেছেন, তবে তো কথাই নাই। অনেক সময়ে জীবিত ব্যক্তিদের চেয়ে মৃত ব্যক্তিদের জীবনচরিত হইতে দৃষ্টান্ত দিলেই সর্ব্বসাধারণের অধিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া সম্ভাবনা। কারণ জীবিত কোনো এক ব্যক্তির প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা জগতে শুভ্র কীর্ত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, মৃত্যু দ্বারা যাঁহারা লোকের মনে আরো বেশী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা প্রায় সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শুনিবে ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে।

এই জন্যই বাজে নভেল নাটকের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা জীবনচরিত হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইলেই মানুষের বেশী শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়, কারণ জীবনচরিত সত্য। এই জন্যই পুরাণ গ্রন্থগুলির অনেক স্থান হইতে কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া, আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া, কেহ যদি তাহা প্রচার করিতে পারেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। পুরাণগ্রন্থের ভাবগুলি আমাদের মজ্জাগত। বিশেষ করিয়া পুরাণগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে তাহাতে সামাজিক, নৈতিক কোনো আলোচনাই বাদ পড়ে নাই। কোনো নবেল অথবা নাটকে কোনো কল্পিত সদানন্দ স্বামী তাঁহার রামানন্দনামক শিষ্যকে কি উপদেশ দিতেছেন ইহা শুনার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন শুনিলেই লোকের মনে বেশী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সত্য, চিরকালই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মুখ হইতে তাহা বাহির হইলে উহার শতগুণ ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। ধর্ম্মজগতের জটিল তত্ত্বগুলি সেই নমস্য ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য। তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে উহা গ্রথিত। তাই শুষ্ক তৃণের ভিতরে অগ্নিবৎ, লোকের চিত্ত উহা শুনিবামাত্রই পুণ্যপ্রভায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে বর্ত্তমান সময়ে, আধুনিক ধরণে বালকগণকে কি প্রকারে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে, কি প্রকারে তাহাদের জীবন গঠন করিতে হইবে ইহা একটি বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকদের কাছে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" কথাটাকে খুব প্রাকৃত বাংলা ভাষায় নেহাৎ সরল করিয়া ধরিলেও তাহাদের তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়—কোনো-প্রকারে বুঝিলেও তাহা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না। একটী কথা বুঝা, আর তাহা জীবনে পরিণত করা এ দুইটী বিভিন্ন জিনিস। নিরক্ষর ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মজগতে বালক। তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইলে একটু সরস এবং সরলভাবে বুঝাইতে হইবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে নাটক, উপন্যাস, কবিতা, জীবনচরিত এবং কথকতা প্রভৃতির দ্বারা।

যাহারা কেবলমাত্র জটিল ও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের একান্ত পক্ষপাতী, তাহাদের দ্বারা উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ এযুগে শিক্ষিতগণের জন্যও বক্ষ্যমান উপায় অবলম্বনীয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের ভিতরে পৌরাণিক উপাখ্যান, সুরুচিপূর্ণ, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারোপযোগী নাটকাদির প্রচলন হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শক্তিমান্ গ্রন্থকারগণ এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বড়ই ভালো হয়। প্রায়শঃ এ ভাবের কোনো ভালো পুস্তক বাহির হইতেছে না। কেবল কবিতা আর ছোটো গল্পের পুস্তকেরি বেশী কাট্‌তি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলির মধ্যে কবিতা ও ছোট গল্পের আস্বাদ তো থাকিবেই; ইহা ছাড়া এমন কিছু থাকিবে. যাহাতে মানুষকে প্রকৃত পক্ষেই মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী পুস্তক লিখিতে হইলে, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য এবং শ্রদ্ধা থাকা বিশেষ দরকার। কারণ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"। পুরাণের উপাখ্যানগুলির অন্তর্নিহিত সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। একটা সত্য কথা পুনঃ পুনঃ বলা কিম্বা লিখিত হইল, তবু মানুষ তাহা গ্রহণ করিল না; ইহাতে বুঝিতে হইবে যে সেই ভাব বা সত্যটীর পশ্চাতে যতটা ভাষার জোর, লিখন ক্ষমতা এবং ঐকান্তিকতা থাকিলে মানুষের মনে ক্রিয়া করিবে, তাহার অভাব হইয়াছে। এক একটী সত্য প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয় না। যিশুখ্রীষ্ট, সক্রেটিশ, গ্যালিলিও সত্য প্রচারের জন্য প্রাণ দিয়াছেন; গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ গৃহত্যাগ করিয়াছেন; মহম্মদ কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন!

নাট্যাভিনয়ের দ্বারাও সহজে সর্ব্বসাধারণের ভিতরে ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হয়। সকল সভ্যজাতির ভিতরেই উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও এ প্রথা অতি পুরাতন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সুরুচিপূর্ণ, সরস নাটকের এ দেশে বড়ই অভাব। ব্যবসায়ী নাট্যসম্প্রদায় যে সকল নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা ভাল হওয়া অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইতেছে। ইহাদের অনেক নাটকই পিতার কাছে বসিয়া পুত্র অসঙ্কোচে পড়িতে পারে না। অথচ এই সকল নাট্যাভিনয় দেখিতে অর্থব্যয় করিয়া দলে

দলে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ এবং ভদ্রলোকগণ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইতেছেন। স্কুল কলেজের ছাত্রগণেরও এই সকল অভিনয় দেখিয়া অভিনয় করিবার একটা ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু সুরুচিপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবে প্রায়শঃ তাহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠে না। মানুষের জীবনে উৎকৃষ্ট আনন্দ না পাইলেই রুচিবিকার উপস্থিত হয়। ধর্ম্মমূলক, সমাজ সংস্কারোপযোগী নাটক প্রকাশিত করিয়া দেশের এই অভাব দূর করিলে বড়ই ভালো হয়।

আমাদের দেশে গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের লেখক ও কথক অনেক আছেন; কিন্তু আমরা এ যুগে চাই একদল পণ্ডিত এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি, যাঁহারা সহজ মানুষ হইয়া, সহজ কথা কহিয়া, সহজে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

একটী পত্র।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি যে গত সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা" প্রবন্ধ সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক গণ্যমান্য সভ্য আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে আপনি যে "ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া-সমস্যা" প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, এবং এই কথা আপনাকে জানাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"এমন কোন আচার বা রীতি নাই, যাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যাহাতে আচার নিয়মের ভালটা রক্ষা পায় এবং মন্দটা বর্জ্জন করা যায়, সাধুসমাজমাত্রের বুদ্ধিমান ও হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। মেয়েদিগকে লেখাপড়া না শিখাইলেও চলিবে না; কিন্তু লেখাপড়া শিখাইবার যদি কোনও আনুষঙ্গিক দোষ থাকে, তাহাও পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা না পাইলে চিরকালই বিলাতী মহিলাদের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; তাঁহারা আসিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী হইবেন। আবার গৃহস্থাশ্রম বা বিবাহিত জীবনই যে যুবক ও যুবতীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবন, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

"আপনার বিপক্ষবাদীদের অবস্থায় আপনি সহানুভূতি দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনূঢ়া বৃদ্ধির অমঙ্গল আশঙ্কা যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন, বিশেষতঃ একদিকে পুত্রের ইংরেজী শিক্ষা, অন্যদিকে কন্যার ইংরেজী শিক্ষা, এতদ উভয় ব্যয়-সাপেক্ষ শিক্ষার চাপে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ বিশেষরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে।"

মান্যবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের সম্মানলাভ।

আমরা গভীর আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম-এ, মহোদয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "স্যার" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে পারিবারিক হিতকরী সভা গত ২৮শে জুলাই দিবসে টেগোর কাসেলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটী পঠিত হইয়াছিল।

হে বাঙ্গালীর ভুবন-আলো, জ্ঞানের মেরুযাত্রী,
তোমার মানস-প্রতিভাতে, প্রভাত তিমির-রাত্রি।
দেশ বিদেশের নিত্য বাণী, ভাষা-সাগর-রত্নহার,
উজলিছে কণ্ঠ তব অক্ষয় অতুল অলঙ্কার।
সুপ্রসন্ন দৃষ্টি তোমার, সম্মানিত শুভ্রকেশ,
দিব্য শুভ মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত সর্ব্ব দেশ।
একনিষ্ঠ বিদ্যাতপাঃ গৌরব-হিমালয়-মাঝে,
সিদ্ধি তোমায় বরণ করে, সফল-শঙ্খ ওই বাজে।
মগ্ন আছ কর্ম্মযোগে, স্বর্ণরথে পূর্ব্বাশায়,
দেখছ অন্তঃনেত্র মেলি' শুক-তারকার রশ্মি ভায়।
সার্ব্বভৌম শ্রেষ্ঠ নিধি, চিত্ত-বিকাশ-মন্তরে
ধন্য তোমার অন্তরাত্মা, যশের তৃষ্ণা জয় করে।'
আজকে তোমায় বন্দিতেছি, প্রস্ফুটিত হৃৎকমল,
আনন্দেরি ছন্দলীলায় স্পন্দিছে এই বক্ষতল।
তোমার মহিমায় মহীয়ান, আমরা তোমার দেশবাসী
গুণের পূজায়, বীরের পূজায় অর্ঘ্য সঁপি তাই আসি।
দেশকে বড় করেছ গো, এই অভিষেক তার লাগি'
বিরাট্ বনস্পতি তুমি, আমরা ছায়া-ফল-ভাগী।
অনুরাগের বেদীর পরে প্রতিষ্ঠিয়া সিংহাসন,
আরতি-দীপ উদ্ভাসিয়া বসায় তোমার ভক্তজন।
এস নীরব সরল সুধী, প্রাণ উঠেছে চঞ্চলি'
লও গো মোদের সচন্দন এই ভক্তিপ্রেমের অঞ্জলি।

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তবুও ক্রন্দন।

তোমা বড় ভালবাসি ওগো প্রাণসখা—
তুমি এসে দেখে যাও মরমের মাঝে
তোমার প্রেমের দীপ ধ্রুবতারা যেন
নয়নের আগে মোর সদা জেগে আছে—
তবুও ক্রন্দন কেন অন্তরেতে জাগে?
চিন্তা তবু কেন ঘুরে তোমা হতে দূরে?
তোমারে জানিতে চাহি আরো আরো আরো
সাধিয়া তোমারি প্রিয়—আশা নাহি পূরে।
মুহূর্ত্তেরো তরে তোমা দেখিবারে চাই—
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হনু—তবু নাহি পাই।
তবে কি তোমারে ভাল নাহি বাসি আমি?—
ভাবিতেও নারি যে তা' হে জীবনস্বামি।
কবে মম পূর্ণ প্রেম তোমারি চরণে
নিবেদি' সার্থক হব, সদা ভাবি মনে।
মুহূর্ত্তের তরে দেব ভেঙ্গে দাও ভয়
সংশয় দূরিয়া দাও করগো অভয়।
তোমারি পরে নির্ভর শিখাও করিতে
তোমারি মহান প্রেমে শিখাও মিলিতে।
সকল সংসার মাঝে কেবা আছে বল
হৃদয়ে ধরিয়া যারে হইব সবল!
জানায়ে যাহারে সব সুখ দুঃখ কথা
জুড়াব তপত প্রাণ ঘুচাইব ব্যথা?

—

কাতর প্রার্থনা।

হে প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইবার আনন্দের একটী কণিকামাত্র আমাকে দাও, তাহাতেই যে আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে; তাহাতেই যে আমার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা আসিবে। সেই বন্যাতে আমার হৃদয়ের দুই কূল ভাসিয়া গিয়া নব নব জ্ঞানের নব নব ভাবের জন্মদান করিবে। প্রাণনাথ, তোমার সেই আনন্দের চিন্তামাত্র আমাকে পাগল করিয়া দিতেছে। তোমার আনন্দ-বারির একটী কণা দিয়া আমার এই উন্মত্ত প্রাণকে শীতল কর, তাহার পিপাসার শান্তি কর। তোমার সেই আনন্দকণাটুকু পাইবার জন্য সমস্ত রাত্রি আমি আমার হৃদয়নদীর তীরে বসিয়া কাটাইলাম। তোমার আনন্দকণার পরিবর্ত্তে চারিদিক হইতে কত গঞ্জনা লাঞ্ছনার তীব্র শিলাঘাত, নিন্দাবাদের বরষার ধারা, ভবিষ্যৎ চিন্তার নিবিড় অন্ধকার, এই সকল একটীর পর একটী আসিয়া কত না আঘাত দিয়াছে, হৃদয়ে কত না ভীষণ তরঙ্গ জাগা-ইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিশীথিনীর গভীর অন্ধকারে ভয়ে কাঁপিতেছিলাম, কিন্তু তোমার সেই আনন্দকণা লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই। প্রভু, সে অন্ধকার এখন কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর নিন্দা গঞ্জনা প্রভৃতির সকল ভয় দূরে গিয়াছে। প্রভাতের আলোক দেখা

দিতেছে। প্রভু আর তুমি বিলম্ব কোরো না। তোমার আনন্দধারায় আমাকে প্রাতঃস্নাত ও পবিত্র করিয়া দাও। হে প্রাণপতি, তোমার সঙ্গে আমাকে অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে আবদ্ধ কর। আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তি তোমার প্রেমের অধিকারী হইয়াছি—একথা ভাবিতেও যে ভয়ে আনন্দে সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। যত কিছু নিন্দা গঞ্জনা আমি সহ্য করিয়াছি, সকলকে নমস্কার করি—তাহারা তোমাকে আমার স্মৃতিতে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছে।

অনন্ত ও কাল।

(শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী)

অনন্তের মুখের অবগুণ্ঠনের নিমিত্ত যে দুইখানি যবনিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একখানি কাল অপর খানি স্থান। সান্ত মানব যখনই অনন্তকে জানিতে চায় এই দুইটী যবনিকা তাহার দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়। তাই সৃষ্টির আদি কাল হইতে মানব কেবলই অনন্তকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া মানবের হিসাব নিকাশ একেবারে কখনও মিটাইয়া ফেলা হয় নাই। কোন্ মাহেন্দ্রযোগে হয়ত কখন্ কে এই অবগুণ্ঠন ঈষদুন্মোচিত হইতে দেখিয়াছেন—বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চকিতে অনন্তের সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন—আবার পরক্ষণেই সেই যবনিকা তাঁহার নয়নের সম্মুখে পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছে। অনন্ত চিরদিনই মানবের নিকট প্রহেলিকা। "ফাউস্ট" সারাজীবন জ্ঞান উপার্জ্জনে কাটাইয়া, মৃত্যুকালে—"আরো আলো আরো আলো" বলিয়া হতাশ হৃদয়ে চীৎকার করিয়াছেন।

"কোথায় আলো ওরে কোথায় আলো
বিরহ আঁধারে তারে জ্বালো"

অনন্তের সঙ্গে মিলন হয় নাই, বিরহ-অন্ধকারে হৃদয় পূর্ণ—আলোর অন্বেষণ চলিয়াছে, আলো কোথায়? কালের যবনিকার অন্তরালে। এই যবনিকা ভেদ করিতে পারিলে যথার্থ আলো দেখা যাইবে—অন্য আলো আলেয়ার আলোকের ন্যায় মানবকে বিপথগামী করিবে, সারাজীবন কেবল মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে, অবশেষে জীবনপথে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ক্লান্ত পথিককে ম্যাক্‌বেথের ন্যায় বলিতে হইবে—"All our yesterdays have lighted fools the way to dusty death"—কিন্তু অনন্তের আলোকরশ্মি যদি আবিষ্কৃত হয়, যদি সত্যের আলোক নয়নে কখনো আবির্ভূত হয়, তখন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যাইবে—সব অস্ফুট ফুটিয়া উঠিবে, সন্দেহ থাকিবে না—সংশয় থাকিবে না—সত্যের ভাস্বর জ্যোতিতে হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে।

অনন্তের ব্যাপার আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র দর্শনে কত নব নব মীমাংসা করিতেছি—কত বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে তথাপি মানবের অভাব মিটিতেছে না। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার জন্য কত নব নব অস্ত্র নির্ম্মিত হইল, কত সুখের, সাধের ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত হইল কিন্তু সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়? সবই অচিরস্থায়ী, সবই অনিত্য, সবই চঞ্চল। আজ যাহাকে দেখি—কাল আর দেখি না, আজ যে যৌবন সরোবরে স্নান করিয়া সুখের হিল্লোলে ভাসিতেছে—কাল সে জীর্ণ জরাগ্রস্ত; সবই অনিত্য সবই চঞ্চল সবই নশ্বর! কালের হস্তে কাহারও নিস্তার নাই, কাল সকলকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সংহার—সংহার, মহামার, গগনে গহনে এই ভীমরব উঠিয়াছে। নিস্তার নাই কাহারও, নিস্তার নাই "সহায় সম্পদবল, সকলই ফুরায় কাল'';—কাল রৌদ্র, কাল ভীষণ, কাল করাল! বিশ্বে যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় প্রলয়ের প্রলয়ঙ্করী ভেরী যখন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত করিয়া বাজিতে থাকে, সেই বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাল তাণ্ডব নৃত্য করেন। কাল এমনই ভয়ঙ্কর। নিত্য খণ্ডপ্রলয় চলিতেছে, আবার মহাপ্রলয়—যদিও বা খণ্ডপ্রলয়ে কিছু রহিয়া গেল মহাপ্রলয়ে তাহাও আর রহিবে না। সর্ব্বসৃষ্টির নাশকর্ত্তা মৃত্যুবিধায়ক এই কাল মানবের সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া আসিতেছে। কোথায় গেল আর্য্যের সে অপূর্ব্ব গৌরব, সমগ্র সভ্য জগত স্তব্ধ হইয়া অনিমিষ নয়নে যাহার পানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল? ম্যারাথন,

ধার্ম্মাপলী, গ্রীস আজ আঁধারে নিমজ্জিত কেন? মুসলমানের সে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়বৈজয়ন্তী, সসাগরা অর্দ্ধধরার বক্ষের মাঝখানে একদিন যাহা উড্ডীন হইয়াছিল, সুবাতাসের অভাবে আজ তাহা কোথায় পড়িয়া আছে? এ সকলের প্রভাব লোপ করিয়াছে কে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর "কাল।" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভীত অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ রূপ কিসের?" —উত্তর হইয়াছিল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"—সকলে চক্ষে দেখিতেছেন এবং বিশ্বাসও করিতেছেন যে কালই যথার্থ ক্ষয়কারী; কালের ভীম প্রহরণের আঘাতে বালক বৃদ্ধ যুবা কাহারও পরিত্রাণ নাই। কালের অঙ্গ হইতে অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিয়ত বর্ষিত হইতেছে—ইহাই কালের চিত্র।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা—প্রকৃতির সকল দিক দেখিবার শক্তি আমাদের কোথায়? সামান্য একটু দর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে না করিতে আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়—নিজেদের মনগড়া একটা মীমাংসায় আমরা অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া থাকি। টেনিসনের "আর্থার" পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাঁহার আত্মীয় শিষ্য তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাঁহার প্রাণোপমা পত্নী বিশ্বাসঘাতিনী। আপনারই বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া রক্তাক্তকলেবরে বিকলাঙ্গ আর্থার পড়িয়া আছেন —তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে জীবনের একমাত্র শেষ সঙ্গী "সার বিডিভিয়ার"। বিডিভিয়ার চিন্তা করিতেছেন—"একি হইল—এমন মহৎ কার্য্যের এ শোণিতবাহী পরিণাম কেন? আত্মীয় স্বজনের রক্তমজ্জিত সমরস্থল এ মহাপুরুষের সমাধি কেন"? মীমাংসা হয় না—কিছুই বুঝিতে পারেন না। সহসা তাঁহার মনে হইল—"perchance we see not to the end" আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখি না। পরিণাম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই, তাই জগতের অনেক কার্য্য আমাদের প্রহেলিকা মনে হয়, অনেক কার্য্য অত্যাচার অন্যায় বলিয়া মনে হয়। বিশ্বের অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন নিয়ম যুগ যুগান্তরের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়া জীব ও জড় জগতকে রমণীয় বরণীয় ও কমনীয় করিয়া তুলিতেছে। আমরা মনে করিতেছি কাল ধ্বংস করিতেছে—মানবের প্রিয়তমগুলিকে অপহরণ করাই কালের কার্য্য। আর্থারকে রণস্থলে শোণিতার্দ্র ভাবে পতিত থাকিতে দেখিয়া কাহার না চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়—তাঁহার অপেক্ষা কে অধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছে? তাঁহার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। যদি এই খানেই এ দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইত তাহা হইলে বলিতাম "কাল সব ধ্বংস করিল—আর্থারের বিপুল কীর্ত্তি, মহান উদ্দেশ্য আজ কালস্রোতে ভাসিয়া গেল।" কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতেছি যে না, তাহা সত্য নয়; ইহা পরিণাম নহে, একটা অবস্থামাত্র—এখনও শেষ হয় নাই—ইহা আর্থারের জীবননাট্যের যবনিকা নয়—একটী গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি মাত্র। Hope Charity এবং Faith নামক তিনটী তরুণী দেবকন্যা পরিশ্রান্ত আর্থারকে লইয়া কোন্ অজানার পারে চলিয়া গেলেন। কালের যবনিকার অন্তরালে যে দৃশ্য লুক্কায়িত ছিল তাহা যে অতীব মনোরম, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? আর্থারের জীবননাট্য যে ট্রাজেডী তাহা আর বলিবার উপায় নাই; যদি আশা থাকে, বিশ্বাস থাকে, প্রাণের কণ্টক তুলিয়া ফেলিবার জন্য কোন ব্যগ্রহস্ত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে তবে আর কিসের ভয়? এইখানেই ট্রাজেডীর কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া মনে করিতে হয়—জীবন—"Divine Comedia।" কদর্য্যতার মধ্য হইতে এ স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিল কে? কাল—অপেক্ষা করিতে হইবে, কালকে ধ্বংসের কর্ত্তা বলিয়া সব মীমাংসা শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না।

কালের ধ্বংসের চিত্র আমরা দেখিয়াছি—এইবার তাহার মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া তাহার অন্যমূর্ত্তি দেখিতে হইবে। জগতে যত বরণীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা ছিলেন বলিয়া এই ধরণী ধন্য হইয়াছে সেই সকল মহাপুরুষগণের সৌন্দর্য্য কে এ জগতে প্রকাশ করিয়াছে? অতীতকে কে নূতন নূতন রূপ দিয়া মানবের মানসসরোবরে "মধুময় তামরসের" ন্যায় নিত্য প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়াছে? কাল যদি

ধ্বংসেরই নায়ক, তবে কেন এত ধ্বংসের পর ধরণী আজিও সুন্দর? এখনও প্রভাতের আলো, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড, সান্ধ্য তপন, পূর্ণিমার কৌমুদীধারা নিত্য সৌন্দর্য্য প্রবাহ আনিতেছে কেন? কাল যদি শুধু ধ্বংসই করিত তাহা হইলে এ পৃথিবীর অস্তিত্ব এতদিন লোপ পাইত, এই পরিদৃশ্যমান সুন্দর বিশ্বের পরিবর্ত্তে রহিয়া যাইত একটী শব—কঙ্কালচ্ছাদিত বিরাট মহাশ্মশান। ধ্বংস এ সৃষ্টির পরিণতি নহে; কঙ্কাল সৌন্দর্য্যের পরিণতি নহে, মৃত্যু জীবনের পরিণতি নহে।

অনন্তের দুইটী দিক আছে একটী ব্যক্ত আর একটী অব্যক্ত। একটী মানবের নয়নে নিত্য প্রতিভাত আর একটী গভীর রহস্যযবনিকার অন্তরালে। দুইটী দুই বিভিন্ন প্রকারের। কবি লংফেলো বলিয়াছেন "Things are not what they seem"—বাস্তবিক তাই কালকে আমরা ধ্বংসের নায়ক বলিয়া মনে করিতেছি। আপাত দৃষ্টিতেতাহাই বোধ হয়। কিন্তু ব্যক্ত দৃষ্টিতে অব্যক্তের রহস্য কেমনে উদ্ঘাটন করিব? অব্যক্তকে বুঝিতে হইলে দৃষ্টির সম্মুখে যাহা দেখা যায় তাহা হইতে আরও দূরে যাইতে হইবে—দূরে দূরে বহুদূরে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে চলিতে হইবে; বিশাল কালপয়োধির অন্ত নাই সীমা নাই কেবল অবিশ্রান্ত গর্জ্জনশীল লক্ষ উর্ম্মিমালার আকুল প্রাণের অশ্রান্ত লীলা।

কালের তরঙ্গাঘাতে ধ্বংসের সম্ভাবনা নাই কেবলমাত্র নিত্য সৌন্দর্য্যের নবতর বিকাশ! অনিত্য আসিয়া সেই বিকাশকে মাঝে মাঝে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, কাল তাহার তরঙ্গাঘাতে অনিত্যের সেই আবরণ খানিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়—তখন আবার নিত্য জাজ্বল্যমান ভাস্বর জ্যোতিতে বিরাজমান হইতে থাকেন। এই লীলা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের এই ধরণী অনন্তযৌবনা। নব নব ধ্বংসের মধ্য দিয়া ইহাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাল এই নিত্য সৌন্দর্য্যকে নিত্য নূতন করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা ধ্বংস দেখি বটে, কিন্তু এ ধ্বংসের প্রকৃত তত্ত্ব কি? সৌন্দর্য্যের গাত্র হইতে ধূলি অপসারণ, বিশ্বের এই সনাতন নিয়মই এই তত্ত্ব। সকল সমাজ, মানব এবং জড় জগতকে এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইতেছে। সকল দেশে সংস্কারকগণ এই বিশ্বনিয়মেই তাঁহাদের কার্য্য করিতেছেন। "Iconoclast" বলিয়া জগত যাঁহাদিগকে গালি দিয়াছে তাঁহারা বাস্তবিক "Iconoclast" নহেন—তাঁহারা প্রকৃতই সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের উপাসক! ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত রহিয়াছে। সৃষ্টির নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন—নব সৌন্দর্য্য বিকাশের নিমিত্ত ধ্বংসের প্রয়োজন। মৃত্যু অমঙ্গল নহে—মৃত্যু চিরদিন কল্যাণকে বরণ করিয়া আসিতেছেন। মানব এই চিরযৌবনা ধরণীকে নিজের ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিয়া মাঝে মাঝে মনে করেন বুঝি ইহার যৌবন বিগত হইয়াছে—তখন যেমন দেখিয়াছিলাম আর বুঝি তেমন নাই; প্রভাতের আলো সেকালে যেমন করিয়া সোনা ছড়াইত—কই এখন ত আর তেমন করিয়া ছড়ায় না—আকাশের নীলিমা আর যেন তেমন গাঢ় নয়—যেমন দেখিয়াছি তেমন আর দেখিব না, যেমন গিয়াছে তেমন আর হইবে না! তাঁহার কেবলই মনে হইতে থাকে—"আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?" তাঁহার প্রাণে অনন্ত আশা—ধরণীকে আর একবার তেমন ভাবে দেখেন, জগতে নব আগন্তুক হইয়া আসিয়া সেই সোনার শৈশবকালে যেমন দেখিয়াছিলেন—যৌবনের সুখস্বপ্নের মাঝে মাঝে আধবিজড়িত ঘুমঘোরে এই তরুণা ধরণীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিত্তে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; তাই জরাগ্রস্ত কলেবরে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় তিনি ধরণীর সেই রূপ দেখিতে কামনা করেন।

কিন্তু কেমন করিয়া দেখিবেন—কে তাঁহাকে দেখাইবে, সে নয়ন যেআর নাই—নয়নে আবরণ পড়িয়াছে। এ আবরণ উন্মুক্ত করিবে কে?

"দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি আবরণ
তাহার সাথে কনকপ্রাতে জগতজাগা জাগরণ"

এই সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধকে জাগাইয়া তুলিবে কাল—সেই জাগরণে ধূলি অপসারিত হইবে, মানব নিজে জাগিবেন, সঙ্গে সঙ্গে এই জগতও জাগিয়া উঠিবে। এই জাগরণের নিমিত্ত মৃত্যুর প্রয়োজন; মৃত্যুর মধ্য হইতে এই জাগরণের বিকাশ। সেক্ষপীয়র বলিতেছেন—"To die perchance to sleep
Ah, there's the rub."

হ্যামলেটের সন্দেহ হইতেছে যে মৃত্যু মাত্র নিদ্রা বা বাস্তবিকই মৃত্যু। নিদ্রা নয়—জাগরণ। মানবের যৌবন মৃত্যুনদীর পরপারে মানবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, মরণ পার হইলেই আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। চিরকল্যাণকে জাগরিত করিতে চিরসৌন্দর্য্যের উদ্বোধনে মৃত্যু পুরোহিত মাত্র। কবি বলিতেছেন—

"যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে
নিয়ত লোলুপ মম চিত্ত মধুকরে
যে উদ্যানে সে কুসুম নিত্য বিরাজিত
হে মৃত্যু তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত!"

হিন্দু পুরাণ আলোচনা করিলে—"মৃত্যু যে মঙ্গলময় এবং সৌন্দর্য্যের আকর" এই তত্ত্বেরই মীমাংসা দেখিতে পাই। মহাকাল ধ্বংসের নায়ক। দেবদেব ত্রিশূলী তাঁহার শূলাঘাতে এই জগত সংসারের লয় করিতেছেন। অথচ তিনিই আবার শিব সুন্দর। তিনি সর্ব্বমঙ্গলের আকর—তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। অনন্তের এ প্রহেলিকা কে বুঝিবে! হে মৃত্যুরহস্যবিজড়িত অনন্ত, মঙ্গলময় চির সৌন্দর্য্যাধিনায়ক মহাকাল, তোমাকে বুঝিতে চাহি না! তুমি তোমার যবনিকার অন্তরালে চিরদিন অবস্থান করিয়া, অনন্তকালের তরে আমার হৃদয়ে নব নব সৌন্দর্য্যের সঞ্চার কর—নব নব কল্যাণের দ্বারা আমাকে বিমণ্ডিত কর। হে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় চিররহস্যময় তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

প্রভাতী-উপাসনা।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

আজি এ প্রভাতে, উঠিনু জাগিয়া
তোমারে করিয়া প্রণতি
দেহ হৃদয়ে নবীন আশা
বাহুতে দেহগো শকতি।

জীবনে মরণে মননে বচনে
মতি গতি যেন রহে গো চরণে
অবিরত যেন রাখি গো স্মরণে
জীবনসাধনা মহতী।

বরণে গন্ধে ছন্দে গীতে
আঁধারে আলোকে প্রদোষে নিশীথে
অবিরত যেন বহ্নি আনে চিতে
তোমারই অনুভূতি।

(কর) আকাশের মত কান্তবিমল
শিশিরের মত শুভ্র শীতল
প্রভাতের মত আলোক-উজ্জ্বল
দেহগো প্রাণে ভকতি।

(কর) কুসুমের মত পূত নিরমল
সুরভির মত পীযূষ-তরল
বাতাসের মত মুক্ত সরল
দেহ অবাধ মুকতি।

স্থির চেতনা প্রাণের প্রাণ
উচ্চ লক্ষ্য হৃদয়ে আন
দৈন্য লজ্জা করহে ম্লান
জয় জয় তব জয়তি।

গীতা-রহস্য।

কর্ম্মযোগশাস্ত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও 'ভাল ও মন্দ' এই অর্থেই 'কার্য্য ও অকার্য্য', 'ধর্ম্ম্য ও অধর্ম্ম্য', ইত্যাদি বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার কারণ,—বিষয় প্রতিপাদন বিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ কিংবা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। যে যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর কিংবা শ্রেয়স্কর নহে, অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২, ৭)। কোন আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে অর্জ্জুনের নিজের লাভালাভ কিরূপ ও সমস্ত সমাজের উপর তাহার কি পরিণাম ঘটিতে পারে তাহার সারাসার বিচার করিয়া, যুদ্ধ করা 'ন্যায্য' কি 'অন্যায্য' এই বিষয়ে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। কারণ, কোন কর্ম্মের—

জগতের উপর—যে আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাহ্য পরিণাম ঘটিতে পারে তাহা ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন বা কষ্টিপাথর এই আধিভৌতিক পণ্ডিতের অভিমত নহে। কিন্তু এইরূপ উত্তরে অর্জ্জুনের সমাধান হয় না। তাঁহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল। শুধু এই জগতের নহে, পারলৌকিক দৃষ্টিতে আপন আত্মার পরিণামেও এই যুদ্ধ শ্রেয়স্কর হইবে কি হইবে না ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি নিহত হইলে, আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া সুখ লাভ হইবে কি না, কিংবা যুধিষ্ঠিরাদির শাসনকাল, দুর্য্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর সুখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমি যাহা করিতেছি তাহা 'ধর্ম্ম্য' বা 'অধর্ম্ম্য', 'পুণ্য' কি পাপ, ইহাই তাঁহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচার আলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। শুধু গীতায় নহে, মহাভারতেও অন্য স্থানে যে বিচার-আলোচনা আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে করা হইয়াছে। তাহাতে কোন কর্ম্মের 'ভাল মন্দ' দেখাইবার সময়, 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' এই দুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্ম্ম' ও তাহার প্রতিযোগী অর্থাৎ উল্টা 'অধর্ম্ম' এই দুই শব্দের ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন করায়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রে মুখ্যরূপে কোন্ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে এইখানে অল্পাধিক মীমাংসা করা আবশ্যক।

নিত্যব্যবহারে, অনেক সময় "ধর্ম্ম" শব্দ. নিছক্ "পারলৌকিক সুখের মার্গ" এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "তোমার কোন্ ধর্ম্ম ?" এইরূপ যখন আমরা কাহাকে প্রশ্ন করি, তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্ মার্গ অনুসরণ করিতেছ—বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্ট কি পার্সী—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার আমাদের হেতু থাকে; এবং তদনুসারে সে তাহার উত্তরও দিয়া থাকে। সেইরূপ, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত যাগযজ্ঞাদি বৈদিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়, "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রভৃতি সূত্রেতেও ধর্ম্মশব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত হইয়াছে। কিন্তু 'ধর্ম্ম' শব্দের এরূপ সঙ্কুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতীত রাজধর্ম্ম, প্রজাধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, মিত্রধর্ম্ম প্রভৃতি ঐহিক নীতিবন্ধনেও ধর্ম্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশব্দের এই দুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে পারলৌকিক ধর্ম্মকে 'মোক্ষধর্ম্ম' কিংবা কেবল 'মোক্ষ' এইরূপ বিশেষ নাম দিয়া, ব্যবহারিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা নীতি সম্বন্ধে এই একই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদাহরণ যথা—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের গণনা করিবার সময়, 'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ' এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। ইহার অন্তর্গত প্রথম শব্দ 'ধর্ম্ম'—ইহার ভিতর মোক্ষের সমাবেশ হইলেও, 'মোক্ষ" বলিয়া শেষে পৃথক পুরুষার্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দে এইস্থানে জগতের কিংবা সংসারের শত শত নীতিধর্ম্মই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হইবে। ইহাকেই আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নীতি, নীতিধর্ম্ম কিংবা সদাচরণ এইরূপ আজকাল বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'নীতি' কিংবা 'নীতিশাস্ত্র' এই শব্দ বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত বলিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিংবা সদ্বর্ত্তন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনাকে 'নীতিপ্রবচন' না বলিয়া 'ধর্ম্মপ্রবচন' এই নাম পূর্ব্বে দেওয়া হইত।

নীতি ও ধর্ম্ম এই দুই শব্দের এই পারিভাষিক ভেদ, সকল সংস্কৃত গ্রন্থেই স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ নহে। তাই আমিও 'নীতি', 'কর্ত্তব্য' ও শুধু 'ধর্ম্ম' এই সকল শব্দ এই গ্রন্থে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি; এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর্ত্তব্য, সেই প্রকরণকে আমি 'অধ্যাত্ম' ও 'ভক্তিমার্গ' এইরূপ স্বতন্ত্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে 'ধর্ম্ম' শব্দ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; "কেহ কোন কিছু সাধন করিতে গিয়া ধর্ম্মের সাহায্যেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে" এইরূপ বিধান যখন করিতে পারা যায়, তখন ধর্ম্ম এই শব্দে কর্ত্তব্য শাস্ত্র কিংবা তৎকালীন সমাজব্যবস্থাশাস্ত্র এই অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে; এবং পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত করিবার প্রসঙ্গ যখন আসিয়াছে তখন—অর্থাৎ শান্তিপর্ব্বের উত্তরার্দ্ধে এই বিশিষ্ট শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইরূপ আবার মনু-আদি স্মৃতিশাস্ত্রে,

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদের বিশিষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের বিশিষ্ট কর্ম্ম বিবৃত করিবার সময়েও ধর্ম্মশব্দ অনেক সময়ে ও অনেক স্থানে ব্যবহার করা হইয়াছে; ভগবদ্ গীতাতেও "স্বধর্ম্ম-মপি চাবেক্ষ্য" (গী, ২, ৩১) অর্থাৎ স্বধর্ম্ম কি তাহা দেখিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান যুদ্ধ করিতে যখন বলিয়াছেন, তখন এবং তৎপূর্ব্বে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গী, ৩, ৩৫) এই স্থানেও 'ধর্ম্ম' শব্দ "ইহলৌকিক চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম্ম" এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাজের সমস্ত ব্যবহার যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত ভার ন্যস্ত না হইয়া সকল পক্ষেরই সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ঋষিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। পরে, উহাদের অন্তর্গত ব্যক্তি কেবল জাতিমাত্রোপজীবী অর্থাৎ প্রকৃত স্বকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র হইয়া পড়িল, এই বিষয়টা আপাত আমরা পাশে সরাইয়া রাখিব। গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ বাহির হওয়ায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে, কিংবা কোন বর্ণ হঠাৎ বিনষ্ট হয় ও তাহার স্থান অন্য লোক আসিয়া পূর্ণ না করে, তাহা হইলে, সমাজ সেই অনুসারে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ে, আস্তে আস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা অন্ততঃ নিকৃষ্ট অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। পাশ্চাত্য খণ্ডে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা ব্যতীত, পরিণত অবস্থায় উপনীত অনেক সমাজ আছে। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থা না থাকিলেও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম্ম, জাতিরূপে না হউক, গুণবিভাগরূপে অন্য ব্যবস্থার দ্বারা, সেই পাশ্চাত্য দেশের সমাজে জাগ্রত রহিয়াছে, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সারকথা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করি তখন সর্ব্বসমাজের ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা দেখিয়া থাকি। 'অসুখোদর্ক' অর্থাৎ যাহা হইতে পরিণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, মনু বলিয়াছেন (মনু, ৪, ১৩৬); এবং শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, ১০৯, ১২) ধর্ম্মাধর্ম্মের যখন আলোচনা হইতেছিল, তখন ভীষ্ম ও তৎপূর্ব্বে কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন যে—

ধারণাদ্ধর্ম মিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

অর্থাৎ "ধর্ম্ম শব্দ ধারণ করা এই ধাতু হইতে বাহির হওয়ায় ধর্ম্মের দ্বারাই সমস্ত প্রজা বদ্ধ হইয়াছে। যাহার দ্বারা (সর্ব্বপ্রজার) ধারণ হয় তাহাই ধর্ম্ম—ইহা নিশ্চিত" (সভা, কর্ণ, ৬৯, ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম্ম চলিয়া গেলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে; এবং "সমাজের বন্ধন ছিন্ন" অর্থে আকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আকাশস্থ সূর্য্যাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, এইজন্য অর্থ কিংবা দ্রব্য লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়া না যায়, এইরূপ ভাবে করিবে এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে হইলে তাহা ধর্ম্মতই করিবে, এইরূপ অনেক স্থানে বলিয়া মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে—

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষঃ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম্মঃ কিং ন সেব্যতে॥

অর্থাৎ, "ওরে! বাহু তুলিয়া আমি আক্রোশ করিতেছি, (কিন্তু) আমার কথা কেহই শুনে না! ধর্ম্মের দ্বারাই অর্থ ও ধর্ম্মের দ্বারাই কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; (তথাপি) এইরূপ ধর্ম্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না?" মহাভারত যে ধর্ম্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্ম্মসংহিতাকে স্বীকার করে, সেই 'ধর্ম্মসংহিতা' শব্দের মধ্যে "ধর্ম্ম" এই শব্দের মুখ্য অর্থ কি তাহা ইহা হইতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই দুই পারলৌকিক ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ ও এই সম্বন্ধসূত্রে "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই প্রতীক শব্দগুলি মহাভারতও যে ব্রহ্মযজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 'সমাজধারণ, ও দ্বিতীয় প্রকরণের মধ্যে সত্যানৃতবিবেক প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে তদনুসারে 'সর্ব্বভূতহিত' এই

তত্ত্ব যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ও আধিভৌতিক দৃষ্টিতে তফাৎটা কি? কারণ, এই দুই তত্ত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক কিংবা আধিভৌতিক। পরবর্ত্তী প্রকরণে এই প্রশ্নের সবিস্তার বিচার করিয়াছি। আপাতত এইটুকু বলিতেছি যে, সমাজ-ধারণই ধর্ম্মের প্রধান বাহ্য উপযোগ—এই তত্ত্ব আমি স্বীকার করিলেও, বৈদিক কিংবা অন্য সমস্ত ধর্ম্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যাণ কিংবা মোক্ষ তাহা হইতে আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হইতে দিই না;—অন্য হইতে আমার মতের ইহাই বিশেষত্ব। 'সমাজ ধারণ'ই বল, আর 'সর্ব্ব-ভূতহিত'ই বল, এই দুই বাহ্যোপযোগী তত্ত্ব যদি আমাদের আত্মকল্যাণের পথের অন্তরায় হয়, তবে তাহা আমরা চাহি না। বৈদ্যকশাস্ত্রও শরীররক্ষণ দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়—আমাদের আয়ুর্ব্বেদের যদি এইরূপ মত হয়, তবে, এই জগতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই গুরুতর বিষয়ের যে শাস্ত্র বিচার-আলোচনা করে, সেই কর্ম্মযোগশাস্ত্রে আমাদের শাস্ত্রকার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান ছাড়িয়া আর কিছু বিবৃত করিবেন ইহা কখনই সম্ভবনীয় নহে। অতএব, মোক্ষের অর্থাৎ আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল যে কর্ম্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম্ম, কিংবা শুভকর্ম্ম এবং তাহার প্রতিকূল যে কর্ম্ম তাহাই পাপ, অধর্ম্ম কিংবা অশুভ, এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি। কর্ত্তব্য ও কার্য্য এবং অকর্ত্তব্য ও অকার্য্য এই সকল শব্দের স্থানে একই অর্থে, একটু সন্দিগ্ধ হইলেও, আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি; উহাদের মর্ম্মও ইহাই। বাহ্যসৃষ্টির অন্তর্ভূত ব্যবহারিক কর্ম্ম কিংবা ব্যাপার, মুখ্যরূপে আমাদের বিচারের বিষয় হইলেও, উক্ত কর্ম্মসমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারের ন্যায়ই, এই সকল ব্যাপার আমাদের কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল—এই বিচারও আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত কেন করিব, এইরূপ আধিভৌতিকবাদীকে কোন প্রশ্ন করিলে—"সাধারণত ইহাই মানব স্বভাব"—ইহা ব্যতীত আর কোন উত্তর তিনি কি দিতে পারেন? আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই মহাভারত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন; ভগবদ্‌গীতাতে বেদান্ত এইজন্যই বিবৃত হইয়াছে। মনুষ্যের 'অত্যন্ত হিত' কিংবা 'সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা' এইরূপ কোন কিছু পরম সাধ্য কল্পনা করিয়া, পরে সেই অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলোচনা করিতে হইবে, এইরূপ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মত; আত্মহিতের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া থাকে এইরূপ আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন (১, ৭, ৫)। তথাপি আত্মহিত সম্বন্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল ততটা প্রাধান্য দেন নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের কথা সেরূপ নহে। আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা ইহাই প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয় এবং অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া পরে তদনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করা আবশ্যক, আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে ছাড়িয়া কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এইরূপ তাঁহারা স্থির করিয়াছেন; এবং অর্ব্বাচীনকালে, পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে 'শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মিক) বুদ্ধির মীমাংসা' এই আধ্যাত্মিক বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া পরে তাহার পূরণস্বরূপ 'ব্যবহারিক (বাসনাত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা' এই নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়াছেন,* এবং ইংলণ্ডেও গ্রীন্ আপন 'নীতিশাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাতে'† সৃষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বদলে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রন্থ আমাদের ইংরেজি পাঠশালায় প্রায়ই পড়ান হয় বলিয়া, গীতায় উক্ত কর্ম্মযোগশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত বিদ্বানেরাও ঠিক বুঝিতে পারেন না,—এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

* কাণ্ট জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী; ইনি অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের জনক বলিয়া খ্যাত, ইঁহার critique of pure reason (শুদ্ধ বুদ্ধির মীমাংসা) ও critique of practical reason (বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংসা) এই দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

† গ্রীন্, এই গ্রন্থের নাম prolegomena to ethics এই নাম দিয়াছেন।

'ধর্ম্ম' এই সাধারণ শব্দ মুখ্যরূপে ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে। মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা এই সংস্কৃত গ্রন্থে শুধু নহে, প্রাকৃতিতেও ব্যবহারিক কর্ত্তব্য কিংবা নিয়ম অর্থে ধর্ম্ম শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। কুলধর্ম্ম ও কুলাচার এই দুই শব্দ আমরা সম্মানার্থক বলিয়া বুঝি। মহাভারতীয় যুদ্ধে পৃথ্বী-গ্রাসিত রথের চাকা উপরে তুলিবার জন্য কর্ণ রথ হইতে নীচে নামিলে পর, অর্জ্জুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া "শত্রু নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মারা যুদ্ধকর্ম্ম নহে" এইরূপ কর্ণ বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কিংবা সকলে মিলিয়া একলা অভিমন্যুর বধসাধন প্রভৃতি আগেকার কথা পাড়িয়া তিনি নানাপ্রসঙ্গে—

"তখন কোথায় ছিল রাধাসুত ধর্ম্ম তব"

এইরূপ কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাষ্ট্র কবি মোরোপন্ত বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মহাভারতেও এই প্রসঙ্গে "ক্ব তে ধর্ম্মস্তদা গতঃ" এইরূপ ধর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। শেষে এই প্রকারের অধর্ম্মকে ঠিক্ এই নীতি অনুসারেই শাসন করা উচিত এইরূপ দেখাইয়াছেন। সার-কথা, কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত উভয়েতেই শিষ্টেরা নানা বিষয় সম্বন্ধে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সমাজ-বিধরণের জন্য যে নীতি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, ধর্ম্ম শব্দে তাহার উল্লেখ করিবার রীতি সর্ব্বত্রেই আছে। ঐ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে বজায় রাখিয়াছি। সমাজ বিধরণার্থ শিষ্টগণস্থাপিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত নীতির যে নিয়ম কিংবা যাহাকে 'শিষ্টাচার'ও বলা হইয়া থাকে, তাহা এই দৃষ্টিতে ধর্ম্মের মূল। এবং তাই, মহাভারতে (অনু, ১০৪।১৫৭) ও স্মৃতিগ্রন্থে "আচারপ্রসবো ধর্ম্মঃ" অথবা "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ" (মনু, ১।১০৮), কিংবা ধর্ম্মের মূল কি তাহা বলিবার সময় "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ" (মনু, ২।১২), এই সকল বচন প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগ শাস্ত্রে এইরূপ মর্ম্মার্থ খাটে না ; এই আচার প্রবৃত্ত হইবার কারণ তবে কি হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ ও মার্মিক বিচার করা কেন আবশ্যক তাহা আমি দ্বিতীয় প্রকরণে বলিয়াছি।

ধর্ম্ম শব্দের আর এক যে ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু বিচার করা এইখানে আবশ্যক। এই ব্যাখ্যা মীমাংসাকারেরা "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ বলিয়া থাকেন (জৈ, সূ, ১।১।২)। চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা ; কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক "তুমি অমুক কাজ কর" বা "করিও না" এইরূপ বলা কিংবা আদেশ করা। যে পর্য্যন্ত এই রকমের বিধান কেহ স্থাপন না করে, কিংবা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যে-কোন বিষয় যে-কোন ব্যক্তির করিবার অধিকার আছে। ধর্ম্ম প্রথমতঃ নিয়ম বিধানের হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এইরূপ মীমাংসাকারের অভিপ্রায় ; এবং প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার "হব্‌স্"এর মতের সঙ্গে, ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশে মিল আছে। অসভ্য বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তদনুসারে কাজ করে। কিন্তু পরে, আস্তে আস্তে এই প্রকারের স্বৈরাচার একেবারেই শ্রেয়স্কর নহে এইরূপ অবগত হইবার পর, ইন্দ্রিয়গণের যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত ব্যাপারের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে এবং শিষ্টাচারের দ্বারা কিংবা অন্য কোন রীতির দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এই সীমামর্য্যাদা প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় পালন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং এই প্রকারের সীমামর্য্যাদার সংখ্যা বেশী হইলে, সেই সমস্ত লইয়াই শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে। বিবাহব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যবস্থা আমলে আনিয়াছিলেন। সুরপান শুক্রাচার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন—ইহা আমি পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই সীমামর্য্যাদা স্থাপনে শ্বেতকেতু কিংবা শুক্রাচার্য্যের হেতু কি ছিল তাহা না দেখিয়া, এই প্রকার সীমা মর্য্যাদা স্থাপনের পক্ষে কেবল তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বকেই লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া "চোদণালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্ম শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্ম হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ব লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া তবে কেহ তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'খাও, পিয়ো, মজা লোটো' একথা কাহাকে বলিতে হয় না। কারণ, উহা ইন্দ্রিয়াদিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। "ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে" (মনু, ৫।৫৬) মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে

কোন দোষ নাই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম্মের বিরুদ্ধ বিষয় এরূপ নহে—এইরূপ মনু যে বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যই এই। এই সব বিষয় শুধু মনুষ্য নহে, বিবিধ প্রাণী প্রবৃত্তিসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্"। সমাজধারণের জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জন্য এই প্রবৃত্তি-সূত্রে প্রাপ্ত স্বৈরাচারকে আটক করাই ধর্ম্ম। কারণ—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনং চ সামান্য মেতৎপশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পশু উভয়েই সমানভাবে প্রবৃত্তিমূলে প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মেই ("অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীমা স্থাপন") মনুষ্য পশুতে ভেদ, বুঝিতে হইবে! মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই অর্থের এক শ্লোক আছে (শা, ২৯৪, ২৯ দেখ)। আহার বিহারের সংযম সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্ব্বপ্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদ্গীতাতেও—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ও সেই সেই ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য কিংবা ত্যাজ্য পদার্থে, প্রীতি ও দ্বেষ স্থায়ীভাবে স্বভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে। কারণ, রাগ ও দ্বেষ উভয়ই আমাদের শত্রু। এইরূপ যেখানে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, (গী, ৩, ৩৪) তখন স্বভাবতঃ প্রাপ্ত স্বৈরমনোবৃত্তিকে সংযত করা যে ধর্ম্মের লক্ষণ, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে শত্রুর ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবং তাহার বুদ্ধি তাহাকে উল্টাদিকে টানিয়া থাকে। দেহের মধ্যে বিচরণকারী পশুত্বকে এই কলহানলে আহুতি দিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্ঞিক ও সেই ধন্য হয়।

ধর্ম্ম 'আচার-প্রভবই' বল, 'ধারণাৎ' ধর্ম্মই বল, বা 'চোদনালক্ষণ' ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত তিন লক্ষণের উপযোগ বড় একটা হয় না। ধর্ম্মের মূল স্বরূপ কি তাহা প্রথম ব্যাখ্যাটিতে বুঝা যায়; উহার বাহ্য উপযোগ কি, তাহা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দ্বারা জানা যায়, এবং ধর্ম্মের সীমা মর্য্যাদা প্রথমে যেই কেন স্থাপন করুক না, তৃতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আচারে আচারে ভেদ হয় শুধু নহে, এক আচারের কর্ম্ম পরিণাম অনেক হওয়া প্রযুক্ত এবং অনেক ঋষির আদেশ অর্থাৎ 'চোদনা'ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সংশয়স্থলে ধর্ম্মনির্ণয়ের অন্য মার্গ কি তাহা দেখা আবশ্যক হয়। এই মার্গটা কি, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলে পর, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিলেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নৈকো ঋষির্যস্য বচঃ প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থাৎ—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, যাহার যেরূপ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ তদনুসারে অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও ভিন্ন ভিন্ন আদেশ; এবং স্মৃতিশাস্ত্রের কথা যদি বল, এমন এক ঋষিও নাই যাঁহার বচন আমরা অন্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। (এই ব্যাবহারিক) ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব যদি দেখিতে যাও, তাহাও অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। এই জন্য মহাজন যে পথ দিয়া গিয়াছেন, সেই পথই পথ। (মভা. বন, ৩১২, ১১৫)"। ঠিক্ কথা! কিন্তু 'মহাজন' কাহাকে বলে? "অধিক কিংবা বহু জন সমূহ" এরূপ উহার অর্থ হইতে পারে না। কারণ, যে সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়ও কখন উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা কি রকম?—না যেমন, কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিশ্বিরের ন্যায় ("অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ) অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ! মহাজনের অর্থ যদি "বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি" ধরা যায়—এবং এই অর্থই উপরি উক্ত শ্লোকের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলেও, ঐ সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায়? নিষ্পাপ রামচন্দ্র, অগ্নি হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্গত আপন পত্নীকে কেবল লোকাপবাদের জন্যই ত্যাগ করিলেন; এবং সুগ্রীবকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র' অর্থাৎ 'তোমার আমার শত্রু মিত্র এক' এই প্রকার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের প্রতি যে ব্যক্তি

কোন অপরাধ করে নাই, সেই বালীকে রামচন্দ্র বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার আজ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন! পাণ্ডবদিগের আচরণ দেখ—পঞ্চজনের এক স্ত্রী! স্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—কোন এক অহল্যার উপপতি কোন দেবতা (ব্রহ্মদেব) মৃগরূপা আপন কন্যায় অভিলাষ করা প্রযুক্ত রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হইয়া আকাশ হইতে পতিত হন (ঐ, ব্রা, ৩, ৩৩)। এই কথা মনে করিয়াই 'উত্তররামচরিত' নাটকে লবের মুখ দিয়া "বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয় চরিতা;"—অর্থাৎ, এই বৃদ্ধদের চরিত্র বেশী বিচার করিয়া কাজ নাই—এই কথা ভবভূতি বাহির করিয়াছেন। ইংরেজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক এক গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন যে, সয়তানের অনুচর ও দেবদূত ইহাঁদের যুদ্ধবৃত্তান্তে দেখা যায়, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যদিগকে কাপট্য করিয়া ঠকাইয়াছেন; এবং সেইরূপ কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (কৌষী, ৩, ১ ও ঐ, ব্রা, ৭, ২, ৮ দেখ) ইন্দ্র প্রতর্দনকে এইরূপ বলিতেছেন যে, আমি বৃত্রকে (সে ব্রাহ্মণ হইলেও) বধ করিয়াছি। অরুন্মুখ সন্ন্যাসীকে আমি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বৃকদিগের নিকট ফেলিয়া দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহ্লাদের আত্মীয় ও গোত্রজদিগকে ও পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিলেও আমার এক গাছা চুলও বাঁকে নাই,—"তস্য মে তত্র ন লোম চ মা মীয়তে"! "এই মহাপুরুদিগের কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিবার তোমাদের কোন হেতু নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদে কথিত অনুসারে (তৈত্তি, ১, ১১, ২) তাঁদের যে সকল কর্ম্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ কর, বাকী ছাড়িয়া দেও; উদাহরণ যথা—পরশুরামের মতোই পিতার আজ্ঞা পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ করিও না" এইরূপ যদি কেহ বলে, তাহা হইলে ভাল মন্দ কর্ম্ম বুঝিবার উপায় কি—এই যে প্রথম প্রশ্ন, তাহাই পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। তাই, উপরে যাহা বলা হইল তদনুসারে আপন কৃত্যাদি বর্ণনা করিলে পর ইন্দ্র প্রতর্দনকে এইরূপ বলিতেছেন যে, "যে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানী হইয়াছে; তাহাকে মাতৃবধ, পিতৃবধ, ভ্রূণহত্যা কিংবা স্তেয় ইত্যাদি কোন কর্ম্মেরই দোষ স্পর্শে না—ইহা মনে করিয়া "আত্মা কাহাকে বলে" ইহা তুমি প্রথমে বুঝিয়া লও; তাহা হইলে তোমার সকল সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে"; তাহার পর ইন্দ্র, প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। সার কথা, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই যুক্তি সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সহজ হইলেও, উহার দ্বারা সব কাজ না হওয়ায়, শেষে মহাজনদিগের আচরণের প্রকৃত তত্ত্ব যতই গূঢ় হউক না কেন—বিচারক ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে বাধ্য হন। "ন দেবচরিতং চরেৎ" অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র অনুসারে কাজ করিবে না—এই যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার কারণও ইহাই।

কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ ইহা ব্যতীত আর এক সহজ যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, যে কোন সদ্‌গুণ হউক না কেন, তাহার অতিরেক না হয় এই জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক; কারণ, এইরূপ অতিরেকের দ্বারা সদ্‌গুণও শেষে দুর্গুণ হইয়া পড়ে। দান-করা একটা সদ্‌গুণ সত্য, কিন্তু "অতি দানাদ্‌ বলির্বদ্ধঃ"—অর্থাৎ অতিদানে বলি বাঁধা পড়িয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ের এই যুক্তি বিবৃত করিয়া প্রত্যেক সদ্‌গুণ 'অতি' হইলে কিরূপে 'মাটি' হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কালিদাসও, নিছক্‌ শৌর্য্য—বাঘের ন্যায় হিংস্র জন্তুদিগের ক্রূর কর্ম্ম, এবং নিছক্‌ নীতি—ভীরুতা এইরূপ স্থির করিয়া, "অতিথি" রাজা, তরবারি ও রাজনীতি এই দুয়ের যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন, এইরূপ রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন। (রঘু, ১৭, ৪৭)। বেশী বলিলে 'বাচাল ও অল্প বলিলে 'মূক', বেশী খরচ করিলে 'উড়োনচণ্ডী' ও খরচ না করিলে 'কঞ্জুষ', সামনে অগ্রসর হইলে 'প্রগল্‌ভ' ও পিছাইয়া পড়িলে 'শিথিল', অতিশয় আগ্রহ করিলে 'জেদী' ও না করিলে "চপল", সর্ব্বদা গোলমাল করিলে 'লঘু' ও চুপ করিয়া থাকিলে 'গর্ব্বিত'—এইপ্রকারে ভর্ত্তৃ-

হরি প্রভৃতিও কোন কোন দোষগুণের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ স্থূলরকমের কষ্টিপাথরে শেষ পর্য্যন্ত কাজ হয় না। কারণ, 'অতি'ই বা কি 'মিত'ই বা কি—ইহার ঠিক নির্দ্ধারণ কে করিবে, কেমন করিয়াই বা করিবে? একজনের নিকট কিংবা এক প্রসঙ্গে যাহা 'অতি' তাহাই আর একজনের নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি' বা ন্যূন হইতে পারে। উপজল্যার সমান, সূর্য্যকে ধরিবার জন্য লম্ফ প্রদান করা হনুমান কঠিন মনে করে নাই (বা, রামা, ৭, ৩৫)। এইজন্য, শ্যেন যেরূপ শিবিরাজকে বলিয়াছিল—সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয় উপস্থিত হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের, শেষে—

অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম।
বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্‌।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ॥

পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের তারতম্য কিংবা লাঘব গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মের নির্ণয় করা আবশ্যক হয় (সভা বন, ১৩১, ১১, ১২ ও মনু, ৯, ২৯৯ দেখ)। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মের সারাসার বিচার করাই সংশয়স্থলে প্রকৃত কষ্টিপাথর এরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ, যাহার যেরূপ বুদ্ধি তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত সারাসার বিচারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমত্তার নির্ণয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহার অনেক সময় আমাদের নজরে পড়ে; এবং এই অর্থেই "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" ইহা উপরি-উক্ত বচনে বর্ণিত হইয়াছে। তাই, এই প্রশ্নের নির্ভুল মীমাংসা করিবার অন্য কোন উপায় আছে কি নাই, যদি থাকে ত সেটী কি, আর যদি অনেক উপায় থাকে তবে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোন্‌টি, ইহাই এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে। শাস্ত্রের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। "অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্‌"—অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন হইবার দরুণ, অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জটিল পাক হইতে বুদ্ধিকে প্রথমে মুক্ত করিয়া ঐ সকল বিষয়ের অর্থ নিঃসংশয় ও সুগম করা এবং এক্ষণে যাহা প্রত্যক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এইরূপ বিষয়সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন করা—এইরূপ শাস্ত্রের লক্ষণ। জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা ভাবী গ্রহণও কিরূপে গণনা করিতে পারেন তাহা দেখিলে, এই লক্ষণগুলির মধ্যে "পরোক্ষার্থস্য দর্শকং" এই অন্য অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু অনেক সংশয়-জালের মধ্যে সেই বিশেষ সংশয় কোন্‌টি তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। তাই, কোন শাস্ত্রান্তর্গত সিদ্ধান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, সেই সংক্রান্ত যে অন্য পক্ষ বাহির হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া, তাহার দোষ কিংবা অপূর্ণতা প্রদর্শন করা—প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থকারদিগের প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই স্বীকার করিয়া লইয়া গীতাতে কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত-পক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই কাজের জন্যই অন্য যে কিছু মুখ্য যুক্তি পণ্ডিত লোকেরা সংযোজিত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি তাহারও বিচার করিব। এই সকল যুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না; মুখ্যরূপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই অর্ব্বাচীনকালে পরে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার দরুণ উহার বিচার এই গ্রন্থে করা উচিত নহে, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, কেবল তুলনার জন্য নহে, গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যও এই সকল যুক্তি—যতই সংক্ষেপে হউক না কেন—অবগত হওয়া আবশ্যক।

ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমায় শিশুর মতন সহজ দেখা
দেখ্‌বো কবে
আকাশ বাতাস পুষ্প আলো
সবায় ভালো বাসব কবে।
না লাগে ভালো এ দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ—
এ দীনতা হীনতা বন্ধ অশেষ
কুটিল স্বার্থ কপট বেশ
চিরতরে ঘুচবে কবে!

তাই তো চেয়ে আছি আমি—
তুমি কবে আস্‌বে নামি
সহজ করে তুল্‌বে আমায়
বাধাবাঁধন খুলে দিবে!
মরুর মাঝে ফুট্‌বে গো ফুল
গুঞ্জরিয়া ছুট্‌বে অলি
তোমার আকাশ বাতাস অবাক্‌ হবে
আমার পানে চেয়ে রবে॥

লিঙ্গায়ত ভিক্ষুক ও উৎসব।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়তগণ গলদেশে যে লিঙ্গ ধারণ করে তাহা একটি ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গের অনুরূপ। এ সম্বন্ধে বিজাপুরের গেজেটিয়রে এইরূপ বর্ণনা লিখিত আছে।

It consists of two discs, the lower one circular about one-eighth of an inch thick, the upper slightly elongated. Each disc is about three quarters of an inch in diameter, and is separated by a deep groove about an eighth of an inch broad. From the centre of the upper disc, which is slightly rounded, rises a pea-like knob about a quarter of an inch long and three-quarters of an inch round, giving the stone lingam a total height of nearly three quarters of an inch. This knob is called the bain on arrow. The upper disc is called Jalhari, that is, the water carrier, because this part of a full sized lingam is grooved to carry off the water which is poured over the central knob. It is also called *pita*, that is the seat, and *pithak* the little seat. Over the lingam, to keep it from harm, is plastered a black mixture of clay, cow-dung ashes, and marking nut-juice. This coating is called *kanthi* lingam."

জঙ্গম ভিক্ষুকগণ অতি অভিনব সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভিক্ষার্থ গমন করিয়া থাকে। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে একটি জঙ্গম ভিক্ষুকের সাজসজ্জার কিছু বিবরণ দিতেছি। উহার মস্তকের পাগড়ীর উপর একটি লিঙ্গ রক্ষিত আছে। সেই লিঙ্গের উপর একটি পঞ্চশিরবিশিষ্ট সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। এই লিঙ্গের সম্মুখে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন বত্রিশটি লিঙ্গের একটি মালা তাহার শিরদেশে বেষ্টন করিয়া আছে। পশ্চাৎদিকে শুভ্রবর্ণ পরচুলা। মুখমণ্ডল তৈল ও সিন্দুর দ্বারা রক্তবর্ণে রঞ্জিত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা এবং রৌপ্যকোষবেষ্টিত একটি লিঙ্গ দোদুল্যমান আছে। কটিদেশে দক্ষ-প্রজাপতি, বীরভদ্র প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত একটি ধাতুনির্ম্মিত বন্ধনী এবং কয়েকটি ঘণ্টা। বক্ষস্থলে একটি তাম্র নির্ম্মিত চতুষ্কোণ পত্রে দক্ষপ্রজাপতি তাঁহার স্ত্রী এবং বীরভদ্রের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। কটিদেশের নিম্নস্থান ব্যাঘ্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত। তাহার উপর একটি সিংহ অঙ্কিত ও তাহার উভয় পার্শ্বে আবার দক্ষপ্রজাপতি ও বীরভদ্রের প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান আছে। ইহার নিম্নদেশে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবার প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষিণ হস্তে একটি প্রকাণ্ড খড়্গ, এবং বামহস্তে আবরণ-কবচবিশিষ্ট একটি করবাল ধারণ করিয়া আছে। এইরূপ সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ হুঙ্কার প্রদান এবং বীরভদ্র ও শিবের গুণগান করিতে করিতে নগর মধ্যে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বেলারী জেলার অন্তর্গত মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে কড়লিগি নামক মহকুমায় উজ্জানী গ্রামে লিঙ্গায়তগণের একটি প্রধান মঠ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীশৈল, কোলেপাক, বলিহালী এবং বারাণসী ধামেও লিঙ্গায়তদিগের প্রধান প্রধান মঠ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে কোলেপাকস্থ মঠটি এক্ষণে হুসপেটের সন্নিকট বক্কসাগর নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। অন্যান্য লিঙ্গায়ত গ্রামেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গায়ত মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যে সকল

মঠে "বিরক্ত"গণ থাকেন, সেগুলি প্রায়ই গ্রামের বাহিরে সংস্থাপিত।

লিঙ্গায়ত শাস্ত্রমতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লিঙ্গায়ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। গত শতাব্দীতেও ধারবার জেলার অন্তর্গত টুমিনকট্টি নামক স্থানের বহুসংখ্যক তন্তুবায়কে উজ্জানী নিবাসী জনৈক জঙ্গম লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বাসবার মতে অতি নীচ জাতিকেও লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার রীতি আছে। এ সম্বন্ধে Abbe Dubois লিখিয়াছেন :—Even if a pariah joins the sect, he is considered in no way inferior to a Brahmin. Wherever the lingam is found, there they say is the throne of the deity, without distinction of class or rank. The pariah's humble hut containing the sacred emblem is far above the most magnificent palace, where it is not.

বাসবার মত এইরূপ হওয়া সত্বেও উজ্জানী মঠের জঙ্গমগণ "মাল" জাতিকে লিঙ্গায়ত শ্রেণীভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লিঙ্গায়তগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে বাল্য বিবাহও প্রচলিত আছে। অসৎ-চরিত্র স্ত্রীলোককে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে দেবদাসী প্রথাও বর্ত্তমান আছে। এই দেবদাসীগণকে বাসবি কহে। লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নীর সন্তানগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ দিবার রীতি নাই। এই সম্বন্ধ দুই পুরুষ অন্তর হইলেও বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীর কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা আছে। এইরূপ বিবাহ মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও হইয়া থাকে।

জঙ্গমদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মৃতপত্নীকগণ সাধারণতঃ বিধবাকে বিবাহ করিয়া থাকে। অবিবাহিত ব্যক্তি প্রায়ই বিধবা বিবাহে সম্মত হয় না। বিধবাগণ তাহাদের পূর্ব্ব স্বামীর ভ্রাতা বা ভর্ত্তৃ সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারে না। বিধবাবিবাহ সাধারণ বিবাহের ন্যায় ক্রিয়াসংকুল নহে। বিবাহার্থী পুরুষ এবং রমণী মঠপতি এবং একজন "চুড়ীওয়ালার" সহিত দেবমন্দিরে গমন করে। তথায় "চুড়ীওয়ালা" রমণীর হস্তে "চুড়ী" পরাইয়া দেয় এবং মঠপতি তাহার কণ্ঠে একটি সূতার হার পরাইয়া দেয়। এই বিবাহের নাম "উদিকী বিবাহ" এবং গলদেশে লম্বিত সূত্রকে "মঙ্গল সূত্রের" পরিবর্ত্তে "তালী" কহিয়া থাকে। এই বিবাহ সমাজে এবং আদালতে গ্রাহ্য হয়।

এ সম্বন্ধে Indian Law Report, Madras VII, 1884এ নিম্নলিখিত নজীর দেখিতে পাওয়া যায় :—

There is an immemorial custom by which Lingait widows are remarried. Such marriage is styled, not Kalianum, but Odaveli or Kudaveli, It is not accompanied with the same ceremonies as a Kalian marriage, but a feast is given, the bride and bridegroom sit on a mat in the presence of the guests and chew betel, their cloths are tied together, and the marriage is consummated the same night. Widows married in this form are freely admitted into society, They cease to belong to the family of their first husband, and the children of the second family inherit the property of their own father.

লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার প্রথা আছে। স্ত্রী কুচরিত্রা হইলে পঞ্চগণ সম্মুখে স্বামী দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তৎপরে তাহার বিবাহ করিবার অধিকার জন্মে। পরিত্যক্ত স্ত্রীকে কেহ বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে স্ত্রীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারে। তৎপরে তাহার উপর পরিত্যক্ত স্বামীর কোন দাবী দাওয়া থাকে না। কিন্তু সে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। এই রীতি উজ্জানী মঠ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া থাকে।

কোন কোন মঠ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীর বিবাহের বিধান দিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধেও, Madras Law Report series viii, 1885এ এইরূপ একটি নজীর আছে :—

Second marriage of a wife forsaken by the first husband is allowed. Such marrige is known as Serai Udiki (giving cloth); as distingnished from lagna on dhara, the first marriage.

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মধ্যেই হিন্দু দায়ভাগ (Law of inheritance) মতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গায়তদিগের প্রতিমাসেই একটা না একটা উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে তাহাদিগের নববর্ষ। নববর্ষকে উগাড়ী কহে। এই দিবস সকলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিয়া, নিম্ব পুষ্প, সর্করা অথবা গুড়, কিস্‌মিস্ কিম্বা মনক্কা, বাদাম, পোস্ত, নারিকেল এবং বেশম দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। বোধ হয় "বসন্তে নিম্ব ভক্ষণম্" এই বাক্য অবলম্বনে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ণিমার দিন হম্পেপম্পা-পথিস্বামীর রথযাত্রা উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কৃষকগণ "হগি" নামক বনৌষধি পত্র বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। এইজন্য এই উৎসবের নাম "হগিহুনমে"।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন বৃষসকলকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া মহাসমারোহের সহিত শোভা-যাত্রা করিয়া থাকে। এই মাসের অমাবস্যার দিন মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃষের পূজা হইয়া থাকে। ইহার নাম "মন্নয়েত্থিনম" অমাবস্যা।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে "কদলাকদভেন হুন্যমে" কহে। এই দিবস আস্ত কলাইয়ের পূর দিয়া পুলি-পিঠার ন্যায় সিদ্ধ করত পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করা হয়।

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিকে নাগর পঞ্চমী বলে। এই দিবস সর্প বিবর হইতে সংগৃহীত মৃত্তিকা দ্বারা সর্প নির্ম্মাণ করিয়া, দুগ্ধ, কলাই, চাউল, গুড়, তিল, তিলপিষ্টক, নারিকেল, কদলী এবং ফুল দিয়া পূজা করিয়া থাকে। প্রতি সোমবারে ঈশ্বরের পূজা এবং জঙ্গম ভোজন করান হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্থীর দিবস ইহারা অপরাপর হিন্দুগণের সহিত গণেশ চতুর্থী উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে। মহালয়ার বা মলদ-অমাবস্যার পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে প্রেতকার্য্যাদি সমাপন করিয়া থাকে।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ প্রতিপদের দিন বালক-গণ স্নান এবং নব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পাঠ-শালায় গমন করে। দশমীর দিন পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত থাকে। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সমভিব্যাহারে গৃহে গৃহে গমন পূর্ব্বক বৃত্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। তৎপরে দশমীর দিন পুস্তক, খাতা, দাঁড়ী, পাল্লা, বাটখারাদি তৌল-যন্ত্র প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে এবং জঙ্গমদিগের সহিত একত্র বসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করে। সায়ংকালে দেবমন্দিরে নারিকেল প্রদত্ত হয়। তৎপরে সকলে আত্মীয় স্বজন এবং গুরুজনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পদধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করে। একাদশীর দিন শিবপার্ব্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

অমাবস্যার দিবস "নোপে" অথবা "নোমুলু" অর্থাৎ গৌরীব্রত সমাপন করা হয়। এই ব্রতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয় যথা—২১টি পান, ২১টি আস্ত সুপারী, ২১টি ভাঙ্গা সুপারি, ২১ টুকরা হরিদ্রা, ২১টি "চিন্ত" অর্থাৎ গাঁদাফুল, ২১টি "তুম্বে হভু" অর্থাৎ রেসমের সুতা, ২১টি তুলার সুতা, ২১টি গিরা বাঁধা সুতা, ১টি নারিকেল শস্য, ১টি সোয়ারা, কুঙ্কুম, নারিকেল, গন্ধদ্রব্যাদি এবং ১খানি ব্যজন। এই ব্যজন বা পাখা দ্বারা দেবীকে ২১বার হাওয়া করা হয়। সাধারণত ঘটস্থাপন দ্বারা দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। পরদিবস প্রাতে দেবীকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করে এবং পূজারি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে রেসমের সুতা বন্ধন করিয়া দেয়। উক্ত দিবস সকলে তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করিয়া নব বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে। পরদিবস অতি প্রত্যূষে স্ত্রীলোকেরা গোময় দ্বারা দুই স্তর পঞ্চপাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া বহির্দ্দরজার দুই পার্শ্বে রাখিয়া দুগ্ধ, নবনী, ঘৃতা-দির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে বালিকাগণ বল্মীক-মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক কয়েক দিবসব্যাপী একটি ব্রত করিয়া থাকে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস পিষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। সংক্রান্তির দিবস নানাবিধ খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে এবং জঙ্গমদিগকে ভোজন করায়।

মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে "বরাত পুণ্যমে" বলে। এই দিবস উপবাস করিয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিবস সমস্ত দিবারাত্রব্যাপী উপবাসাদি দ্বারা সাবিত্রীব্রত সম্পন্ন করা হয়।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকলে হোলী বা দোল উৎসবে যোগদান করে। কিন্তু উপরিউক্ত কোন উৎসব বা ব্রতকার্য্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন কার্য্য সমাধান করা হয় না।

পৌষমাসে ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। "মার্গ-শিরা" অর্থাৎ অগ্রহায়ণ অথবা মাঘমাস ভূমিকর্ষণের উপযুক্ত সময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঙ্গল কিম্বা শুক্রবারই প্রথম ভূমিকর্ষণের প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া পরিগণিত হয়। ভূমিকর্ষণের পূর্ব্বে কর্ষণকারী বৃষের পূজা এবং তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধৌত করিয়া বিভূতি দ্বারা ভূষিত করে। ধূর্য্যকাষ্ঠের উপর নারিলেল ভগ্ন করে। যে বংশখণ্ডের দ্বারা বীজ রোপণ করা হয় তাহাকে চূণ এবং রাঙ্গা মাটি দ্বারা রং করে। কতকগুলি অশ্বত্থ পত্র এবং হরিদ্রা ভূমির স্থানে স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখে। লাঙ্গলে এক টুকরা সুতার দ্বারা ভেলা তাল পত্রাদি বাঁধিয়া দেয়। শস্য কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে উহার উপর দুগ্ধ ঘৃতাদির ছিটা দেওয়া হয়। শস্য সংগৃহীত হইলে পর শস্য-স্তূপের সম্মুখে গোময়নির্ম্মিত মন্দিরাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া খাদ্য দ্রব্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

প্রাণ খুলে গাও।

(রামপ্রসাদী সুরে)

(মন) প্রাণ খুলে গাও মায়েরি নাম॥
বিপদ আপদ যাই না আসুক
বিকট হাসি যতই হাসুক
(ওরে) বাঁকিসনে টুক্ এদিক ওদিক
মায়ের পরে রাখিস রে প্রাণ।
(যবে) ধন-রাশি রাশি সুখ
ভরে দেয় তোর হাসিতে মুখ
(তখন) ভুলিস নে-কো সার কথাটী
যা কিছু সব মায়েরি দান।
উঠিস যবে সকাল হোলে
ফিরিস যবে সাঁঝের কোলে
(তখন) ভক্তি-ভরে চরণ পরে
মাথা থুয়ে করিস্ প্রণাম॥

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে নব ক্ষেত্র সমাবেশ।

আমরা গত সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "ধর্ম্ম প্রচারের সহজ উপায়" প্রবন্ধে ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কতকগুলি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে অভিনয় একটী। কেবল জোর করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের মস্তকে ধর্ম্মকথাগুলি কিলাইয়া প্রবেশ করাইলে বিশেষ ফল হয় না। গুরুর স্নেহের, প্রেমের ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক ধর্ম্মভাব ছাত্রের মস্তিষ্কে বসিয়া যায়। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে ছাত্রদিগের প্রতি যে ভয়ের কঠোর শাসন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু স্নেহপ্রেমের কোমল শাসনই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেবল রাশি রাশি দার্শনিক তত্ত্ব উদ্গীর্ণ করিয়া নানা প্রকারে পরলোক সম্বন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভয়প্রদর্শন করা কঠোর শাসনপ্রণালীর অন্যতর এবং অভিনয়াদির দ্বারা দর্শনতত্ত্ব হৃদ্গত করানো প্রেমের শাসনপ্রণালীর অন্যতর। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় নানাবিধ সুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধ প্রথমাবধি প্রকাশিত হইবার কারণে সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী উহাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কিন্তু একটু ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেই ভীতি দূর করিবার জন্য আমরা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৭৫ বৎসর বয়সে পড়িবার উপলক্ষে বর্ত্তমান সংখ্যার পত্রিকায় একটী ক্ষুদ্র গীতিনাট্যের সমাবেশ দ্বারা একটী নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া পত্রিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার দূরীকরণে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

গীতিনাট্যের নাম "ছুটী" এবং লেখক সুপ্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন। "ছুটী"তে দেখানো হইয়াছে যে আমাদের ছুটীর মধ্যে কাজ এবং কাজের মধ্যে ছুটী। ইহা ছোট ছোট বালকবালিকাদের দ্বারা অভিনয় করিবার খুবই উপযুক্ত। সম্মুখে শারদীয় পূজার অবকাশ আসিতেছে। যদি বালকবালিকাদের অভিভাবকগণ সেই অবকাশে নিজ নিজ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দ্বারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় করান, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। আবালবৃদ্ধ বনিতার সম্মুখে অম্লানবদনে অভিনয় করিতে পারা যায় এরূপ পুস্তক আমাদের দেশে দুএকখানি ব্যতীত নাই বলিলেই চলে। ধ্রুব, বুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অভিনয় করিতে বা দেখিতে গেলে এমন অংশে আসিয়া পড়িতে হয় যেখানে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া থাকা অসম্ভব। যাঁহারা ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দ্দোষ অভিনয়ের উপযুক্ত পুস্তকাদি রচনা করেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। এরূপ পুস্তকের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, কথক হেমচন্দ্রের উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। হেমচন্দ্রের রচিত "দাদা ঠাকুর" বা "আদর্শ" গত বৎসর মুকুন্দ দাস কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়া সমগ্র রাজধানীকে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এবারে আমরা তাঁহার রচিত "ছুটী" প্রকাশ করিলাম। এ বিষয়ে পাঠকগণের অভিমত পাইলে সুখী হইব।

ছুটি।

(গীতি-নাট্য)

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

(গান করিতে করিতে পাঠশালার বালকগণের প্রবেশ।)

প্রভাতকাল।

গীত।

সারা রাত্ ঘুমিয়ে কেটে' সকাল বেলায় উঠি,
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি,
ওরে হয়ে গেছে ছুটি!

সারা জগৎ মোদের সনে
খেলতে এসেছে
কোন্ সুদূরের সাগর পারের
খবর এনেছে—
কোথায় বাঁশী বেজেছে! কোথায় সাড়া পড়েছে
ভোরের আলো তাই দেখে ভাই হেসে কুটি-কুটি!
লুট করে আজ নেব আকাশ
সবাই মুঠি মুঠি
হাসি গানের ঝড় বহায়ে'
নেব জগৎ লুটি!
মোরা, নেব জগৎ লুটি'!

১ম বালক। ছুটি তো হল এখন কি করব?

২য় বালক। তাইতো কি করব?

৩য় বা। বাঃ, ছুটির দিনে আবার কি করব? ছুটিতো ছুটিই।

৪র্থ বা। ছুটিও তো একটা কাজ

৫ম বা। ওগো তা বোলো না। ছুটিটাকেও একটা কাজ বলে ভাবলে আর ছুটিতে ছুটির আনন্দটুকু থাকবে না।

২য় বা। কাজের আনন্দটুকুই তো ছুটি। এই আনন্দটুকু পাবার জন্যই তো যত কাজ।

৪র্থ বা। তা হলে কথাটা দাঁড়াল কি, কাজের জন্য ছুটি না ছুটির জন্য কাজ?

২য় বা। ও দুটো'ই।

৫ম বা। কাজের মধ্যেই একটা ছুটি আছে; আর ছুটির মধ্যেও একটা কাজ আছে। কাজ আর ছুটি—দুটোতে এত মাখামাখি যে বেশী করে না ভাবলে চেনা যায় না।

২য় বা। আমাদের পাঠশালাটি বেশ কিন্তু—

৩য় বা। কি রকম?

২য় বা। এটা বরাবর দেখে আসচি যে আমরা ছুটির মধ্যে কাজের আনন্দ পাই আবার কাজের মধ্যে ছুটির আনন্দটুকু পাই।

৫ম বা। পাঠশালার শিক্ষাই যে তাই।

গীত।

মোদের কাজ আর ছুটি এক হয়েছে
কাজেই আমোদ পাই
এই পড়া পড়েছি মোরা এই শেখাই
শিখ্চি ভাই।
মোদের এই ভোর বেলাতে
মোদের এই পাঠশালাতে
বাধা বাঁধন, বেতের শাসন, কোনো বারণ নাই।

হাওয়ার সনে মেতে উঠে
ফুলের মতন উঠি ফুটি'
ভোরের আলোর আমোদ লুটি, পাখীর মতন গাই।

(একটী আগন্তুক বালকের পুস্তকহস্তে প্রবেশ।)

১ম বা। কি হে ভাই. তুমি যাচ্ছ কোথায়?
২য় বা। হাঁগা তোমার নাম কি?
৩য় বা। তুমি কোন্ পাঠশালায় পড়?
৪র্থ বা। তুমি কোন্ গাঁয়ে থাকো?
৫ম বা। ওকি কথা কইছনা যে?
৪র্থ বা। ওকি অমন ক'চ্ছ কেন?
আ-বা। আঃ পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও।
২য় বা। ওগো দুটো কথাই কও!
আ-বা। কথা কয়োনা; কথা কয়োনা।
৩য় বা। কেন?
আ-বা। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে মানা।
৩য় বা। কেন ভাই?
আ-বা। গুরুমশায় মানা করেছেন।
৩য় বা। তোমার গুরুমশায় কে?
আ-বা। ঐ, যাঁর হাতে বেত।
৩য় বা। ও বাবা, হাতে বেত কেন?
আ-বা। তিনি যে গু-রু-ম-শা-য়।
৩য় বা। তা হোক—তা বেত কেন হাতে?
আ-বা। না হলে শাসন করবে কি দিয়ে? তোমরা পাঠশালায় পড়না?
৩য় বা। পড়ি।
আ-বা। তোমাদের গুরুমশায় নেই?
৩য় বা। আছেন। তাঁর হাতে বেত নেই। তাঁর বেতের শাসন নেই।
আ-বা। তবে কিসের শাসন? তা হলে বুঝি মোটে শাসনই নেই? বেত না হলে কি শাসন হয়?
৩য় বা। শাসন থাকবেনা কেন? কিন্তু সে বড় মজার শাসন, তা কেমন; মুখে বুঝিয়ে বলতে পারব না। এ পাঠশালায় পড়লেই বুঝতে পারবে।
আ-বা। তোমরা পড়তে যাবে না?
২য় বা। পড়চিই তো।
আ-বা। সেকি! এখানে যে ঘর নেই; এযে খোলা জায়গা।
২য় বা। আমাদের পড়া এই রকম খোলা জায়গাতেই। আমাদের পাঠশালার জায়গার অন্ত নেই।
আ-বা। গান কচ্ছিলে কেন?
২য় বা। বাঃ, আজ যে ছুটি!
আ-বা। তবে আর পড়া হল কৈ? ছুটি কি পড়া? পড়াতে ছুটি নেই।
২য় বা। পড়া আছে বলেই তো ছুটি আছে; তোমাদের পাঠশালায় বুঝি ছুটি নেই।

(এমন সময়ে বই হাতে করিয়া আর একটি বালকের প্রবেশ।)

আ-বা। তা নেই। সে খানে কেবল নড়াচড়া না করে, চুপ্ করে বুড়োর মত মুখ ভারী করে বসে কেবল পড়তে হবে।
৪র্থ বা। ওহে, এ কি রকম পাঠশালা?
আ-বা। এ সব শুনে মনে হচ্ছে তোমাদের পাঠশালা-টাই ভালো। আমি ও-পাঠশালা থেকে পালিয়ে আস্‌ব। তোমাদের সাথে মিশে আমোদ করব।
৪র্থ বা। সে কি? পাঠশালা থেকে কি আর পালানো যায়? পালানো কেন? পালানোটা ভালো নয়। যে ওখান থেকে পালাতে পারে সে এখান থেকেও পালাতে পারে।
৩য় বা। চল ওকে আমাদের গুরুমশায়ের কাছে নিয়ে যাই।
২য় আ-বা। ও বাবা! গুরুমশায়ের নাম শুন্‌লেই যে ভয় হয়।
৩য় বা। কেন?
২য় আ-বা। তিনি যে গুরুমশায়—সেইটাই তো ভয়।
৩য় বা। তাই বলেই তো ভয় নেই; আমরা তো ভয় পেলেই আরো গুরুমশায়ের কাছে যাই।
১ম ও ২য় আ-বা। তাঁর কি রকম চেহারা?
১ম বা। ঠিক্ গুরুমশায়েরি মত।
১ম ও ২য় আ-বা। ও বাবা! তবেই হয়েছে। ও বাবা! আমরা যাই।
সকল বালকেরা। আরে দাঁড়াও না! যাচ্ছ কেন?
২য় আ-বা। তাঁর খুব রাঙা চোখ, গম্ভীর মুখ, লম্বা দাড়ি—কেমন, নয় কি?
১ম বা। না গো না; তুমি যেমন ভাবছ তেমন নয়।
১ম ও ২য় আ-বা। সে খানে আমাদের নিয়ে কি করবে?
২ ও ৩য় বা। তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে তোমরা নাচবে, গাইবে, আমোদ করবে।
১ম বা। সে কি! বল কি!—গুরু মশায়ের সঙ্গে আমোদ!
৩য় বা। তা নয় তো কি? কাজের দিনে তিনি সাথে সাথে, আর ছুটির দিনে কি তিনি ছাড়া?

গীত।

কাজের দিনের সাথের সাথী ছুটির দিনে নয় ছাড়া
কাজের মাঝে ছুটির মাঝে সকল কাজেই পাই সাড়া।
আমাদের কাছে আসে
আমাদের সাথে হাসে
ভালোবাসায় ভালোবাসে এম্‌নি বটে তাঁর ধারা।
যূথীর মালা গলে দোলে
হাসিতে তাঁর পরাণ খোলে
(সব) মুখ দেখিলেই আপন ভোলে ভয় ভাবনা হয় হারা

১ম আ-বা। আজ তোমাদের ছুটি কেন?

৩য় বা। বেশি করে কাজ সুরু করতে হবে। আমাদের পাঠশালায় যাবে একবার? সেখানে গেলে কাজও হবে, ছুটীও পাবে।

১ম ও ২য় আ-বা। যাবো। কিন্তু পথে যদি আমাদের গুরুমশায়ের সাথে দেখা হয়?

৪র্থ বা। তা হলে কি হবে?

২য় আ-বা। মেরে ধরে নিয়ে যাবে?

৩য় বা। না গো না। এ পথ থেকে কেউ নিতে পারে না। এটা আমাদের পাঠশালার পথের গুণ।

১ম ও ২য় আ-বা। তবে চল। বড় ভাগ্যি তোমাদের সঙ্গে সকাল বেলায় দেখা হয়েছে।

৩য় বা। সেটা ভোরের আলোর গুণে।

১ম ও ২য় আ-বা। তবে চল একবার তোমাদের গুরু-মশায়ের কাছে।

৪র্থ বা। তিনিই এখানে আস্‌বেন।

১ম আ-বা। একথা তোমায় কে বল্লে?

৪র্থ বা। এই রকম তিনি আসেন। ছুটির আনন্দ যখন খুব বেশী হয়ে উঠবে, তখনি তিনি আস্‌বেন।

২য় আ-বা। তা হলে এস আমরা আমোদ করি।

(গীত।)

আয় আকাশের ঝোড়ো বাতাস
আয়রে চাঁদের হাসি
আয়রে তারা আয়রে লয়ে
কিরণ-মালার রাশি।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে।)
ফটিক জলের নাচন লয়ে
আয়রে নিঝর-বারি
নদীর জলে পড়া চাঁদের
আলোর ঝিলিক মারি।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে)
মেঘ দেখে যে ময়ূর নাচে,
ফাগুন মাসের পিকের গান—
গানের মাঝে নাচের মাঝে
হয়ে উঠ মূর্ত্তিমান।
(তোরা, আয় আয় আয় আয় রে)

২য় দৃশ্য—পথ।

দুইটী পথিক। সন্ধ্যাকাল।

১ম পথিক। কি গো তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

২য় পথিক। আজ নাকি ছুটি?

১ম প। এ কি আর বলে দিতে হয়। চার দিকে চাইলেই বুঝা যায়।

২য় প। যায় নাকি? ওঃ এত দূর হয়েছে! বাহির দেখেও বুঝা যাচ্ছে! তাইতো একটু কাঁদি।

১ম প। আহা, বল কি! এমন সুখের দিনে কাঁদতে আছে?

২য় প। সুখের দিন! শুনেছি নাকি আজ বাঁধন গুলো সব খসে' পড়্‌বে, সব ছাড়বে, এও কি একটা সুখের দিন?

১ম প। তাই বলেই তো সুখ। সব ছেড়ে যেতে হবে এমন কথা তোমায় কে বল্লে? ছুটির অর্থ তা নয়। ছুটি যে সব ছেড়ে সব পাওয়া। সবাই তোমায় ছাড়বে, তুমিও সবাইকে ছাড়বে, অথচ সকলি তোমার হবে।

২য় প। বল কি! এ আমার বিশ্বাস হয় না।

১ম প। বিশ্বাস করেই দেখ না।

২য় প। হায়, হায়, এই আমার খাতাপত্র, এই আমার পোঁটলা পুঁটলী এ সব ছাড়তে হলে আর আমি বাঁচব না। এ সব গেলে এর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব। এই দ্যাখ না ভাই শিকল দিয়ে হাত পা সব বেঁধে রেখেছি।

১ম প। তা যতই বাঁধো, ছুটি হলে ও-সব আপনা আপনি খসে পড়্‌বে।

২য় প। হায়রে আমার পুঁটলী!

১ম প। আবার কাঁদ্‌ছ?

২য় প। আচ্ছা, ছুটি হল কেন?

১ম প। ও অমন হয়ে থাকে। ছুটি হতেই হবে।

২য় প। কি সর্ব্বনাশ!

১ম প। সর্ব্বনাশ কি?

২য় প। সর্ব্বনাশ নয়! সব ছেড়ে যাওয়া, সব ছেড়ে দেওয়া,—এর চেয়ে কি সর্ব্বনাশ কিছু আছে?

১ম প। বলেছিই তো এ সব-ছাড়া নয়,—সব-পাওয়া। অনেক জিনিস দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পাওয়া হয় নাই। আজ এই ছুটিতে সেগুলি পাওয়া হবে।

২য় প। এ কেমন করে হয় আমি বুঝ্‌তেই পারি না।

১ম প। যদি আমার কথা শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে।

২য় প। যদি পুঁটলী ছাড়ার কথা ছাড়া আর কোনো কথা বল তাহলে শুনতে পারব।

১ম প। আচ্ছা থাক্; পুঁটলী তুমি নিজেই ছাড়তে চাইবে। আগে একটা সহজ কাজ কর।

২য় প। কি?

১ম প। এই শিকলটা খুলে ফেল।

২য় প। ও বাবা তা'হলে আর বাঁচব না; আমার এরূপ বাঁধা থাকাই অভ্যাস। একি একদিনের অভ্যাস?

১ম প। একবার খোলা হয়ে দেখ কি মজাটা।

২য় প। আমি খুলতে পারব না, তুমি যদি পারো খুলে দাও।

১ম প। তা আমার একার ইচ্ছায়, একার চেষ্টায় হয় না। তোমারো ইচ্ছা থাকা চাই,—চেষ্টা থাকা চাই।

২য় প। যাই বল, খুলতেই আমার মন সরে না।

১ম প। আচ্ছা থাক্; মন না সরলে, ধরে বেঁধে খোলা কোনো কাজের নয়। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি নিজেই যখন খুলতে চাইবে তখন খুলে দেব।

২য় প। ও বাবা—বল কি? আমি নিজেই খুলতে চাইব? হায়রে এ আমার ভাবতেই যে কান্না পায়। হায়রে আমার পুঁটলী।

১ম প। আঃ ছুটির দিনে আবার কাঁদ্ছ?

২য় প। ও কি অমন চ্যাঁচাচ্ছে কারা? এই রে সেরেছে! আমার পুঁটলি নিতে এল বুঝি; এই বুঝি আমার শিকল খুলে দিতে আস্‌চে। হায়রে! হায়রে আমার পুঁটলী। বেরোও বাপু এখান থেকে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তুমিই একজন ঐ দলের। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি, বেশ বুঝ্‌তে পারছি। হায় হায় এই তো শিকলটা যেন ঝন্ ঝন করছে, এই খুল্‌ল বুঝি! খুলল বুঝি! হায়রে আমার পুঁটলি!

১ম প। আচ্ছা আমি তবে এখন ঐ আনন্দে মিশে যাই।

(গান করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ)

গীত।

সকল বাঁধন পড়বে খসে;—আজ যে মোদের ছুটি
রইবে কে আর কোণে বসে? আজ যে মোদের ছুটি
সব ছেড়ে সব পাবে যে আজ; আজ যে মোদের ছুটি
আমায় আমি ভুলতে হবে; আজ যে মোদের ছুটি
ভোরের আলোয় নাইতে হবে; আজ যে মোদের ছুটি
পুঁটলী তোমার ছাড়িয়ে লবে; আজ যে মোদের ছুটি
হয়নি যাহা হবে তা আজ; আজ যে মোদের ছুটি
করনি যা করবে তা আজ; আজ যে মোদের ছুটি

২য় প। এই এই গেল বুঝি, শিকল খুলে গেল বুঝি! এই এই বেরো, বেরো দুষ্টু ছোঁড়াগুলো বেরো।

(বালকগণ তাহাকে ঘিরিয়া গাহিতে লাগিল)

২য় প। হায়, হায়রে এই তো, এই তো খুলে গেছে! ঐ যাঃ খুলে গেল! (শিকল খুলিয়া পড়িল) হায়রে, হায়রে আমার পুঁটলী!

(তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

১ম প। চল চল গেয়ে চল; দেখছ আকাশ ক্রমে বেশি নীল হয়ে উঠচে; বাতাস ক্রমে খোলা হয়ে আসচে। চল গেয়ে চল।

(কাঁদিতে কাঁদিতে পুঁটলীধারী পথিকের পুনরায় প্রবেশ)

২য় প। হায়, হায়রে! হায়রে আমার পুঁটলী! সর্ব্বনেশে ছোঁড়াগুলো কি-করে বা খোঁজ পেলে! ঐ ঐ ঐ বুঝি আবার আসে। ঐ ঐ এলো তো! হায়রে আমার পুঁটলী! একি! শিকল খুলে যাওয়ার পর থেকেই যে কেবল ছুটাছুটি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। একি কেবলি যে দৌড়োচ্ছি। একি হল? শেষটা কি ঐ ছোঁড়াগুলোর মত হব নাকি? না, না, আমি পুঁটলি নিয়ে এবার গম্ভীরভাবে বসব। আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো আর ছোক্‌রা নই। যাক্, গম্ভীরভাবে বসি (গম্ভীরভাবে উপবেশন) না না একি! কেবলি যে মনে হচ্ছে আমি আর বুড়ো মানুষ নই। আমি যেন আবার নতুন হয়ে গেছি। হায়রে আমার "আমি" গেল কোথায়?

২য় প। সর্ব্বনাশ! ছোঁড়াগুলো আবার আসছে। প্রথমবারে বাঁধন খুলে গেছে; এবার পুঁটলীটিও যাবে। লুকোবোই বা কোথায়? বাঁধন খুলে গেলে কি আর লুকানো যায়?

(বালকগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

বারে বারে আসতে হবে, বারে বারে ডাকতে হবে
কাঁদতে হবে, গাইতে হবে, ঘুরতে হবে এই দ্বারে।
কত আর তাড়িয়ে দিবে, কত আর ফিরিয়ে দিবে?
সাথের সাথী হতেই হবে পেতেই হবে আজ তাঁরে।
চল্‌বেনা আজ ফেলে যাওয়া, চল্‌বেনা আজ একা গাওয়া
সবারি ডাক পড়বে যাহে সেই সুরে আজ গান গা'রে।
চলবেনা আজ একলা হাসন, চলবেনা আজ মিছে কাঁদন
ছুটির আমোদ হলে ঘন থাক্‌তে একা কে পারে?

২য় প। ওরে তোরা গান গাচ্ছিস কেন?

১ম প। আজ যে ছুটি, তাইতো আমোদ

২য় প। আমার তো আমোদ বোধ হচ্ছে না।

১ম প। ঐ পুঁটলীটি ছেড়ে দেও; তবেই আমোদ হবে।
২য় প। ও সর্ব্বনাশ! তা হতেই পারে না।
১ম বা। তবে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখ।
২য় প। তাতে কি হবে?
১ম বা। গুরুমশাইকে দেখতে পাবে।
২য় প। সে কোথায়?
১ম বা। তাকে খুঁজলেই দেখতে পাবে।
২য় প। দেখলে কি হবে।
১ম বা। আনন্দ হবে।
২য় প। আমি তো সব দিক্ দেখ্‌চি, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি নে।
১ম বা। তবে এই গানে যোগ দাও।

(বালকগণের গীত)

আনন্দে আজ দেছে ধরা সারা গায়ে ঢেউ লাগে
সারা রাতের ঘুমের পরে ভোরের আলো আজ জাগে
মেল নয়ন দেখ্‌তে পাবে
দাঁড়িয়েছে সে কি সাজে
কাণ পেতে ভাই শোনো শোনো
বাঁশীতে তাঁর কি বাজে
হৃদয় দিয়ে বোঝো হৃদয় তাঁরেই শুধু আজ আগে।

২য় প। বাঃ এতো বড় চমৎকার! পুঁটলীটি কে যেন নিয়ে গেল, কিন্তু দুঃখ তো হচ্ছে না! বাঃ সঙ্গে সঙ্গে আমিই যে বদলে গেছি। বাঁধন তো আগেই গেছে; দুঃখও নেই—এখন কেবল আনন্দ—গাও তোমরা, আমিও গাইব।

সকলের গীত।

সকল দিকে পরশ-করা এই তো তাঁকে পেয়েছি
সবার পরাণ হরষ-করা এই তো সে গান গেয়েছি
সুধার সাগর মাঝে নামি'
এই হারালাম আমার "আমি!"
ডুব্ দিয়ে যে উঠে দেখি, নূতন সাজে সেজেছি!
এতই ছিল পাইনি এত
তাড়িয়ে দিছি যায়নি' সে তো
জিত্‌তে গিয়ে হার মেনেছি; হেরে' যে আজ জিতেছি।

শেষ।

বাইবেল সংশোধন ও সত্যের অভিব্যক্তি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

এদেশে গত শতাব্দী হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধারণা লইয়া আবার নূতন চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব চারিদিকে দিন দিন ছাইয়া পড়িতেছে। তাঁহার প্রভাব যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, উহার অবান্তর ফলে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে সঞ্জীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসাধনার ভিতরে যেখানে যে কিছু কলঙ্ক বা আবর্জ্জনা রহিয়াছে, তাহার উপরে তত্তৎ সম্প্রদায়ের মনোযোগ নিপতিত হইয়াছে। বামাচার বীরাচার, সতীদাহ, সমুদ্রে পুত্রকন্যা নিমজ্জন উঠিয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের নামে পশুহত্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

কেবলমাত্র এ দেশে নহে; ইউরোপব্যাপী রণকোলাহলের ভিতরে পড়িয়াও বিলাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় নাই। যাঁহারা প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত ভগবৎভক্ত তাঁহাদের তীব্র দৃষ্টি ধর্ম্মপুস্তকের ভিতরে পড়িয়া কলঙ্ক অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের (গির্জ্জায়) ধর্ম্মালয়ে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহার মধ্য হইতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিবার কথা উঠিয়াছে। "ভগবান চিরদয়ালু চিরকৃপাল, তিনি বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কখনও কাহাকে বিধ্বস্ত করেন না, কাহাকেও অভিসম্পাত দেন না, তাঁহার রাজ্যে যে কেবলই দয়া, তিনি পাপী অপরাধী সকলকেই পরিশোধিত করিয়া তুলিতেছেন", এই ভাবের ভাবুক হইয়া কয়েকজন পাদ্‌রী Pslams of David হইতে কোন কোন অংশ অপসারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে অভিশাপমূলক অংশগুলি পরিবর্জ্জন করিয়া উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের নূতন সংস্করণ বাহির হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য উক্ত সঙ্গীত-পুস্তক অতীব প্রাচীন। উহা Old Testament এর অংশ বিশেষ। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে উহা বিরচিত। উক্ত সঙ্গীতগুলির উপর সমগ্র খৃষ্টীয়ান জাতির শ্রদ্ধা অপরিসীম। কিন্তু যখন সত্যের নিকটে বর্ত্তমানে উহা পরীক্ষিত হইল, তখন উহার

অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। তাই তাঁহারা উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের নূতন সংস্করণের পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উক্ত সঙ্গীতপুস্তকের ৫৮ সংখ্যক ধরা যাইতে পারে। উক্ত সঙ্গীতে আছে, "বিচারকগণ তোমরা আইনের সাহায্যে বিচার কর, তোমরা কি কখন ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করিতে পার? যখন বিপন্ন দরিদ্র তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তোমরা কি সেই নির্দ্দোষ দরিদ্রকে তাড়াইয়া দিবে! যখন অর্থ তোমাদের হস্তকে কলঙ্কিত করিবে, তখন কি তোমরা অর্থশালী দোষীকে ছাড়িয়া দিবে। তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ, অথবা জাননা, যে ভগবান বিচারকগণের বিচার করিবেন, স্বর্গের চারিভিতে তাঁহার বিচার চলিতেছে! তোমরা ভগবানের বিচারকে অতিক্রম করিতে চাও, ও সাধারণের হিতাহিতজ্ঞানকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিবার জন্য তোমরা আদেশ প্রচার কর। তোমাদের জিহ্বা হইতে বিষাক্ত শর বাহির হয় ও যেখানে পতিত হয় মৃত্যুকে আনয়ন করে; তোমরা সুপরামর্শ ক্রন্দন ও চক্ষুজল সবই উপেক্ষা কর। * * * হে অনাদি ঈশ্বর! সিংহের মত রক্তস্নাত তাহাদের সেই দন্ত ভগ্ন করিয়া দাও, তাহাদিগকে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত কর, * * তাহাদের আশা ও নাম সমস্তই বিলুপ্ত কর"। * * * তাঁহারা বলেন এইরূপ সঙ্গীত ভজনাগারে গীত হইবার উপযুক্ত নহে। তাঁহাদের মতে উক্ত সঙ্গীত পুস্তকের অন্তর্গত ১৪, ৫৫, ৬৮, ৬৯, ১০৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩ সংখ্যক সঙ্গীতের কোন কোন অংশ ঐরূপ দোষদুষ্ট। ঐ ঐ সকল অংশ পরিহার হওয়া বিধেয়। সঙ্গীতের যে যে অংশে ভগবানের অভিশাপ ভিক্ষা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ সঙ্গীত পুস্তকে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

এইরূপ আন্দোলনে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠার গৌরব সূচিত হয়। কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে Psalms of David রচিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের উপর অসামান্য শ্রদ্ধা থাকিলেও সত্যের অনুরোধে তাঁহারা উক্ত সঙ্গীত পুস্তককে নির্দ্দোষ করিতে চান। ধন্য তাঁহাদের সৎসাহস।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র উপনিষদ্ মন্থন করিয়া, সময় ও শিক্ষা ও গ্রহণের উপযোগী করিয়া, উহার ভিতর হইতে শ্লোকরাজি সংকলন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ নিবদ্ধ করিলেন এবং আপনার হৃদয়ের ছবি উহার ভিতরে প্রতিবিম্বিত করিলেন। ক্ষুদ্র আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা সহজে ও সংক্ষেপে বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিলেন। তিনি ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া যে সংগ্রহগ্রন্থ প্রচার করিয়া গেলেন, নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহার জন্য চিন্তাশীল মাত্রেরই তিনি শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার অধিকারী। তিনি সমগ্র জীবনে সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

মিলন।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

তোমার সঙ্গে মিলন আমার
হবেই হবে হবেই হবে।
এই সেই পাপের তুচ্ছ বাঁধন
কদিন রবে কদিন রবে!
তুমি চাহ মিলন আমার
আমি চাহি মিলন তোমার
মোদের মিলনের এই ইচ্ছা-নদী
কোন্ সে পাষাণ-বাধা স'বে।
পাষাণ সে তো গলবে প্রেমে
বুকের বোঝা যাবে নেমে
ঝঞ্ঝা সে তো আস্‌বে থেমে
মিলন যত নিকট হবে!
তপন তারা রহে চেয়ে
আলোয় আনে ভুবন ছেয়ে
মোদের মিলনেরি বার্ত্তা সে তো
ভুবন মাঝে তা'রাই ক'বে!
কাননে সব কুসুম ফোটে
কোন্ কথা সে জানায় তারা—
কিসের কথা প্রকাশ করে
পাখীর গীতি নদীর ধারা?
নিমেষহারা চাহে আকাশ
কুসুমগন্ধ বহে বাতাস

কিসের লাগি—কি তারা চায়—
মোদের দোঁহার প্রেমের বিকাশ!
মোহের বাধা ক'দিন রবে
গভীর ইচ্ছা বাঁধন স'বে?
জন্ম মরণ পারে যে ঐ
নিবিড় মিলন হবেই হবে॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূল। অথেদানীং প্রত্যধিকরণমবয়বচতুষ্টয়ং শ্লোকাভ্যাং সংগৃহ্যতে—তত্র প্রথমে ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বাধিকরণে শাস্ত্রস্য প্রথমং সূত্রং॥

অনুবাদ। অনন্তর এক্ষণে দুইটী শ্লোকের দ্বারা অবয়বচতুষ্টয়সহ প্রত্যেক অধিকরণ সংগৃহীত হইতেছে। বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভে "ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব" অধিকরণে প্রথম সূত্র—

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে ২য় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক অধিকরণের পঞ্চ অবয়ব—বিষয়,সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত এবং সংগতি। তন্মধ্যে সংগতিসকল সহজবোধ্য বলিয়া, অতঃপর যে সকল অধিকরণ বলা হইবে, সেই সকল অধিকরণের সংগতিগুলি আর স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইবে না, কিন্তু অন্য চারিটী অবয়ব স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রথম অধিকরণ হইতেছে—"ব্রহ্মের বিচার্য্যত্ব"। তাহার প্রথম সূত্র নিম্নে উক্ত হইল—

মূল। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসানিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্হতি ॥১১॥
অধ্যাসোঽহংবুদ্ধিসিদ্ধোঽসংগং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতং।
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্মবেদতঃ॥১২॥

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" [বৃহং ২।৪।৫] ইত্যত্রাত্মদর্শনফলমুদ্দিশ্য তৎসাধনত্বেন শ্রবণং বিধীয়তে। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং নির্ণেতুমনুকূলো ন্যায়বিচারঃ। তদেতদ্বিচারবিধায়কং বাক্যং বিষয়ঃ। ন চ অয়ং বিষয়ঃ শ্লোকয়োর্ন সংগৃহীতঃ ইতি শঙ্ক্যং সন্দেহসংগ্রহেণৈবার্থাত্তৎসংগ্রহপ্রতীতেঃ। ব্রহ্মবিচারাত্মকং ন্যায়নির্ণয়াত্মকং শাস্ত্রমনারভ্যম্ আরভ্যম্ বা ইতি সন্দেহঃ। পূর্ব্বোত্তরপক্ষযুক্তিদ্বয়ং সর্ব্বত্র সন্দেহবীজমুন্নেয়ং। তত্র অনারভ্যম্ ইতি তাবৎ প্রাপ্তং বিষয়প্রয়োজনয়োরভাবাৎ। সন্দিগ্ধং হি বিচারবিষয়ো ভবতি। ব্রহ্মত্বসন্দিগ্ধং। তথাহি—তৎ কিং ব্রহ্মাকারেণ সন্দিহ্যতে আত্মাকারেণ বা নাদ্যঃ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" [তৈত্তিং ২।১।১] ইতি বাক্যেন ব্রহ্মাকারস্য নিশ্চয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ অহংপ্রত্যয়েনাত্মাকারস্য নিশ্চয়াৎ। অধ্যস্তাত্মবিষয়ত্বেন ভ্রান্তোঽহংপ্রত্যয়ঃ ইতি চেৎ ন অধ্যাসানিরূপণাৎ। তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োর্জড়াজড়য়োর্দেহাত্মনোঃ শুক্তিকারজতবদন্যোন্যতাদাত্ম্যাধ্যাসো ন নিরূপয়িতুং শক্যতে। তস্মাদভ্রান্তাভ্যাং শ্রুত্যহংপ্রত্যয়াভ্যাং নিশ্চিতস্যাসন্দিগ্ধত্বাদ্বিচারস্য ন বিষয়োঽস্তি। নাপি প্রয়োজনং পশ্যামঃ উক্তপ্রকারেণ ব্রহ্মাত্মনি নিশ্চিতেঽপি মুক্ত্যদর্শনাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্ম বিচারানর্হং ইতি শাস্ত্রমনারম্ভণীয়ং ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অত্রোচ্যতে শাস্ত্রমারম্ভণীয়ং। কুতঃ বিষয়প্রয়োজনসদ্ভাবাৎ। শ্রুত্যহংপ্রত্যয়য়োর্বিপ্রতিপত্ত্যা সন্দিগ্ধং ব্রহ্মাত্মবস্তু। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" [বৃহং ২।৫।১৯] ইতি শ্রুতিরসংগং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশতি। অহং মনুষ্যঃ ইত্যাদ্যহংবুদ্ধির্দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসেনাত্মানং গৃহ্নাতি। অধ্যাসস্য চ দুর্নিরূপণত্বমলংকারায়। তস্মাৎ সন্দিগ্ধং বস্তু বিষয়ঃ। তন্নিশ্চয়েন মুক্তিলক্ষণপ্রয়োজনং শ্রুত্যা বিদ্বদনুভবেন চ প্রসিদ্ধং। তস্মাৎ বেদান্তবাক্যবিচারমুখেণ ব্রহ্মণো বিচারার্হত্বাচ্ছাস্ত্রমারম্ভণীয়ং। ইতি সিদ্ধান্তঃ।

সূত্রানুবাদ। অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

অধিকরণ শ্লোকের অনুবাদ। প্রথম অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

ব্রহ্মবিচার্য্য অথবা অবিচার্য্য? অধ্যাস নিরূপিত হইবার অভাব, সন্দেহের অভাব এবং বিচারের নিষ্ফলত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। (কিন্তু) অহংবুদ্ধি দ্বারাই অধ্যাস সিদ্ধ হইতেছে এবং শ্রুতিকথিত ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সন্দেহ এবং মুক্তিফলত্ব হেতু ব্রহ্ম বেদমুখে বিচার্য্য।

টীকার অনুবাদ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই মন্ত্রে আত্মদর্শনরূপ ফলের উদ্দেশ্যে তাহারই সাধনস্বরূপে শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। বেদান্তবাক্যসমূহের ব্রহ্মবিষয়ক তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পক্ষে অনুকূল যুক্তিবিচারের নামই শ্রবণ। সেই এই বিচারপ্রবর্ত্তক বাক্যই হইল বিষয়। এই বিষয় যে উপরোক্ত দুইটী শ্লোকে সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া আশঙ্কা করিবে তাহা ঠিক নহে। সন্দেহের উল্লেখেই স্বতই বিষয়ও উল্লিখিত বলিয়া ধরিতে হইবে। যুক্তিমূলক ব্রহ্মবিচারবিষয়ক শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত বা অনুচিত ইহাই হইল সন্দেহ। সর্ব্বক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তরপক্ষের যুক্তি হইতেই সন্দেহবীজ পাওয়া যাইতে পারে। এই বিচারে বিষয় এবং প্রয়োজনের অভাব প্রযুক্ত বিচার আরম্ভ করা উচিত নহে ইহা পাওয়া গেল। যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাই বিচারের বিষয় হয়। ব্রহ্মবিষয়ে কিন্তু কোনই সন্দেহ নাই। যদি বল যে ব্রহ্মবিষয়ে সন্দেহ আছে— তবে সে সন্দেহ কি ব্রহ্মাকার ধরিয়া অথবা আত্মাকার ধরিয়া? ব্রহ্মাকারে সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাকার সুনিরূপিত হইয়াছে। অহংপ্রত্যয়ের দ্বারা আত্মাকারও সুনিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত আত্মাকার ধরিয়াও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যদি বল যে আত্মাতে অধ্যাস প্রযুক্ত অহংপ্রত্যয় ভ্রান্ত, তাহাও ঠিক নহে, কারণ অধ্যাসের স্বরূপ নিরূপিত হয় নাই। অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব জড় ও চেতন দেহ ও আত্মার, শুক্তি ও রজতের ন্যায় পরস্পরের তাদাত্ম্যমূলক অধ্যাস নিরূপণ করিতে পারা যায় না। অতএব শ্রুতিবাক্য ও অহংপ্রত্যয়, এই দুইটী অভ্রান্ত বস্তু দ্বারা নিরূপিত বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহের অভাব বশত বিচার করিবার বিষয়েরও অভাব হইল। এরূপ বিচারের কোন প্রয়োজনও দেখি না, কারণ উক্ত প্রকারে ব্রহ্মাত্মা নিরূপিত হইলেও মুক্তি সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। অতএব ব্রহ্ম বিচারের অযোগ্য এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা উচিত নহে। ইহাই হইল পূর্ব্বপক্ষের কথা।

তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত। কেন? কারণ, বিচারের বিষয় ও প্রয়োজন উভয়ই আছে। শ্রুতিবাক্য এবং অহংপ্রত্যয়, এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ থাকিবার কারণেই ব্রহ্মাত্মবস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ আছে স্বীকার করিতে হয়। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্য সঙ্গবিহীন ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। আর, "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি অহংবুদ্ধি দেহের উপরেই তাদাত্ম্য অধ্যস্ত করিয়া আত্মাকে গ্রহণ করিতেছে। অধ্যাসের দুর্নিরূপণত্ব আমার সপক্ষেই যায়। সুতরাং সন্দেহোদ্দিষ্ট বস্তু হইল বিষয়। সেই বস্তুর স্বরূপ অবগতি দ্বারা মুক্তিরূপ প্রয়োজন যে সিদ্ধ হয় তাহা শ্রুতিবাক্যেও দৃষ্ট হয় এবং বিদ্বানগণ স্বীয় অনুভূতির দ্বারা তাহা উপলব্ধি করেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অতএব বেদান্তবাক্য সমূহের বিচার অবলম্বনে ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য এবং সুতরাং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষের কথা।

তাৎপর্য্য। উপোদ্ঘাতের পর এখন অবধি এক একটী করিয়া অধিকরণমালা ব্যাখ্যাত হইবে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্রের সুপ্রসিদ্ধ প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবলম্বনে প্রথম অধিকরণ সংরচিত হইয়াছে।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের পদ হিসাবে অর্থ হইতেছে "অনন্তর এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" "অনন্তর"—কিসের অনন্তর? যে ঘটনার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয সেই ঘটনার পর। সে ঘটনাটী কি? চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই হয় না, ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। এই চিত্তশুদ্ধির উপায় কি? উপায় হইতেছে সাধনচতুষ্টয়। এই সাধনচতুষ্টয় হইতেছে—(১) নিত্য ও অনিত্যবস্তু স্বরূপ জানা, (২) ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনারাহিত্য, (৩) যোগশাস্ত্রোক্ত শমদমাদিসাধনে [illegible]তিষ্ঠা এবং (৪) মুক্তিলাভের ইচ্ছা। এই কারণে শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ "অথ" শব্দের অর্থে "সাধন-চতুষ্টয়ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সূত্রের দ্বিতীয় পদ হইতেছে "অতঃ" অর্থাৎ "এই হেতু"। এই হেতুটী কি? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়

কেন? অনিত্য বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জানিলে এবং নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিত্য সুখের উৎস বলিয়া জানিতে পারিলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। তাই ভাষ্যকারগণ শ্রুতি অবলম্বনে বলেন যে "অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ অনিত্য অর্থাৎ নিত্যসুখ প্রদান করিতে পারে না এবং একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য" বলিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অথবা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর—তিনিই ব্রহ্ম"।

অধিকরণ-নির্দ্দেশক শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য তাহার টীকাতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। টীকার তাৎপর্য্য নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সংগতি ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেক অধিকরণের চারিটি করিয়া অবয়ব থাকে—বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত। সমস্ত শ্রুতিবাক্যই যে ব্রহ্মনির্দ্দেশক এই কথা বুঝানোই হইল সমুদয় বেদান্তগ্রন্থের উদ্দেশ্য। তাই সমুদয় বেদান্তগ্রন্থের বিষয় হইল ব্রহ্ম। কিন্তু এই ন্যায়মালা-রচয়িতা কয়েকটী যথাযুক্ত শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে সুবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্তগ্রন্থের সূত্রগুলিকে কতকগুলি অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। যে যে শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে যে যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, সেই সেই শ্রুতিবাক্য সেই সেই অধিকরণের বিষয়। বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয় হইতেছে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটী বাক্য—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।

উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য হইল বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয় এবং বেদান্তগ্রন্থের প্রথম সূত্র হইল তাহার অবলম্বন। বিষয় এবং অবলম্বন, এই উভয়ের মধ্যে একটী সংগতি বা সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং আছেও। এই সম্বন্ধটী কি? উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা কিপ্রকারে আসে। শ্রুতিবাক্যের মুখ্য বক্তব্য হইল আত্মদর্শন এবং সেই আত্মদর্শন করিবার উপায় হইল শ্রবণ। শ্রবণ অর্থে শোনা। কোন বিষয় শুনিতে গেলেই তদ্বিষয়ে বিচার বা আলোচনাও অপরিহার্য্য। এখন, আত্মদর্শনের উপায়স্বরূপে যে শ্রবণের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রবণ শব্দেরও অর্থে আসিতেছে আত্মার বিষয়ে শোনা এবং তদ্বিষয়ে বিচার। এই বিচার কোন্ মুখী হইবে। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই আত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপ শ্রুতিবাক্যসমূহ অবলম্বনে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এই বিচার ব্রহ্ম-মুখী হইতে হইবে, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যসমূহ শুনিয়া আমার বুঝিতে হইবে যে সেই সকলের তাৎপর্য্য ব্রহ্মপর। বৈয়াসিক ন্যায়মালাকার সেই অর্থ পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে "বেদান্তবাক্যসমূহের অর্থ একমাত্র ব্রহ্মেতেই পরিসমাপ্তি হয়, ইহাই বুঝাইবার পক্ষে অনুকূল যে যথাযুক্ত বিচার, তাহারই নাম শ্রবণ।" শ্রুতিবাক্যে "দ্রষ্টব্য" "শ্রোতব্য" প্রভৃতি তব্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। তব্য প্রত্যয়ের তাৎপর্য্যই হইল বিধি। কাজেই "দ্রষ্টব্য" "শ্রোতব্য" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মের দর্শনের সঙ্গে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ ও বিচার করা বিহিত, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইতেছে। এবং এই বিচার করা উচিত এইরূপ বিধি উক্ত শ্রুতিবাক্যে সূচিত হইয়াছে বলিয়াই উহা বর্ত্তমান ব্রহ্মবিচারার্থক অধিকরণের বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এখন, গ্রন্থকার যে দুইটী শ্লোকে বর্ত্তমান অধিকরণ রচনা করিয়াছেন, সেই দুইটী শ্লোকে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্য-রূপ বিষয়টী স্পষ্টরূপে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। তাই, পাছে কেহ বলেন যে শ্লোকে যখন বিষয়েরই উল্লেখ নাই, তখন উহা দ্বারা বিষয়প্রমুখ পঞ্চাবয়বসমন্বিত অধিকরণ সংরচিত হইতে পারে না, গ্রন্থকার ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে বিষয়টী স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও শ্লোকদ্বয়ের ভিতর অন্তর্নিহিত ভাবে রহিয়াছে। শ্লোকদ্বয়ে যখন সন্দেহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সেই সন্দেহসূত্রেই উক্ত বিষয়ের স্বতই প্রতীতি হইবে। এইখানে অধিকরণের একটী অঙ্গ বিষয়ের অস্তিত্ব স্থাপিত হইল। অধিকরণের বিষয়ের সহিত বেদান্তসূত্রের

সংগতির অস্তিত্ব ইতিপূর্ব্বেই প্রকারান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এইবারে অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব আলোচিত হইবে।

অধিকরণ-শ্লোকে "সন্দেহ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সন্দেহটী কি? না ব্রহ্ম বিচার্য্য বা বিচার্য্য নহে? মূলসূত্রে আছে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। শ্রুতিবাক্যে আছে "ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।" এই সকল বাক্য অবলম্বনে এক পক্ষ (পরে যাহাকে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলা হইয়াছে) যুক্তি দেখাইয়া বলিবেন যে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। প্রতিকূল পক্ষ যদি যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে ব্রহ্মবিচার নিষ্প্রয়োজন, তখনই সন্দেহের উৎপত্তি হইল। দুইটী পক্ষের যুক্তি না পাইলে সন্দেহ উঠিতেই পারে না। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে পূর্ব্ব ও উত্তর (প্রতিকূল ও অনুকূল) এই উভয় পক্ষের যুক্তিই হইল সন্দেহের মূল। যখন শ্লোকদ্বয়ে সংক্ষেপে পূর্ব্ব ও উত্তর পক্ষের যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন কাজেই সেই যুক্তিমূলক সন্দেহও উক্ত শ্লোকে রহিয়া গিয়াছে। আর, বিষয় না থাকিলে সপক্ষ ও বিপক্ষ কোন পক্ষেরই কোন যুক্তি বিনা অবলম্বনে দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই উভয় পক্ষের যুক্তির উল্লেখ থাকাতেই যেমন সন্দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই সঙ্গে বিষয়েরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অধিকরণের তিনটী অবয়ব প্রদর্শিত হইল। এইবারে পূর্ব্বপক্ষের বা প্রতিকূল পক্ষের যুক্তি প্রথমে বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে ব্রহ্মবিচার নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার মূল যুক্তি হইতেছে যে ব্রহ্মবিষয়ে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না। সন্দেহের বস্তুই না বিচারের বিষয় হয়? সন্দেহের অভাবে যখন বিষয়েরও অভাব হইল, তখন বৃথা বিচার করা একান্তই নিষ্ফল। সন্দেহ নাই কেন? পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে দুইভাবে বিচারের ফলে সন্দেহ আসিতে পারে—(১) ব্রহ্মের স্বস্বরূপ অবলম্বনে বিচার এবং (২) আত্মস্বরূপ অবলম্বনে বিচার। পূর্ব্বপক্ষের মতে কোন বিচারেরই ফলে সন্দেহ আসিতে পারে না। প্রথমত, ব্রহ্মের স্বস্বরূপ অবলম্বনে বিচারের ফলে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। কারণ, শ্রুতিই তো "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের আকার বা স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মের এই স্বরূপ পূর্ব্ব এবং উত্তর উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়া লইতেছেন, কাজেই উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়ে সন্দেহও রহিল না এবং কাজেই সে বিষয়ে আর বিচারও চলিতে পারিল না। শ্রুতি উভয় পক্ষেরই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত।

পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় কথা এই যে, আত্মস্বরূপ অবলম্বনে বিচার করিলেও কোন সন্দেহ আসিতে পারে না; কারণ আমি আমার আত্মাকে খুব ভাল করিয়াই জানিতেছি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মাকে বিশেষভাবেই জানিতেছে। এই অহংপ্রত্যয়ের দ্বারা যে আত্মাকে আমরা উভয়পক্ষই ভালরূপে জানি তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহও থাকিতে পারে না। সন্দেহের অভাবে বিচারবিষয়েরও অভাব এবং কাজেই সে বিষয়ে বিচারও চলে না।

এই দ্বিতীয় যুক্তিসূত্রেই পূর্ব্বপক্ষ বিপক্ষের হইয়া আর একটী তর্ক উঠাইয়া নিজেই তাহার উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিপক্ষ পক্ষ বলিতে পারেন যে আমি যে অহংপ্রত্যয়কে সত্য জ্ঞান বলিয়া মনে করিতেছি, সে জ্ঞান প্রকৃত সত্যজ্ঞান নহে, তাহা অধ্যস্ত বা আরোপিত আত্মজ্ঞান। অধ্যস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেছে অধি+অস্+ত এবং সেই ব্যুৎপত্তিমূলক অর্থ হইতেছে অধিক্ষিপ্ত অর্থাৎ একটীর উপর আর একটী নিক্ষিপ্ত বা আরোপিত। এখন কথা হইতেছে যে কিসে কি আরোপিত? উত্তর হইতেছে—দেহে বা অন্তঃকরণে বা অনাত্ম অন্য কোন বস্তুতে আত্মজ্ঞান আরোপিত, অর্থাৎ আত্মার অতিরিক্ত দেহাদি বস্তুকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান। ইহা হইতে অধ্যাসের অর্থ দাঁড়াইয়াছে মিথ্যা বা ভ্রান্তজ্ঞান। বিপক্ষ পক্ষ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষের অহংপ্রত্যয়-নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞান অধ্যস্ত বা ভ্রান্ত জ্ঞান, অর্থাৎ অনাত্ম বস্তুকে তাঁহার আত্মা বলিয়া ভ্রম হইতেছে; সাধারণতঃ যখন মানুষ বলে যে আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি, তখন সে প্রকৃত কর্ত্তা "আমি" বা আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার অবসরই পায় না,

দেহাদিকেই কর্ত্তা মনে করিয়া বলিয়া থাকে যে আমি করিতেছি ইত্যাদি এবং সেই কারণে সাধারণত মনুষ্যের অহংপ্রত্যয় হইতে আত্মাবিষয়ক ভ্রান্ত জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে "আমি এপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান স্বীকার করিতেই পারি না, কারণ তুমি এখন ঠিকই করিতে পার নাই যে কোন্ বস্তুতে কোন্ বস্তুর জ্ঞান অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছ। তুমি বলিতেছ যে শুক্তিতে যেরূপ রজত-ভ্রম হয়, অনাত্মবস্তুতে সেইরূপ আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়? কখনই নহে—শুক্তিতে রজত ভ্রম হওয়া সম্ভব, কারণ উভয়েরই মধ্যে চাকচিক্যবিষয়ক একটা সাদৃশ্য আছে; কিন্তু অনাত্মবস্তুতে আত্মা বলিয়া সেরূপ কোন ভ্রম হওয়া সম্ভবই নহে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; অনাত্ম-বস্তুর ধর্ম্ম হইল তম বা অন্ধকার, আত্মার ধর্ম্ম হইল প্রকাশ; একটী হইল জড়, অপরটী হইল অজড় বা চেতন। এরূপ বিরুদ্ধস্বভাব দুইটী বস্তুর একটীতে অপরটীর জ্ঞান আরোপ করা, একটীকে অপরটী বলিয়া ভ্রম করা একেবারেই অসম্ভব। যখন এরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব, তখন আমাদের অহংপ্রত্যয় আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করিতেছে, সে জ্ঞান নিশ্চয়ই সত্যজ্ঞান। কাজেই বলিতে হয় যে সেই অহংপ্রত্যয় যে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই আত্মাকে আমরা সকলেই বিশেষ-রূপে জানিতেছি, এবং শ্রুতিবাক্য অনুসারে যদি সেই আত্মাই ব্রহ্ম হয়েন, তবে আত্মাকারেও আমরা ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপেই জানিতেছি—তদ্বিষয়ে আমাদের কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মাকারে অথবা অহংপ্রত্যয় অবলম্বনে আত্মাকারে, কোন আকারেই যখন ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না, তখন বিচারের বিষয়ও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইল বলিতে হয়। পূর্ব্বপক্ষ আরও বলেন যে ব্রহ্মবিষয়ক এই বিচার করিয়া কোন লাভও নাই, কারণ বিচারের ফলে এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত করিলেও তাহার ফলে মুক্তিলাভ হইয়াছে এমন তো কোথাও দেখা যায় না। পূর্ব্বপক্ষ উপ-রোক্ত যুক্তিসমূহ দেখাইয়া এই মীমাংসা করিতে চাহেন যে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রের সূত্রপাত করা কর্ত্তব্য নহে।

এইবারে উত্তরপক্ষ পূর্ব্বপক্ষের প্রদর্শিত যুক্তি-সমূহ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রও আরম্ভ করা যে উচিত তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষের প্রথম কথা এই যে ব্রহ্মবস্তুতে সন্দেহের অভাবে বিচার-বিষয়েরও অভাব। উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্মবস্তুতে সন্দেহের অভাব নাই—একদিকে শ্রুতি সত্যংজ্ঞানমনন্তং বলিয়া যে অসঙ্গ বা সম্বন্ধরহিত ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অসঙ্গ ব্রহ্মকেই আবার শ্রুতি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই বাক্যের দ্বারা আত্মারূপে নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন; অপরদিকে তুমি (পূর্ব্বপক্ষ) আমিই মনুষ্য এইরূপ অহংবুদ্ধি অবলম্বনে দেহেতেই আত্মার অধ্যাস করিতেছ, অর্থাৎ দেহকেই ভ্রান্তজ্ঞানে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। তুমি স্বীকার কর বা না-ই কর, আমার মতে তোমার এই ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে। এইখানেই শ্রুতিবাক্য এবং অহংপ্রত্যয়, এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবার কারণেই ব্রহ্মই আত্মা কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাজেই সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিচারের বিষয়ও আপনা হইতেই আসিতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ ব্রহ্মের আত্মাকারে আলোচনাতেও সন্দেহের অভাবপক্ষে যুক্তি দেখাইবার কালে বলিয়াছেন যে তিনি অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞানের অধ্যাস সম্ভব মনেই করেন না। তদুত্তরে উত্তরপক্ষ বলেন যে পূর্ব্বপক্ষের যে ঠিকই অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান হইতেছে, অধ্যাস সম্ভব মনে না করাই তাহার প্রমাণ। ভ্রমকে যদি ভ্রম বলিয়াই জ্ঞান হইল, তবে তো সেই ভ্রম দূর হইয়া সত্যজ্ঞান উপস্থিত হইল। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া মনে করিব ততক্ষণই তাহা অধ্যাস বা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু যেই সেই ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম, তখনই তো যাহা সত্য তাহাই অর্থাৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই উপলব্ধি করিলাম। এই যুক্তিতে উত্তরপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের স্বীয় ভ্রম বুঝিতে না পারাই তাঁহার ভ্রমের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। কাজেই, উত্তর-পক্ষের মতে সন্দেহ যখন রহিয়াছে, তখন বিচারের বিষয়ও রহিল।

তারপর, পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছেন ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিয়াও কোন লাভ নাই, কারণ ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিতে পারিলেও যে মুক্তিলাভ হয় এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না। তদুত্তরে উত্তর-পক্ষ বলেন যে, যখন শ্রুতিতে দেখা যায় যে ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিলে মুক্তি হয় বলিয়া উল্লেখ আছে এবং আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষেরা উক্ত প্রকার জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যখন প্রসিদ্ধি আছে, তখন পূর্ব্বপক্ষের একথা মানিতে পারা যায় না,—স্বীকার করিতে হয় যে ব্রহ্মকে আত্মা-রূপে মানিলে মুক্তিলাভ হয়।

উত্তরপক্ষ এইরূপে পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিসকল খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে বেদান্তবাক্য বা উপনিষদ্‌বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করা এবং বেদান্তশাস্ত্র আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বালী-গঞ্জ নিবাসী আমাদের পরম বন্ধু রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি-ধারী শ্রীযুক্ত বাবু অমলকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, গত ৪ঠা শ্রাবণ "নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী" সভা হইতে "বিদ্যা-ভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

বিবাহ। বিগত ২৯শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীউমা-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নীহারিকা দেবীর বিবাহ আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহক্ষেত্রে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

উপনয়ন। শ্রীমান প্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরী ও শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপনয়ন আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিগত ২৫শে ভাদ্র সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শোক-সংবাদ।

৺কান্তিচন্দ্র মিত্র। বিগত ৪ঠা ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রায় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নববিধান মণ্ডলী যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি বিনয়ে ঔদার্য্যে চরিত্রের মাধুর্য্যে নিষ্ঠায় এবং সেবাধর্ম্মে জনসাধারণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার চির শান্তিময় ক্রোড়ে তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে স্থান দিন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ ব্রতীন্দ্র নাথ পরিবারবর্গকে শোকে ভাসাইয়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ২৫শে ভাদ্র বেলা ৯টা ৪০ মিনিটে টাইফয়েড রোগে অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ব্রতীন্দ্রনাথ সবেমাত্র ১২ বৎসরে পদার্পণ করিলেও অত্যন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিল। রোগে ৪০ দিন ভুগিয়াছিল, কিন্তু একটী দিনও স্ব-ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে ভুলে নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও কম্পিত হস্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া গিয়াছে। এরূপ ব্রহ্মপরায়ণ বালক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই উপলক্ষে তাঁহার শোকার্ত্ত পিতা যে একটী গান রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৺ব্রতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে।

(রামপ্রসাদী সুরে)

(ওমা) এমন ছেলে তুই কেন আমায় দিলি।
(তার) মনটা ছিল সোনায় গড়া,তোর পরেতে প্রাণটা পড়া
(সে) তোরি নামেতে ছিল ডুবে কেন তারে হরে নিলি।
কে তো'য় বলেছিল দিতে, (তার)ভোগ না হতে হরে নিতে
(এমন) রাক্ষস বিধান তোর যদি হয়,
ভেবেই পাইনে কি যে বলি।
ফুটতে সে না ফুটতে ফুল, চললি নিয়ে ভবের ওকুল,
(তার) সুগন্ধেতে আকুল চিতে রইনু পড়ে মুগ্ধ অলি।
(কবে) তুলি দিলি তুই চোখের পরে,
তুলো দিলি তুই দুকান ভরে,
(তোরে) দয়াময়ী জানতুম আগে করালী মা কবে হলি।
কষ্ট তার দেখে শুনে মানুষের প্রাণ যেত ভেঙ্গে
লাগত না কি তোর মনে তা' কবে এত নিঠুর হলি।
(আহা) কত কষ্ট সে পেয়েছিল হাড় কখানা রেখে গেল
(তার) আত্মাপাখী বিমান রথে আরাম করে গেল চড়ি।
দিয়ে নিতে নাইক যদি, মানুষের বেলায় হয় এ বিধি,
(তবে তুই) কোন্ বিধানে দিয়ে নিলি
বুঝতে আমায় নাহি দিলি।
(তারে) যতদিন ফিরে পাব নাকো,
(তোর) শিষ্ট ছেলে হব নাকো,
(দেখবি) আমিও মরব ঘুরে ফিরে,
(তুই) আমার পাছে মরবি ফিরি॥

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
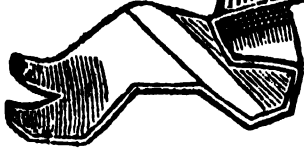
"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

মা।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(রামপ্রসাদী সুরে)

(ওমা) মা বলে তুই ডাকতে দে মা॥
মায়ের মত তুই মা আমার,
বুঝবে কে তুই কি-মা আমার,
(ওমা) মা মা বলে প্রাণের ভিতর
রাখব ধরে তোরে ওমা।
কতদিন তোরে ছেড়ে ছিনু,
কাঁটার ঘায়ে ফিরে এনু,
(ওমা) হারা ছেলে পেয়ে ফিরে
কোলে করে তুলে নে মা।
(আর) যাব নাকো তোরে ছেড়ে,
চরণ র'ব বুকে ধরে,
(এবার তোর) দুষ্টু ছেলে ভাগতে গেলে
কানটী মলে ফেরাস ওমা।
অপরাধ করেছি ঢের,
ক্ষমা তো মা চেয়েছি ফের,
(তবে) কেমন করে না নিয়ে কোলে
চুপ করে বসে ওমা।
(তোর) দুষ্টু ছেলে শিষ্ট হোল,
বুকের পরে ঝাঁপিয়ে এল,
(এবার) জড়িয়ে বুকে না নিলে তাকে
মাথা কুটে মরবে সে মা॥

মাতাকে স্মরণ কর।

আজ এই পবিত্র সময়ে এসো আমরা সমাহিত হইয়া আমাদের করুণাময়ী মাতার নাম স্মরণ করি। বর্ষার মেঘান্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, শরতের প্রসন্ন গগন আমাদের মাতার প্রসন্ন মূর্ত্তি দিনে নিশীথে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছে। এসো আমরা প্রাণ খুলিয়া তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিতে থাকি। আমাদের পূর্ব্বে ভারতের কত শত সাধক জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন এবং হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সেই ইষ্টদেবতার নাম জীবন্ত মন্ত্রে জনসাধারণকে শুনাইয়া এই ভারতভূমিকে পুণ্যময় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইয়া আমরাও কি প্রাণ খুলিয়া আমাদের মাতা জগতের মাতাকে ডাকিতে পারিব না? তাহাই যদি না পারি, তবে সুখের কথা বলিয়াই বা লাভ কি, আর দুঃখের কথা আলোচনা করিয়াই বা লাভ কি? সেই করুণাময়ী মাতাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে সত্যই অনুভব করিব যে সুখ যাহা কিছু তাহাও যেমন মাতার দান, তেমনি দুঃখ কষ্ট যাহা পাই, তাহাও আমাদের মঙ্গলের জন্য ঔষধস্বরূপে তিনিই প্রেরণ করেন। মাতাকে হৃদয়ে অনুভব করিলে সত্যই যে এই জ্ঞান উপস্থিত হয় তাহা আজ অল্প কয়েক দিন হইল আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি দ্বাদশবর্ষীয় একটী

বালকের রোগশয্যার এবং অন্তিমশয্যায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চিকিৎসকের পরামর্শে যখনি সে কোন একটী ভাল জিনিস খাইতে পাইত, তখনই সে প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিত "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ" এবং ঈশ্বরের প্রতি এইরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার পর সেই আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিত। আবার যখন রোগযন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইত, তখন তেমনই বলের সহিত বলিত যে এই রোগ, এই যন্ত্রণা, এ সকলই ঈশ্বর মঙ্গলের জন্যই দিয়াছেন। সেই বালক হইতে আমি প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে দেহ হইতে আত্মা কিরূপ সম্পূর্ণ পৃথক এবং শত সুখের মধ্যে সহস্র বিপদের মধ্যেও সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতাকে ভুলিতে নাই।

বিপদ আপদের মধ্যে, দুঃখ কষ্টের মধ্যে, তাঁহাকে ভুলিবার অবসরই কোথায়? আমাদের মতে, সংসারের দৃষ্টিতে বিপদের শেষ সীমা মৃত্যু। কিন্তু একবার নিজ নিজ অন্তরে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা কর—দেখিবে যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে মৃত্যু বলিয়া সত্যই কিছুই নাই। এখানেও যেমন তাঁর রাজ্য, পরলোকও কি তেমনই তাঁর রাজ্য নহে? অনন্ত গ্রহ তারা অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র, অনন্ত লোক লোকান্তর সকলই তো তাঁরই নিয়মে চলিতেছে। তুমি বলিতেছ যে তোমার আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু মৃত্যু কোথায়? তোমার সেই আত্মীয়স্বজন তো মঙ্গলময়েরই রাজ্যে বাস করিতেছে? তিনি তো তাহার ইহলোকের অনুপযুক্ত দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া যথোপযুক্ত অন্য লোকে লইয়া গিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর—দেখিবে সহস্র রোগশোক সহস্র মৃত্যু তোমাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না।

যেমন বিপদ আপদেও মাতার করুণাহস্ত দেখিবার চেষ্টা করিবে, সেইরূপ সুখ সম্পদেরও মধ্যে তাঁহাকে ভুলিবে না। তিনিই যখন সকলই নিয়মিত করিতেছেন, তখন তোমার যাহা কিছু সুখসম্পদ তাহাও তো তাঁহারই মঙ্গলনিয়মে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। তখন ইহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে যে সুখসম্পদ সকলই তাঁহারই দান? সেই দানের জন্য আমাদের কিসের গর্ব্ব? আমার এত টাকা বেশী আয় হইল, এত সম্মান লাভ হইল, এ সমস্তই তো তাঁহারই কৃপায়; ইহাতে আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। এরূপ সুখসম্পদ লাভকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর জানিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে।

এক মুহূর্ত্তও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। প্রভাতের প্রাতঃসমীরণের সঙ্গে যখন তাঁহার মঙ্গল নিশ্বাস তোমাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে, তখনও সেই বিশ্বপিতাকে যেমন ভক্তিভরে প্রণাম করিবে, আবার সন্ধ্যা যখন নীরব পদক্ষেপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় শান্তভাবের প্রভাব তোমার উপর বিস্তৃত করিয়া শান্তিময় রাজ্যে তোমার চিত্তকে উপনীত করিবে, তখনও তেমনি তুমি সেই অখিলমাতা পরমেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবে। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিশ্বাসকে তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র করিয়া তুলিবে। তোমার শোক দুঃখ সমুদয় তো চলিয়া যাইবেই; তাহার উপর পরলোকের অনন্তরাজ্য, পরলোকের গভীর তত্ত্বসমূহ তোমার নয়নের সম্মুখে এই বিস্তৃত আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

এসো আমরা সকলে সমাহিত হইয়া আমাদের অন্নদাতা, সুখদাতা, মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি এবং আমাদের তপ্ত হৃদয়কে শীতল করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রকাশ।

ঋগ্বেদ অনুবাদের ফলে ব্রাহ্মগণ দেখিলেন যে সাধারণত হিন্দুসমাজ সমগ্র বেদকে যেভাবে আপনাদের অপৌরুষেয় ধর্ম্মভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করেন, সেভাবে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। বেদে ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রাকৃতিক শক্তিরও উপাসনার বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। উপনিষৎ আলোচনা করিয়াও দেখা গেল যে তাহাও সমগ্রভাবে ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিতে অক্ষম। উপনিষদ্ সমূহের অনেকগুলিই অদ্বৈতবাদ পূর্ণ, অথচ দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মমণ্ডলী অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধমূলক পূর্ণ দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ

বলেন—"ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না। আমাদের ধর্ম্ম পোষণের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, বেদান্তদর্শনকে ছাড়িয়া কেবল একাদশ উপনিষৎকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা পাইব, এই জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম "সোঽহমস্মি," তিনিই আমি, "তত্ত্বমসি" তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম।" যখন ব্রাহ্মগণ সমগ্র বেদ উপনিষদকেই ধর্ম্মভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন যে তাঁহারা তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রকেও সমগ্রভাবে ধর্ম্মভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য।

এইরূপে একসময়ে ব্রাহ্মেরা বলিতে গেলে সর্ব্বশাস্ত্রত্যাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়েই হিন্দুসমাজের প্রকৃত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লবের সময় প্রত্যেকেই আপনাপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্ত হয় ও ভালবাসে। ব্রাহ্মগণও এই সময়ে সকল শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে চাহিয়াছিলেন। এবিষয়ে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" শাস্ত্রের এই বাক্যটী তাঁহাদের বড়ই সহায় হইয়াছিল। তাঁহারা আত্মপ্রত্যয় অর্থে নিজের মনগড়া ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ হৃদয়ের প্রতীতিমূলক আত্মপ্রত্যয়কে বুঝিয়া তাহাকে ধর্ম্মভিত্তি ও জীবনের নিয়ামক করিলাম, একথা বলা যত সহজ, তাহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। আর, তাহার উপর, একটী তত্ত্বমাত্র, তাহা যতই সত্য হউক না, অবলম্বনে সাধারণ মানবের পক্ষে নিজ নিজ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাহারা সেই তত্ত্বের এমন একটী প্রত্যক্ষ আকার দেখিতে চায়, যাহা অবলম্বনে নিশ্চিন্তমনে সংসারযাত্রা সুনির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। ফরাসি বিপ্লবেই আমরা এই সত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই বিপ্লবের সময়ে সকলেই নিজ নিজ মনগড়া ভাবকেই সত্য বলিয়া মনে করিত। প্রত্যেকেই ভাবিত যে তাহার অভিপ্রায়-মত দেশ শাসিত হইলেই দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। কিন্তু ফলে ফ্রান্সে আর কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। অবশেষে মহাপুরুষ নেপোলিয়ন ন্যায়, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ আকার দিয়া ফরাসিজাতিকে একটী আইন সংগ্রহ (Code Napoleon) প্রদান করিলেন ; সেই অবধি বলিতে গেলে ফ্রান্সে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সময় আসিল। ব্রাহ্মসমাজেও যখন ব্রাহ্মসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, অথচ ব্রাহ্মসমাজ হইতে পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি চলিয়া গিয়াছিল, তখন আত্মপ্রত্যয়রূপ গভীর তত্ত্বের নামমাত্র তাঁহাদের প্রাণের অভাব কতদিন পূর্ণ করিতে পারে? এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ আকারে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল ; আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষভাবে জীবনের নিয়ামক ও ধর্ম্মভিত্তি করিবার উপায় সম্বন্ধে একটী তীব্র অভাব অনুভূত হইতেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মদিগের আত্মপ্রত্যয়তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ আকার দিয়া ব্রাহ্মদিগের সেই তীব্র অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা তিনি এই অভাব দূর করিতে পারিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সর্ব্বপ্রথম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক উদারমন্ত্র একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর তাহার ছিদ্র অন্বেষণ করা বা সমালোচনা করা সহজ, এবং তাহার পরে তদনুকরণে আরও ভাল করিয়া নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করাও সহজ, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষক স্বরূপে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কল্পনা নিজ মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রথম আনয়ন করা এবং সেই কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা যে এক অসাধারণ প্রতিভাবান ও ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষের কার্য্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "Precepts of Jesus" গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষকরূপে রচিত হয় নাই, এবং তাহা অনেকটা একপেশে হইয়াছিল বলিতে পারি—জীবনের সমগ্রটা তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে

পারে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, একদিকে প্রত্যক্ষভাবেই আত্মপ্রত্যয়ের পরিপোষকরূপে, অপরদিকে যাহাতে সমগ্র জীবন ইহা অবলম্বনে সুপরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংগ্রথিত হইয়াছিল। এই কারণে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, বর্ত্তমান যুগে সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র জগতের পক্ষে এক অভাবনীয় ঘটনা। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যে আত্মপ্রত্যয়-পোষক এবং সমগ্র জীবনের নিয়ামক মন্ত্রতন্ত্র সংকলিত হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকেই তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

আত্মপ্রত্যয়পোষক অসাম্প্রদায়িক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা বিষয়ে সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় আর কোন ভারতবাসীর ক্ষমতা বা অধিকার বেশী ছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক এবং সর্ব্বশেষে স্বদেশবাসীর সহিত, স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ধারার সহিত যে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে সে সকলই যথাযুক্ত পরিমাণে ছিল বলিয়াই ভগবান ঐরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকেই নিজের যন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যক্ষ আকার দিবার একটী কাঠামো দাঁড় করাইয়াছিলেন, এখন সেই কাঠামোর উপর তদনুকূল মন্ত্রসাহায্যে একটী সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইল না। তিনি অক্ষয়কুমার দত্তকে কাগজ কলম লইয়া বসিতে বলিলেন এবং সেই আত্মপ্রত্যয়মূলক ব্রাহ্মধর্ম্মবীজকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদগত উপনিষৎসমূহ হইতে আত্মপ্রত্যয়সমর্থক যে সকল মন্ত্র মনে সহজে উদিত হইতে লাগিল তাহাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়বাবু সেইগুলি লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত হইল। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের মন্ত্রভাগ বা উপনিষৎখণ্ড। সর্ব্বপ্রথম এই উপনিষৎখণ্ডই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখণ্ড সংকলন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এখন (ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ বাক্সের মধ্যে রাখিবার পর) আমি ভাবিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্ম্মগ্রন্থ চাই। তখনই আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি লিখিতে থাক। এখন আমি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি সতেজে বলিলাম "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" ব্রহ্মবাদীরা বলেন। ব্রহ্মবাদীরা কি বলেন? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে এই শক্তি বিশিষ্ট বস্তুসকলের সহিত প্রাণীজঙ্গম জীবজন্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। তাহার পর আমার হৃদয়ে এই সত্য আবির্ভূত হইল যে ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ। আমি অমনি বলিলাম "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিলাম যে পূর্ব্বে কেবল এক অজ আত্মা পরব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। অমনি বলিলাম "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।" এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! কেবল অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনিই এই জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। আমি দেখিলাম যে তিনি দেশ, কাল, কার্য্যকারণ, পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল সকলি আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "স তপোঽ-

তপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ।" তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আমি দেখিলাম তাঁহারি অনুশাসনে সকলি শাসিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পরপর বলিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম—"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতয়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বরের প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া গেল।" * * * "লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম।* প্রথম অধ্যায়ের নাম আনন্দ অধ্যায় হইল। এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ—ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের শেষে লেখা আছে—"উক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব তউপনিষদমক্রমেত্যুপনিষৎ।" তোমার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইল, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ।"

দেবেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত উক্তি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ যে কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। আমরা যেমন একটা একটা করিয়া বাছাই করিয়া কোন সংকলন-গ্রন্থ রচনা করি, দেবেন্দ্রনাথ সে প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয়-পোষক যে সকল সত্য মন্ত্রসকল সহজে সদ্য সদ্য উদিত হইতেছিল, তাহাই তিনি মুখে বলিয়া গিয়াছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে আত্মপ্রত্যয়-পোষক একখানি নাভি-গ্রন্থ (nucleus) বলিতে পারি, কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে অন্যান্য শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া, উপনিষৎ হইতেও আত্মপ্রত্যয়-পোষক সকল মন্ত্রই ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেভাবে মন্ত্র বাছাই করিয়া গ্রন্থ প্রস্তুত করিলে হয়তো তাহা একখানি সুন্দর কোষগ্রন্থ স্বরূপে গৃহীত হইত, কিন্তু তাহা জীবনের নিয়ামক ও নিত্যব্যবহার্য্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার প্রণালীর কারণেই তাহা মন্ত্রসম্বন্ধীয় কোষগ্রন্থহিসাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত এবিষয়ে অনেকবার আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে তিনি কখনও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে আত্মপ্রত্যয়পোষক একমাত্র অদ্বিতীয় এবং শেষগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতেন না—তিনিও ইহাকে একখানি আত্মপ্রত্যয়পোষক অন্যতর আদর্শ গ্রন্থ বলিয়াই মনে করিতেন। বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়া সাধারণত অপৌরুষেয় বলা হয়, মহর্ষিই বল, অথবা অন্য যে কোন ব্রাহ্ম বল, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে কাহারও কখনও সেভাবে অপৌরুষেয় দাঁড় করাইবার ইচ্ছা জাগ্রত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে ব্রাহ্মী উপনিষৎ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—উপনিষৎ হইতে সকল মন্ত্রই গৃহীত এবং সকল মন্ত্রগুলিই ব্রহ্মনির্দ্দেশক বলিয়াই উহাকে ব্রাহ্মী উপনিষৎ বলা হইয়াছে। ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপনিষৎ খণ্ড গ্রন্থে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া তাহার তাৎপর্য্য লেখা ও তাহার সংশোধন কার্য্য চলিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই একটা গুণ ছিল যে তাঁহার হস্ত দিয়া যে সকল

* ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইবার অনেক পরে দেবেন্দ্রনাথ মসুরি পর্ব্বত বিচরণ কালে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং" উপনিষদের এই মন্ত্রটী ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন।

লেখা যাইত বা তাঁহাকে যাহা কিছু শোনানো হইত, তাহা তিনি সংশোধনের পর সংশোধনের দ্বারা নিখুঁত না করিয়া ছাড়িতেন না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে এই গুণ ছিল, আমরা অনেকবার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যগুলি যে তাঁহার হস্তে কিপ্রকার আমূল সংশোধন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম তিনটী মন্ত্রের * মূল তাৎপর্য্য অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যখন দেখি যে তেরো বৎসর বাদে ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের তাৎপর্য্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই কতকটা বুঝিতে পারি যে কত সাবধানতার সহিত তাৎপর্য্যগুলি লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।

উপনিষৎখণ্ড গ্রন্থাবদ্ধ হইবার পর একদিকে তাৎপর্য্য লেখা চলিতে লাগিল, অপরদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড সংকলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়খণ্ড অনুশাসন খণ্ড। উপনিষৎ খণ্ডের ন্যায় এখণ্ড একদিনেই সংকলিত হয় নাই। ইহা সংকলিত হইতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। উপনিষৎ খণ্ড হইতে ব্রাহ্মগণ আত্মপ্রত্যয়মূলক ধর্ম্মতত্ত্ব সকল লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সেই সকল ধর্ম্মতত্ত্বের অনুযায়ী সুনীতির পথে নিজ নিজ পরিবারের সন্তানবর্গকে চালাইবার পথপ্রদর্শন করিতে পারে এরূপ একখানি নীতিগ্রন্থেরও অভাব অনুভূত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের এই অনুশাসনখণ্ড সেই অভাব পূর্ণ করিল।

এই দ্বিতীয়খণ্ড সংকলন সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ [illegible]ন—"ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনু[illegible] বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী [illegible] পারে না। সেই ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মনীতি কি? [illegible]হ্মদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই ধর্ম্মনীতি অনুসারে চরিত্রগঠন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই দুই অঙ্গ—একটী উপনিষৎ, দ্বিতীয়টী অনুশাসন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমখণ্ডের উপনিষৎ তো সমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুস্মৃতি আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে আমার বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছিলাম, পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহাকেও ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্মে ব্রহ্মের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়—"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥" গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কিপ্রকারে ব্যবহার করিবে তাহার উপদেশ—"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ। ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং। তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়াস্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না

(১) ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি; (২) যতো বা ইমানি ভূতানি [illegible] যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। [illegible]: (৩) আনন্দাদ্ধ্যেবখল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন [illegible] জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥" পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পতি এবং পত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম্মনীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্তোষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সত্যপালন ও সত্য ব্যবহার। সপ্তম অধ্যায়ে সাক্ষ্য। অষ্টম অধ্যায়ে সাধুভাব। নবম অধ্যায়ে দান। দশম অধ্যায়ে রিপুদমন। একাদশ অধ্যায়ে ধর্ম্মোপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে পরনিন্দা নিষেধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় সংযম। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পাপপরিহার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্য, মন এবং শরীরের সংযম। এবং ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম্মে মতি। ইহার শেষের দুই শ্লোকে আছে—"মৃতংশরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ। বিমুখাবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥" "তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ। ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥" বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করে, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহায্যার্থ ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। "এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনং এষ মুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যং।" এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।" এই দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্ত্তৃক লিখিত। অনুশাসন খণ্ডের সংকলনেও অযোধ্যানাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহীর, সৎকর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্মরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে সন্ন্যাসভাবকে বলিতে গেলে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। কাজে কাজেই সাধারণত নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে যাহা বুঝা যায় সে প্রকার কৈবল্যস্বরূপ নির্গুণ বা গুণরহিত পরব্রহ্মের কোনপ্রকার উপাসনাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নাই—সে প্রকার নির্গুণ ব্রহ্মের শাস্ত্রমতে কোন উপাসনা হইতে পারে কিনা সন্দেহ। সাধারণত সগুণ ব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝা যায় সেই সগুণ কিন্তু পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই পূজাবিধি অর্থাৎ কি ভাবে তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে তাহারই উপায় প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উপনিষদাদি শাস্ত্রমুখে উক্ত হইয়াছে। সচরাচর মানুষ যে ভাবেই হউক, কোন না কোনভাবে ভগবানকে ডাকিতে হইলেই তাঁহাকে আত্মা বা তাহার নিজস্বরূপ হইতে পৃথকভাবে না ডাকিয়া থাকিতে পারে না, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মে দ্বৈতবাদ অবলম্বিত হইয়াছে এবং পরব্রহ্মের সত্যস্বরূপ অবলম্বনে আমাদের এই আত্মা, এই জগত প্রভৃতি সকলই সত্য, এই তত্ত্বের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মকে দাঁড় করানো হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের মতে যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব তাহা তাঁহার উক্তিতে আর একটু বিশদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পরস্পরের সখা ও তাঁহারা সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া আছেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইহাতে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "ন বভূব কশ্চিৎ" তিনি আপনি কিছুই হন নাই। তিনি জড়জগতও হন নাই, বৃক্ষলতাও হন নাই, পশুপক্ষীও হন নাই, মনুষ্যও হন নাই। ইহাতে অবতারবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে "স তপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদংসর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণ সত্য হইতে এই বিশ্বসংসার নিঃসৃত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক সত্য, ইহার স্রষ্টা যিনি তিনি সত্যের সত্য, পূর্ণ সত্য। এই বিশ্বসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, ইহা মানসিক ভ্রমও নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। যে সত্য হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে, তিনি পূর্ণ সত্য আর ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহাতে মায়াবাদ নিরস্ত হইল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্ম-

গ্রন্থ ছিল না; তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল।"

অনেকের একটী ভ্রান্ত ধারণা আছে যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন। ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহার মতে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যসকল দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্য। সেই সকল সত্য যেমন বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্পাপ ঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ আমাদের চিত্তকে নির্ম্মল ও জ্ঞানোজ্জ্বল করিলে সেই সকল সত্য আমাদেরও হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান হইবে। দেশকালজাতি-নিরপেক্ষভাবে সকলেরই আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সত্যসকল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে উপনিষৎখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের যে তাৎপর্য্য তিনি সন্নিবেশিত করিয়াছেন সেই তাৎপর্য্য হইতেই এ বিষয়ে তাঁহার মনোগত ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সেই তাৎপর্য্যে লিখিত আছে "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গলরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এইরূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্ম-বিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।"

এই তাৎপর্য্যের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হও-য়াই উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কিন্তু তবুও যে অনেকের মন হইতে ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় না তাহার কারণ এই যে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষৎ হইতেই প্রথম খণ্ড সংকলিত করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্যের শেষে স্পষ্টাক্ষরে তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।" ইহার উপর, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উপদেশ ও নীতিসমূহও তিনি একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র হইতে সং-কলিত করাইয়াছেন। ইহা দ্বারা কখনই এরূপ প্রমাণিত হইতে পারে না যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুশাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়া-ছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বরঞ্চ ইহাই প্রতীতি হইবে যে ব্রাহ্মদিগকে আত্ম-প্রত্যয়পোষক একটী আদর্শ গ্রন্থ দিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সংকলিত করিয়াছিলেন। তবে, এই গ্রন্থটীকে হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র স্বাভাবিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু ইহা তাঁহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতারও পরিচয় দিয়াছে। যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ সংশয় নানা প্রকার অশান্তির কঠোর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখন তিনি যে উপনিষদের মন্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়াছিলেন, যে উপনিষদের শান্তিমন্ত্রে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় অশান্তি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিল, ব্রাহ্মমণ্ডলীরও সংশয় দূরীকরণ এবং শান্তি আনয়নের জন্য তাঁহার দৃষ্টি যে প্রথমেই সেই উপনিষদের প্রতি নিপতিত হইবে, তাহাই যে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে তাহা কি কিছু আশ্চর্য্য? বরঞ্চ এরূপ না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। যখন তিনি সেই উপনিষৎ অবলম্বনে নিজের এবং ব্রাহ্মমণ্ডলীর সকল সংশয়ের উত্তর পাইলেন, আত্মপ্রত্যয়ের সম্পূর্ণ সমর্থন প্রাপ্ত হইলেন, তখন নিকটের সেই উপনিষৎ ছাড়িয়া কেন তিনি দূরের বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকট ভিক্ষার্থী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইবেন? সেইরূপ পরিবার, সমাজ প্রভৃতিকে আত্মপ্রত্যয়ের অনুবর্ত্তী করিয়া সুপথে চালাইবার জন্য যে সকল নীতির প্রয়োজন, সেই সকল নীতি যখন তিনি দেশের স্বজাতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহেই প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই সকল নীতির

জন্য বিদেশের অপরাপর জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অন্বেষণ করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনই হয় নাই। এমন যদি হইত যে আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়পোষক বিশেষ কোন কিছু পাওয়া যায় না, তাহা হইলে বিদেশীয় শাস্ত্রের নিকটে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়ানো আবশ্যক হইত। ভগবৎগীতা যে সময়ে রচিত হয়, সে সময়ে কত দেশের কত শাস্ত্র ছিল, কিন্তু গীতার উপদেশ সমূহ আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রের উপর অবলম্বিত করিবার প্রয়োজনই হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, প্রাচীন ইতিহাস ও ধারার প্রতি যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল, প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাহাতে দেশের শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সংকলন করা তাঁহার পক্ষে কিরূপ স্বাভাবিক কার্য্য ছিল তাহা একজন বালকও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

এই ভাবে সংকলন তাঁহার স্বাভাবিক দূরদর্শিতারও ফল বটে। তিনি স্বাভাবিক দূরদর্শিতার ফলেই বুঝিয়াছিলেন যে দেশের শাস্ত্র অবলম্বন বিনা আত্মপ্রত্যয়পোষক তত্ত্বসকল সহস্র মুখে প্রচার করিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় একটী প্রাচীন দেশের অধিবাসীগণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা সহজ হইবে না। গীতোক্ত উপদেশসকল যদি বিদেশীয় কোন শাস্ত্র অবলম্বনে প্রদত্ত হইত, তবে সেগুলি সহস্র প্রকারে মিষ্ট হইলেও এখন যে ভাবে গৃহীত হইতেছে সেভাবে গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। তুমি গঙ্গাতীরে বাস কর—তোমার পক্ষে গঙ্গাজলে তৃষ্ণানিবারণ করা সহজ হইবে অথবা টেম্‌স্ নদীর জল আনয়ন করিয়া তৃষ্ণা দূর করা সহজ হইবে? নিকটে তোমার যদি জল না থাকে, তবে শতবার বলিব যে, যেখানে জল আছে এমন দেশে যাও। বাইবেলোক্ত অথবা কোরাণোক্ত পুণ্যাত্মাদিগের জীবন-চরিত অবলম্বনে হিন্দুদিগের নিকটে ধর্ম্মকথা বুঝানো সহজ হইবে অথবা ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি পুরাণোক্ত কথা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বুঝানো সহজ হইবে? এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। অবশ্য আমি যদি বাইবেল বা কোরাণপন্থীদিগের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করি তবে আমার নিজেকে আগে স্বধর্ম্মের কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বাইবেল বা কোরাণ হইতে তদনুকূল বিষয় সকল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইব এবং সেই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিব। কিন্তু স্বধর্ম্মের কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলে কৃতকার্য্য হইবার আশা বড়ই কম। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মমণ্ডলী হিন্দুসম্প্রদায় হইতেই বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই সেই ব্রাহ্মমণ্ডলীকে জাতীয় শাস্ত্র অবলম্বনে স্বধর্ম্মের কেন্দ্রে দাঁড় করাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বারম্বার বুঝাইতে হয় ইহাই আশ্চর্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—"ইহা (ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ) অত্যন্ত গভীর ও আশ্চর্য্য মনুষ্যের গভীরতম চিন্তার ফল। এরূপ মনুষ্য কেবল এদেশে কেন, কোন দেশেই সহজে দেখা যায় না। যে উপনিষৎ তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের আদিম কারণ এবং এখনও যে উপনিষদের চিরনবীন ও পূর্ণ উৎস হইতে তাঁহার মহান্ আত্মা সত্য, আত্মানুভূতি, আনন্দ ও পবিত্রতার সুধা পান করেন, এই গ্রন্থে সেই উপনিষদের সুনির্ব্বাচিত মন্ত্রসমূহের উপর তাঁহার গভীর আলোচনা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার শিক্ষাফলে ও অভিজ্ঞতাতে তিনি যে আলোক যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহারই পূর্ণ প্রতিবিম্ব এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন আধ্যাত্মিক ভক্তিতত্ত্বের উপর সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে বুদ্ধিচালনা এবং শাস্ত্রালোচনার একটী বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্মুখে উন্মুক্ত হয় এবং সেই কারণে ইহা চিন্তাশীল ও ভক্তিমান জিজ্ঞাসুদিগের নিকট অত্যন্ত আদরণীয়।"*

* It represents the deepest thoughts of a very deep and singular man, the like of

নীরবে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

নীরবে তোমায় স্বামী, কত ভাল বাসি আমি,
আমার চিরিয়া বুক দেখে যাও আসি।
তব সাথে দিবানিশি, চাহি যে রহিতে মিশি,
দাওনা তেমন ধরা—আঁখি জলে ভাসি॥
তোমায় আমায় মধু, কত কথা প্রাণবঁধু,
সবার অজানা চাহি নীরবে কহিতে।
তুমি কেন সরে যাও, পরাণ ভাঙ্গিয়া দাও,
আপনার প্রাণ চাহি আছাড়ি বধিতে॥
জগতে আনন্দ আলো, কিছুই না লাগে ভালো,
প্রাণের হুতাশ জাগে আগুনের মত।
মরিতেও সুখ তায়, তোমারে যদি গো পাই,
বারেক হৃদয় পুরে আপনার মত॥
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, শোন তুমি কান দিয়া,
বুঝিবে আমার প্রাণে কি গভীর ব্যথা।
থাকিতে নারিবে কভু, ওগো মোর প্রাণপ্রভু,
জানিলে বেদনা মম না কহিয়া কথা॥
দুপুর বেলায় যবে, আঁধার বনের মাঝে,
চলে যাই একা একা শ্রান্ত ক্লান্ত মনে।
সহসা জাগিয়া উঠে, হৃদয়কমল ফুটে,
কহিতে শতেক কথা তব মধু-সনে॥
এস মোর চিত্তধন, তুমি এক প্রিয়জন,
তোমারে ছাড়িয়া মম নাহি আর কেহ।
চাহিনা কিছুই আর, শুধু তুমি একবার,
ভালবেসে দাও মোরে ঢালি তব স্নেহ॥

---

whom is not easily met with in this or in any other country. It contains his mature reflections on the chosen passages of the Upanishads, the early source of his wonderful conversion, and still the fresh and full fountain from which his grand spirit drinks truth, inspiration, joy and sanctity, reflects all the light, all the wisdom, which his trained and experienced mind can throw upon them, sets forth short and effective sermons on all manner of devotional speculation and practical subjects, which those feats suggest. It opens out a large area of critical and scriptural thought, very attractive to the devout and meditative students.

লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্মমত।

(কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

এক্ষণে আমরা লিঙ্গায়তদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। লিঙ্গায়ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবা কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল? কি প্রকারে তিনি মানবগণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন? তিনি ধর্ম্মজগতে কোন্ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত ছিলেন? এই সকল তাঁহার উপদেশাবলী বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

তাঁহার কার্য্য কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম বা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার সারা জীবন ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যে অভিষিক্ত ছিল। তাঁহার মতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন একটি অথবা কতকগুলি যাগযজ্ঞপূজাদি করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না। মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের আরাধনা, সৃষ্ট জীবের সেবা করা এবং কর্ত্তব্য প্রতিপালন না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মমার্গে উপনীত হইতে পারা যায় না। বর্ণাশ্রম, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহুতর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং অবশেষে পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অদ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাসবা বলিয়াছেন যে মনুষ্য উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই উচ্চ হয় না। মানব নিজ অধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা যে স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত সে সেই স্থানই প্রাপ্ত হয়—জন্ম হেতু নহে। সে যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যে কোন পেষা বা ব্যবসাই অবলম্বন করুক না কেন, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া অকপট হৃদয়ে পরমাত্মায় চিত্তার্পণ করিতে পারে তবে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বাসবা বলিয়াছেন:—

তুমি জাতি নির্ব্বাচন করিতে চাও? তুমি কি জানিতে চাও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ জাতিভুক্ত ছিলেন? তবে শুন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্যাসদেব ধীবরকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বশিষ্ট উর্ব্বশী-পুত্র ছিলেন। মানুষ নীচকুলে জন্ম-গ্রহণ করিলে কি হইল? যদি সে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে উচ্চ জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। সকল দেহই সমান, সকল দেহই রক্ত, মাংস ও বীর্য্য হইতে উৎপন্ন, সকল দেহই ব্যাধিসংকুল। লৌহ উত্তপ্তকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি লৌহ উত্তপ্ত করিয়া যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, কর্ম্মকার বা লোহার নাম প্রাপ্ত হয়। বস্ত্র ধৌতকারী রজক নামে অভিহিত হয়। জাল বিস্তার পূর্ব্বক মৎস্য জীবীকে ধীবর কহে। ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণ হয়। জগতে কি কেহ জাতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যে ব্যক্তি গোসকলকে বধ করে সেই চণ্ডাল। যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে সেই "জেরিয়া" (অতি নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত হয়। দেহের জাতিত্ব কোথায়? যে যাবতীয় জীবের হিত সাধন করে সেই উচ্চ বংশীয় মধ্যে গণ্য হয়। "কুদাল সঙ্গমের" (বাসবার গুরু) ভক্তগণ সকলে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত কারণ তাহারা জীব মাত্রেরই হিত সাধন করে।

মাহেশ্বর স্থল—৬৩-৬৪

তুমি তোমার জাতিগত অভিমানে অভিমানী। শতকোটী ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন বলিয়া পরিগণিত হইয়া কি ফল? ভগবৎ-বাণীর প্রতি ভক্তিই সাধুগণের অমূল্য রত্ন। মানব! নষ্টপ্রজ্ঞ হইও না। যাহারা কুদাল সঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মজগতে চুম্বকস্বরূপ তাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

—ঐ ৬৯

ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ করিয়া ফল কি? ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়? কঠিন তপস্যা করিলে কি ফল প্রাপ্ত হইবে? মন্ত্র পাঠ দ্বারা কি লাভ হইবে? যত দিন না তুমি আমা-দের গুরু এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি অগ্রসর হইবে ততদিন তোমার সকল কর্ম্মই বৃথা।

ঐ ৭৩

হে কর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তি, তুমি কর্ম্ম দ্বারা তোমাকে উচ্চ মনে করিতেছ? তোমার বেদাদি শাস্ত্র, পুরাণ এবং স্মৃতি কাহার যশ গান করিতেছে? তাহারা সকলেই সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পুরুষের এই বলিয়া অর্চ্চনা করিতেছে "সেই একমাত্র ঈশ্বর যিনি পৃথিবী এবং আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তাহারা বলিতেছে যে "ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু একথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমাদের কুদাল সঙ্গমের শিষ্যগণই সকল জাতির গুরু। ব্রহ্মের প্রতি অক-পট ভক্তিই প্রকৃত শিক্ষা পরাবিদ্যা, এবং প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার জাতিতে কি করে? ভগবান চণ্ডালের অন্নও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব তোমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে কলহ হইতে ক্ষান্ত হও। কেবল কুদল সঙ্গমের শিষ্যগণই উচ্চ বর্ণভুক্ত।

ঐ ৭৪। ৭৫

মনুষ্য নিজের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিবে এমত নহে, যাবতীয় মানবসমাজের মঙ্গল সাধন করাই তাহার কর্ত্তব্য। ভগবন্! আমার শরীর এবং মনে বলপ্রদান করুন যাহা দ্বারা আমি তোমার ভক্তগণের সেবা করিতে পারি। আমি যেন তোমার কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পশ্চাৎপদ না হই।

ভক্তন মাহেশ্বর স্থল

পাপীর অর্থ বৃথা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, দরিদ্রের দুঃখমোচনে নহে। কুকুরের দুগ্ধে কখন পঞ্চামৃত হয় না। যে অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সেবার জন্য প্রয়োগ করা না হয় তাহা নিশ্চয়ই বৃথা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ভক্ত জ্ঞানীস্থল ২২৩

কষ্টি পাথরে স্বর্ণকে ঘর্ষণ করিলে যে পরিমাণে উহাতে স্বর্ণ লাগিয়া থাকে, আমি যদি সেই পরিমাণ স্বর্ণকে চুরি করি, অথবা কোন বস্ত্রের একটিমাত্র সুতাও অপহরণ করি, কিংবা তণ্ডুলস্তূপ হইতে কণামাত্র শস্য অসৎ উপায়ে গ্রহণ করি তাহা হইলে কুড়ল দেবকে প্রতারণা করা হয়।

ভক্তন মাহেশ্বর স্থল ৫।

আমি তোমার প্রদত্ত ধন তোমারই কার্য্যে ব্যয় করিব।

মাহেশ্বরণ ভক্তস্থল—১৮২।

অতএব মানুষ যে ব্যবসাই করুক না কেন, তাহার জাতিগত পেশা তাহাকে নীচ করিতে পারে না। মড়িবাল মাখিদেব রজকবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন তত্রাচ তিনি বীর শৈব (লিঙ্গায়ত) সম্প্রদায়ে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিঙ্গায়তগণকে তপ-মন জ্ঞান দ্বারা যখন পরমেশ্বরে লীন হইতে হইবে তখন যে লিঙ্গায়ত ভিন্ন অপরের দাস্য বৃত্তি বা নীচ কর্ম্ম করে সে আধ্যাত্মিক অবনতি প্রাপ্ত হয়। যদি সে কেবলমাত্র ব্রহ্মবিশ্বাসী গণের সেবা করে তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না।

বসবা যে কেবল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজ জীবনেও ঐ সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এবং জাতি হইতে সংগৃহীত লিঙ্গায়তগণের মধ্যে পংবিবাহ, পুঁক্তিভোজন সম্বন্ধে তিনি যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজেও সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বলিতেন যে লিঙ্গায়তগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ঐ প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অপরের সংসর্গে তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইবার সম্ভাবনা।

তিনি বলিয়াছেন:—

প্রকৃত বিশ্বাসী যে জাতি মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন (তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য) আমি তাহার চর্ব্বিত তাম্বুলও চর্ব্বণ করিতে দ্বিধা করিব না। তৎকর্ত্তৃক বর্জ্জিত বস্ত্রও ব্যবহার করিতে লজ্জিত হইব না।

ভক্তন প্রসাদ স্থল ৪৬২।

আমি প্রকৃত ভক্তের গৃহে তাহার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। আমি (ভগবৎ) ভক্তগণের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী কিঙ্কর মাত্র।

ঐ ৪৬০।

যদি মহাপাপী অতি নিকৃষ্ট পাপে লিপ্ত হইয়াও প্রকৃত ভক্তের গৃহে গমন করে এবং তাহার ভোজনাবিশিষ্ট অন্নকণামাত্রও ভোজন করে তাহা হইলে তাহার সকল পাপ ধৌত হইয়া যায়।

ঐ ৪৬৯।

অনেকে ভক্তগণের সহিত একত্র ভোজন পান করা সত্ত্বেও জাত্যভিমানবশত তাহাদের সহিত বিবাহসূত্রে কুটুম্বিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। হে কুড়ল সঙ্গ! আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ভক্ত বলিব? আমি কেমন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানীজনমধ্যে গণ্য করিব? তাহারা নিশ্চয়ই পবিত্র সলিলে অবগাহনকারী চণ্ডালের ন্যায় গণ্য হইবে।

বাসবা বলিয়াছেন যে প্রকৃত (ভগবৎ) ভক্ত হইবামাত্রই মনুষ্যের জাতিগত হীনতা দূরীভূত হইয়া যায়। অনেকে লিঙ্গায়ত ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অপরাপর লিঙ্গায়তগণের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করা সত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত অসবর্ণ বিবাহে লিপ্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাদের উপর নিশ্চয়ই বাসবার শিক্ষা ফলপ্রদ হয় নাই। এমন কি, আজকাল অনেক লিঙ্গায়ত পরস্পরের মধ্যে পান ভোজনাদি করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। জঙ্গম ব্যতীত অপর লিঙ্গায়তগণ এইরূপ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে অনেকেই জাতিগত প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তথাপি লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহপ্রথা অপর সম্প্রদায়ের ন্যায় কখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই।

মঠে লিঙ্গায়ত ভক্তগণ সকলে পংক্তিভোজনই করিয়া থাকে। ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যাদি যে কোন জাতীয় লিঙ্গায়তের গৃহেই প্রস্তুত হউক না কেন তাহাতে কোন আপত্তি হয় না। যাহারা আপনাদিগকে উচ্চশ্রেণী মধ্যে জ্ঞান করিয়া অপর নীচ জাতীয় ব্যক্তির গৃহে ভোজন করিতে অস্বীকার করেন, যদি তাহাদের গৃহে উচ্চ নীচ জাতীয় লিঙ্গায়ত নিমন্ত্রিত হয় তাহা হইলে তাহাকে লইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া পান ভোজন করিতে আপত্তি হয় না। এমন কি উক্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট থালা কোন উচ্চশ্রেণীভুক্ত লিঙ্গায়ত ধৌত করিতে অপমান বোধ করে না। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত জাতিগত মর্য্যাদার সামঞ্জস্য রক্ষণের ইহা একটি অভিনব প্রথা বলিতে হইবে।

লিঙ্গায়ত রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি জাতি যাহারা লিঙ্গায়ত ভিন্ন অপর জাতির কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা লিঙ্গায়ত বলিয়া গণ্য হয় না। তাহাদিগকে লইয়া কেহ পংক্তি ভোজনও করে না।

গীতা-রহস্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

৪র্থ প্রকরণ।

আধিভৌতিক সুখবাদ।

দুঃখাদুদ্বিজতে সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য সুখমীপ্সিতম্।

(অর্থাৎ, দুখ সকলকেই উদ্বেজিত করে, সুখ সকলেরই অভীপ্সিত।)

মহাভারত, শান্তি, ১৩৮।৬১।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের "অহিংসা সত্য-মস্তেয়ং" ইত্যাদি নিয়ম স্থাপন করিবার কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিত্য, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, অথবা উহাদের মূলতত্ত্বটি কি, এবং ইহাদের মধ্যে দুই পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম এক কালেই প্রাপ্ত হইলে, কোন্ মার্গ স্বীকার করা যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ," কিংবা "অতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ" এইরূপ সাধারণ যুক্তির দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে না পারায়, এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় করিয়া শ্রেয়স্কর মার্গ কোন্‌টি তাহা স্থির করিবার কোন নিশ্চিত সাধন আছে কি নাই, অথবা কোনরূপ দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের লাঘব গৌরব কিংবা ন্যূনাধিক মহত্ত্ব আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি কি না, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে।

অন্য শাস্ত্রীয় প্রতিপাদন অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্ম-বিচার-প্রশ্নেরও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এইরূপ যে ত্রিবিধ মার্গ আছে সেই সকল মার্গের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পূর্ব্বপ্রকরণে বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য দুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক হওয়ায়, কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আধিভৌতিক মূলতত্ত্বের চর্চ্চা এই প্রকরণে প্রথম করিয়াছি। অর্ব্বাচীনকালে যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্থ সমূহের বাহ্য ও দৃশ্য গুণের বিচার মুখ্যরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাই, আধিভৌতিক শাস্ত্রাদির অধ্যয়নে যাঁহার জীবন কাটিয়াছে, কিংবা এই সকল শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে যাঁহার অভিমান আছে, তিনি বাহ্য পরিণামের বিচারে নিত্য অভ্যস্ত; এবং সেই কারণে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানদৃষ্টিও অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হইয়া কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক, কিংবা অব্যক্ত ও অদৃশ্য কারণসমূহের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু এইরূপ কারণে, অধ্যাত্ম কিংবা পারলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করিলেও, এই জগতে, মনুষ্যে-মনুষ্যে ব্যবহার সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া লোকসংগ্রহ হইবার পক্ষে নীতিনির্ব্বন্ধ অবশ্যই আছে। পরলোক সম্বন্ধে যাঁহাদিগের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত অধ্যাত্মজ্ঞানের উপর যাঁহাদের বিশ্বাস হয় না, এইরূপ পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতেরাও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, কেবল আধিভৌতিক শাস্ত্ররীতি অনুসারে অর্থাৎ নিছক ঐহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেও কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের উপপত্তি প্রয়োগ হইতে পারে কি না এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও এই তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এই তর্কবিতর্কে, অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, নীতিশাস্ত্রের আলোচনা করিবার জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের আদৌ আবশ্যকতা নাই। কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইহার মীমাংসা—উক্ত কর্ম্মসমূহের যে বাহ্য পরিণাম প্রত্যক্ষ আমাদের নজরে পড়ে সেই অনুসারেই করা আবশ্যক এবং তাহা করিতেও পারা যায়। কারণ, মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে তাহা সমস্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া থাকে। অধিক কি, "সকল মনুষ্যের সুখ"—ইহাই ঐহিক পরমসাধ্য বিষয়; এবং সকল কর্ম্মের শেষের দৃশ্যফল এই অনুসারে নিশ্চিত হইলেও সুখপ্রাপ্তির কিংবা দুঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়া সকল কর্ম্মের নীতিমত্তা নির্দ্ধারণ করা নীতি নির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু হ্রস্বশৃঙ্গী ও শান্ত এবং অধিক পরিমাণে দুধ দেয় সেই গরু ভালো, এইরূপ বাহ্য উপযোগের হিসাবেই যদি ব্যবহারে কোন বিষয়ের ভাল মন্দ স্থির করা যায় তবে ঐ নীতি অনুসারেই যে কর্ম্ম হইতে সুখপ্রাপ্তি কিংবা দুঃখনিবারণাত্মক বাহ্য ফল অধিক, তাহাই নীতিদৃষ্টিতেও শ্রেয়স্কর বুঝিতে

হইবে। কেবল বাহ্য ও দৃশ্য পরিণামসমূহের লাঘব-গৌরব দেখিয়া নীতিমত্তার নির্ণয়—ইহাই সহজ ও শাস্ত্রীয় কষ্টিপাথর বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেই জন্য, আত্মা-অনাত্ম বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় "দ্রাবিড়ী প্রাণায়াম" করা উচিত নহে। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" * অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য কিজন্য পর্ব্বতে যাইবে? কোন কর্ম্মের কেবল বাহ্যফল দেখিয়া নীতি ও অনীতির নির্ণয়কারীর পক্ষকে আমি "আধিভৌতিক সুখবাদ" এই নাম দিয়াছি। কারণ, নীতিমত্তার নির্ণয়ার্থ এই মত অনুসারে যে সুখদুঃখের বিচার করিতে হয় তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষদৃষ্ট সুতরাং আধিভৌতিক হওয়ায়, এই পন্থাও সর্ব্বজগতের কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকারী পণ্ডিতেরাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদের সবিস্তর বিবরণ এই গ্রন্থে বলা সুসাধ্য নহে। বিভিন্ন গ্রন্থকারদিগের মতের শুধু সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাই, ভগবদ্গীতান্তর্গত কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রের এই আধিভৌতিক মার্গের যতটা বিবরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক ততটা স্থূল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া আমি দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্বানদিগের মূল গ্রন্থ তাঁহার দেখা আবশ্যক। আধিভৌতিকবাদী পরলোক সম্বন্ধে কিংবা আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন এইরূপ উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে এই মার্গের সকল বিদ্বানই স্বার্থসাধু, আত্মম্ভরী কিংবা অনীতিমান এইরূপ কেহই মনে করে না। পারলৌকিক না হইলেও ঐহিক দৃষ্টিতেও যতটা হইতে পারে ততটা ব্যাপক করিয়া সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বলাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এইরূপ খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যাঁহারা প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই কোঁৎ, মিল, স্পেন্‌সর প্রভৃতি সাত্ত্বিকবৃত্তির পণ্ডিতও এই মার্গে আছেন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্‌ভ বিচারের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই গ্রন্থ পঠনীয়। কর্ম্মযোগশাস্ত্রের পন্থা ভিন্নরূপ হইলেও 'জগতের কল্যাণ' এই বাহ্য সাধ্য যে পর্য্যন্ত না উহা হইতে বাদ পড়ে সেই পর্য্যন্ত নীতিশাস্ত্রের উপাদানের কোনও মার্গ ভিন্নরূপ বলিয়া সেই জন্যই তাহা উপহাস করা উচিত নহে। সে যাই হোক্; নৈতিক কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ার্থ যে আধিভৌতিক বাহ্য সুখের বিচার করিতে হইবে, সে কাহার সুখ? নিজের, না, পরের, একজনের, না, বহুলোকের—এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় নব্য প্রাচীন উভয়ে মিলিয়া সমস্ত আধিভৌতিকবাদীরা কোন্ কোন্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এবং তাঁহাদের এই মার্গ কতটা উপযোগী কিংবা নির্দ্দোষ, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার বিচার করা যাইবে।

তন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক স্বার্থসুখবাদীদিগের। পরলোক কিংবা পরোপকার সমস্তই মিথ্যা হওয়ায়, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছে; এ জগতে স্বার্থই একমাত্র সত্য, এবং তাহা যে প্রকারেই সাধিত হউক না কেন, কিংবা যাহার দ্বারা নিজের আধিভৌতিক সুখের অভিবৃদ্ধি হউক না কেন তাহাই ন্যায্য, প্রশস্ত কিংবা শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিতে হইবে,—এই মার্গের এইরূপ কথা। আমাদের ভারতবর্ষে এই মত অতি প্রাচীনকালে চার্ব্বাক উচ্চৈঃস্বরে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে, জাবালী রামকে যে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাহা এবং মহাভারতের কণিক নীতি (সভা, আ, ১৪২) এই মার্গেরই অন্তর্ভূত। পঞ্চমহাভূত একত্র হইয়া তাহার মিশ্রণ হইতে আত্মারূপ গুণ উৎপন্ন হয় এবং দেহ দগ্ধ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও দগ্ধ হইয়া যায়। তাই, আত্মবিচারের গণ্ডগোলের মধ্যে না পড়িয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন "ঋণ করিয়াও উৎসব করিবে"—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—মরিলে আর কিছুই থাকে না—এইরূপ চার্ব্বাক বাহাদুরের মত। চার্ব্বাক ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঘৃতের উপরে তাঁহার লোভটা বেশি ছিল।

---

* এই শ্লোকে 'অর্ক' শব্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইরূপ কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ৩.৪.৩ উপরি উক্ত শঙ্কর ভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি 'অর্ক' শব্দের অর্থ 'সমীপ' এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ "সিদ্ধস্যার্থস্য সংপ্রাপ্তৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ" এইরূপ আছে।

তা না হইলে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এইরূপ সূত্রটির রূপান্তর হইত ! কোথায় বা ধর্ম্ম, কোথায় বা পরোপকার ! এজগতে যে যে বস্তু পরমেশ্বর—শিব শিব ! ভুলিয়াছি ! পরমেশ্বর কোথা হইতে আসিল ?—এই জগতে যে যে বস্তু আমি দেখিতেছি সে সমস্তই আমার উপভোগের জন্য। তাহাদের অন্য কোন ব্যবহার দেখা যায় না, সুতরাং নাই-ই ! আমি মরিলেই জগৎ অন্তর্হিত হইল ! তাই, যতদিন বাঁচি সেই পর্য্যন্ত আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহা কিছু সমস্ত আমার আয়ত্ত করিয়া লইয়া আমার সমস্ত বাসনা কামনা আমি পরিতৃপ্ত করিব। আমি তপ করিলে কিংবা দান করিলে, সবাই আমার যশ ঘোষণা করিবে বলিয়াই আমি তপ করি বা দান করি। এবং আমি রাজসূয় কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও কেবল আমার অধিকার সর্ব্বত্র অবাধিত আছে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। সারাংশ,—এই জগতের 'আমি'ই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমস্ত নীতিশাস্ত্রের রহস্য; বাকী সব মিথ্যা। "ঈশ্বরোঽহং ভোগীসিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী" (গীতা, ১৬,১৪) আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্, আমি সুখী—ইত্যাদি প্রকারে, ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদের যে বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ মতাবলম্বী মনুষ্যেরই বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে ইহাদের মধ্যে জাবালীর ন্যায় কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের পাশে বসিয়া অর্জ্জুনকে যদি উপদেশ দিত তাহা হইলে প্রথমেই সে অর্জ্জুনকে মুখথাবড়া দিয়া বলিত যে "ওরে তুই কি মূর্খ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়া অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাস্ উপভোগের এই উত্তম সুযোগ পাইয়াও "ইহা করিব কি উহা করিব" এইরূপ ব্যর্থ প্রলাপ কেন বলিতেছিস্ ? এরূপ সুযোগ আর আসিবে না। কোথাকার আত্মা তা ঠিক্ নেই, আর তুই কিনা আত্মকুটুম্ব নিয়ে বসে আছিস্। ভারী ভুল ! তুই হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্য সুখে ও নিষ্কণ্টকে ভোগ কর্ ! ইহাতেই তোর পরম কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ ঐহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু আছে কি ?" কিন্তু অর্জ্জুন এই জঘন্য বাণী স্বার্থসাধু ও নিছক্ আত্মম্ভরী রাক্ষসী উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥

"শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ত্রৈলোক্যের রাজ্যও (এইরূপ বিপুল বিষয় সুখ) যদি (এই যুদ্ধে) আমি পাই তবু তজ্জন্য আমি কৌরবদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার যদি গলা কাটা যায় তাও স্বীকার!" (গী, ১, ৩৫)। অর্জ্জুন আগেই, যে আত্মমংলবী নিছক্ স্বার্থপরায়ণ আধিভৌতিক সুখবাদ-পন্থার এই প্রকার নিষেধ করিলেন সেই আসুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার খণ্ডন হয়। লোকের যাই হৌক্ না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়োপভোগসুখকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া নীতি ও ধর্ম্মবিসর্জ্জনকারী আধিভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ পদবীর কর্ম্মযোগ শাস্ত্রসংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকার ও সাধারণ লোকেরাও এক্ষণে অত্যন্ত অনীতিমূলক ত্যাজ্য ও গর্হিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অধিক কি, এই পন্থাটি নীতিশাস্ত্র কিংবা নীতিবিচার নামেরও যোগ্য নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিয়া আধিভৌতিক সুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্।

সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসর্ব্বস্বতা জগতে চলেনা। কারণ, আধিভৌতিক বিষয় সুখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের সুখ অন্য লোকের সুখভোগের অন্তরায় হওয়ায়, উহা নিজের সুখেরও বিঘ্ন না হইয়া যায় না, এইরূপ প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে। তাই, আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ কিংবা স্বার্থ সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদিগকে নিজের মত সাহায্য করা ব্যতীত নিজেরও সুখলাভ হইতে পারে না, তাই নিজের সুখের জন্য, দূরদর্শিতা-সহকারে অন্যের সুখের প্রতিও আমাদের লক্ষ্য করা আবশ্যক এই আধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করি। নীতির আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইখান হইতেই হয় বলিলেও চলে। কারণ, সমাজ বিধ-

রণের জন্য নীতির বন্ধন চাই না এইরূপ চার্ব্বাকের ন্যায় না বলিয়া, উল্টা ঐ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, আমাদের দৃষ্টিতে তাহার কারণ বলিবার জন্য এই বর্গের অন্তর্গত লোকেরা প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন যে, জগতে অহিংসাধর্ম্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা লোকেরা তাহা কেন পালন করে ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিলে, "আমি অন্যকে মারিলে, অন্যেরাও আমাকে মারিবে ও পরে আমার নিকট হইতে সুখ চলিয়া যাইবে" এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য কোন গভীর কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়; এবং অহিংসাধর্ম্মের ন্যায় অন্য সমস্ত ধর্ম্মই এই স্বার্থমূলক কারণপ্রযুক্তই প্রচলিত হইয়াছে। নিজের দুঃখ হইলে আমরা কাঁদি এবং অন্যের দুঃখে আমাদের দয়া হয়। কেন? আমারও কখন ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী দুঃখ, মনে আইসে। তাই, পরোপকার, ঔদার্য্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের সুখের নিমিত্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা মূলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই সুখের কিংবা নিজেরই দুঃখনিবারণের পর্য্যায় মাত্র। আমার নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও আমাকে সাহায্য করিবে এই অন্তঃস্থ ধারণা হইতেই, কোন কিছু ঘটিলে অন্যকে আমরা সাহায্য বা দান করিয়া থাকি; এবং আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়া আমি তাহাদের উপর দয়া করিয়া থাকি। নিদানপক্ষে, লোকেরা ভাল বলিবে এই স্বার্থমূলক হেতুটিও আমাদের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। পরোপকার ও পরার্থ এই দুই শব্দ নিছক ভ্রান্তি-মূলক। একমাত্র স্বার্থই সত্য; স্বার্থ অর্থাৎ নিজের সুখলাভ কিংবা দুঃখনিবারণ। মাতা সন্তানকে স্তন্য দেন—তাহার কারণ মাতার প্রেম নহে; তবে তাহার স্তনের স্ফীতি তাহাকে কষ্ট দেয় বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা করিয়া তাহাকে সুখ দিবে এইজন্যই সে এই স্বার্থসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে,—প্রেম বাৎসল্যাদির ইহাই মূল কারণ! আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক না, আরও দূরদৃষ্টিপূর্ব্বক যাহাতে অন্যেরও সুখ হইতে পারে এইপ্রকারের নীতিধর্ম্ম পালন করিতে হইবে—এই পন্থার লোকেরা এইরূপ স্বীকার করেন। এই মতের সহিত চার্ব্বাকমতের গুরুতর প্রভেদ আছে। তথাপি মনুষ্য নিছক বিষয়সুখরূপ স্বার্থের ছাঁচে তোলা পুতুল—সেই যে চার্ব্বাকমত, তাহাও ইহাতে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে হব্‌স্ ও ফ্রান্সদেশে হেল্‌বেশিয়স্ ইহাঁরা এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ইংলণ্ডে নহে, অন্যত্রও এই মতের অনুগামী এক্ষণে বেশী নাই। হব্‌সের নীতিধর্ম্মের উপপত্তি প্রকাশিত হইলে বট্‌লরের * ন্যায় বিদ্বানেরা তাহার খণ্ডন করিয়া এইরূপ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সব-শুদ্ধ মানবস্বভাব নিছক্ স্বার্থপর নহে; স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণও ন্যূনাধিক পরিমাণে মনুষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে। এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার কিংবা কর্ম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময়, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না দেখিয়া স্বার্থ ও পরার্থ এইরূপ মানবস্বভাবের যে দুই নৈসর্গিক প্রবৃত্তি সেই দুই দিকেই সর্ব্বদা লক্ষ্য করা আবশ্যক। বাঘিনীর ন্যায় ক্রূর জানোয়ার পর্য্যন্ত আপন বাচ্চা-দের রক্ষণার্থ যদি প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তবে সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম কিংবা পরোপকারবুদ্ধি নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বলা ব্যর্থ; কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা করা শাস্ত্রদৃষ্টিতেও উচিত নহে এইরূপ প্রমাণিত হয়। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় নাই এইরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক সময় আমাদের হিতের জন্যই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরও মনে আসি-য়াছিল। "শাশুড়ীর তরে কাঁদে বৌ। মনের ভাব ভিন্নরূপ।" (গা, ২৫৮, ৩,২) এইরূপ তুকারাম বলিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত হেল্‌বেসি-য়সকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। উদাহরণ যথা—

* হব্‌সের মত তাঁহার Leviathan গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বট্‌লরের মত তাঁহার Sermons on Human nature এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। হেল্-ভেশিয়সের পুস্তকের সারাংশ, মর্লি স্বীয় Diderot বিষ-য়ক গ্রন্থে দিয়াছেন। (Vol. II. Chap V.)

মনুষ্যের সমস্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দোষময় হইয়া থাকে—প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ—এই গৌতম ন্যায়সূত্রের (১, ১, ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে সকল বিধান করিয়াছেন (বে, সূ, শাং, ভা, ২, ২, ৩), তাহার উপর টীকা করিবার সময় আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "আপনার মধ্যে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হইলে, তাহা হইতে আমাদের যে দুঃখ হয় তাহা দূর করিবার জন্য আমরা লোকের উপর দয়া কিংবা পরোপকার করিয়া থাকি।" আনন্দগিরির এই যুক্তি প্রায় সমস্ত সন্ন্যাসমার্গীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সব কর্ম্মই স্বার্থপর অতএব ত্যাজ্য,—ইহাই উহার দ্বারা মুখ্যরূপে সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে, যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ী ইঁহাদের মধ্যে দুই স্থানে যে কথোপকথন আছে (বৃ, ২. ৪, ৪. ৫) তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই যুক্তিক্রমই প্রযুক্ত হইয়াছে "আমার অমৃতত্ব কিসে লাভ হইবে?" মৈত্রেয়ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে এইরূপ বলিলেন যে "মৈত্রেয়ী! স্ত্রী স্বামীকে যে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে;—আত্মপ্রীত্যর্থই ভাল বাসে। সেইরূপ, পুত্রকে পুত্রের জন্য আমরা ভালবাসি না, আমার নিজের জন্য পুত্রকে ভালবাসি। * ধন সম্পত্তি, পশু কিংবা অন্য সমস্ত পদার্থেও এই নীতি প্রয়োগ হইতে পারে। 'আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বপ্রিয়ং ভবতি'—আত্মপ্রীত্যর্থ সমস্ত পদার্থ আমাদের প্রিয় হইয়া থাকে; এবং সমস্ত প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে আত্মাকে (আমি) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে কি? তাই. 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—আত্মা কে (প্রথমে) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর" এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যের শেষ উপদেশ। এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার পর সমস্ত জগৎই আত্মময় হইয়া গিয়া, স্বার্থ ও পরার্থ এই ভেদও মন হইতে বিলুপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই যুক্তিবাদ হবসের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, উহা হইতে দুই জনের নিষ্কর্ষিত সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। হব্‌স্ স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন ও সমস্ত পরার্থ দূরদর্শী স্বার্থ মনে করিয়া, স্বার্থ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু নাই—এইরূপ বলেন; এবং যাজ্ঞবল্ক্য 'স্বার্থ' এই শব্দান্তর্ভূত 'স্ব' (আপনি) এই পদের বনিয়াদে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, আমার এক আত্মার মধ্যেই সমস্ত ভূতের ও সমস্ত ভূতের মধ্যেই আমার আত্মার অবিরোধে যেরূপ সমাবেশ হয়, তাহা দেখাইয়া স্বার্থ ও পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে অবভাসমান দ্বৈতের বিরোধও ভাঙ্গিয়া দিলেন। সন্ন্যাসমার্গের ও যাজ্ঞবল্ক্যের উপরি-উক্ত মতের বেশী বিচার পরে করা যাইবে। "সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মসুখপর হইয়া থাকে" এই এক বিষয়ের নানাবিধ গৌরব করিয়া কিংবা উহা একেবারেই অব্যভিচারী এইরূপ বুঝিয়া আমাদের প্রাচীন গ্রন্থকারেরা উহা হইতেই হব্‌সের উল্টা অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্যই এইস্থানে যাজ্ঞবল্ক্যাদির উল্লেখ করিয়াছি।

ইংরেজ গ্রন্থকার হব্‌স্ ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌ভেসিয়াস্, ইঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মনুষ্যস্বভাব নিছক্ স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী কিংবা রাক্ষসী নহে; স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিও মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে, পরোপকার শুধু দূরদর্শী স্বার্থ নহে;—এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-সুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ অন্যের সুখ এই দুই তত্ত্বের উপরেই সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি শাস্ত্রের রচনা করা যাইতে পারে। আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তৃতীয় বর্গ। তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ উভয়ই ঐহিক সুখবাচক, ঐহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

---

* "What say you of natural affection? Is that also a spieces of self-love? yes; all is self-love. Your children are loved only because they are yours. Your fr end for a like reason. And your country engages you only so far as it has connection with yourself." এইরূপ হিউমও স্বকীয় "Degnity or meanness of Human nature" নামক প্রবন্ধে এই যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। হিউমের নিজের মত ইহা হইতে ভিন্ন।

এইটুকু ভেদ যে, স্বার্থবুদ্ধির ন্যায় পরার্থবুদ্ধিও নৈসর্গিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, নীতির বিচার করিবার সময় স্বার্থের ন্যায় পরার্থকেও আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, এইরূপ এই পন্থার লোকেরা বুঝে। সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন না হওয়া প্রযুক্ত মনুষ্য যে যে কর্ম্ম করে সেই সেই কর্ম্ম প্রায় সমাজের হিতকরই হইয়া থাকে। এক জন ধনসঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজেরও হিত সাধিত হয়; কারণ, সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ হওয়ায় তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি না করিয়া নিজের লভ্য করিয়া লইলেও তাহাতে সমাজেরই কল্যাণ হয়। এইজন্য নিজের সুখের প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিত সাধন করিতে পারে তাহাই তাহার কর্ত্তব্য,—এইরূপ এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া সব সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার বিচার করিয়া নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখন লোকের সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জ্জন করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযোগে পড়িয়া অনেক সময় মনুষ্যের স্বার্থের দিকে বেশী টানাই সম্ভব হইয়া পড়ে। উদাহরণ যথা,—স্বার্থ ও পরার্থ দুই-ই সমান প্রবল বলিয়া মানিলে সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া কিংবা রাজ্য হারানো দূরের কথা, ধনের ক্ষতি অধিক হইলেও উহা সহ্য করিবে কিনা, ইহা এই মার্গের মতানুসারে নির্ণয় হয় না। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের জন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলম্বী লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা করিবে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই নৌকায় যে সকল পণ্ডিত সর্ব্বদাই পা দেন তাঁহারা স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুঁকিবেন তাহা আর বলিতে হইবে না। হব্‌সের অনুসারে পরার্থ স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারভেদ ইহা না মানিয়া স্বার্থ ও পরার্থ উভয়কেই তৌলে স্থাপন করিয়া উহাদের তারতম্য অনুসারে আমরা নিজের নিজের স্বার্থ খুব চতুরতার সহিত স্থির করিয়া থাকি—এইরূপ বুঝিয়া এই পন্থার লোকেরা আপন মার্গকে * "উচ্চ" বা "জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ" (কিন্তু যাই হোক্ না, উহা স্বার্থই) এইরূপ নাম দিয়া তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভর্ত্তৃহরি কি বলিতেছেন দেখ—

একে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থ মুদ্যমভৃতঃ স্বার্থোঽবিরোধেন যে।
তেঽমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

অর্থাৎ—নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তাঁহারাই প্রকৃত সৎপুরুষ, বলিতে হইবে। স্বার্থ না ছাড়িয়া লোকের জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণ পুরুষ, এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি যাহারা করে তাহারা মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস! কিন্তু ইহাদের পরেও, যাহারা নিরর্থক লোকহিতের নাশ করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি না!" (নী, শ, ৭৪)। রাজ ধর্ম্মের উত্তম অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া কালিদাসও—

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ।
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবম্বিধৈব॥

"নিজ সুখের অভিলাষ না করিয়া তুমি প্রতিদিন লোকহিতের জন্য কষ্ট করিয়া থাক। অথবা তোমার বৃত্তি কিংবা ব্যবসায়ই এইরূপ,"—এই কথা বলিয়াছেন (শকুং, ৫, ৭)। কর্ম্মযোগশাস্ত্রে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই স্বীকার করিয়া উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কিংবা কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয় কেমন করিয়া করিবে, তাহা ভর্ত্তৃহরি কিংবা কালিদাস দেখেন নাই, তথাপি পরার্থের জন্য যাঁহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন সেই সব পুরুষকে তাঁহারা যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, তাহা নীতিদৃষ্টিতেও ন্যায্য। এই মার্গের লোকেরা, এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন যে, তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে পরার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, ইহা না দেখিয়া সাধারণ ব্যবহারে 'সামান্য' মনুষ্য কি ভাবে কাজ করিবে ইহাই স্থির করিতে হইবে, তাই, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে আমরা যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে

---

* ইংরাজীতে ইহাকে Enlightened self interest বলে। আমি ইহার ভাষান্তরে "উদাত্ত" কিংবা (সেয়ানা) "সুবিজ্ঞ স্বার্থ" করিয়াছি।

সমুচিত। † কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তিক্রমে কোন ফল নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন মাপে সর্ব্বদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে; এই কারণে রাজদরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত ওজনমাপের উপর যতটা সম্ভব যদি চোখ না রাখা হয় তবে কি আমরা সেই সম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারী-দিগের উপর দোষারোপ করি না? কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতি-ধর্ম্মের পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপ কি,—ইহার শাস্ত্রীয় নিশ্চয় সম্পাদনার্থই নীতিশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং এই কাজ নীতিশাস্ত্র যদি না করে তবে নীতিশাস্ত্র নিষ্ফল বলিতে হইবে। 'জ্ঞানা-লোকিত স্বার্থ'—ইহা সাধারণ মনুষ্যের মার্গ—এই-রূপ সিজ্‌বিক্‌ যে বলেন, তাহা কিছু মিথ্যা নহে। ভর্ত্তৃহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদিগেরও পরাকাষ্ঠা-নীতিমত্তা সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে সিজ্‌বিক্‌ "জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের" যে মহত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক এবং নিষ্কলঙ্ক নীতির মার্গ কিংবা সৎপুরুষ অনুসৃত আচরণের মার্গ—ইহা সাধারণ স্বোদর-পূরণ মার্গ হইতে ভিন্ন,—এই-রূপ সাধারণ লোকেরও ধারণা। এবং এই অর্থই উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্ত্তৃহরি বিবৃত করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

পরাজয়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

এমনি করেই তৈরি হচ্চে পথটা গো
এমনি করেই তৈরি হচ্চে পথ—
বুকের রক্তে রাঙিয়ে তোমার তৈরি হচ্চে পথ
ওগো চল্‌বে তোমার রথ।
ব্যথা দিয়েই হচ্চে মাটী পেষা গো
পথটা হচ্চে পেটা
অশ্রুধারার বন্যাজলে হচ্চে বারি ছিটা গো
হচ্চে বারি ছিটা!
এম্‌নি দারুণ আগমনী গো—
এম্‌নি ভীষণ আগমনী
ওগো রুদ্র বাজাও শঙ্খধ্বনী
তুমি শোনাও তোমার বাণী
এমনিতর বুকের রক্ত তরল করে ছানি!
ওগো বল্‌ব আমি কি
রেখেছ বা কি বাকি
চরম করে মরণ-বাণে বিঁধেছ
এখনো সেই পথটা তোমার হল না কি?
ওগো চল্‌বে তোমার রথ্—
আমি নইলে রথটা তোমার
সর্‌বে কি গো পথ
রশি সে তো আর কিছু নয়
আমারি মনোরথ।
তবুও রুদ্র জয় হবে তা জানি
শেষকালে হার—আমিই হার্‌বো মানি
তবু তোমায় বলি
ওগো প্রিয়, আর কত দিন
এমনে রাখ্‌বে ফেলি
ওগো এসো এসো এসো আমার
মরমখানি চরণপাতে দলি।
তোমা তরেই চেয়ে আছি আমি
ব্যথা দিয়েই এসো প্রাণে নামি॥

তন্ত্রে তত্ত্বপদার্থ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

বিভিন্ন তন্ত্রসম্মত তত্ত্ব বা মৌলিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মৌলিক পদার্থের প্রভে-দানুসারে উৎপত্তিপ্রক্রিয়ারও পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈবাগমসম্মত ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব, বৈষ্ণ-বাগমসম্মত দ্বাত্রিংশত্তত্ত্ব, মৈত্রাগমসম্মত বা সাংখ্য-সম্মত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, প্রাকৃতাগমসম্মত দশতত্ত্ব এবং ত্রৈপুরাগমসম্মত সপ্ততত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে।

সাংখ্যপ্রসিদ্ধ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এবং শিব, শক্তি সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ; এই ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্ব শৈবতত্ত্ব নামে

† Sidgwick's Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 2, pp 18-29, also Book Iv. Chap. Iv § 3 P. 474. এই তৃতীয় পন্থা Sidgwick বাহির করিয়াছেন এরূপ নহে, সাধারণ সুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রায় এই পন্থারই অনুগামী; ইহার Common sense morality এইরূপ নামও আছে।

প্রসিদ্ধ।* (এই স্থানে ঈশ্বর শব্দের পর যে বিদ্যা শব্দ পঠিত হইয়াছে, উহার অর্থ শুদ্ধ বিদ্যা।)

ইহাদের মধ্যে শৈবতত্ত্বেরই বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যসম্মত চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ যেমন প্রকৃতি, বিকৃতি এবং প্রকৃতি-বিকৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে, সেইরূপ শৈবতত্ত্বগুলিও শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা এই পাঁচটি তত্ত্ব শুদ্ধ ; মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, রাগ ও পুরুষ এই সপ্ততত্ত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ ; এবং প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব বা পদার্থ অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শারদাতিলকে এই বিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঘবভট্ট তত্ত্বের শুদ্ধত্বসম্বন্ধে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আণব, কার্ম্মণ এবং মায়ীয় এই ত্রিবিধ মলের সম্বন্ধরহিত পদার্থই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। প্রদর্শিত পঞ্চপদার্থে উক্ত ত্রিবিধ মলের সম্বন্ধ নাই, অতএব উহারা শুদ্ধতত্ত্ব। মলত্রয়ের বিবরণ ভাস্কর-রায়কৃত সেতুবন্ধ নামক রামকেশ্বর তন্ত্র-টীকায় কথিত হইয়াছে, যথা—অণু কর্ম্ম ও মায়া এই তিন প্রকার পাশ, তন্মধ্যে অণু শব্দের অর্থ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দুই প্রকার,—এক, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আত্মজ্ঞানের অভাব, অপর, অনাত্ম দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি, অর্থাৎ প্রকৃত আত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে না করিয়া অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা। এই দ্বিবিধ অজ্ঞানই মিলিতভাবে আণব মল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহার অণু নাম এবং মল সংজ্ঞা হইল কেন, তাহার কারণ সৌরসংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—"আত্মনোঽণুত্বহেতুত্বাদণুর্মালিন্যতোমলম্" অপরিচ্ছিন্ন আত্মার অণুত্ব সম্পাদন করে বলিয়া অর্থাৎ জীবভাবে আত্মার সূক্ষ্মতা প্রতিভাত করে বলিয়া অজ্ঞান অণু নামে অভিহিত হয়, এবং নির্লেপ আত্মাতে মালিন্য সঞ্চার করে বলিয়া মল নামে কথিত হয়।

বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য শরীর সম্পাদন-সমর্থ যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। (সমস্ত আস্তিক দর্শনের মতেই পুণ্যপাপের ফলেই বিবিধ যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে।) কর্ম্ম দুই প্রকার—পুণ্য ও পাপ ; এই উভয়ই "কার্ম্মণ" মল নামে অভিহিত হইয়াছে। এক আত্মার যে নানাত্ব অর্থাৎ নানাত্বজ্ঞান, তাহার কারণ মায়া। এই মায়া অনেক প্রকার হইলেও মিলিত হইয়া মায়ীয় মল নামে অভিহিত হইয়াছে।

উক্ত মলত্রয়ের বিবরণ "শিবসূত্র নামক * শৈব দর্শনের "জ্ঞানং বন্ধঃ", ১। ২ এই সূত্রে এবং উহার বিমর্শিনী নামক টীকায় বিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে। পরন্তু তথায় কার্ম্মণ শব্দের পরিবর্ত্তে কার্ম্ম এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পল্লবনা পাঠকের অপ্রীতিকর হইতে পারে, এই ভয়ে শিবসূত্রের অধিক প্রমাণ এবং ব্যাখ্যা এই স্থলে প্রদত্ত হইল না। বিশেষতঃ ভাস্কর রায়ের বাক্যাবলী শিবসূত্র বিমর্শিনীরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

শিব হইতে বিদ্যা পর্য্যন্ত পাঁচটী পদার্থ কারণ-রূপে বিবেচিত হইয়াছে, অতএব ইহারাও শুদ্ধতত্ত্ব।

---

* জগৎকে যিনি অভেদরূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত জগতই আমার শরীর এইরূপ মনে করেন, তিনি সদাশিব। আবার যিনি জগৎকে নিজ হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ঈশ্বর। জগৎ ও আত্মা এতদুভয়ের অভেদবুদ্ধি শুদ্ধবিদ্যা এবং এতদুভয়ের ভেদবুদ্ধির নাম মায়া। পরব্রহ্মেতে বর্ত্তমান সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, নিত্যতৃপ্তত্ব, নিত্যত্ব ও স্বতন্ত্রত্ব এই পঞ্চনামে প্রসিদ্ধ নিরবগ্রহ (অপ্রতিহত অর্থাৎ যাহাকে কেহই বাধা দিতে পারে না এইরূপ) পাঁচটি শক্তিরূপ দেবতা আছেন। ইঁহারা সাবগ্রহ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকযুক্ত হইয়া যখন সঙ্কুচিত হন, যখন শক্তির কিছু হ্রাস হয়, তখন ক্রমে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পঞ্চসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

উক্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব আবার আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব, এই তিন তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট। এতত্ত্রিতয়ের সমষ্টি তুরীয়তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"মায়ান্তমাত্ম-তত্ত্বং বিদ্যাতত্ত্বং সদাশিবান্তং স্যাৎ।
শক্তিশিবৌ শিবতত্ত্বং তুরীয়তত্ত্বং সমষ্টি রেতেষাম্॥"

ক্ষিতি হইতে মায়া পর্য্যন্ত একত্রিংশৎ পদার্থ আত্মতত্ত্ব নামে কথিত, শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিন পদার্থ বিদ্যাতত্ত্ব নামে অভিহিত, এবং শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থ শিবতত্ত্ব নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ইহাদের সমষ্টিই তুরীয়তত্ত্ব বা সর্ব্বতত্ত্ব। পৃথিবী হইতে মায়া পর্য্যন্ত পদার্থসমূহে সৎরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তারূপ অংশ প্রকটিত ভাবে আছে, কিন্তু চিদংশ ও আনন্দাংশ আবৃত অর্থাৎ চৈতন্যের এবং অনন্দের অভিব্যক্তি নাই ; অতএব ইহারা আত্মতত্ত্ব। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব, এতত্ত্রিতয়ে সচ্চিদংশ অভিব্যক্ত এবং আনন্দাংশ আবৃত, অতএব ইহারা বিদ্যাতত্ত্ব। শিব ও শক্তি এতদুভয়ে সৎ চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের এই তিন অংশই সমভাবে প্রকটিত আছে। সুতরাং ইহারা শিবতত্ত্ব নামে অভিহিত।

* "শিবসূত্র" সাক্ষাৎ শিবকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বসুগুপ্ত নামক পরম শৈব স্বপ্নযোগে শিবের আদেশক্রমে জানিয়াছিলেন যে মহাদেবগিরির উপত্যকাতে মহতী শিলা অবস্থিত। উহার অপর পার্শ্বে শিবসূত্র উৎকীর্ণ আছে। অনন্তর তিনি সেই শিলা হইতে সূত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই শিলা অদ্যাপি "শঙ্করোপল" নামে প্রসিদ্ধ আছে। অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ এই সূত্রের উপরে শিবসূত্র-বিমর্শিনী নামক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন।

মায়া হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সপ্ততত্ত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ এবং মলত্রয়ের সম্বন্ধ যুক্ত। ইহারা পূর্ব্বকথিত তত্ত্বের কার্য্য এবং পরবর্ত্তী পদার্থের কারণ, অতএব ইহারা শুদ্ধাশুদ্ধ। প্রকৃতি হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত অশুদ্ধতত্ত্ব বলিয়াই কথিত হইয়াছে, কারণ উহারা পূর্ব্বকথিত তত্ত্বের কার্য্য এবং মলত্রয়ের সম্বন্ধযুক্ত।

এই সমস্ত শৈবতত্ত্বের উৎপত্তিপ্রণালী মাধবাচার্য্যকৃত "কালমাধবে" ভোজদেবের "তন্ত্রনিবন্ধ" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "ভোজরাজ শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর ও বিদ্যা এই পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়া অন্যান্য তত্ত্বগুলিকে মায়ার কার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করিবার সময়ে কালের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—জগতের নির্ম্মাণের জন্য শিবসংযুক্ত মায়া হইতে কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা ও রাগ এই পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। ভোজরাজ মায়ার সহিত এই একাদশতত্ত্ব এবং সাংখ্যপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, নানাবিধ শক্তিময়ী সেই মায়া প্রথমত কালতত্ত্বকেই সৃষ্টি করিয়াছেন। *

রাঘবভট্ট বায়বীয় সংহিতার প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, শিব হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুরূপী সদাশিব উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সদাশিব হইতে মহেশ্বর, মহেশ্বর হইতে শুদ্ধা বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছেন। †

এই পঞ্চবিধ শুদ্ধতত্ত্বের উৎপত্তি কথনের পর অশুদ্ধতত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, বাগীশ্বর নামক মহাদেবের বাগীশ্বরী নাম্নী যে শক্তি আছেন, যিনি বর্ণস্বরূপে মাতৃকা নামে অভিহিত হইয়া আবির্ভূত হন, তিনিই শিবের সংযোগবলে মায়ার সৃষ্টি করেন। অনন্তর মায়া হইতে কাল, তৎপর নিয়তি কলা, বিদ্যা, এবং কলা হইতে রাগ ও পুরুষ এই ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। *

উৎপন্ন তত্ত্বসমষ্টির মধ্যে সদাশিব পঞ্চমূর্ত্তিতে বিভক্ত, এই পঞ্চমূর্ত্তির দ্বারা তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই পাঁচ প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। † উক্ত পঞ্চকর্ম্মসম্পাদক পঞ্চমূর্ত্তি যথাক্রমে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পঞ্চ নামে অভিহিত হইয়াছেন। মাধবাচার্য্য "ন্যায়মালা বিস্তরের" উপক্রমে বুক্কন নরপতির সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে শৈবাগমোক্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "সমস্ত উপনিষদে যে ব্রহ্ম প্রতীয়মান হন, তিনিই শৈবাগমে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিরোধ ও অনুগ্রহ এই পাঁচপ্রকার ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচ প্রকার মূর্ত্তির প্রথা (প্রসিদ্ধি অথবা বিস্তার) প্রকটিত করেন, ইহা প্রতিপাদিত হয়। সেই মূর্ত্তিসকলের মধ্যে এই বুক্কণ রাজ স্থিতিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। সেই মূর্ত্তির অর্থাৎ নরপতিরূপধারী স্থিতিমূর্ত্তির আত্মাতে (অন্তঃকরণে) স্ফুরিত মূর্ত্তি বিদ্যাতীর্থ মুনি (রাজ গুরু) সমস্ত জগতের অনুগ্রাহিকা মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যেহেতু এই রাজা বেদান্তোক্ত পরং ব্রহ্ম, যেহেতু ইনি আগমোক্ত মহেশ্বরের স্থিতিমূর্ত্তি, যেহেতু বিদ্যাতীর্থ মুনি ইঁহার অন্তঃকরণে সন্নিহিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, অতএব এই রাজার সর্ব্বজ্ঞত্ব অবিসংবাদে সকলের হৃদয়েই প্রতিভাত হয়"। ‡

মাধবাচার্য্যের এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয়

---

* ভোজরাজঃ শুদ্ধানি পঞ্চতত্ত্বানি শিব-শক্তি-সদাশিবেশ্বর-বিদ্যাখ্যানি নির্দ্দিশ্যেতরাণি নির্দ্দিশন্মায়াকার্য্যোক্তিপূর্ব্বকমেব কালং নিরদিক্ষৎ.

"পুং সো জগতঃ ক্রিয়তে মায়াত স্তত্ত্বপঞ্চকং ভবতি।
কালো নিয়তি শ্চ তথা কলা চ বিদ্যা চ রাগ শ্চেতি॥"

তানি মায়াসহিতান্যেকাদশতত্ত্বানি সাংখ্যপ্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি চোদ্দিশ্য ক্রমেণ বিবৃণ্বন্নিদমাহ—

"নানাবিধশক্তিময়ী সা জনয়তি কালতত্ত্বমেবাদৌ।"

[কালমাধব]

† শিবঃ শক্তি স্ততো নাদ স্তস্মাদ্বিন্দুঃ সদাশিবঃ।
তস্মান্মহেশ্বরো জাতঃ শুদ্ধা বিদ্যা মহেশ্বরাৎ॥

* সা বাচামীশ্বরী শক্তি র্বাগীশাখ্যাসা শূলিনঃ।
যা সা বর্ণস্বরূপেণ মাতৃকেতি বিজৃম্ভতে॥
অথানন্তসমাযোগান্মায়াং কালমবাসৃজৎ।
নিয়তিঞ্চ কলাং বিদ্যাং কলাতো রাগ-পুরুষৌ॥

† সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস-নিগ্রহানুগ্রহকার্য্যপঞ্চককর্ত্তা অতএব জগন্নির্ম্মাণবীজরূপো জগৎসাক্ষী সদাশিবো জাতঃ।

[রাঘবভট্ট]

‡ যদ্‌ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে প্রগুণয়ন্তৎ পঞ্চমূর্ত্তিপ্রথাম্
তত্রায়ং স্থিতিমূর্ত্তিমাকলয়তি শ্রীবুক্কণক্ষ্মাপতিঃ।
বিদ্যাতীর্থমুনি স্তদাত্মনি লসন্মূর্ত্তি স্ত্বনুগ্রাহিকা
তেনাস্য স্বগুণৈ রখণ্ডিতপদং সার্ব্বজ্ঞ্যমুদ্যোত্যতে॥

[জৈমিনীয়ন্যায়মালা]

যে, বেদান্তে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমূর্ত্তিতে বিভক্ত সদাশিব নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, তন্ত্রশাস্ত্রে উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা সদুৎপত্তিবাদি সাংখ্যমতের তুল্য। এই মতে প্রলয়সময়ে সমস্ত পদার্থই মায়াবচ্ছিন্ন শিবে কাষ্ঠসংশ্লিষ্ট জতুর ন্যায় লীন হইয়া থাকে। অনন্তর সৃষ্টি সময়ে তিল হইতে তৈলের ন্যায় জগতের যাবতীয় পদার্থের আবির্ভাব হয় মাত্র। সুতরাং এই উৎপত্তি আরম্ভবাদি নৈয়ায়িক-বৈশেষিকাভিমত উৎপত্তির মত নহে *। ইহাতে মায়ার কথা আছে সত্য, কিন্তু উহা বেদান্তসম্মত মায়ার মত তুচ্ছ পদার্থ নহে। সুতরাং উহার কার্য্য পদার্থনিবহও মরীচিকার ন্যায় ভ্রমমাত্রের বিষয় নহে, উহাদের সত্তা রহিয়াছে।

তান্ত্রিক দর্শনে কালের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, অথচ শারদাতিলকের ১ম পটলের পঞ্চদশ শ্লোকে কালসহকৃত পরম শিব হইতে সদাশিবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে; ইহাতে আপাততঃ বিরোধ প্রতিভাত হয় যে, কাল যদি উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে প্রলয়সময়ে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং জগতের সাক্ষী সদাশিবের উদ্ভব সময়ে কালের সহকারিতা সম্ভব হয় না। এই বিরোধের পরিহারাভিপ্রায়ে রাঘবভট্ট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মহাপ্রলয় সময়েও প্রকৃতির এবং কালের অবস্থিতি স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব ইহাদেরও আপেক্ষিক নিত্যতা আছে। পারমার্থিক নিত্যত্ব একমাত্র পুরুষেরই বুঝিতে হইবে, কারণ সংহৃতি সময়ে অর্থাৎ প্রলয়কালে ক্রমে যাবতীয় পদার্থের বিনাশ পুরুষ পর্য্যন্তই বর্ণিত হইয়াছে; একমাত্র পুরুষেরই ধ্বংস হয় না। প্রলয় সময়েও বিষ্ণুর কালস্বরূপ রূপ বর্ত্তমান থাকে, এই মতটি বিষ্ণু পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শারদাতিলকে বর্ণিত মতও তাহারই অনুরূপ মনে হয়।

কালের নিত্যত্ববাদি-বৈশেষিকের মত উপেক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "যদি মনে কর মহামুনি কণাদ মহাতপস্যার দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বপদ লাভ করিয়া বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং মন্দবুদ্ধিরা বেদের যেরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকে, তাহারই অর্থান্তর কল্পনাসঙ্গত, অর্থাৎ কণাদাভিমত কালের নিত্যত্ব মতই সমীচীন, এমত হইলেও যাঁহার প্রসাদে কণাদ মুনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই শিবই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাঁহার মতানুসারে কণাদমতেরই অন্যথা কল্পনা অত্যন্ত উচিত। যে হেতু, শিব সমস্ত আগমে ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব নিরূপণ করিবার সময়ে কালতত্ত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন" *।

বৈষ্ণবতত্ত্ব—জীব, প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চমহাভূত, হৃৎপদ্ম, তেজস্ত্রয় (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য) চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই দ্বাত্রিংশৎ পদার্থ বৈষ্ণবতত্ত্ব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

মৈত্রতত্ত্ব বা সাংখ্যতত্ত্ব—পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রাকৃততত্ত্ব—নিবৃত্তি প্রভৃতি পঞ্চকলা, বিন্দু, কলা, নাদ, শক্তি এবং সদাশিব এই দশটি প্রকৃতির বা শক্তির কলা।

ত্রৈপুরতত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব (আবার ব্যুৎক্রমে) শিবতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং সর্ব্বতত্ত্ব এই সপ্ত পদার্থ ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যার তত্ত্ব বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে।

প্রদর্শিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অল্পসংখ্যক তত্ত্বের মধ্যে অন্যান্যতত্ত্বের অন্তর্নিবেশ বুঝিতে হইবে। আচার্য্যগণ এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্যরক্ষণে চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই। আমরা উহা ক্রমে দেখাইতে চেষ্টা করিব। উক্ত তত্ত্বভেদের সহিত তান্ত্রিক উপাসনারও সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; তাহাও ক্রমে প্রতিপাদিত হইবে।

* নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে পরমাণু নিত্য পদার্থ, তাহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা ছিলনা তাহারই উৎপত্তি হয়। এই মতটি কন্দলীতে আরম্ভবাদ নামে কথিত হইয়াছে।

* অথ মন্যসে মহতা তপসা শিবমারাধ্য তৎপ্রসাদলব্ধসর্ব্বজ্ঞত্বপদঃ কণাদমহামুনির্বেদতাৎপর্য্যং সম্যগ্ বেত্তীতি বেদস্যৈব মন্দমতিপ্রতীতাদর্থাদর্থান্তরং নেতব্যমিতি, এবমপি যস্য প্রসাদাদয়ং সর্ব্বজ্ঞতামলভত স এব শিবো মুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি তন্মতানুসারেণ কণাদমতস্যৈবান্যথানয়নমত্যন্তমুচিতম্। শিবো হি সর্ব্বেষ্বাগমেষু ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি নিরূপয়ন্ কালতত্ত্বস্যোৎপত্তিমঙ্গীচকার। (কালমাধব)

আনন্দ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

আনন্দ তাঁর জড়িয়ে আছে
প্রতি ফুলে ফুলে
আনন্দ তাঁর ছড়িয়ে গেছে
তৃণে তরুর মূলে।
আনন্দ তাঁর উঠ্‌ছে বেজে
নীল আকাশের নীরব গানে
বাতাসের ঐ করুণ তানে
তপন তারার দোলে!
আনন্দ তাঁর উঠ্‌ছে ফুটে
নিখিল বেদন-জটা টুটে
অশ্রুমণির মালা হয়ে
ঝর্‌চে বুকের তলে!
আনন্দ তাঁর মূর্ত্তি ধরি
আস্‌চে আমার জীবন 'পরি
দুঃখ সুখের সাজে, দুয়ার
দিচ্চে খুলে খুলে॥

বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমা নির্দ্দেশ করা আছে—তাহাতে বঙ্গদেশ আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে আপনার আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গদেশ আর্য্য সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া ভারতবর্ষের একটী বিশিষ্ট প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত। অতি প্রাচীন যুগের ইতিহাসের সহিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই দেশের ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন আর্য্য ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত ভাষা নানাবিধ বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া প্রাদেশিক ভাষা সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উপরে কোন্ কোন্ স্তর পড়িয়া যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে নিরূপণ করিবার উপায় নাই।

আদিযুগ ও পৌরাণিক যুগে বঙ্গদেশের ভাষা ভিন্ন ছিল না। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একই সংস্কৃত ভাষা লিখিত ও কথিত হইত। বঙ্গদেশে ও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সংস্কৃত ভাষারই সমধিক চর্চ্চা ছিল। জগতের সমস্ত চলিত ভাষার সাধারণতঃ দুইটী করিয়া শ্রেণী থাকে—একটী ঐ ভাষার ব্যাকরণসঙ্গত সাধু প্রয়োগ এবং অন্যটী কথোপকথনাদিতে প্রযুক্ত সাধারণের ভাষা। এই সাধারণ নিয়মানুসারে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তেও দুই শ্রেণীর ভাষা ব্যবহৃত হইত। ঋষিগণ যে ভাষায় পুরাণ সংহিতাদি রচনা করিতেন, মহাকবিগণ যে ভাষায় কাব্যাদি প্রণয়ন করিতেন তাহার নাম ছিল সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোক ও জনসাধারণ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত তাহার নাম ছিল প্রাকৃত। কথিত ভাষা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পশ্চিম বঙ্গের কথাবার্ত্তার ভাষা এবং চট্টগ্রামের খালাসীগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে তাহা যদি পাশাপাশি করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে ঐ দুইটী ভাষা যে একই ভাষা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে তাহা কখনই মনে হইবে না।

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে নানা প্রকার মৃত্তিকাস্তরের সহযোগে বর্ত্তমান ভূখণ্ড সংগঠিত। কতপ্রকার পরিবর্ত্তন যে ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকার গঠনের সহায়তা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাষাতত্ত্বও এই ভূতত্ত্বের ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। প্রত্যেক ভাষার উপর দিয়াও এইরূপ প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইবে। যে ভাষায় কথাবার্ত্তা হয় বা পুস্তকাদি প্রণয়ন হয় সে ভাষা চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে যে কয়টী ভাষা চলিত আছে তাহাদের প্রত্যেকটী প্রাচীন ভাষা (classical language) হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভাষা বলিতে সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক ও ল্যাটিন বুঝায়। আধুনিক প্রত্যেক ভাষায় এই সকল প্রাচীন ভাষার এবং সেই সকল ভাষায় লিখিত সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যেমন প্রাচীন ভাষা সমূহ হইতে আধুনিক ভাষার সংগঠন হইয়াছে সেইরূপ প্রাচীন ভাষাসমূহও যে একই ভাষার শাখা তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বৈদিক যুগের আর্য্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা যথার্থ সংস্কৃত ভাষা নহে। সেই ভাষাই বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে যে ভাষা ছিল তাহার নাম আর্য্যভাষা। এই আর্য্যভাষা আর্য্য সভ্যতার অনুগামী হইয়া দেশ বিদেশে বিভিন্নভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার ধারা বিকীর্ণ করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষায় দুইটী শ্রেণী ছিল, একটী লিখিবার ভাষা সংস্কৃত, আর একটী কথা কহিবার ভাষা প্রাকৃত। এই প্রাকৃত কালক্রমে এবং দেশভেদে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে পরিণত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া যদি বাঙ্গালা ভাষার কুলজী প্রস্তুত করিতে হয় তবে তাহা এইরূপ হইবে যথা—আর্য্যভাষা হইতে সংস্কৃত, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষা সংগঠিত হইলেও তাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত শুধু কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত—লিখিবার ভাষায় উন্নীত হয় নাই। বঙ্গভাষা জনসাধারণের ভাষা, বঙ্গসাহিত্যও জনসাধারণের সাহিত্য। যাঁহারা শিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ভাষা ও সাহিত্যের আভিজাত্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জনসাধারণের এই অনাদৃত মলিন ভাষা কোন দিন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন এবং সেই ভাষাতেই আবার তাঁহাদের গ্রন্থাদিও লিখিতেন। আমাদের বঙ্গভাষা জননী কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া যখন আপন বক্ষের ভাব পীযূষধারা পান করাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন তখন এই শ্যামল বাঙ্গালার জনসাধারণ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিল। এই বঙ্গদেশের কৃষকগণ তাহাদের আপনার ভাব তাহাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের গীত এই মাতৃভাষায় প্রথম গান করিয়া ধন্য হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ তাহাকে অনাদর করিয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণের ভাষা নহে, রাজার ভাষা নহে,—ইহা সাধারণের ভাষা। দীন দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া যেখান হইতে অমৃতের ধারা ক্ষরিত হইতেছে—সেই স্থান হইতেই এই ভাষার উৎপত্তি। এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ প্রকৃতিই রহিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও শিক্ষিত লোকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করা অপমানকর বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য নেতৃবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্গভাষার স্থলে অবলীলাক্রমে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরুপায় জনসাধারণ, যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন নাই, ইংরাজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসাস্বাদ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই,—কেবলমাত্র তাঁহারাই একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই ভাবরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া এই বঙ্গভাষা মাতৃত্বের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বলিলে বঙ্গদেশের জনসাধারণেরই ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বুঝায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই—বাঙ্গালার সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রভৃতি। এক কথায় বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত ইতিহাস এই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই নিবদ্ধ।

যে সাহিত্য ধর্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয় তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না ইহা জগতের সাহিত্যিক ইতিহাসে দেখা যায়। বঙ্গভাষা যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়াছেন ধর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ। ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাহিত্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আর দেশমধ্যে প্রচলিত সাধারণের ধর্ম্মমতই তাঁহার কাব্যাদির বিষয় ছিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার একান্ত আপনার জিনিষ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইয়োরোপে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের বিরোধ ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল কিন্তু বঙ্গদেশে উক্ত বিরোধ

বিভিন্ন বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনসমাজের মঙ্গলসাধন। এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহাদের সম্প্রদায়োক্ত দেবতার মঙ্গল জয়গান করিয়া সমাজের কল্যাণের প্রতি সমুৎসুক হইয়াছেন। সমাজের মঙ্গলকামনা উদ্দেশ্যে সেগুলি নিজ নিজ সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্বোধন। সেই জন্য প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মঙ্গলগান প্রচলিত হইয়াছিল—যথা ধর্ম্মমঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী,মনসামঙ্গল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব কবিতাই কেবল সাম্প্রদায়িক ভাব বিমুক্ত হইয়া মানবহৃদয়ের সনাতন ভাবধারার অভিষিঞ্চনেই বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

কতকাল ধরিয়া যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতে হইতে বঙ্গভাষায় পরিণত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার কোনই উপায় নাই। তবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষাগুলি যে বিশেষ ভাবে সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ এই ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিতের ভাষা, নিম্নশ্রেণীর লোকসকল সে ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না এই মনে করিয়া তাঁহারা সর্ব্বসাধাণের ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। মহারাজ অশোক যে ভাষায় তাঁহার অনুশাসনলিপি প্রণয়ন করাইয়াছিলেন তাহার নাম "মাগধী ভাষা। এই ভাষাই পরবর্ত্তীকালে পালী ভাষায় উন্নীত হয়। বঙ্গদেশে যে ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা "পৈশাচী প্রাকৃত" নামে অভিহিত। পণ্ডিতগণ সাধারণের কথিত এই অবিশুদ্ধ ভাষার প্রতি এমনই বিরূপ ছিলেন যে তাহাকে "পৈশাচী প্রাকৃত" এইরূপ ঘৃণার্হ নাম দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। উত্তর কালে যখন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি ভাষান্তরিত হইয়া বঙ্গভাষাকে বিশেষ ভাবে সৌষ্ঠবশালিনী করিয়া তুলিতেছিল তখনও পণ্ডিতগণের এ বিরূপতা বিলুপ্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ যে মানব অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিত বঙ্গভাষায় শ্রবণ করিবে সে সুনিশ্চয় রৌরব নরকগামী হইবে। মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যাঁহারা মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়া বঙ্গভাষা ও সমাজের মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন—তাঁহারাও ব্রাহ্মণগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটী তাহার প্রমাণ—

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেশে, আর বামুনঘেঁষে—
এই তিন সর্ব্বনেশে।"

কিন্তু "সাগর উদ্দেশে যবে বাহিরায় নদী,
কে রোধে তাহার গতি"

সমগ্র গৌড়ীয় জনসমাজের মঙ্গল সাধন করিতে বঙ্গভাষা তখন আবেগময়ী—ব্রাহ্মণগণের বাধা ভাগিরথী স্রোতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দূরে অপসৃত হইল। রৌরব নরকের ভয় কেহ করিল না—"কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"—এই বাক্যই সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। মহাভারত পঞ্চমবেদ স্বরূপ। চতুর্ব্বেদ ধারণা করিবার মত ক্ষমতা যাঁহাদের নাই সেই সাধারণ লোকের জন্য ইহার সৃষ্টি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার মহাভারতের মহদুদ্দেশ্য। কালক্রমে বঙ্গভাষা যখন সাধারণের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল তখন এই সাধারণের সামগ্রী আর মাত্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ রাখা অসম্ভব হইয়াছিল—তাহার বঙ্গানুবাদ মানবসমাজের দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট একটী অপরিহার্য্য বিষয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। লোকশিক্ষা ও জনসমাজে ধর্ম্মমত প্রচারই বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তির কারণ।

ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষিত পণ্ডিতগণের বিরোধ সত্বেও এ ভাষা ক্রমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পণ্ডিতগণ বিরোধী হইলেও দেশের রাজা ও জমিদারগণ অনেকে বাঙ্গাল কবির পক্ষপাতী ছিলেন—অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা এবং বাঙ্গালী রাজগণ বঙ্গীয় কবিগণকে বৃত্তি ও ভূমি দান করিয়াছেন। অনেক কবি রাজার আদেশে দেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে যে কারণে বঙ্গভাষা

সাহিত্যের পদে উন্নীত হইয়াছে—তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমত, বৌদ্ধ নৃপতিগণের প্রাদেশিক ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় বঙ্গ ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা রচনা করিয়া বাঙ্গালী কৃষক ও শিল্পীগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে ঐ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—যথা (১) চার্য্যাচার্য্য বিনিশ্চয়, (২) বোধিচার্য্যাবতার (৩) ডাকার্ণব। ডাকের প্রবচনগুলি আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় যখন উহা দুরাচারী তান্ত্রিক কাপালিকের প্রেতলীলায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, যখন ভগবান শঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদিত করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাতে বঙ্গসাহিত্যে একটী নূতন ধারা প্রবাহিত হইয়া সাহিত্যকে নূতনতর কলেবর প্রদান করিয়াছিল এবং পৌরাণিক ধর্ম্ম এবং দেবদেবীগণের পূজাপদ্ধতির প্রতি সাধারণের আগ্রহ আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই হইল বঙ্গসাহিত্যোন্নতির দ্বিতীয় কারণ।

তৃতীয় কারণ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণাদির বঙ্গভাষানুবাদ এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ও দেশীয় রাজগণের তদ্বিষয়ে সহায়তা।

চতুর্থ কারণ নানাবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মঙ্গলগান রচনা এবং সমাজে সেই গানের প্রচার।

পঞ্চম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ বৈষ্ণব কবি ও কাব্যের আবির্ভাব এবং যুগাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কীর্ত্তন ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমহিমা এবং ভক্তগণের চরিতামৃত প্রচার। এই সকল হইল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতির কারণ। দেখা যাইতেছে যে জাতীয় তিনটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এই সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া দেশ ও সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন—(১) বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায় (২) পৌরাণিক ধর্ম্মসম্প্রদায়—শৈব ও শাক্ত এবং (৩) বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্প্রদায়। বঙ্গদেশের সৌভাগ্য যে ধর্ম্মান্দোলনেই প্রধানত তাহার সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এখনও প্রধানতঃ ধর্ম্মের উপরেই তাহার গতি নিয়মিত হইতেছে।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নাসিকে বদলী।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাসিকে আমাদের বদলী হইল এবং আমরা যখন নাসিকে গেলাম তখন ঘরের লোক আমরা তিনটি ও ব্রাহ্মণ, সহিস ও কোচম্যান এই কয়জন গিয়াছিলাম। চাকরের মধ্যে, কিংবা আত্মীয়ের মধ্যে কোন মেয়ে মানুষকে লওয়া হয় নাই। নাসিকে পাচিকা অনেক পাওয়া যায়, সেখানকার একজনকে সেইখানেই রাখিয়া দিব, এইরূপ মনে করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, পাচিকা শীঘ্র পাওয়া যায় না। পাচিকা খুঁজিতে এক মাস দেড় মাস গেল। সেই পর্য্যন্ত, অভ্যাস না থাকায় ঘরকন্নার প্রত্যেক কাজ আমার নিকট কঠিন বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার দরুণ, আমার মনও একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল; অতি সহজ কাজও এই মনের চাঞ্চল্যে খারাপ হইতে লাগিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়াও, রান্নায় নুন বেশী বা ঝাল বেশী যাই হোক না কেন, আমার স্বামী আমাকে ধমকাইতেন না, রাগ করিতেন না। রান্নার অভ্যাস না থাকায়, পাছে রান্না খারাপ হয় এই ভয়ে আমার চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিত তাহাতে কখন কখন রান্নায় নুন দিতেই ভুলিয়া যাইতাম ও কখন কখন ভুলিয়া দুইবার করিয়া নুন দিতাম; তবুও আমার স্বামী রাগ বা তিরস্কার করিতেন না। যে কোন আনাড়ী মানুষ হোক না কেন, তাহাকে কোন রকমে বাগাইয়া লইবেন—এ যেন আমার স্বামীর একটা ব্রতই ছিল। আমার স্বামী আহার করিয়া কোর্টে গেলে পর, আমি আহারে বসিতাম, তখন, নুন কিংবা ঝাল বেশী হইয়া থাকিলে, কাজটা খারাপ মনে হইত, এব সন্ধ্যাকালের রান্নায় খুব মনোযোগ দিয়া রাঁধিব, ভুলিব না। এইরূপ স্থির করিতাম। তদনুসারে, সত্য সত্যই ভাল রান্না হইলে, আমার স্বামী সুধু ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "কিরে "আবা" (নিজের ছোট ভাই) এখন তরকারি খাচ্ছিস্, আর, দুপুরের সময় দুটো রান্না বেশী ছিল তবু কেন ভাল করে খাস্‌নি? তাতে কি কিছু খারাপ হয়েছিল"? তাতে সে হাসিয়া বলিল যে, "দুপুরে রান্না কেমন কেমন! তার মধ্যে একটা রান্না আলুনী ও একটাতে নুন বেশী; কেবল গোটা

ডাল ও শাকের রান্নাটা ভাল হয়েছিল। আমি তাই শুধু খেয়েছিলুম।" তখন তিনি বলিতেন, "মুনে-পোড়া, ঝাল, আ-লুনী যাই হোক, বিদ্যার্থীরা সেদিকে লক্ষ্য করবে না, যা পাবে তাই চুপটি করে খেয়ে যাবে, দেখ আমি তা নিয়ে কখন কি খুঁত খুঁত করেছি, যা পাই তাই চুপ্ চাপ্ করে খেয়ে যাই।" আমি একবার সাহস করিয়া বলিলাম, "আমি আগে থাকতে যদি জানতে পাই, তাহলে আলুনী জিনিসে তখনি মুন দিতে পারি। কিন্তু আমি যখন খেতে বসি তখনই টের পাই ও বড় লজ্জা হয়।" তখন তিনি বলিলেন, "তার আর উপায় কি? একথা বলে দেওয়া অপেক্ষা নিজের অনুভবে জানাই ভাল। তাহলে মানুষ সাবধান হয় ও বেশী মনোযোগ দেয়। আজ আমি তোমার জন্য পাক-শাস্ত্রের এক পুস্তক আনিয়েছি। সব পড়ে দেখ, ওতে যে রকম লেখা আছে সেই অনুসারে রোজ এক একটা রান্না করলেই হবে। তাতে যে সকল জিনিস লাগবে তার পরিমাণ ঠিক্ করে নিয়ে, ধীরে সুস্থে রাঁধবে। রান্নাটা ঠিক হলে ত ভালই, না হলেও একটা বেশ আমোদ হবে"। খুব মনোযোগ দিলে সবই হইতে পারে এই মনে করিয়া, পুস্তকখানি হস্তগত হইলে পর, প্রথম প্রথম প্রতিদিন একটা কোন রান্না করিয়া দেখিতাম। কোন রান্না ঠিক্ হইত, কোন রান্না দুই চারি বার করিয়াও ঠিক্ হইত না। এইরূপ অনেকদিন হইলে পর, রান্নার সখটা কমিয়া আসিল, একজন ভাল পাচিকাও পাওয়া গেল; আহারের ব্যবস্থা ভাল হইল এবং এখন পাঠ-অভ্যাসের বেশী সময় পাইলাম।

এই সময়ে "হাওয়ার্ডের প্রথম পুস্তক" সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক ধরিয়াছিলাম। এখন আমার স্বামীও আমার "পড়া নেবার" জন্য ও "নূতন পড়া দেবার" জন্য সময় পাইতেন। সকালে ঘণ্টা-দেড়েক পাঠ অভ্যাস করবার পর ও সন্ধ্যাকালে বাহির হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একঘণ্টা আহারের পূর্ব্বে, মারাঠী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া পরে তিনি আহার করিতে উঠিতেন এবং আহারান্তে ১০টা ১০৷৷০টা পর্য্যন্ত পুণার "দক্ষিণা প্রাইজ কমিটির" পুস্তকগুলি আসিলে তাহা আমাকে দিয়া পাঠ-করাইতেন—এইরূপ পাঠের নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আবার ভোর ৪টা ৪৷৷০টার সময়ে আমার স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিত। তখন "কেকা", "আর্য্যা", "শ্লোক", কখন কখন "নবনীত" কিংবা "প্রার্থনা-সঙ্গীত" এই সমস্তের মধ্য হইতে যা' পড়িতে বলিতেন, তাহাই তাঁহাকে আমার পড়িয়া শুনাইতে হইত। কোন কোন দিন আমার স্বামী তাঁর স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক কিংবা স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন ও তাহার অর্থ বলিতেন এবং আমাকে দিয়া শ্লোক পাঠ করাইতেন পূর্ব্ব-কথিত অর্থ কিরূপ আমার মনে আছে তাহা দেখিতেন। এইরূপ, আলো হওয়া পর্য্যন্ত চলিত। তখন হইতে ১০টা পর্য্যন্ত—রান্নার সমস্ত সামগ্রী, শাক-সবজী চাটনী, "কোসিম্বিরী" ও ঝোল প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে পর, প্রথমে ভাত তরকারী পাতে 'বাড়িয়া' লইয়া সমস্তক্ষণ কথা কহিতে কহিতে আহার করিতেন। আহারান্তে আমার স্বামী কাছারী গেলে পর, আমি কাছারীতে পাঠাইবার জলখাবার প্রস্তুত করিতাম। রোজ ভিন্ন ভিন্ন চারি পাঁচ রকমের জিনিস করিতে হইত। সেই পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা কাল বেশ সহজে কাটিয়া যাইত। পৌনে দুইটার সময় জলযোগের পাত্র ভরিয়া ব্রাহ্মণের হাতে উহা উঠাইয়া দিবার পর, আমি পাঠ অভ্যাস করিতে বসিতাম। তাহা ৪৷৷০টা পর্য্যন্ত,—সন্ধ্যাকালে পড়িয়া দেখাইবার জন্য পাঠ তৈরী করিতাম এবং শব্দও একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতাম। কারণ প্রথম, শব্দের বানান ও অর্থ বেশ তৈরী হইয়াছে দেখিয়া পরে নির্দ্দিষ্ট পাঠ পড়িয়া লওয়া হইত; নচেৎ তিনি রাগ করিতেন। সে রাগ অন্য লোকদিগের মত হাঁক-ডাক কিংবা মুখে কটূক্তি করা নয়, বরং উল্টা চুপ করিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া থাকা। খুব যদি বেশী হইল ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেন। এই অবস্থা অনেকক্ষণ থাকিত। কোন রাগী লোক রাগিয়া উঠিলে সেই রাগের ভরে হাঁক-ডাক করিয়া দুটা গালী দিয়াই খালাস। দুই চারি মিনিটের মধ্যে আবার হাসিতে কথা কহিতে প্রস্তুত—যেন রাগ মোটেই হয় নাই। কিন্তু আমার স্বামীর প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। ছোট খাটো বিষয়ে তাঁর রাগ কখনই হইত না, কিন্তু এইরূপ কোন বিষয়ে রাগ হইলে সে রাগ অনেকক্ষণ থাকিত। সেইজন্য আমার বড় ভয় হইত, মন খারাপ হইত, মনে সুখ থাকিত না। তাই, পারতপক্ষে ঐরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হয়, তার জন্য আমি খুব সাবধান হইতাম। এইরূপে, ইংরেজি দ্বিতীয় বুক্ শেষ করিয়া তাহার দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হইলে পর, ইসপ্ নীতি ও সেই সঙ্গে, বাইবেলের ভাষা সহজ ও তাহাতে ছোট ছোট বাক্য থাকায় বাইবেলের নিউটেষ্টমেন্ট পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ঘরকন্নার কাজ ও পাঠ-অভ্যাসের ব্যবস্থা ঠিক হইলে পর তিনি আমাকে বলিলেন—"এখন প্রতিদিনের উপস্থিত খরচ নিজের হাতে নির্ব্বাহ করে' তার হিসাব টুকে রেখো।" নাসিকে আসা অবধি দুই মাস কাল, আমাদের সঙ্গে বিনায়ক নামে যে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল, তাহার উপরেই উপস্থিত মত খরচ করিবার ও হিসাব লিখিয়া রাখিবার ভার ছিল এবং তদনুসারে সে ঐ কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিত। মোট টাকাটা আমার কাছে থাকিত। কিন্তু আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়া, উপস্থিত মত খরচের জন্য টাকা তাহার হাতেই দিতেন। এখন, উপস্থিত খরচের ভার আমার হাতে লওয়ায়, রোজকার খরচ আমিই লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু প্রায়ই তেরিজ কসিতে ও জের বাকীতে ভুল করায়. মোট বাকীর মিল হইত না, এবং তাহা মিলাইবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতাম। এইরূপ হইলে পর, সে দিনকার নির্দ্দিষ্ট পাঠের অভ্যাস যেমন হওয়া উচিত—তাহা হইত না। তাহার দরুন সমস্ত বিষয়েই বিভ্রাট উপস্থিত হইত। পাঁচ ছয়বার এইরূপ হইলে পর, উনি এক দিন এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রতিদিন জমা খরচের বহি দেখিয়া তাহার পর শুইতে যাইবেন। তদনুসারে, পাঁচ সাত দিন হইয়া গেলে, এক দিন, আমার ভুল কোথা থেকে হয় জানিতে পারিলেন এবং আমি যাহাতে বুঝিতে পারি, এইরূপ স্পষ্টরূপে আমাকে দেখাইয়া

দিয়া এরূপ ভুল যাহাতে আর না হয় সেইরূপ চেষ্টা করিতে বলিলেন। আরো দুই এক বার পরীক্ষা লইয়া তাহার পর, প্রতিদিন জমা খরচের বহি দেখা ছাড়িয়া, মাসের শেষে একবার দেখিবার নিয়ম করিলেন। আমাদের বাড়ীতে খাবার লোক আট জন ছিল। তখন প্রতিমাসে খাই-খরচ কত পড়িত তাহার একটা আনুমানিক হিসাব, আগের দুই মাসের দৈনিক হিসাবের খাতা দেখিয়া স্থির করিতেন। এবং কোন মাসের ১লা তারিখে আমাকে বলিলেন যে, "তুমি, এই মাসে শুধু খাইখরচের জন্য ১০০ টাকা নেও, ওতে পুরা এক মাসের খরচ বেশ চলবে।" আমার আন্দাজ ছিল না, তাই আমার মনে হইল, ১০০ টাকা ত খুব বেশী, এত টাকা কি শুধু খাই খরচেই ফুরাইয়া যাইবে? তখন উনি বলিলেন,—"ভালই ত, যদি এর চেয়ে কম টাকা লাগে, যে টাকা বাঁচবে তা আমি ফেরত নেব না। তোমার শেলাই কাজের জন্য তোমাকে বক্‌শিস্ করব।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। তাহার পর আমি আবার বলিলাম, "ইহার ভিতর চাকরদিগের বেতন, চাঁদার টাকা প্রভৃতি আসিবে না ত"? তখন, তিনি বলিলেন, "খাই-খরচ ছাড়া, অন্য খরচ ওর ভিতর নেই। অন্য খরচের জন্য, তুমি আর কিছু টাকা বের করে' নিও। কেবল আমার এখনকার মতো আহারের ও জলযোগের জিনিস ঠিক সব পাওয়া চাই, তাতে কমি হলে চলবে না,—কিন্তু যে-কোন জিনিস আনাতে হবে তা নগদ মূল্যেই আনাতে হবে—ধারে নয়"। এত করে' বলিলেও আমার মনে কিছুই বসিল না; উল্টা, এত টাকা কি-করিয়া ফুরাইবে ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। সেই মাসের ২০দিন বিনা বিভ্রাটে কাটিয়া গেল; কিন্তু তাহার পর, ২১শে তারিখ হইতে,—একেবারে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী পরিবারবর্গের, মাসকাবারে যেরূপ টানাটানি হইয়া থাকে ও তাহার দরুণ গোলযোগ ঘটে, আমার অবস্থা সেইরূপ হইল। ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত আমি,—আলাদা বাহির করা পুঁজি অনেকটা ক্ষয় হইয়া গেলে,—একেবারে মর্ম্মাহতের ন্যায় হইয়া, এতটা ভাবিত হইয়া পড়িলাম যে, সে ভাবনা কিছুতেই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ভাবনা চিন্তা করিয়া রোজকার খরচ অল্পই কমান যায়। ঐ টাকায় খরচ চালাতেই হইবে। এবং অনুমতি ব্যতীত বেশী টাকা খরচ করা যায় না। সেইজন্য আমি খুব ভাবিত হইয়া পড়িলাম। এইরূপভাবে দুই একদিন চলিয়া গেলে, উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আজকাল তুমি এরকম নিরুৎসাহ ও মন-মরা হয়ে আছ কেন? তোমার কিছু হয়েছে কি"? এই কথা শুনিয়া আমি আরও মর্ম্মাহত হইলাম (কারণ এই বিষয় তাঁর নজরে না পড়ে বলিয়া খুব চেষ্টা করিতাম) এবং ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলাম,—"না, আমার কিছু হয়নি।" তাহার পর,—খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে আরও কিছু টাকা বাহির করিয়া লইব কিনা,—ইহ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাজারবার মনে হইতেছিল কিন্তু আমার অভিমানী স্বভাব তাহা করিতে দিল না এইরূপে মন বেশী অস্থির হইয়া উঠিলে, আমি একেবারে কাঁদিতে লাগিলাম, কান্না ঢাকিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা পূর্ব্বেই উনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমি না বলিলেও অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, এবং "খরচের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে এইটুকু কথা আমার মুখ হইতে বাহির হবামাত্র উনি বলিলেন যে, "খরচের জন্য যত টাকা আবশ্যক, বার ক'রে নেও। এর দরুণ এতটা মন খারাপ হবার কারণ কি? সমস্ত টাকা তোমার কাছেইত আছে। তবে এত ভাবনা কিসের জন্য? টাকার কমী হলে মন খুলে বলবে। ওরকম মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে না। অল্প খরচ করতেই হবে এরকম আমাদের অবস্থা নয়, আর তার জন্য ভাবিত হবারও কোন কারণ নেই। কিন্তু ব্যয় সংযম করতে ও হিসাব টুকে রাখতে শিখলে মানুষের মনোযোগ ও বিচক্ষণতা বাড়ে ও গৃহের সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থাক্রমে চলে—এইটিই তোমাকে শেখান আমার উদ্দেশ্য। আমার এই উদ্দেশ্যের দিকে একটু যদি তোমার লক্ষ্য থাকত তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কাজটাকে একটা ভার মনে করে ওরকম পাগলের মত ভাবিত হয়ে পড়তে না; এখন থেকে যত টাকা লাগে তুমি নিতে থাকো কিন্তু কেবল খরচটা সময় মত টুকে রেখো"—এইরূপ উনি বলিলেন। সেই মাসে যত টাকা খরচ হইয়াছে সেই পরিমাণ টাকা খরচের জন্য বাহির করিয়া লইতে বলিলেন। এই সময়ে উঁহার ৮০০৲ টাকা বেতন ছিল। বেতনের সমস্ত টাকা ও ঘরের সঞ্চিত সমস্ত টাকা আমার কাছেই থাকিত। কারণ উনি এক পয়সাও নিজের কাছে রাখিবেন না, এইরূপ নিয়ম ছিল। কোন তালার চাবি কোন প্রসঙ্গেই তিনি হাতে লইতেনই না, পৈতায় ঝুলাইয়া রাখা তো দূরের কথা কিন্তু সমস্ত টাকা আমার নিকট থাকিলেও মাসিক খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট টাকা ছাড়া উঁহার অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত আমি পাঁচ টাকার বেশী খরচ করিতাম না। বেশী খরচ করিতে হইলে, উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই উনি "হাঁ" বলিতেন, "না" কখন বলিতেন না; কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া অধিক খরচ করিলেও রাগ করিতেন না। এবং তদনুসারে চলিতে আমি কখন অবহেলা কিংবা কসুর করি নাই। সেইজন্য আমাদের উভয়ের মধ্যে, রাগ কিংবা অসন্তোষ উৎপন্ন হইবার প্রসঙ্গই হইত না। (ক্রমশঃ)

(সন ১২৩৪ সালের ৩রা ভাদ্রের)

অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের অনুমতি-ক্রমে গত ৩ রা ভাদ্র (১৯১৭ খৃঃ, ১৯ আগষ্ট) রবিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দালানে আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভা আহূত হইয়াছিল।

সভায় উপস্থিত ছিলেন—(১) শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক (২) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, (৩) শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন, (৪) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৬) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতিগণের অনুপস্থিতি প্রযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে এবং চিন্তামণি বাবুর সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তৎপরে—

১। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম, এ, বিদ্যার্ণব অধ্যক্ষসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

২। ১৮৩৯ শকের আনুমানিক আয়ব্যয় আলোচিত হইল।

বজেট এক প্রস্থ করিয়া প্রত্যেক অধ্যক্ষের নিকট পাঠানো হইয়াছিল।

স্থির হইল—এই বজেট গৃহীত হউক এবং উহাতে ট্রষ্টীগণের সম্মতি লওয়া হউক।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপিবার বিষয় আলোচিত হইল।

ইহার খরচ বজেটে ধরা আছে।

স্থির হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ শীঘ্রই ছাপানো হউক।

৪। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের ২রা জুন তারিখের পত্র আলোচিত হইল। (পরিশিষ্ট ক)

এই পত্রে তিনি বিতরণার্থ ২০ খানি ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ) অর্দ্ধ মূল্যে চাহিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাবে, আদিসমাজের অনুমতি পাইলে প্রত্যেক সূত্র কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া তাৎপর্য্যের ইংরাজী অনুবাদ সহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের নূতন সংস্করণ তিনি মুদ্রিত করিতে চাহেন।

স্থির হইল—(১) সুলভ ব্রাহ্মধর্ম্ম কয়েক খণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকাতে প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে ১০ খণ্ড অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া হউক।

(২) প্রাণকৃষ্ণ বাবুকে লেখা হউক যে ইং-রাজী অনুবাদ সহ ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী সংস্করণ তিনি প্রকাশ করিলে আদিসমাজের তাহাতে আপত্তি নাই। অধ্যক্ষ সভার অনুরোধ এই যে তিনি তাঁহার অনুবাদ আদিসমাজের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি জন্য যেন পাঠাইয়া দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের সূত্র কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে উল্লেখ সম্বন্ধে অধ্যক্ষসভার বক্তব্য এই যে তাহা সম্ভবপর নহে, কারণ একই সূত্র বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে; তদ্ব্যতীত সেরূপ করা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য হইবে।

৫। All-India Theological College এর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের গত ২১ শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে "থিও-লজিকাল কলেজফণ্ড" স্থাপন করিয়া তাহা হইতে প্রচারক প্রভৃতির বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থার জন্য উক্ত ফণ্ডে ৬২৫৲ টাকা প্রদানের প্রস্তাব আলো-চিত হইল (পরিশিষ্ট খ)

স্থির হইল—যে সর্ত্তে এই টাকা প্রদান করা হইতেছে, সেই সর্ত্তে উহা গ্রহণ করা হউক এবং উহার পৃথক হিসাব রাখা হউক।

৬। মণিপুর প্রবাসী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের গত বর্ষের ১৬ই আগষ্ট তারিখের পত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিপোষক কয়েকটী পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ে মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

স্থির হইল—কাগজের মূল্য দিলে এবং অনুবাদ ভাল হইলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ছাপাইয়া দেওয়া যাইবে।

৭। মাদ্রাজের ভি, লক্ষ্মী নরসিংহের কয়েক দিবস সমাজে অবস্থিতির প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা প্রভৃতির জন্য বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তিকে সমাজে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

৮। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের প্রচার কার্য্যের জন্য পাথেয় দিবার প্রস্তাব আলো-চিত হইল।

অধ্যক্ষসভার কার্য্য বিবরণ

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে তাঁহারই উৎসাহে অধ্যক্ষ সভা বসিতে গেলে নবজীবন লাভ করিয়াছে। সমাজ হইতে তাঁহাকে ইতি পূর্ব্বে ২০৲ টাকা সাহায্যও করা হইয়াছে।

স্থির হইল—সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কেদার বাবুকে প্রচার কার্য্যের জন্য সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৯। "নচিকেতা" গ্রন্থ ছাপাইবার বাবতে ১১৯৷৶০ টাকার দেনা হইতে শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রেরণ প্রভৃতি নানা উপায়ে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার কারণে অতুল বাবু এখন অবধি যে সকল প্রবন্ধ দিবেন তদ্বাবতে যে পারিশ্রমিক পাইবেন তাহা হইতে ছাপিবার খরচ কাটাইয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহাকে কাগজের মূল্য যাহা পড়িয়াছে তাহা দিতে হইবে।

১০। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিশ্রের বিনামূল্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাইবার প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতার সময়ে পত্রিকা তাঁহাকে বিনামূল্যে দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট পত্রিকার মূল্য বাবতে প্রাপ্য ১০৲ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হউক।

১১। ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিত কালের বেতন পাইবার প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ১৩২২ সালের ১৮ই মাঘ তারিখে বাটী যান এবং ২৪ শে চৈত্র এখানে আসেন। বিগত ১৩২৩ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে উক্ত ২ মাস ৬ দিনের বেতনের আবেদন করেন। বিবেচিত হইয়া অর্দ্ধেক বেতন দেওয়া স্থির হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এরূপ অনুপস্থিত হইলে অবসর প্রদানের আদেশ হয়। ১৩২৩ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৫ দিনের ছুটী লইয়া পুনরায় বাটী যান. অবসর কাল অতীত হইলে কার্য্যে যোগ না দেওয়ায় অধ্যক্ষসভার পূর্ব্বাদেশ অনুযায়ী ৭ই আষাঢ় তারিখে অবসর পত্র দেওয়া হয়। ১লা বৈশাখ হইতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত একমাস সাত দিন উপস্থিত ছিলেন। উক্ত এক মাস সাত দিনের বেতন ৩০৲ হিঃ ৩৭৲ টাকা পাওনা আছে। তিনি ইহার উপর জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩ সপ্তাহের বেতন প্রার্থনা করেন।

সমাজ হইতে তাঁহাকে ১১৲ টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহার পিতা ৺ ঈশানচন্দ্র বসুর "ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা" পুস্তক মুদ্রণহিসাবে ১২০৲ টাকা পাওনা আছে।

স্থির হইল—অনুপস্থিত কালের প্রার্থিত বেতন দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার নামে হাওলাতী টাকা দানসাহায্য হিসাবে খরচ লিখিয়া হাওলাত শোধ করিতে হইবে। তাঁহার নিকট "ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা" পুস্তক মুদ্রাঙ্কন হিসাবে প্রাপ্য টাকা হইতে ছাপাইবার খরচ ছাড় দিয়া কাগজের মূল্য চাওয়া হউক।

১২। The Calcutta Temperance Federation হইতে প্রাপ্ত গত ৩০শে জুলাইয়ের পত্র আলোচিত হইল।

স্থির হইল—সম্ভবপর হইলে এই সভার সহিত আদিসমাজ মিলিতভাবে কার্য্য করিলে ভাল হয়।

১৩। কালনা ব্রাহ্মসমাজের জমীর কবুলতি প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।

কবুলতির মুসবিদা এই সঙ্গে দেওয়া গেল (পরিশিষ্ট গ)। এই কবুলতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

স্থির হইল—কবুলতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৪। ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষের অবসরকালে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একাকী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করায় অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং ১৩২৪ সালের বৈশাখ হইতে বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা আলোচিত হইল।

স্থির হইল—বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ হইতে উহার বেতন মাসিক ৫৲ হিসাবে বর্দ্ধিত হউক এবং তাহাকে উভয় পদের বেতনের বাড়তির (difference এর) পঞ্চমাংশ পারিতোষিকরূপে দেওয়া হউক।

১৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আকার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আলোচিত হইল।

আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী কয়েক ব্যক্তি পত্রিকার আকার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। তদুপলক্ষে এ বৎসরের প্রথমেই একটী পত্র আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যমাত্রেরই নিকটে পাঠাইয়া মত চাওয়া হইয়াছিল। প্রাপ্ত মতসমূহের সংক্ষেপ একটী তালিকাকারে অধ্যক্ষগণকে পাঠান হইয়াছিল। (পরিশিষ্ট ঘ)

অবিসম্বাদভাবে স্থির হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত নহে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক।
সভাপতি।

১৮।৯।১৭

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪।১০।১৭ ট্রষ্টী।

পরিশিষ্ট।

(ক) শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের পত্র।

৫৬, হ্যারিসন রোড্,
২, ৬, ১৭,

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

অনেক যুবক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে আমার কাছে আসে। আমি অনুভব করি তাদের প্রত্যেকের হাতে এক খণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ দিতে পারলে ভাল হয়। এইজন্য ২০ খানা সুলভ সংস্করণের পুস্তক পাইলে ভাল হয়। আপনি যদি ঐ পরিমাণ পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে দেন তাহা হইলে উপকৃত হই। পুস্তকগুলি বিতরণ করা হইবে।

আর একটি কথা অন্যান্য প্রদেশের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের একটী সংস্করণ করিতে চাই। তাহাতে মূল শ্লোক, তাহার ব্যাখ্যা থাকিবে—বাংলা অংশের পরিবর্ত্তে তাহার ইংরাজী অনুবাদ থাকিবে। প্রত্যেক শ্লোক কোন্ উপনিষৎ হইতে তাহার উল্লেখ থাকিবে। ইহাতে আপনাদের অনুমতি পাইলে প্রসন্নমনে কার্য্যের আয়োজন করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ভিন্ন ইহাতে অন্য লক্ষ্য নাই। আর্থিক হিসাবে ক্ষতি হওয়াই বেশী সম্ভব।

বিনীত নিবেদক
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য।

LETTER FROM THE ASST. SECRETARY ALL INDIA THEOLOGICAL COLLEGE.

(খ) 92/3 Upper Circuler Road,
21st March 1917.

Dear Sir,

The Council of the All-India Theological College is willing to make over a sum of Rs 625 out of the balance of its funds, to the Adi-Brahmo Samaj on condition that the amount shall be invested with or without any addition that the Samaj may make, in permanent security to be called the "Theological College fund" and the proceeds shall be devoted to giving stipends, grants or medals to students preparing themselves for the mission work of the Brahmo Samaj or allowance as grants to the missionaries of the Brahmo Samaj.

I shall be obliged if you will kindly let me know at an early date if your Samaj is willing to accept the offer.

yours faithfully
Hem Chandra Sarcar
Asst. Secretary All-India
Theological College.

(গ) মহামহিম বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতপ বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, কে সি, আই, ই, আই, ও, এম,
বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী

কস্য কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে, বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের দেবত্তর মহল কাছারী সংক্রান্ত তহশীল মহল নওয়াগঞ্জ কালনার মালের সেরেস্তার অধীন নওয়াগঞ্জ কালনার ছুটা মহালের মধ্যে নিম্নের চৌহদ্দির লিখিত কাঠা জায়গা ১৯১২।১৬৯১ নং বাকীকর নিলামে খাস খরিদ হওয়ায় ঐ জায়গা আমি বন্দোবস্ত করিয়া লইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলে উক্ত জায়গার সালিয়ানা ১৵৩ টাকা খাজনা স্বীকারে এবং একসনের জমার উপযোগী ১৵১ টাকা ডিপজিট রাজসরকারের নওয়াগঞ্জ কালনার মালের সেরেস্তায় দাখিল করত স্বত্তী প্রজাই স্বত্বে এই কবুলতি লিখিয়া দিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে—

১। এই জমার কমী, নাজাই, পতিত, জায়গা দখল না করা বা না পাওয়া ইত্যাদি লোকসানী কোন দফার ওজর না করিয়া অবধারিত মালগুজারীর টাকা সন সন বিমর্জ্জিন নীচের কিস্তীবন্দী অনুসারে কিস্তি কিস্তি নওয়াগঞ্জ কালনার তহশীল সেরেস্তায় যিনি যখন তহশীলদার নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহার নিকট আদায় দিয়া রাজসরকারের প্রচলিত রীতিমত ছাপকৃত চেক দাখিলা লইব সেওয়া দাখিলায় কোনও টাকা আদায় দিলে খাজনায় মুসমা পাইব না।

২। মালগুজারীর টাকা আদায় দিবার কিস্তী খেলাপ করি তাহা হইলে কিস্তি খেলাপি টাকার শতকরা বার্ষিক ১২৷৷০ টাকা হিসাবে আদায় কালতক সুদ দিব ও বাকী খাজনা আর সুদ জায়গার উপর সর্ব্বাগ্রগণ্য দায় স্বরূপ পরিগণিত হইবে।

৩। মালগুজারির টাকা আদায় না দিলে কিস্তি কিস্তি কিম্বা এককালীন রাজসরকার আমার নামে নালিশ করিয়া আসল আর সুদ খরচা বেবাক বাকী আমার স্থাবর অস্থাবর যাহা আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবেক তাহা ক্রোক ও বিক্রয় মতে ও আমার উক্ত জামিনী টাকা ও জায়গা হইতে ইচ্ছামুরূপে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাতে আমার কিম্বা আমার ওয়ারীসানের কোনও ওজর আপত্ত চলিবে না।

৪। উক্ত জায়গায় মিউনিসিপাল ট্যাক্স যাহা ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যতে যাহা হইবেক বা গভর্ণমেণ্ট হইতে অন্য রকমের নূতন কোনও দরি অঙ্ক ধার্য্য কি বৃদ্ধি হইবে তৎসমুদয় আমি আলাহিদা আদায় দিব। রাজসরকার তজ্জন্য কোনও দায়িক হইবেন না এবং তাহা আদায় দিবার জন্যে কোনও ওজর আপত্ত করিতে পারিব না করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

৫। উক্ত জায়গায় সীমানা সরহদ্দ আমূল মামুল বজায় মতে দখল করিব আমার হেপাজাতের ত্রুটীতে জায়গার সীমানা সরহদ্দ বাহির হইয়া যায় তাহাতে রাজসরকারের যে পরিমাণ ক্ষতি হইবেক তাহার দায়িক আমি হইব ঐ জায়গার হানিকর কোনও রূপান্তর করিতে পারিব না।

৬। জায়গা মজকুরের যে মাপ রাজ সেরেস্তায় প্রকাশ আছে তাহা পরিমাণে বেশী হইলে যে পরিমাণ জায়গা বেশী হইবেক তাহা আমার দখল করার তারিখ হইতে উক্ত জমার হারাহারিতে যে জমা ধার্য্য হইবেক তাহা এই জমার উপর বার আনিয়া আদায় দিব, তদ্বিষয়ে কোনও ওজর আপত্ত করিতে পারিব না করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

৭। উক্ত জায়গায় নূতন ভীদ খুলিয়া কোনরূপ ইমারাত আদি করিবার আবশ্যক হইলে রাজসরকারের বিনা হুকুমে করিতে পারিব না।

৮। ঐ জায়গা বা তাহার কোনও অংশ গভর্ণমেণ্ট কোনও কার্য্যবশত গ্রহণ করিলে তাহার ক্ষতিপুরণ আদি যাহা পাওয়া যাইবেক, তৎসমুদয় রাজসরকার লইবেন তবে ঐ জায়গায় আমার কৃত কোনও ইমারত থাকিলে তাহার ন্যায্য মূল্য আমি পাইব ও হারাহারি মত জমা কমি পাইব মাত্র।

৯। ঐ জায়গার উপর কোনও অকুয়াৎ উপস্থিত হইলে তাহার জবাব দিহি আমি করিব, রাজসরকারের সহিত কোনও এলাকা নাই।

১০। জায়গা মজকুর যে কোন কারণে রাজসরকারের খাস করিবার ইচ্ছা হইলে, যে নিয়মে নোটীশ পাইব সেই নিয়ম মধ্যে উক্ত জায়গাস্থিত কোনও ইমারতাদি থাকিলে সেই ইমারতের তৎকালের উচিত মূল্য লইয়া জায়গা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিব, ছাড়িয়া দিবার পক্ষে কোনও ওজর আপত্ত করিতে পারিব না, যদি তাহা করিও তৎসম্বন্ধে রাজসরকারকে কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হয় তাহা হইলে তৎসূত্রে যতদিন কালাতীত তাবৎকালের প্রতি সন বার্ষিক জমার তিন গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব।

১১। ঐ জমার মালগুজারী আদায়ের মাতব্বরী কারণ কোং টাকা নগদ জামিন দাখিল করিলাম, যাবৎ এই স্বত্বী প্রজার দায় হইতে পরিত্রাণ না পাইব, তাবৎ উক্ত টাকা ফেরৎ কিম্বা তাহার কোনও সময়ের সুদ পাইবার কোনও দাবী দাওয়া করিতে পারিব না এবং আমার অপর কোনও দেনার দায়ে উক্ত টাকা ক্রোক বিক্রয় হইবে না।

১২। ঈশ্বর না করেন ইতিমধ্যে আমি ফৌৎ কি অনুদ্দেশ হই তাহা হইলে আমার ওয়ারীসান যে কেহ বর্ত্তমান কায়েম মোকাম ও স্থলাভিষিক্ত থাকিবে তাহাদের প্রতি আমার এই লিখিয়া দেওয়া কবুলতির স্বর্ত্ত আমার সমানরূপে আমলে আসিবে। এতদর্থে আপন খুসিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি।

তপশীল চৌহদ্দি—

(ঘ) **আকার পরিবর্ত্তন।**

সপক্ষে।

১। শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়—বোয়ালিয়া, রাজসাহী।
লম্বায় ১/২ ও চাওড়ায় ১/২ অংশ কমাইয়া দিলে ভাল হয়।

২। রায় বসন্তকৃষ্ণ বসু বাহাদুর—৬৩ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর আকার হইলে ভাল হয়।

৩। শ্রীচণ্ডীচরণ রায়—রংপুর।
আকার কিছু ছোট করিলে ভাল হয়।

৪। শ্রীকাশীনাথ রুদ্র সরকার—আলিপুর।
আকার নয় ইঞ্চি করিলে ভাল হয়।

৫। শ্রীঅনাদিধন বন্দ্যোপাধ্যায়—গাজিপুর।
আমার মতে ভারতীর মত হইলে ভাল হয়।

৬। শ্রীঅক্ষয়কুমার সিংহ—দারিবাঁধ।
এই প্রেরিত পুস্তকের আকারে বাহির হইলে ভাল হয় (রামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক রিপোর্টের আকার)।

বিপক্ষে।

১। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস—খারওয়ার।
আকার পরিবর্ত্তন সঙ্গত নহে ইহাতে উহার মৌলিকতা নষ্ট হইবে।

২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চট্টগ্রাম।
পূজ্যপাদ মহর্ষি দেব যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার অন্যথা যাহাতে না হয় তাহাই আমার ইচ্ছা।

৩। রায় সাহেব রসিকলাল রায়—৯৬।১ নং গড়পার।
এতাবৎকাল যে পবিত্র আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে সেই আকার চিরবিদ্যমান রাখা আমার মত।

৪। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দেব—পানবাজার, গৌহাটী।
আকার পরিবর্ত্তন না করাই ভাল।

৫। শ্রীসুকুমার হালদার—চাঁইবাসা।
আমি আকার পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৬। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মল্লিক—পাণ্ডুয়া।
৭৪ বৎসর যে আকার চলিয়া আসিতেছে সেই আকার থাকাই প্রার্থনীয়।

উনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯২ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

ভাসাও তরী।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(রামপ্রসাদী সুর)

পাল্ তুলে দাও, ভাসাও তরী॥
ডাক এসেছে, ওপার্ হতে
মায়ের ঘরে হবে যেতে
(সবাই) আনন্দেতে, হৃদয় ভরে
একমনে যায় গো চলি।
ওপারেতে, দেখ্ না চেয়ে
আলোয়, আলো যাচ্ছে ছেয়ে
(সেই) আলোর নাচে, স্রোতের মাঝে
ছুটছে তরী হেলি দুলি।
ভাসা মেঘে, চাঁদের মত
ঢেয়ের পরে হাঁসের মত
(আমার) পাগল হয়ে, হৃদয় ছোটে
কে আর্ তারে রাখবে ধরি।
সারা পালে, লেগেছে বায়
জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায়
এমন্ সুযোগ, দিয়ে ছেড়ে
রোস্ নে কো পাছে পড়ি।
(হোথা) সাঁঝের্ আগে, হবে যেতে
চল্ রে ধরে অভয় হরি॥

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার গান।

(ডাক্তার শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু)

কবি সাধারণতঃ দুই দিক দিয়া দেখিয়া কবিতা রচনা করিয়া থাকেন—একদিক হইতেছে চক্ষু, অন্যদিক হইতেছে হৃদয়। যাঁহারা শুধু একটা কিছু দেখিয়া কবিতা রচনা করেন তাঁহাদের কবিতাগুলি প্রায়ই একঘেঁয়ে হয়। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কবিতার মাধুর্য্য উপভোগ শেষ হইয়া যায়। আর যাঁহারা ভাবের কবি, যাঁহারা চক্ষু ও হৃদয় উভয় লইয়া কাব্যকুঞ্জের অধিকারী হন, তাঁহাদের কবিতা মর্ম্মস্পর্শী ও নূতন ধরণের হয়। এই ভাবের যে সকল কবিতা, সেগুলি কখন কোন বাঁধা অর্থের ভিতরে নিজের মাধুর্য্যকে ধরা দেয় না। এইগুলি কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—কবিতার এই বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এত নিন্দা ও প্রশংসা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা তাহাব অর্থ লইয়া যদি কাহারো কোলাহল করিতে হয় করুন, তাহাতে সাধকের সাধনা কখনও ভঙ্গ হইবে না। তিনি গাহিয়াছেন

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষ মুগ্ধ হয় কেন? কারণ, তাঁহার কবিতার মধ্যে মানবজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাগুলির প্রতিধ্বনি সর্ব্বদাই পাওয়া যায়।

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে
কাঁদিছে আপন মনে।"

এই যে সৃষ্টির অনাদি কাল হইতে মানবের ক্রন্দন, এ ক্রন্দন যিনি শোনেন তিনিই তো কবি! কবিবর অভয় বাণীতে নূতন আশা জাগাইয়া বলিয়াছেন—

"ভয় নাই ভয় নাই ওরে ভয় নাই
কিছু নাই তোর ভাবনা ;
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে
পূরিবে সকল কামনা ;
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।"

এই যে অভয়বাণী. এই যে এত বড় আশার কথা—তবু ব্যাকুল পরাণের উদ্বেগ মিটিল কই? ফাগুনের প্রভাতসমীরণে, প্রভাতসূর্য্যের দিকে হাসিয়া ফুল যখন প্রতিযোগিতায় বলিয়া উঠে—"দেখ দেখি কে সুন্দর" তখন কুঁড়ির ভিতরের বদ্ধ গন্ধ অতৃপ্ত বাসনায় ছটফট করে, তাই না বিকাশের জন্য পূর্ণতার জন্য "কুসুম দল বন্ধ" মানব আত্মার এ ক্রন্দন যুগে যুগে ধরিত্রীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কুড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপন মাঝে।
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কি জানি কিসের কাজে॥

এই যেতে চাওয়া, এই ব্যাকুল হওয়া এই জীবনের প্রারম্ভে ছটফট—এ কুঁড়ি জীবনে কে না উপলব্ধি করেছেন? এ সকল কেন? এ কেনর জবাব কেউ দিতে পারেন নাই। কোথায় পথ, কোথায় যেতে হবে, কেহই জানেনা—তবু যেতেই হবে।

আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চ'লে যাবে না।

কবির এ আশ্বাসবাণী যদি না থাকিত, তবে ব্যাকুলতাও থাকিত না,—এ ডাকে যে ব্যাকুলতা আরো বাড়াইয়া দেয়। আবার এই ব্যর্থ আশাকে ধিক্কার দিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আশারে কই ঠাকুরাণী—
তোমার খেলা অনেক জানি
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস।

তাপদগ্ধ সংসারী—সারাজীবনে যাহারা ব্যর্থতার ফোঁটা ললাটে দাগিয়া লইয়া আশার শেষে গিয়া দাঁড়াইয়াছে,তাহাদিগকে কবি কত বড় পদ দান করিয়াছেন—ভবিষ্যতে কত বড় অমৃতখণ্ড পাওয়াইবার জন্য তাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন—

রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীত দাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

একথা শুনিয়া দীন দুঃখীরও কি প্রাণ পরিপূর্ণতার দিকে নব আশা লইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহে না? এতবড় সত্য কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবে? মৃত্যু যেমন না আসা পর্য্যন্ত মানুষের ভুল ভাঙ্গে না, তেমনি মনের গতি না ফিরিয়া গেলে এ কথাটাও কেহ মানিবে না। সত্য চিরকালই সত্য, তবু এত বড় সত্য কথার উপর কেহ নির্ভর করিতে পারে না,—তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে মানুষ সর্ব্ব কার্য্যের ভিতরেই সিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বা কতকগুলি কবিতার পরিচয় দিতে গেলেও একখানা পুস্তকের আকার আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ আশার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের বাঁশী শুনিয়া আমাদিগকে ভক্তিরও কত কথা শুনাইয়াছেন।

এই যে নানা সুরের ছন্দ, এ ছন্দ কবি না শুনাইলে বঙ্গসাহিত্যে একটা অপ্রকাশিত দিক চিরলুক্কায়িত থাকিত। অভিধানের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কেহ কি কবিতার সুখ উপভোগ করিয়াছেন? কিন্তু কবি সেই শব্দগুলিই বাছিয়া লইয়া নৈপুণ্য ও শৃঙ্খলা সাহায্যে তাহাতে কবিতার মাধুর্য্য ফুটাইয়া দেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না দেন সে পর্য্যন্ত আমরা কবিতার রসগ্রহণে সক্ষম হই না। সেই রসের মধুরতা যখন মর্ম্মস্থল স্পর্শ রে কতখনই কবির প্রতি শ্রদ্ধা আপনি ছুটিয়া যায়, কেহ তাহার গতি রোধ করতে পারে না। আজ বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

বসন্তের শেষ রাতে, এসেছিরে শূন্য হাতে
এবার গাঁথিনি মালা তোমারে করি দান।

ইহাতেই বুঝা যায় যে ভগবানকে রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া পাইতে চান। এ মালা না গাঁথাতেই,

কাঁদিছে নীরব বাঁশি অধরে মিলায়ে হাসি,
তোমার নয়ন ভাসে ছল ছল অভিমান,
এবার বসন্ত গেল, হলনা গান।

ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই যে আপন ভাব, এ মানুষ লালসায় ডুবিয়া থাকিয়া লাভ করিতে চায় না, কিন্তু কবি বলিয়াছেন,

আরো আঘাত সইবে আমার—সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝঙ্কারো॥

এই যে যাচিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা—এ কেন? দুঃখ যদি আসে, ব্যথা যদি মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে, তাহলেই যে সে বিজয়ীর মত ভগবানকে লাভ করিতে ছুটিবে। তাই

যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে,
বাজেনি তা চরম তানে
নিঠুর মূর্চ্ছ্ণার সে গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো।

চরম তানে যদি বাজিত তাহা হইলেতো মানুষ তখনই হৃদয়ে ভগবানের মূর্ত্তি সঞ্চারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত। ব্যথা জাগিতে জাগিতে—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে॥
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল
আমার জীবনে তব সেবা
তাই বেদনার উপহারে।

কুঁড়ি-জীবন থেকে কবি কি বেদনা কেন বহিয়া আজ জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা সম্ভবত কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ নীরব সাধক, নীরবে গান গাহিয়াই তাহার সিদ্ধি একদিন নীরবে বরণ করিয়া লইয়া যাইবেন। প্রকাশ হইলে কবি ব্যস্ত হইয়া পড়েন, বাহিরে কবিকে লইয়া কোলাহল হইলেই কবি গান ধরেন

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে,
মরচে সে এই নামের কারাগারে।

সে গান শুনিয়া দেশ যখন তাঁহাকে সকল কোলাহলের ভিতরে বলপূর্ব্বক ডাকিয়া আনে, তখনও কি তিনি গান নাই?—

অহঙ্কারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে—
রাখ আমায় যেথা আমার স্থান।

এই অহঙ্কারে জড়িত হইয়া অপরাধী হইবেন বলিয়াই তিনি ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

গর্ব্ব করে নিইনি ওনাম জান অন্তর্য্যামী।
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে॥

তিনি এমনি ভাবে লজ্জিত হইয়া তাঁকে তো একভাবে চান নাই,—

তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে,
এস গন্ধে বরণে এস গানে।

* * *

এস দুঃখ সুখে এস মর্ম্মে,
এস নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে;
এস সকল কর্ম্ম অবসানে।

এমন ভাবে প্রাণ দিয়া যাঁহাকে নানা ছন্দে চাহিয়াছেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর পাইয়াছেন। কবি ত্যাগী, লালসাহীন, সব ছাড়িয়াছেন, তাই সব তাঁর বজায় আছে।

মানুষের কোলাহলে যেই কবির ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইবে, অমনি ব্যাকুল কবি গাহিয়া উঠিবেন,—

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছো নয়নে নয়নে;
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
রয়েছো হৃদয়ে হৃদয়ে॥

বালকের মত কবি যখন এমনি বিভোর—ধরি ধরি করিয়া যখন ধরিতে পারেন না, তখনই হার মানিয়া গাহিয়াছেন,—

তুমি কেমন করে গান করহে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।

পাওয়ার মত হইলেই মানুষের নানা বাধা সম্মুখে পড়ে, পাওয়া আর হইয়া উঠে না। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।
হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি।

এত গেল তাঁর নীরব সাধনা। আবার দেশকে তিনি ভক্তি করিয়া গাহিয়াছেন—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি-নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী।

সমস্ত সাধনার মাঝখান থেকে কার এ আহ্বান বাণী,—

"ধূলি শয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে।"

মানুষহ ইবার জন্য তাঁর এ ডাক তো আজকার নহে, ডেকে ডেকে সারা হইয়াই নিজেকে নিজে বুঝাইয়াছেন—

যদি তোর ডাক শুনে ভাই কেউ না আসে
তবে তুই একেলা চলরে।

সোণার বাংলা তাঁর প্রাণ, বাঙ্গলার মাটী তাঁর তীর্থরেণু। এমন হৃদয় নিংড়াইয়া কেহ জননী জন্মভূমিকে ভাল বাসেন নাই। কৈ—একজনও তো একবার বলেন নাই,—

আমার সোণার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।

কৈ মায়ের কোমল স্পর্শে মাতিয়া কেহইতো শান্তির সুরে গান নাই—

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটেরমূলে নদীর কূলে কূলে।

জননীর মলিন মুখ দেখিয়া কৈ একজন বাঙ্গালীও তাহাতে ব্যথিতকণ্ঠে বলেন নাই—

মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
আমি নয়ন জলে ভাসি।

এভাবে কত ব্যথার গান, কত শান্তির গান, কত জাগরণের গান, কত আশার গান গাহিয়া গাহিয়াও খাঁটী জিনিষকে ধরিতে কবি আবার গাহিয়াছেন,—

হেথা যে গান গাইতে আসা,
হয়নি সে গান গাওয়া,
আজো কেবলি সুর সাধা,
কেবল গাইতে চাওয়া।

এমনি কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই না কবি পরিপূর্ণতার সুরে গাহিয়াছেন,—

এবার নীরব করে দাওহে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে॥

তাই না সব সম্পদ, যা কিছু বাহ্যিক আনন্দ তা ছাড়িয়া কবি বলিয়াছেন—

বহুদিনের বাক্য রাশি,
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

এ গান তাঁর প্রাণের; এই গানের সুরেই তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা আনয়ন করিবে; তিনি চান,—

তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য সাধিব।
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিও কোলে
বিরাম আর কোথা লইব॥

রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দময় জীবন কোন্ এক ঈপ্সিতের জন্য অনির্দ্দিষ্ট পথে আত্মগোপন করিয়া আছে, কয়জন তাহার খোঁজ রাখে। জগতের স্তুতি ও নিন্দা তাঁহাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না।

আলো ও ছায়া।

জগতের যাহা কিছু হাসি আর ভালো।
সকলের পরিচয় বুঝি তুমি আলো॥
তবু কেন থাকে তাহে আঁধারের ছায়া।
কিছুই বুঝিতে নারি কি যে তাঁর মায়া॥
শুধু জ্যোতি কেবা পারে সুদীর্ঘ সহিতে।
তাই বুঝি দেখি তায় আঁধারে ঢাকিতে॥
নিদাঘের তাপ যবে দগধিয়া মারে।
আঁধার জলদ ঢালে মধু বারিধারে॥
গোলাপ কুসুম নাই কণ্টকবিহীন।
প্রেম জাগে কোথা, বিনা বিরহ মলিন?
সুখ দেন যিনি, পাছে রহি তাঁরে ভুলে।
তাই বুঝি সুখ মাঝে দুঃখছায়া তুলে॥
গভীর আনন্দ যবে চিত্তে পরকাশে—
দুঃখের আঘাতকম্প কোথা হতে আসে॥
কেনই বা আসে আর আসে কোথা হতে।
কিছুই না জানি বুঝি, ভাসি সংশয়েতে॥
আলো আঁধা মিলে আনে বিশ্বে প্রেমগান।
সন্ধ্যার রাগিণী নিতি ঢালে নব প্রাণ॥
তারি মাঝে জেগে ওঠে দয়াময় নাম।
তাঁহারে প্রণমি সবে, ছাড়ি অন্য কাম॥

দৈব ও পুরুষকার।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

দৈব ও পুরুষকার লইয়া মধ্যে মধ্যে বাক্‌-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। কাহারও মতে দৈবই সব, পুরুষকার কিছুই নহে। আবার কেহ বা বলিতে চান, পুরুষকারই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব, পুরুষকার ছাড়িয়া মনুষ্য একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে পরস্পরের মধ্যে তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা যদি দৈব ও পুরুষকার শব্দের প্রকৃত অর্থের দিকে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে মতবিভিন্নতার বিশেষ কারণ থাকে না। যত গণ্ডগোল ঐ দুইটি বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য-বোধের অভাবে।

আমাদের মতে দৈব কথাটি নানা অর্থ-বাচী। ভাষার মধ্যে শব্দের বাহুল্যের অভাবে আমরা অনেক স্থলে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। এই শব্দদৈন্য যে কেবলমাত্র বঙ্গ-ভাষার মধ্যে বিদ্যমান তাহা নহে, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার ভিতরেও এইরূপ দৈন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ idea কথাটি লওয়া যাইতে পারে। ইহার অর্থ স্থল-বিশেষে মর্ম্ম, কল্পনা, কোথাও বা আদর্শ (ideal আদর্শীভূত) কোথাও বা অবাস্তব (unreal), কোথাও বা দর্শন শাস্ত্রের অনুভূতি, কোথাও বা ধারণা ইত্যাদি। দৈব কথাটির অর্থ ঠিক এইরূপ পিচ্ছিল। (১) যাহা দেব বা দেবতার দান বা অন্য কথায় ভগবানের দান তাহাও দৈব; (২) যাহা আকস্মিক (accidental) তাহাও দৈব; (৩) যাহা প্রাক্তন বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, তাহাও দৈব। (৪) যাহা বিনা আয়াসে লাভ করা যায়, তাহাও দৈব। আমরা যদি দৈব এই কথার এক একটি অর্থ লইয়া আলোচনা করি এবং উহার একটি অর্থ হইতে অন্য অর্থে পিছলাইয়া না পড়ি, তাহা হইলে প্রকৃত সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হওয়া যায়। অন্যথা উভয় পক্ষেরই বিভ্রান্ত হইতে হয় এবং হাবুডুবু খাইতে হয়, কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারা যায় না।

(১) যাহা দেবতা বা ভগবানের দান এই অর্থে দৈব শব্দ ধরিলে আমাদিগের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা দৈবাধীন। সবই তাঁহার দান, সবই তাঁহার কৃপা। আমরা যে কিছু শক্তি লাভ করিয়াছি, যে কিছু বিষয় বিভব, খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছি, যে কিছু ধর্ম্মভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, এ সবই যে তাঁহার দান। নিজের বলিয়া গর্ব্ব করিবার যে আমাদের কিছুই নাই। আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র জীবনের সবেতেই যে তাঁর লীলা, তাঁর কৃপা কার্য্য করিতেছে। এই অর্থে দৈববাদী ও পুরুষকারবাদীর মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

(২) দৈব শব্দের অর্থ আকস্মিক ধরিলে এই আকস্মিকতা আমাদের জীবনে সত্য সত্যই কার্য্য করিতেছে কি না তাহা চিন্তা বা আলোচনা করিতে হইবে। আকস্মিক ঘটনার বা আকস্মিক অবস্থা বা সুবিধার সংযোগ আমাদের জীবনে মধ্যে মধ্যে ঘটিলেও তাহার ভিতরে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সূক্ষ্ম-ভাবে বর্ত্তমান। মানুষের শিক্ষা, তাহার সাধনা, তাহার ধর্ম্মভাব, তাহার চরিত্র-সংগঠন, তাহার অর্থোপার্জ্জন আকস্মিকতার ফলে নহে। যুবক মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেছে, ধর্ম্মলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছে, অর্থ-সংগ্রহের জন্য দিন-যামিনী প্রয়াস পাইতেছে, দেহ রক্ষার জন্য পরিমিত আহার ও ব্যায়াম করিতেছে, রোগে চিকিৎসকের ঔষধ সেবন করিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আত্ম-রক্ষার জন্য দারুণ সংগ্রাম করিতেছে, এই সকলের ভিতর আত্মচেষ্টা ভিন্ন যে আর কিছুই নাই। এত সভ্যতার বিস্তার, এত জলযান বাষ্পীয়শকট খপোতের আবিষ্কার, এত শিক্ষা বাণিজ্যের উদ্ভাবন, সাহিত্য গণিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা চিকিৎসা-শাস্ত্র দর্শন রসায়নের আলোচনা, ইহার ভিতরে নিরবচ্ছিন্ন পুরুষকারের কার্য্য চলিতেছে। এই আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার মনুষ্যজীবনকে নিয়মিত করিতেছে। আকস্মিকতার ভাব নিয়মের ভাব নহে, পদ্ধতির ভাব নহে। ধনীর পুত্র নির্ধনের পুত্রকে কেহ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করাতে সেই দরিদ্র পুত্র রাজা হইয়া দাঁড়াইল, ইহা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিকতার নিদর্শন ধরিলেও ইহার ভিতরে যে নিয়ম বা কারণ নাই তাহা নহে। ধনীর পুত্র দায়াদ সূত্রে পিতার ধনের অধিকারী হইল,

ইহা তাহার দেশের নিয়ম। এ নিয়ম তাহার দেশ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আসামে গারোদের মধ্যে পুত্র পিতার ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় না, কন্যা তাহার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার জাতির নিয়ম। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহার দেশের নিয়ম। এইরূপ অবস্থায় পিতৃধনের অধিকারী হওয়া দেশের নিয়মাধীন, ঠিক আকস্মিক নহে। পোষ্য-পুত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পোষ্যপিতার হৃদয়ে অনুরাগের নিয়ম রহিয়াছে; পোষ্যপুত্রের পক্ষে এমন কিছু আকর্ষণের বিষয় আছে, যাহা দ্বারা সে আকৃষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু পোষ্যপুত্র গ্রহণ সকল দেশের নিয়ম নহে। অপুত্রক ব্যক্তি স্নেহের নিয়মের অধীন হইয়া, ভবিষ্যতে বিষয়রক্ষার উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বংশমর্য্যাদার উপর লক্ষ্য রাখিয়া দরিদ্র পিতার নিকট তাহার পুত্রটিকে চাহিয়া লইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইল। দরিদ্র পিতা পুত্রের ভাবী সৌভাগ্য বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া শিশু পুত্রকে দান করিল। ইহাতে দরিদ্র পিতার পুরুষকারের ভাবই দেখা যায়। এই নির্ব্বাচন ও দানপ্রণালীর ভিতরে ঠিক আকস্মিকতা নাই। তাহার ভিতরে উভয় পক্ষেরই পুরুষকার রহিয়াছে। আবার এই আপাত-প্রতীয়মান আকস্মিকতার ভিতরে অর্থরক্ষণে ধনীর পুত্র ও পোষ্যপুত্রের জীবনব্যাপী পুরুষকারের প্রয়োজন, তাহা না হইলে দুই দিনের মধ্যে প্রাপ্ত বিষয় বিনষ্ট হইয়া যায়। আকস্মিকতা যাহাকে বল, তাহা যে জীবনের কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে না, তাহা স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। আত্মচেষ্টা ও পুরুষকার মনুষ্যের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কার্য্য করে। মহামারীতে বা বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটিলে তাহা আমাদের স্থূল গণনায় আকস্মিক হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে হইবে উহার পশ্চাতে স্বভাবের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। যখন কোন কারণে কোন স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার প্রভাব স্বভাবের নিয়ম অনুসারে মনুষ্যের উপর কার্য্য করিবেই করিবে; অধিকন্তু যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষায় অজ্ঞ, তাহাদের উপরে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিবে। যখন পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের মধ্যে তাড়িতের তারতম্য ঘটিবে তখনই স্বভাবের নিয়মানুসারে বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী। আমি এমনস্থানে গিয়া পড়িয়াছিলাম যেখানে তাড়িতের সমতা রক্ষার কার্য্য চলিতেছিল, তাই বজ্রপাতে আমার মৃত্যু ঘটিল। আমি নিয়ম বুঝিলাম না, বলিয়া উঠিলাম, অকস্মাৎ আমি প্রাণ হারাইলাম। আমরা যাহাকে অদৃষ্ট বলি, তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে সেখানে কারণ অদৃশ্য রহিয়া যায়; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঐ কারণ ধরিয়া লইতে পারি না, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল বুঝিয়া উঠি না। তাই আমাদের জীবনের কোন কোন ঘটনাকে আমরা অদৃষ্টের ফল বলি। প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্ট কথাটি একভাবে অর্থশূন্য। তাই বলিতেছিলাম আকস্মিক সম্পদ বা বিপদ, যাহাই বল, উহারও ভিতরে সূক্ষ্ম ভাবে কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতে আকস্মিক ঘটনা ঘটে না। একদিকে প্রকৃতির নিয়ম অবাধে কার্য্য করিতেছে। অপরদিকে মনুষ্যের আত্মচেষ্টা অবিরাম চলিতেছে। আকস্মিক মারীভয়ের সময়ে মানুষ আত্ম-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করে, দেশব্যাপী রোগের আক্রমণকে ব্যর্থ করিতে যায়, আকস্মিক বিপদ আসিয়াছে বলিয়া নীরবে আত্মবলিদান দেয় না, সে সংগ্রাম করে। আকস্মিকতাকে দৈব বলিয়া সে বরণ করিয়া লয় না, সে পুরুষকারের সাহায্য গ্রহণ করে, ইহাই তাহার সংস্কার এবং এই সংস্কার তারপক্ষে যারপরনাই স্বাভাবিক। মানুষ জড় নহে, সে চেতন। তাহার সমস্ত চেতনা তাহাকে পুরুষকারের শরণাপন্ন হইতে আদেশ দেয়।

(৩) যাহা পূর্ব্বজন্ম বা প্রাক্তনের ফল তাহাও দৈব, এইরূপ ধরিলে সংসারে ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ ইত্যাকার বিচিত্রতার যে পূর্ণ মীমাংসা হইয়া যায় তাহা নহে। আমরা সহজে যাহা স্থির করিয়া উঠিতে বা যাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি না, অতীতের বা পূর্ব্বজন্মের অন্ধকারময় গহ্বরে তাহার বরাত দিলে আপাততঃ মীমাংসা সহজ হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিলে চলিবে না। ফলকামনা ও ফললাভের আশা আমাদের দেশের কাম্যকর্ম্মাত্মক ব্রতনিয়মের ও যাগযজ্ঞের অস্থি-মজ্জা হইয়া রহিয়াছে। তাই যাহারা পূর্ব্বজন্মে দানধ্যান করিয়া আসিয়াছে তাহারা ইহজগতে সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে, যাহারা

করে নাই তাহারা কষ্টে দুঃখে দুর্ভিক্ষে কালযাপন করিতেছে এইরূপ অনুমান করিয়া লওয়া আমাদের দেশে স্বাভাবিক। আমরা বলি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল ইহলোকে পুণ্যজীবন লাভ। সম্পত্তিলাভ মান-যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ পূর্ব্বজন্মের কৃত পুণ্যকর্ম্মের চরম পুরস্কার নহে। আমরা নিজে চির-দরিদ্র, তাই ধনীর অবস্থাকে আমরা সৌভাগ্যের অবস্থা বলি। বিষয়রক্ষার জন্য মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য এত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়া ধনীর জীবন অতি-বাহিত হয়, যে বঙ্গের একজন রাজর্ষি বলিয়া গিয়াছেন যে "বিষয়ের সুখ যাহা, জানি তা, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে ; আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে"। বলিতে কি প্রকৃত সুখ আত্মপ্রসাদে, প্রকৃত শান্তি ভগবানের নাম গানে ও তাঁহার মহিমা প্রচারে। আমরা এই পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত যে বিগত জীবনে যতদূর মানবাত্মার উন্নতি হইয়াছে, ইহজীবনে তাহার পর হইতে উন্নতির ধারা উর্দ্ধদিকে চলিতে থাকিবে। কিন্তু এই উন্নতির ধারা রক্ষা করিতে হইলে মানবের আত্ম-চেষ্টা চাই। এই আত্ম-চেষ্টা বা সাধনা না থাকিলে আমাদিগকে আবার অধো-গতির অভিমুখীন হইতে হইবে। প্রাক্তন আমাদিগকে উচ্চস্থানে রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মফলে দুর্ভাগ্য বহন করিয়া যে এখানে আসি-য়াছি, একথা সত্য হইলেও সেই দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় আত্ম-চেষ্টা বা পুরুষকার, একথা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

(৪) যাহা বিনা আয়াসে লাভ করা যায় তাহা দৈব। এই অর্থ ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে মানুষ বিনা চেষ্টায় আপনার সমগ্র জীবনের ভিতরে অতি অল্পই লাভ করিতে পারে। অতি অল্প লোক, এমন কি লক্ষের মধ্যে একজন, লুপ্তধন এক-বার মাত্র প্রাপ্ত হয় কি না তাহাও সন্দেহ। অরণ্যের মধ্যে যোগী তপস্বী বৃক্ষের ফল লাভ করে এবং তাহা খাইয়া জীবনরক্ষা করে ইহাকে দৈব বলা যায় না। কেন না ফলদান বৃক্ষের স্বাভাবিক। কেহ বা পীড়াতে মৃতপ্রায় হইয়া স্বপ্নে ঔষধ লাভ করে, ইহাকে দৈব বলে এবং কেহ বা ঐরূপ ঔষধ সেবনে রোগমুক্ত হয়। কিন্তু এইরূপ ঔষধ লাভ দৈব হইলেও লক্ষের মধ্যে একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ। রোগী যখন অনন্যোপায় হইয়া মুক্তিকামনায় ঐকা-ন্তিকভাবে চিন্তা করিতে থাকে, বুঝিতে হইবে যে ঔষধ লাভও তাহার ঐ ঐকান্তিকতার ফল। এখানেও মানস-রাজ্যে চিন্তার ভিতরে ব্যাকু-লতার ভিতরে পুরুষকারের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন রহি-য়াছে।

সত্যযুগে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, উহার ভিতরে দেবতাগণের পুরুষকার বিদ্যমান ছিল। রামরাবণ-যুদ্ধে, কুরুপাণ্ডব-রণে পুরুষ-কারেরই অভিব্যক্তি। সাহিত্য বিজ্ঞান আপনা হইতে সংরচিত হয় না, সেখানেও লেখকের পুরুষ-কার। শিল্পীর কর্ম্মশালায় পুরুষকারেরই বিকাশ। চিকিৎসক আপনার নিপুণতা লইয়া রোগের সহিত সংগ্রাম করে, রোগী আত্মচেষ্টা লইয়া রোগমুক্ত হইতে চায়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে উভয়পক্ষ নিজ নিজ পুরুষকার লইয়া সংগ্রাম করিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়াও দুর্দ্দিনে যদি বলি সবই দৈব এবং দৈব বলিয়া নীরবে সহ্য করিতে চাই, তবে তাহার ভিতরে অলসপ্রকৃতি আমাদের এই বাঙ্গালী-চরিত্রই ফুটিয়া উঠে ; জগতের অন্যান্য দেশের লোক বা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার বিন্দুমাত্র পোষকতা করে না।

তিন চারি জন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একজন সাহস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অপর দুই তিন জন বন্ধু, যাহারা আলস্যে ঔদাস্যে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা বন্ধুর বিপুল অর্থাগম দেখিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে এ সবই অদৃষ্টের ফল, তাহা না হইলে আমরা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে কিসে কম,—ঐ লোকটাই বা কেন এত অর্থ উপার্জ্জন করে—যার যেমন ভাগ্য। এইরূপ সুমিষ্ট আলাপে এবং অপরের মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ আমাদের নিকট বড়ই সরস লাগে, এবং ইহাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের পরিস্ফুট ছবি। গৃহে ক্ষুদ্র শিশু-সন্তান প্রকৃষ্ট চিকিৎসার অভাবে বা স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষার অজ্ঞানতা ফলে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। নিজের ত্রুটি বুঝিলাম না, শেল-বিদ্ধ অন্তরে প্রলাপ

করিতে করিতে বলিলাম এ সমস্তই অদৃষ্টের ফল। এই ত আমাদের অধিকাংশের ভাব। এই অদৃষ্টবাদ স্বীকারে আমরা শোকে সান্ত্বনা পাই, বিপদে সহজ মীমাংসা দেখিতে পাই, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করি, একথা সমস্তই সত্য; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে অতিরিক্ত মাত্রায় অদৃষ্টবাদ স্বীকারে স্বাধীন চেষ্টার পথ চিরনিরুদ্ধ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত জাতিগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভের আর কোন আশা থাকে না। যেখানে রোগে মারীভয়ে বজ্রাঘাতে সর্পদংশনে দুর্ভিক্ষে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা দৈবকে অভিসম্পাত করি, ঠিক সেইখানে পাশ্চাত্য জগৎ রোগ ও মারীভয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেছে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহার প্রশমন চেষ্টা করিতেছে, মিউনিসিপালিটি রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছে, ঔষধ আবিষ্কারে সর্পভয় খর্ব্ব করিতেছে, ফল-শস্য অধিক পরিমাণে পাইবার আশায় ক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বিবর্দ্ধিত করিতেছে, উপনিবেশ সংস্থাপনে দুর্ভিক্ষের অপনোদন করিতেছে; রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটনে সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা বিদূরিত করিতেছে; অবাধ বাণিজ্যের পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে; ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণ ভগবানের মঙ্গলভাবের সাধনা করিয়া শোকশল্যের মর্ম্মগত যাতনার তীব্রতাকে খর্ব্ব করিয়া তুলিতেছে।

দুই জন সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি একই মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল; একজন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিল, আর একজন অর্থলাভ করা দূরে থাকুক মূলধন পর্য্যন্ত হারাইল। আপাত-দৃষ্টিতে ভাগ্য একজনের অনুকূল, অপরের প্রতিকূল, অনেকে এইরূপ সহজ মীমাংসা করিয়া বসেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উহাদের মধ্যে একজন প্রয়োগ-সন্ধান-বিধিতে পটু, আর একজন প্রত্যুৎপন্নমতি-বিহীন। তাই পরস্পরের এই অবস্থাবিপর্য্যয়। আমরা সূক্ষ্ম কারণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম না, বলিয়া উঠিলাম সবই ভাগ্য। কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে ও শান্তভাবে যদি আলোচনা করি, দেখিব যে আত্মচেষ্টা বা পুরুষকার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল কারণ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পৃথিবীতে এত পার্থক্য কেন, কেহ ধনী কেহ নির্দ্ধন, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ সুখী কেহ সন্তপ্ত। আমরা তাহার উত্তরে বলিব বিচিত্রতাই জগতের ভাব এবং ঐ বিচিত্রতার মূলে কারণ রহিয়াছে। দুইজন মনুষ্য এক প্রকৃতির নহে, দুই জনের মুখশ্রী সমতুল্য নহে, পশুজগতে দুইটি প্রাণী একই আকারের নহে, সবই বিচিত্র, সকলের ভিতর সামান্য অসামান্য বিভিন্নতা রহিয়াছে। আমরা বলি প্রতি মনুষ্যের উপরে চারিটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধনা। সবলের পুত্র সবল, দুর্ব্বলের পুত্র রুগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষা ও শিক্ষার অভাব, মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য আনিয়া দিতেছে। সৎসঙ্গ অসৎসংসর্গ চরিত্রে কত বিভিন্নতা আনিয়া দিতেছে। সাধনার বা আত্মচেষ্টার ফলে এক জন ঋষি তপস্বী, আর এক জন তাহার অভাবে দস্যু তস্কর হইয়া পড়িতেছে; একজন ধনী আর এক জন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। এক জন সাধনা ও চেষ্টা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময়ে তাহার অর্জ্জিত ধন পুত্রকে দিয়া যাইতেছে; আর এক জন সাধনা বা চেষ্টার অভাবে দুর্গতি ও দারিদ্র্য লাভ করিতেছে এবং তাহার সন্তান সন্ততির উপরে ঋণের চাপ রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিতেছে। এইত সংসারের গতি। ঐ চারিটি কারণ ও দেশের নিয়ম পদ্ধতি ও অন্যান্য নানা কারণ জীবনে কার্য্য করিতেছে, তাই এত পার্থক্য। আমরা তাহা না বুঝিয়া বলি সবই ভাগ্য সবই অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের কোন স্থান নাই।

আমরা উপসংহারে এই টুকু বলিতে চাই যে একটি জিনিষ বিভিন্ন দিক হইতে দেখা যাইতে পারে বা আলোচনা করা যাইতে পারে। ইংরাজিতে ইহাকে angle of vision কহে। একটি মনুষ্যকে সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ বা পার্শ্ব দেশ হইতে দেখা যাইতে পারে। দৈব ও পুরুষকার কতকটা সেই ভাবের। উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মনুষ্য আপনার জীবনে যাহা কিছু পায়, সবই ভগবৎপ্রসাদাৎ, সবই দৈব বা দেবতার দান। তাই মানুষ ভগবানের দিক হইতে দৈবাধীন। আবার মনুষ্যের আত্মচেষ্টা বা সাধনার একটি দিক আছে; সেই দিক দিয়া দেখিলে মানুষ জীবনে

যাহা কিছু লাভ করে, সবই তাহার পুরুষকার বা আত্মচেষ্টা প্রসূত। একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, দৈব বা পুরুষকার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ নহে, উহারা ফল কথায় এক।

ভগবানের রাজ্যে প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বা জাতি নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবানকে পক্ষপাতদোষযুক্ত বলিতে কেহই কুণ্ঠিত হইত না। মনুষ্যকে তিনি স্বাধীন করিয়াছেন। অথচ তাহার উপরে প্রকৃতির নিয়ম, ধর্ম্মের নিয়ম আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে। যখন মানুষ সাধনাপ্রভাবে আপনাকে সমুন্নত করিয়া তুলে, আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে তাঁহার মহতী ইচ্ছার অনুগত করিয়া ফেলে, আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয়, অভিমান অহঙ্কার একেবারে বিসর্জ্জন করে, তখন ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর সে কিছুই দেখিতে চায় না, আত্মশক্তির প্রভাব তাহার নিজের চক্ষে ঠেকে না, দেখে সে চারিদিকে ভগবৎকৃপা। তাই সে বলিয়া উঠে "জিস্‌নে তু জানায়া সোহি জন জানে" যাহাকে তুমি দেখাও সেই তোমাকে (ভগবানকে) দেখিতে পায়। ঋষিরাও তাই বলিয়াছিলেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" যাঁহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়। ইহার ফলিতার্থ ইহা নহে যে ভগবানের রাজ্যে তাঁহার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বা জাতি রহিয়াছে। সংসারী লোক ঠিক এই স্থানে এইরূপ গণনা করিয়া বসে যে, ভগবান সত্য সত্যই অপরকে বঞ্চিত করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে বরণ করেন—অন্য কথায়, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। সাধক আপনার সাধনার কথা মুখে না আনিয়া তাঁহার কৃপারই কথা বলেন; নিজের পুরুষকারের কথা মুখে উচ্চারণ করা পাপের কথা বিবেচনা করেন। মানুষ যখন এই উচ্চ গগনে বিহার করে তখন তাহারই এই কথা বলিবার অধিকার হয় "ত্বয়া হৃষীকেষ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" আমি তোমাকে আমার জীবন-তরীর হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি আমাকে যে দিকে ফিরাইতেছ আমি সেই দিকেই ফিরিতেছি। ইচ্ছা-যোগে মিলিত সাধকের এই বাণী; সংসারমুগ্ধ আমরা, আমাদের তাহা উচ্চারণে অধিকার নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই আত্মশক্তির উপর নির্ভর কর। এই আত্মশক্তি ভগবানেরই দান। তিনি চান, আমরা এই আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করি। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর জাগ্রত হও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও। উৎযোগী হও, সাধনা কর, আলস্য পরিহার কর. শ্রীসম্পদ সকলই লাভ করিতে পারিবে। ধরণীর মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে এবং নিজ জীবনকে সার্থক করিয়া ধন্য হইবে।

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম-এ, বি-এল)

অন্তরের মাঝে বসি তুমি আমারে যে দিয়াছ ছাড়িয়া,
সংযমের বাঁধ ভাঙ্গি চুরি কোন্ দিকে চলেছি ছুটিয়া।
দিয়েছ নয়ন দুটি তবু নাহি দৃষ্টি আপনার পরে.
দর্শনের যোগ্য যাহা নয় তাই দেখি ঘুরে ঘুরে মরে।
তোমার আদেশ শুনিবারে দিয়েছিলে শ্রবণ যুগল,
বধির হয়েছে শুনি শুধু সংসারের মত্ত কোলাহল।
বাহুযুগ দিয়েছিলে তব প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন,
কুক্রিয়ার ভীষণ আঘাতে রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল এখন।
নির্ম্মল সরল চিত্তখানি কুচিন্তায় কুটিল পঙ্কিল,
তোমার দানের মাঝে আজি খুঁজি নাহি পাই একতিল।
হারায়ে ফেলেছি সব নাথ! আপনাতে করিয়া নির্ভর,
যে পথে চলেছি হেরি তাহা সত্য হ'তে অনেক অন্তর।
রুদ্ধ করি গৃহদ্বার যবে প্রাণে আনি তোমারে ডাকিয়া,
মুক্ত রহে হৃদিদ্বার হায়, কোন্ পথে যাও পলাইয়া।
বিক্ষিপ্ত চিত্তের মাঝে যেন পিশাচের দল উঠে হাসি,
মৃত্যুপথে ল'য়ে যেতে মোরে লালসার শত দৃশ্যরাশি।
কোথা রহে একাগ্রতা আর কোথা যায় প্রাণের ভকতি,
নিমেষের মাঝে যেন ফেলি হারাইয়া সকল শকতি।
জীবনের সত্যপথ ভুলে হ'তেছি বিপথে অগ্রসর,
বিষম দুর্দ্দিনে তুমি বিনে কে মোরে বাঁচাবে মহেশ্বর!
মৃত্যুরে দেখাও মৃত্যু—তব শাসনের প্রদীপ্ত কুলিশ,
ভেঙ্গে যাবে বিপথের ভুল—দণ্ড ছলে লভিয়া আশীষ।
কুপথের মাঝে চ'লে চ'লে তোমার সে ভ্রূকুটি হেরিয়া,
অকস্মাৎ থামিবে চরণ আঁখি দুটি চাহিবে ফিরিয়া।
জীবনের বিস্মৃত সে পথ হয়ত বা লইব চিনিয়া,
জড়তার কঠিন বন্ধন হয়ত বা পড়িবে খসিয়া।
পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত-মাঝে আত্মার চৈতন্য যাবে ফুটি,
দেহ মোর কৃতজ্ঞতাভরে পড়িবে চরণে তব লুটি।

পুণ্যনেত্রে হেরিব চৌদিকে দিব্যধাম তোমার ভাস্বর,
অক্ষয় সে পুণ্যতীর্থ হেরি চিনিব এ জীবন নশ্বর।
দেখিতে স্বর্গের সেই ছবি ডাকিতেছি তোমারে সভয়ে,
মরণের পথ দিয়া দিয়া লয়ে যাও অমৃত আলয়ে ॥

ব্রহ্মগোল ও দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমণ।

ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রভৃতি প্রকাশের পর বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠালাভের সমস্ত উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার উপর অক্ষয় বাবুর সম্পাদকত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন সতেজে চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মদিগেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমাত্রেই যে কেবল ধর্ম্মপিপাসা মিটাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। সভ্যদিগের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা ঈশ্বর বা পরকাল কিছুই মানিতেন না—কেবল নিজেদের একটা খ্যাতি প্রতিপত্তি হইবে, নিজেরা দলের নেতৃত্ব করিতে সক্ষম হইবেন, এই প্রকার নানা স্বার্থভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেকের হৃদয়ে এই প্রকার একটা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়। কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন, সকল সমাজেই দেখা যায় যে এমন অনেক ব্যক্তি থাকেন যাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্মে বিশ্বাস না করিলেও হয়তো কেবল রোগমুক্তি বা অর্থলাভ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাধুসন্ন্যাসীর শরণাগত হয়েন।

যাই হোক, ব্রাহ্মসমাজে যখন ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবান, নেতৃত্বপ্রার্থী অনেক লোকের সমাগম হইতে লাগিল, তখন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দলাদলি বিবাদ বিসম্বাদ আসিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। প্রথম প্রথম যখন দেবেন্দ্রনাথ নূতন মণ্ডলী সংগঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল" দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে "সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না।" কিন্তু দল যতই পুষ্ট হইতে লাগিল, ততই মতভেদ ও তদানুসঙ্গিক বিবাদ বিসম্বাদ অল্পে অল্পে দেখা দিতে লাগিল। পরিশেষে এই মতভেদ ও বিবাদ নিতান্ত যৎসামান্য বিষয় লইয়া উঠিলেও কথায় কথায় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইভাব দেখিয়া বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদের মূল কারণ হইতেছে যে অনেকে আত্মপ্রত্যয়ের প্রকৃত মর্ম্ম ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সেকালে ইয়ং বেঙ্গলের সমাজে সভাসমিতির বড়ই প্রাবল্য দেখা যায় এবং কথায় কথায় তাঁহারা প্রত্যেক বিষয় ভোট (vote) বা হস্তগণনার দ্বারা স্থির করিতে উদ্যুক্ত হইতেন। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে এখানেও কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলেই তাহা ভোটের সাহায্যে মীমাংসা করিয়া লইবেন। ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত তাঁহারা ভোটের দ্বারাই স্থির করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে বলিয়াছেন "একমাত্র সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায় তাঁহার (রামমোহন রায়ের) ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজজ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন। * * * রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আসে নাই।" ক্রমে ব্রাহ্মদিগের মনে হইল যে "বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন

করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল।"

এই গোলযোগের তদানীন্তন অন্যতর নেতা কানাইলাল পাইন বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কতকগুলি কথা এবং সংস্কৃত ভাষায় উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর "সর্ব্বব্যাপী" বলিয়া উক্ত হয়েন। অক্ষয় বাবু এবং কানাই বাবুপ্রমুখ ব্রাহ্মেরা বলিলেন যে "সর্ব্বব্যাপী" কথার পরিবর্ত্তে "সর্ব্বত্র বিদ্যমান" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহারা "সর্ব্বশক্তিমান" শব্দের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র শক্তিমান" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইতেছে যে কিরূপ ছোটখাটো বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই সকল গোলযোগের নাম দিয়াছিলেন "ব্রহ্মগোল"। তিনি ট্রষ্টীদিগের দোহাই দিয়া তবে এই ব্রহ্মগোল নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ট্রষ্টীদিগের মধ্যে একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন।

একদিকে ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্মগোল, অপরদিকে এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের গৃহেও গণ্ডগোল চলিয়াছিল অনুমান হয়। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা যে বাটী হইতে মূর্ত্তিপূজা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দেওয়া হউক। সে সময়ে তাঁহার বাটীতে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা এই দুইটী পূজা বিশেষভাবে ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এই সময়ে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথের মতের বল পাইয়া মূর্ত্তিপূজা দুইটী একেবারেই উঠাইয়া দিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতাগণ জগদ্ধাত্রী পূজা উঠাইয়া দিবার পক্ষে সম্মতি দিলেন, কিন্তু দুর্গোৎসব হিন্দুদিগের সমাজবন্ধন, বন্ধুমিলন এবং সকলের পক্ষে সদ্ভাব স্থাপনের একটী উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায় এবং ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করিলে সমগ্র পরিবারের মনে আঘাত লাগিবে বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না। ইহার উপর ১৭৭৬ শকে দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। তিনিই জমীদারী সমূহ এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্থাপিত "হৌস"গুলির কাজকর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথকেই সেই সকল কার্য্যের ভার লইতে হইল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মগোল এবং গৃহের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতির একরকম বন্দোবস্ত করিয়া ১৭৭৮ শকে আশ্বিন মাস অতিক্রম হইতে না হইতেই দেবেন্দ্রনাথ নৌকারোহণে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

তিনি পাটনা, মুঙ্গের হইয়া কাশী পৌঁছিলেন। কাশী হইতে ক্রমে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে অমৃতসহরে গিয়া শিখদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অমৃতসহর হইতে সিমলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সিমলায় অবস্থানকালে সেই সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নানা বিপদের হাত এড়াইয়া উত্তরপ্রদেশে আরও অগ্রসর হইলেন। সেই উত্তর প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের মুখে দেবেন্দ্রনাথ একদা শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় একটা সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল—"আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব

পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে ? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেইদিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে ? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা ! সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমি সকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।" তিনি ইহা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ যেন অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আকাশবাণী শুনিলেন "তুমি এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও শিক্ষা লাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রকাশ কর।" দেশে ফিরিয়া আসা ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ কলিকাতায় নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ে নির্জ্জনপ্রবাসে বড়ই উপকার হইয়াছিল। হিমালয়ের সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য ও উদারতার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার ফলে তাঁহার হৃদয় হইতে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী স্বতই খসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর ব্রাহ্মসমাজে বিবৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানেই তাঁহার হিমালয়ে প্রবাসের মহৎ ফল উপলব্ধি হইবে।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

ভৈরবী—একতালা।

বন্ধ আছে স্রোতের ধারা
তোমায় পেলেই পাবে ছাড়া।
ভাসিয়ে দেব ভুবন সেদিন,
আপনারে আর রাখবো না দীন।
বুকের তলে রসের ধারা
বয়ে যাবে পাগল পারা।
আর যে আমি রইতে নারি,
এসো তুমি তৃষার বারি।
জ্বলচে অনল প্রাণে প্রাণে,
মরু জাগায় স্থানে স্থানে,
সেথা কান্তি-কমল ফুটবে গানে
তোমার মাঝেই হলে হারা॥

রসায়ন বিজ্ঞানে জড়ের লক্ষণ।*

(৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রসায়নের পূর্ব্বে জড়ের সাধারণ গুণ ও তাপ তড়িৎ প্রভৃতি বর্ণনা করা উচিত। জড়পদার্থের সাধারণ গুণ ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইবে যে, যেমন ইহার ভিতর পরীক্ষার বিষয় অনেক আছে, তেমনি ইহার ভিতর অনেক অনুমানসিদ্ধ আছে। জড় পদার্থ কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে কোন বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় তাহাই জড় পদার্থ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যাহা তাহাই জড় বস্তু, যেমন এই টেবিল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা জানিতেছি এইজন্য টেবিল জড় পদার্থ—কেহ কেহ বলেন যে এ কথাতে (লক্ষণে) ভ্রম আছে। আয়নার ভিতর যখন ছবি দেখিয়া বালকেরা তাহার পিছনে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, বাস্তবিক তো সেখানে কিছু থাকে না, কাজেই ঐ লক্ষণ অনুসারে জড় পদার্থের নিরাকরণ করা যায় না।

এইজন্য কেহ কেহ আর এক লক্ষণ করেন—এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে যদি অন্য ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলেই সেই পদার্থের যথার্থত নিরূপণ হইবে, যেমন এই টেবিল—দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা গ্রাহ্য। ইহার উপর আর কথা কহিবার যো নাই। (কোন কোন স্থলে এক বস্তুর পঞ্চেন্দ্রিয়ই সাক্ষী হয়।) দর্শন দ্বারা কোন বস্তু দেখিলে তাহাতে যদি অপ্রত্যয় জন্মে, স্পর্শন দ্বারা সে ভ্রম দূর হয়। অতএব দর্শন স্পর্শন দ্বারা যাহা একদা গ্রাহ্য, তাহাই যথার্থ। এই লক্ষণেরও ব্যত্যয় আছে। সূর্য্যকে আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাকে স্পর্শন দ্বারা টের পাই না। কিরণকে স্পর্শ করিতেছি বলিয়া কিছু সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছি না। অত-

---

* ১ই বৈশাখ, রবিবার ১৭১৫ শক।

এব দেখা গেল যে দ্বিতীয় লক্ষণেও সব বস্তুকে পাওয়া যায় না।

যদি আর একটা লক্ষণ করিয়া লই তাহা হইলে এই করিতে পারি যে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের একটী দ্বারাই হউক বা দুইটী দ্বারাই হউক, স্থাননির্ব্বিশেষে কাল-নির্ব্বিশেষে মনের অবস্থা নির্ব্বিশেষে যাহাকে একই দেখিতে পাই তাহাই যথার্থ, এবং এই লক্ষণের তারতম্যানুসারে কোন বস্তুর বাস্তবিকতার প্রতি প্রত্যয় বা সন্দেহ হইবে। যে পদার্থকে কি এখানে কি ওখানে যেখানেই থাকি না কেন, কি আজ কি কাল প্রতিক্ষণেই, কি মনের ভাল অবস্থায় কি খারাপ অবস্থায়, কি ব্যস্ত অবস্থায় কি শান্ত অবস্থায়, একইরূপে দেখিতে পাই তাহাকেই যথার্থ বস্তু বলিতে হইবে। কিন্তু এ লক্ষণ এত গুরুতর হইয়া পড়িল যে পরমেশ্বর বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তু ইহাকে সম্যক আবরণ করিতে পারে না।

যাহাকে এক সময়ে দেখিতে পাইলাম, আর এক সময়ে দেখিতে পাইলাম না, তাহাকে পদার্থ বলিয়া সন্দেহ থাকিতে পারে। আয়নার ভিতর ছবি—আয়নার নিকট এই রকম মুখ লইয়া গেলে ছবি দেখিতে পাইলাম, মুখ সরাইলে আর দেখিতে পাইলাম না; একসময়ে এক রকম দেখিলাম, আর এক সময়ে আর এক রকম দেখিলাম—তাহা হইলেও বিশ্বাস ঠিক হয় না। বস্তুতে পরিবর্ত্তন যত কম হয় ততই তাহাতে প্রত্যয় অধিক হয়। ভেল্কীতে বস্তুর স্থান কাল ও বস্তুগত অত্যন্ত পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহাতে আমরা অত বিশ্বাস স্থাপন করি না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারাই জড় পদার্থ ঠিক করি বটে, কিন্তু তাহার নিশ্চয়তা স্থাপ-নের নিমিত্ত স্থান কাল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে যতটুকু হয় তাহাকে সমানভাবে দেখা আবশ্যক হয়, তবে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। মরুভূমিতে মরী-চিকা দ্বারা লোকে প্রতারিত হয়; একস্থান হইতে মরীচিকাকে প্রথমে বোধ হইয়াছিল, সেখানে গেলে আর তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না, তখন আবার তাহা ততদূর সরিয়া যায়। দুই তিনবার এইরূপ ঠকিয়া আর তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস থাকে না, অর্থাৎ দূর হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, নিকটে গেলে বাস্তবিক যে সেইরূপ দ্রব্য প্রাপ্ত হইব তাহা মনে হয় না। আবার উহাকে প্রাতঃকালে দেখিতে পাইব না, সন্ধ্যাকালেও দেখিতে পাইব না, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকিরণ যখন প্রখর হয় তখনই তাহাকে দেখা যায়। আবার যাহারা তৃষ্ণাতুর হয়, তাহারাই হয়তো উদ্যান জলাশয়াদি অধিক দেখিতে পায়। সুতরাং মরীচিকা ভ্রম মাত্র। মরীচিকাকে যে দেখিতে পাইতেছে, সেটা ভ্রম নহে। বাস্তবিক বায়ু উত্তপ্ত হইয়া সূর্য্যকিরণকে ঐরূপ বিখণ্ডিত (refract) করিতেছে বলিয়া সেই সূর্য্যের কিরণ চক্ষে পড়িয়া নানাপ্রকার ছবির আকার ধারণ করে, কিন্তু যেরূপ ছবি চক্ষে দেখিতে পাই সেরূপ কোন পদার্থ সেখানে নাই।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জড় পদার্থ চেনা যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যতদূর হইতে পারে স্থানের নির্ব্বি-শেষতা কালের নির্ব্বিশেষতা ও কখন কখন মনের নির্ব্বিশেষতা হইলে তাহার সত্তায় বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত লক্ষণের সম্যকভাব জড়পদার্থে খাটে না। এ লক্ষণ পরমেশ্বরেতেই পর্য্যবসিত হয়। তিনিই দেশকালপাত্রে অপরিবর্ত্তিতস্বভাবরূপে স্থির হইয়া আছেন। আর সকলই লক্ষণের অংশ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যে বস্তু এই লক্ষণের ভাগ যত অধিক পায় তাহাকে আমাদের ততটা অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে মরীচিকা বা ভেল্কী অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী পুষ্পকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হয়, পুষ্প অপেক্ষা প্রাচীরকে, প্রাচীর অপেক্ষা পর্ব্বতকে, পর্ব্বত অপেক্ষা পৃথিবীকে, পৃথিবী অপেক্ষা সৌরজগতকে, সৌরজগত অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডকে, এবং ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা পরমেশ্বরকে অধিক সত্য বলিয়া বোধ হইবে।

আমাদের উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা জড় পদার্থ আমাদের নিকট অধিক সত্য বা কম সত্য বলিয়া যতই বোধ হউক না, যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকিবে। উল্কাপাত দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হয় বলিয়া উহা কি সত্য নহে? উহাও সত্য। কত উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া লোকের প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়াছে। ক্ষণপ্রভা ক্ষণমাত্র চক্ষুগোচর হয় বলিয়া কি উহা পদার্থ নহে? এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলেও তাহা পদার্থ। কেবল ঐরূপ ক্ষণিক ঘটনার সময় জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা বিবেচনা

করিয়া লইতে হইবে যে ইহা কল্পনা বা বাস্তবিক। যেমন, আমাদের চক্ষুতে যদি কোন রোগ না থাকে, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে উল্কাপাত হয়, তাহা কেন না আমরা উল্কাপাত বলিয়া বিশ্বাস করিব—বিশেষত, ঐরূপ উল্কাপাত যখন আরও অনেকবার হইতে দেখিয়াছি ? যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, আর যদি তাহাতে ক্ষণপ্রভা দীপ্তি পায়, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি ; তাহার কারণ, এক, যখনই মেঘ হয় তখনই বিদ্যুৎ দেখিতে পাই, আর দ্বিতীয়, বিদ্যুৎ যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহার অনেকটা আমরা জানি এবং বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিতে পারি। যে দ্রব্য কখনও দেখি নাই কখনও শুনি নাই, এমন কোন জিনিস হঠাৎ প্রত্যক্ষ হইলে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা নিরাকরণ করিতে পারিলে সে সংশয় দূর হয়।

কেহ কেহ বলেন যে বাস্তবিক পদার্থ দেখিতে পাই না, গুণ দেখিতে পাই—যেমন, এই বোর্ডের কাল গুণটুকু চক্ষে দেখিতে পাই, ইহার বন্ধুরতা গুণ হাতের দ্বারা টের পাই, ইহা হইতে নির্গত শব্দ-গুণ কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাই ; ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর গুণ নিরূপণ হয়, কিন্তু বস্তু নহে। গুণ যে আধারে থাকে সেই আধার তো বস্তু ? গুণ আধারে দেখিতে পাই, অথবা গুণের যহিত বস্তুকে একত্র দেখি, ইহা একই কথা। যেমনি কাল দেখিতেছি তেমনি কালতে আধার জড়িত দেখিতেছি। বস্তুত যদি জড়জ্ঞানকে বিভাগ করিয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইন্দ্রিয় তাহার আংশিকভাগ প্রকাশ করে এবং আমাদের মনও আংশিক ভাগ তাহাতে অর্পণ করে। এই দুইয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই যেন আমরা জড় পদার্থকে জানিতে পারি।

আমাদের আত্মার প্রতিঘাতে আত্মা হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থের অভ্যাস হয়। আমরা ছেলেবেলায় যাহা কিছু দেখি, সব যেন আত্মাতেই দেখি। শিশু ঘর দ্বার যাহা কিছু দেখে, বাহিরে যে এসকল দেখিতেছে তাহা তাহার মনে হয় না ; তাহার আত্মাই যেন তাহার নিকট ঐ সকল হইয়াছে। তাহাকে চিমটি কাটিলে কেহ চিমটি কটিয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হয় না। কিন্তু তাহার আত্মাতে ক্লেশ উপস্থিত হইল, সেইটুকুই সে জানে। বড় হইলে ক্রমে বুঝিতে পারে আত্মাতো ঐ সকল ঘটনার কারণ নহে ; অতএব আত্মার বাহির হইতে ঐ সকল কারণ আসিতেছে। এই প্রকারে আপনার সঙ্গে প্রতিঘাত দ্বারা বাহ্য পদার্থকে জানিতে পারে।

কিন্তু বাহ্য পদার্থের যেটুকু ইন্দ্রিয়গম্য, সেটুকু গুণ। আমাদের মন তাহাতে আধার প্রদান করে। যেমন, বোর্ডের কালটুকু চক্ষে দেখিতেছি, কিন্তু এই বস্তু কাল, ইহা মন বলিতেছে। বোর্ডের রংটুকু চক্ষে পড়িতেছে, ইহা যে শক্ত হাত তাহা টের পাইতেছে। কিন্তু ইহা যে এতখানি স্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, এই স্থানটুকু মন দিতেছে। স্থানকে তো হাত স্পর্শ করিতে পারে না, চক্ষু দেখিতে পায় না—আকাশ শূন্য পদার্থ। মন কিন্তু গুণেতে আধার দিয়া ও আকাশ দিয়া আকৃতি ও বিস্তৃতিযুক্ত বস্তুরূপে গ্রহণ করে। বাস্তবিক মন যে এই আধার ও আকাশ দেয় তাহা নহে। যখনি আমরা জড় পদার্থকে জানি তখনি তাহাকে আকাশস্থ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু বলিয়াই জানি। তবে আমাদের এমন ক্ষমতা আছে যে বস্তু হইতে গুণকে প্রত্যাহার করিয়া কল্পনাতে আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

যাহা হৌক মতামত বিভিন্ন থাকিলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা আংশিক স্থাননির্ব্বিশেষে কালনির্ব্বিশেষে মনের অবস্থানির্ব্বিশেষে যে পদার্থ গ্রহণ করি তাহাই জড় পদার্থ। সেই জড় পদার্থ লইয়াই রসায়নের ব্যাপার। অজড় পদার্থ লইয়া রসায়ন ব্যাপার হয় না। অজড় পদার্থ আত্মা পরমাত্মা। আত্মা হইতে না কোন রসায়নিক ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, না জড়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারাই আত্মার উদ্ভব হইতে পারে।

রাণাডের জীবন-স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমার নাশিকের অভ্যাস এখানেও বজায় রাখিয়াছি, কিন্তু কোন মৈত্রিনী নেই। "উনি" কোর্ট হইতে বাড়ী

আসিলে ও "ভাউজি" স্কুল হইতে আসিলে পর, আমরা তিন জনে টাঙ্গায় করিয়া জমনাগিরির নিকটে কিংবা আর কোথাও বেড়াইতে যাইতাম। একদিন আমি ওঁকে বলিলাম,—আমরা এই সহরে আসিয়াছি, এখন এখানকার ভদ্র মহিলাদের সহিত পরিচয় করিয়া লইব, তাঁহাদিগকে হলদীকুঙ্কুম প্রভৃতির উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিব। কখন বা আমরাও তাঁহাদের বাড়ী যাইব। পরিচয় হইয়া গেলে, তাঁহাদের এখানকার চাল-চলন ও ধরণ-ধারণ আমরা জানিতে পারিব। ভাল স্ত্রীলোকদের সহবাসে, যে সকল বিষয় আমাদের বোধগম্য হয় না, তাহা চোখে দেখিয়াই সহজে বুঝিতে পারিব। এবং সংসারে কিরূপভাবে চলিলে লোকে ভাল বলিবে তাহাও জানিতে পারিব। এইরূপ বলিবার পর, প্রতি শুক্রবারে ও মঙ্গলবারে দুপুর বেলায় হলদীকুঙ্কুমের উপলক্ষে মহিলাদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এবং তাঁহারাও আসিতে লাগিলেন। এইরূপে চেনাপরিচয় হইয়া গেলে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাদা শিলাই, গলাবন্ধ, টুপী প্রভৃতি করিবার জন্য দুপুর বেলায় আমাদের বাড়ী আসিয়া শিখিতে বসিয়া যাইতেন। আমি এই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে শিখাইতে পারিতাম। যাহাই হোক্, আমার সময় বেশ কাটিতে লাগিল। আমরা নীচের গলীতে থাকিতাম। সেই গৃহের সংলগ্ন আর এক ভাগের তাঁগে এই রকমেরই এক গৃহ ছিল। এই দ্বিতীয় গৃহে মাধবরাও মোরেশ্বর নামে খানদেশী পরিবার-বৎসল এক গৃহস্থ বাস করিতেন। বউ, মেয়ে, ছেলে, ভাই, মা প্রভৃতি পরিবারের অনেক লোক। ইহাদের ব্যবহার সরল ও দয়ালু ছিল। পরে, তাঁহাদের বদলীর হুকুম আসিলে পর, ছেলেপিলে লইয়া তাঁহাদের যাইতে হইল। তাঁহারা চলিয়া গেলে, তাঁহাদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, আমার বড় একা-একা ঠেকিতে লাগিল। এবং আর এক ভাল সঙ্গী লাভের জন্য আমার ইচ্ছা হইল। কিছুদিনের মধ্যেই এক ভাড়াটিয়া আসিলেন। ইনিও পরিবার বৎসল ছিলেন। অর্থাৎ ছেলে, বৌ, স্ত্রী, চাকর-বাকর প্রভৃতি এই পরিবারে অনেক লোক। কিন্তু প্রেম ও বাৎসল্য এই দুইটি জিনিস তাঁহাদের নিকট হইতে বহু দূরে ছিল। এইজন্য সমস্ত বৃত্তান্ত আমি তাহাদের দুই বউ ও স্ত্রীর নিকট হইতে জানিয়াছিলাম। প্রধান মহিলাটি স্বভাবত দয়ালু, কর্ম্মদক্ষ ও ধার্ম্মিক ছিলেন। হিন্দু-পরিবারের যে সমস্ত সুখের সাধন বলিয়া আমরা বুঝি, তাহা তাঁহার অনুকূল ছিল। তাহার দরুণ ইনি খুব ভাগ্যবান এইরূপ আমার ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দুঃখে আছেন, তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। এবং এই প্রতিবেশী আমার নিজের হইবে না এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই মহিলার মেয়ে ছিল না, এবং তিনি মেয়ে ভাল বাসিতেন। সেই জন্যই হয়তো আমাকে মায়ের মতো স্নেহ করিতেন। আমারও তাঁর প্রতি টান ছিল। আমাদের দুই ভাড়া বাড়ীর মাঝামাঝি দরজা থাকায়, উহা প্রথম বাড়ী হইতে খোলাই থাকিত। সেই দরজা দিয়াই এই বাড়ীতে আসা যায় বলিয়া সৌভাগ্যবতী কাকু ও দুই বউ সেইদিন হইতে চারি পাঁচবার আমাদের বাড়ী আসিতেন। সকালে আসিয়া চুল বাঁধিতেন। আমার কোন জিনিস অল্পবিস্তর জানা থাকিলে, তিনি আসিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিখিয়া লইতেন। দুপুর বেলায় পুরুষেরা কাছারীতে চলিয়া গেলে, দুই বউ-সহ কাকু আমাদের বাড়ী আসিয়া বলিলেন যে, "কাল আমাদের পুণায় যেতে হবে" আমি ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ এ মৎলব কেন হল? তিনি বলিলেন, আমাদের বাড়ীতে কোন কারণ থাকার দরকার হয় না, কোন মৎলব থাকার দরকার হয় না, এই রকম আমাদের অবস্থা। আজ পর্য্যন্ত তোমাকে ছোট মেয়ে মনে করে স্পষ্ট কিছু বলিনি। কিন্তু তোমাকে আমি 'মেয়ে' বলিয়াছি, তাই তোমাকে কিছু বলিয়া রাখি। একটু এইদিকে বোসে যাও; যে পর্য্যন্ত এই মেয়েটা না আসে সেই পর্য্যন্ত কিছু বলতে পারব।"—এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অনেক কথা বলিলেন। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। কাকু আমাকে কাছে লইয়া বলিলেন যে, "তুমি ভয় পেয়ো না। মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া পাকা করিয়া ফেল। আমার এই কথা তোমার মনে-মনেই রেখে দিও। এই কথা তোমার বাড়ীর লোকেরা জান্‌তে পেলে আমার সম্বন্ধে না জানি কি মনে করবেন", আমি বলিলাম "ছি. তোমার সম্বন্ধে মনে করবার কি আছে? তুমি মায়ের মতো আমার প্রতি কত স্নেহ করেছ, আমার সঙ্গে সহবাস করেছ; আর এখনকার উপকার আমি কখনই ভুলব না।" এইরূপ বলিবার পর, আমার মনে কি হইতেছিল, তা আমি জানি না। মন যেন একেবারে "হতভম্ব" ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। কাকু অনেক সময়ই এখানকার ওখানকার গল্প বলিতেন, আমিও তাঁর সহিত গল্প করিতাম। কিন্তু আমরা কেন গল্প করিতাম এবং আমাদের মধ্যে কে কি বলিতাম তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়েও যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, আমি

কিছুই বলিতে পারিতাম না। সে যাক্। "ওঁর" আসিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া আমরা তিন জনই উঠিয়া গেলাম। কিন্তু আমার প্রাণটা যেন একটু হাল্কা হইল এবং উনি বাড়ী আসিলে এই কথাটা বলিব কিংবা আহারান্তে শুইবার সময় বলিব ইহা আমি মনে মনে ঠাওরাইতে লাগিলাম। সেই সব লোকের জঘন্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার মন গোড়াতেই বিহ্বল হইয়া পড়ায় একাকি চুপটি করিয়া বসিয়া কাঁদিতাম। "উনি" শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যখন বাড়ী ফিরিবেন তখন এই বৃত্তান্ত বলিলে ওঁর কষ্ট হইবে ও তাঁহার খাওয়া হইবে না, তাই, রাত্রে তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত বলিব স্থির করিলাম। নিত্য নিয়মানুসারে ৫টা ৫॥০ টা বাজিলে উনি বাড়ী আসিলেন। আমি উঁহার কাপড় ছাড়াইয়া লইবার জন্য নিত্যনিয়মানুসারে উহাঁর সম্মুখে গেলাম। কাপড় ছাড়াইবার সময়, অন্য সময়ের মতো ঠাট্টা করিয়া আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে দিকে আমার লক্ষ্য না থাকায়, আমার নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না। সেই জন্যই হোক, কি আর কোন কারণেই হোক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ তোমার হয়েছে কি? তোমার মায়ের বাড়ী থেকে কি কোন পত্র এসেছে?" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "চিঠিপত্র কিছু আসে নি,—'আমি এখনি ভাউজীর জলখাবার দিতে যাচ্ছি"—এই কথা বলিয়াই আমি চলিয়া গেলাম। জলখাবার দিবার সময়ে দুপর বেলার বৃত্তান্ত, "উনি বেড়াইতে যাইবার সময়েও আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, রাত্রি পর্য্যন্ত আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিব না, মনে করিলাম। তাহার পর, নিত্যানুসারে ফল ও সুপারী লইয়া বৈঠকখানায় গেলাম। ফল খাইতে খাইতে আবার পূর্ব্বের মতো "আজ কোন বিশেষ খবর আছে"? এইরূপ বলিলে আমি কহিলাম যে, 'আজ বেড়াইতে যাবার সময় অনেক কথা বল্‌বার আছে। উনি পোষাক পরিলেন; ভাউজি জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিল। টাঙ্গা দরজার সামনে তৈয়ারীই ছিল। টাঙ্গায় আমরা তিন জন বসিয়া বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতে বসিলে পর, উহাঁর জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়াই (একবার কোন বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর না পাইলে, আবার সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাগ করেন, একথা আমি জানি) আমি আপনা হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সমস্ত কথা ভাউজির সামনে বলিবার মতো না হওয়ায় আমি "সাঁটে সুঁটে" বলিতে লাগিলাম। ইহা লক্ষ্য করিয়া উনি গাড়ী দাঁড় করাইতে বলিলেন এবং "আমরা আজ এক মাইল হেঁটে যাব" এইরূপ বলিলে, আমরা চলিতে লাগিলাম। ভাউজীও আমাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। তখন "উনি" আপন পকেট্ হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন যে, "আবা, এখন কটা বেজেছে দেখ। ঘড়িটা পকেটের ভিতর রেখে দেও। এই মাইল হইতে অন্য মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছে দৌড়ে যেতে কত মিনিট লাগে তা' সেখানে গিয়ে দেখে রেখো। আমরা সেখানে পৌঁছিলে আমাদের বোলো। "উহাঁর" সোনার ঘড়িটা হাতে পেয়ে ভাউজীর খুব আনন্দ হল। এবং সে "উহাঁর" কথা অনুসারে দৌড়তে আরম্ভ করিল। আমরা আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম ও চলিতে চলিতে, কাকু যেমন যেমন বলিয়াছিলেন তাঁকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি বলিলাম। আমার বড় খারাপ লাগিতেছিল। আমরা এখন এই বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে যাইব, এইরূপ আমি অনেকবার বলিলাম। ওঁর এই সময় মুখ গম্ভীর হইল, এবং খালি আমাকে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি কোন উত্তরই দিলাম না। যাইবার দুই রাস্তা ছিল। ভাউজি যে রাস্তা দিয়া যাইবে বলিয়াছিল সেই রাস্তা দিয়া আমরা না যাইয়া, কথা কবার ঝোঁকে সে রাস্তার দিকে না ফিরিয়া অন্য রাস্তা দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এক মাইল গিয়া অন্য এক মাইল আসিলেও আবাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। আরও কতদূর যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, ওঁর মনে হইল উনি ভুল করিয়াছেন। বলিলেন, "ওগো, আমি ভুল করেছি। তাকে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে বোলে, আমরা সেদিকে না গিয়ে এদিকে এসেছি। শীঘ্র চল সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করচে।" এই বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি চলিয়া যেখানে ভাউজী ছিল, সেই মাইল্ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলাম। সে একেবারে হতভম্বের মত হইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। তাহার নিকটে গিয়া "উনি" বলিলেন "ওরে কথা ক'বার ঝোঁকে আমরা ভুলে অন্য রাস্তা দিয়া আসায়, আমাদের জন্য তোর অপেক্ষা করতে হয়েছে। চল্ আমরা এখন ফিরে যাই," এইকথা বলিয়া আমরা আরো এক মাইল চলিয়া টাঙ্গা মিলিবার পর, শীঘ্রই বাড়ী আসিলাম। তবুও, নিয়মাপেক্ষা বেশী রাত হইয়াছিল। সেই দিন, নিত্যানুসারে কোন কিছু পাঠ না করিয়া, দেরী হইয়াছে মনে করিয়া শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ছেলে মানুষ বলিয়া ভাউজী শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। আমরা বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। আমার মনে সেই দুপর বেলার কথাটা ঘোরপাক খাচ্ছিল। ওঁর মনের অবস্থাও

খুব খারাপ ছিল। প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আমরা আপন-আপন জায়গায় স্তব্ধ হইয়াছিলাম। এবং ১২ টার সময় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ বলিলেন :—"অনীতিমান মনুষ্য হইতে নীতিমান মানুষের কোন ভয় নাই। এই সম্বন্ধে অকারণ ভয় করবে না, চিন্তা করবে না। খারাপ বিষয় যতটা বলা সহজ, ততটা করা সহজ নয়। এই সব লোক বাহিরে সাহস ও ঔদ্ধত্যের ভাব ধারণ দেখালেও ওরা ভিতরে ভিতরে ভীরু। তাই নীতিমান মানুষের সামনে, ওরা নিজে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা রক্ষা করতে পারে না। সেই স্ত্রীলোকটি যে রকম বলেছেন তাই কর। মাঝের দরজায় তালা লাগিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে আমাদের যে-যার কাজ করতে থাকব। মনকে যদি বেকার অবস্থায় না রাখা যায়, তাহলে কোন ভয় ও চিন্তা মনে আড্ডা গাড়তে পারে না। যাওয়া আসা করতে পাঁচ ছয়বার তোমার একলা বাহিরে যেতে হয়। সেই সেই সময় টাইম্‌টেবলের মতো নিয়মিত কাজে মন দিলে কোন ভাবনা থাকবে না।" তাহার পর, আমার স্বামীর বোম্বায়ে বদলী হইলে, আমরা শীঘ্রই বোম্বায়ে চলিয়া গেলাম এবং এই নরাধম প্রতিবেশীর নৈকট্য সহজেই এড়াইলাম। এই ভদ্রলোককে অনেক লোকেই জানেন, এবং এই রত্নটি পুণ্যভূমির এক কোটরে এখনো জীবিত আছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"ধুলিয়া"—১৮৭৯-৮০।

১৮৭৯ অব্দে, মে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক হইতে পুণায় আসিলাম। এই ছুটির মাসটাকে, সমস্ত গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলী দেওয়ালী অপেক্ষাও বেশী উৎসব ও আনন্দের মাস বলিয়া মনে করিত। কারণ, সেই সময়ে পুরাতন ও নব্য মণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও আদর যত্নের ভাব বেশী প্রকাশ পাইত। তাহারা আপন নেতৃত্ব পূর্ণবিশ্বাসে এক জনের হাতে অর্পণ করিয়াছিল। সেই সুদৃঢ় সামর্থ্যবান হস্তে বিন্যস্ত স্বকীয় ভার ও দায়িত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া, পুণারপুরাতন জীর্ণ নৌকা কয়েক বৎসর সুব্যবস্থিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। যে প্রকার, মেয়েরা অনেক দিনের পর, দূর দেশ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া ভাই বোন্‌দের মধ্যে যতদিন থাকে ততদিন খুব আনন্দে কাটাইয়া পরস্পরের সহিত প্রেমে ও সদ্‌ভাবে মন খুলিয়া ব্যবহার করে, ও বয়স্ক লোকেরাও তাহাদিগকে স্নেহ ও আদর যত্ন করে, তাহাদের সমস্ত আবদার শোনে, ইহাও সেই প্রকার। উহারা, এই প্রকার পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও সহবাসকে পরম লাভ বলিয়া মনে করে। কাছাকাছি প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া পুণায় এইরূপ সর্ব্বদাই ঘটিত এ কথা বলা যাইতে পারে। 'উনি' ও এই সমস্ত গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলী এই মে-মাসের ছুটিকে একটা পরম সুযোগ বলিয়া মনে করিতেন। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে পুরাতন ও নূতন সমস্ত বৃক্ষলতা নব পল্লবে ভূষিত হয় ও তাহাদের নূতন অঙ্কুর বাহির হয়। সেইরূপ এই বসন্ত ঋতুতে, গ্র্যাজুয়েট মণ্ডলীর নূতন নূতন বিচার-আলোচনা একত্র করিয়া সুব্যবস্থিত রূপে জুড়িয়া ও গাঁথিয়া তাহা উত্তম উপযুক্ত কাজে লাগাইবার সুনিপুণ মালীর যে কাজ, আমার স্বামীর সেই কাজ ছিল। আমার স্বামীর এই কাজ সমস্ত মণ্ডলীর ইচ্ছানুসারেই হইয়াছিল বৎসরের বারো মাসের মধ্যে এই দুই মাস আমার স্বামীর অবিশ্রান্ত কাজ করিতে হইত। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কখন কখন দুই ঘণ্টাও ঘুমান নাই, এইরূপ কয়েক রাত কাটিলেও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এই কাজ কেহ তাঁহাকে দিলে তিনি বেগার কিংবা 'ঘাড়ের বোঝা' মনে করিতেন না, প্রত্যুত অত্যন্ত প্রিয় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহার দরুণ ক্লান্তি কিংবা বিশ্রামের অভাব বোধ করিতেন না। এই সময়ে পুণায় "বসন্ত ব্যাখ্যান মালা" (series of lectures) ও বক্তৃত্ব উদ্দীপনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল এব এইরূপ আরও অন্য নৈমিত্তিক কোন-না-কোন সভা সমিতির কাজ প্রতিদিন উপস্থিত হইত। এই সমস্তের তত্ত্বাবধান করিয়া সকাল ছাড়া, সন্ধ্যাকালে প্রাচীন ও নবীন মিত্রমণ্ডলীর বৈঠক আমাদের গৃহে হইত। এই মণ্ডলী একবার বসিয়া 'ভবতি ন ভবতি' তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলে আহারের সময়ে উঁহার কখনই উঠা হইত না। দিনের বেলা, ১২ টা কিংবা ১ টার সময়, ও রাত্রিতে ১০॥ টা, এমন কি ১১ টার সময়েও উনি খাইতে বসিতেন পরে নিদ্রার ব্যাপারও এইরূপ। খাওয়া হইয়া গেলে, গৃহের গুরুজনদিগের সহিত ও আশ্রিত লোকদিগের সহিত ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া তবে শুইতে যাইতেন। দিনের বেলাটা বিশেষ বিচার-আলোচনায় অতিবাহিত না হইলে, শীঘ্রই নিদ্রা আসিত ও ভাল নিদ্রা হইত। কিন্তু ইহার উল্টা, যদি কোন নূতন বিচার আলোচনায় দিনের বেলাটা কাটিত, তবে লোকদৃষ্টিতে বিছানায় গিয়া শুইতেন মাত্র, কিন্তু সমস্ত দিনের বিচার আলোচনায় মন ব্যাপৃত হওয়ায় কখন কখন সকাল পর্য্যন্তও বিনা ঘুমে কাটিত। কিন্তু মনের উল্লাসে এই জাগরণ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দরুণ শ্রান্তি কিংবা কষ্ট বোধ করিতেন না। এইরূপ আনন্দে অতি-

বাহিত মে মাসের ছুটিতে আমরা নাশিক হইতে পুণায় আসিয়াছিলাম। এই বৎসরে বাসুদেব-বলবন্ত-ফড়কের বিদ্রোহের এবং আশপাশের অন্যস্থানে ডাকাতদিগের হাঙ্গামার সত্য মিথ্যা বৃত্তান্ত, সকাল সন্ধ্যাকালে মিত্র মণ্ডলী একত্র জমা হইলে নিত্যই জানা যাইত। তাছাড়া, এই সম্বন্ধে কতকগুলি সম্মানিত ভদ্রলোকের পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে লাঞ্ছনা হইতেছে একথাও আমার স্বামীর কানে আসিল। এই সময়ে আমাদিগের পুণাবাসীদিগের দুর্দ্দৈবক্রমে ১৮৭৯ অব্দের ১৯শে মে তারিখে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় পেশোয়ার স্মারক ও সহরের অলঙ্কার এইরূপ এক "বুধবারের" ও আর এক "বিশ্রামবাগের" প্রাসাদ—এই দুই প্রাসাদেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া সকালে দুই প্রাসাদই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এই আগুনে আমাদের বড়ই অনিষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ের বোম্বাই এলাকার রাজ্য পরিচালক প্রতিনিধি (টেম্পল সাহেব) হংসের বিপরীত ছিলেন; সেইরূপ কাছাকাছি তাহারই অনুযায়ী হইবার দরুণ, দুধ জলের বাছাই করিবার পরিবর্ত্তে ঠুকরাইয়াই ক্ষত উৎপাদনের দিকেই তাঁহার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল। তাঁহার ইঙ্গিতেই আংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ ওয়ালারা তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে প্রস্তুত ছিল; তাহারা যে দিকে বাতাস সেই দিকে পিঠ ফিরাইল। এই সময়ে বোম্বায়ের টাইমসপত্র মানহানিজনক লেখা লিখিয়া এবং প্রাসাদ দগ্ধকারী "রাণাডে"র নামের সহিত আমাদের নামের বাদরায়ণী সম্বন্ধ টানিয়া বাহির করিয়া, সরকারের মতের বলবৃদ্ধি করিয়া সরকারের মনকে অধিক দূষিত করিল। প্রাসাদ দগ্ধ হইবার পর হইতে প্রায় ৮ দিবসের মধ্যে যথাহুকুম ছুটি শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া "ধুলিয়ায়" গিয়া প্রথম শ্রেণী সবজজের চার্জ্জ লইবে এইরূপ হুকুম আসায় ছুটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই ধুলিয়ায় গিয়া আমাদের উপস্থিত হইতে হইল। পুণা হইতে যাইবার সময়, পুণা ও অন্যস্থানের মিত্রমণ্ডলীর বড়ই খারাপ লাগিল। এবং তাঁহারা খুব আগ্রহের সহিত বলিলেন যে, এই সময় ধুলিয়ায় আমাদিগকে বদলী করায় সরকারের কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিশ্চয়ই আছে, অতএব সাবধানে চলিবে। আমার মনের মত সকল জগতের মন নির্ম্মল এইরূপ মনে করিয়া সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলা ঠিক নহে। না হয়, ধুলিয়ার হাওয়া উষ্ণ, আমার চোখের পক্ষে ভাল নহে, এইজন্য আমাকে সেখানে বদলী করা না হয়, এইরূপ সরকারের নিকট দরখাস্ত করিবে। এই কথায় "উনি" মণ্ডলীকে স্পষ্টই বলিলেন যে, এমন কথা একেবারেই বোলো না। যে পর্য্যন্ত আমার তাহাদের অধীনে চাকরী করতে হবে, সে পর্য্যন্ত কোন রকম কারণ দেখিয়ে ওজর করা আমি ভালবাসি নে। কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করবার সময় উপস্থিত হলে, রাজিনামা দিয়ে একেবারেই অব্যাহতি পাব, এই আমার বেশী পছন্দ হয়"। তাহার পর আমরা ধুলিয়ায় যাইয়াও, মিত্রমণ্ডলী হইতে উক্ত প্রকার কথা লেখা পত্র পাইতাম। এই পত্রে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই ফলিত দেখিলাম। সেখানে যাইয়া প্রায় একমাস হইলে পর, আমাদের রোজকার ডাক একটু বিলম্বে পাইতে লাগিলাম। এবং ঐ সকল পত্র আবার আটা দিয়া বন্ধ করা এইরূপ ভাবে আসিতে লাগিল (অর্থাৎ একবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার আটা লাগাইয়া বন্ধ করা) এবং ঐ সকল পত্র ঠিক সময়ে না পাইয়া অন্য লোকের অপেক্ষা বিলম্বে পাইতে লাগিলাম। আমাদের পেয়াদা প্রতিদিন ডাকঘরে ডাক আনিবার জন্য যাইয়া থাকে, তবু আমাদের ডাক কেন এত দেরীতে পাই ইহার কারণ কিছুই বুঝিয়া পাইতাম না। উলটা আমি পেয়াদার উপর রাগ করিয়া বলিতাম, "তুই ডাক আনতে নিশ্চয়ই দেরীতে যাস্; কিংবা কোথাও গল্প করতে বসে যাস্" সে বলিত "না মহারাজ! আমি পোষ্টমাষ্টারকে বলি "ডাক শীঘ্র দেও" কিন্তু সমস্ত ডিলিভারি না হওয়া পর্য্যন্ত মাষ্টার সেদিকে মনোযোগ দেন না এবং নিজের কাজ না হয়ে গেলে ডাকও দেন না। এই কথা "উনি" শুনিয়া আমাকে এইরূপ বলিলেন যে, "ও বেচারাকে অনর্থক কেন বোক্‌চ? এর ভিতরকার কথা আর কিছু হবে, আমার মনে হয়।" আমি তাঁর এই কথার অর্থ ভালো বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু পেয়াদাকে এই বিষয়ে আর কোন কথা বলিব না, এইটুকু মাত্র মনে রাখিলাম।

দুই মাসের পর একদিন সন্ধ্যাকালে সেখানকার সেই সময়ের আসিষ্টাণ্ট কলেকটর আমাদের বাড়ীর সামনে আসিলেন এবং "বেড়াইতে যাইবেন কি"? এই কথা "ওঁকে" জিজ্ঞাসা করিলেন। উনি "হাঁ যাইব" বলিলে তিনি আবার বলিলেন, "গাড়ী জোত্‌বার উদ্যোগ কেন? আমার গাড়ীতেই আপনি চলুন"। তখন "উনি" তাঁহার সঙ্গেই গেলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, আমাকে উনি বলিলেন যে, আমি যা মনে করেছিলাম তাই ঠিক্। আমরা এই বিষয়ে আমাদের পেয়াদাকে বক্‌ছিলুম, কিন্তু তার কোন দোষ নেই। আজ সাহেব কথায়-কথায় সহজভাবে বলিলেন যে—"কিছু দিন থেকে আমি একটু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আপনার সহিত ব্যবহার করছিলাম, এই জন্য আমি বড়ই দুঃখিত"। এই দিন অনেকক্ষণ ধরিয়া এই সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল। সেই সময়ে পুণার লোকের উপর সরকারের অবিশ্বাস ও সেই মনোভাব

অনুযায়ী মৎলব আঁটা, এই সম্বন্ধেও অনেক কথা উনি বলিলেন। ঐ কথা শুনিবামাত্র, পুণার লোকেরা কেন যে ঐরূপ লিখিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম। তাছাড়া, দুই একদিনের মধ্যে, বাসুদেব-বলবন্ত-ফড়কে কিংবা হরি-রামোশী এই স্বাক্ষরে ও অমুকস্থানে বিদ্রোহ কিংবা ডাকাতি সম্বন্ধে কাল পরামর্শ হইয়াছে, অমুক লোক কিংবা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি এই মর্ম্মের পত্র না ছেঁড়া অবস্থাতেই আমাদের হাতে আসিত। ঐ সকল পত্র আসিলে, উহা পড়িয়া দেখিয়া, "উনি"পাকেট সমেত যেমনটি তেমনি ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। উপরি উক্ত পত্রাদি বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত দিগের নামে লিখিত হইয়া পুলিশ বিভাগের দ্বারাই পাঠান হইয়া থাকিবে এইরূপ দৃঢ় সংশয় উপস্থিত হইলে, উনি ঐ সকল পত্র তাঁহাদের নিকট ফেরৎ দিতে লাগিলেন। নচেৎ, অন্য বিনামা ও মাথাপাগলা লোকদিগের যা-তা লেখা পত্রাদিও আসিত কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্রোহ কিংবা সরকারী কোন কিছু বিচার করিবার মত লেখা না থাকায়, তিনি সে সমস্ত পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। এইরূপ প্রথম ২।৪ মাস পর্য্যন্ত আমার স্বামীর মন উদ্বিগ্ন হওয়ায় এবং আমিও দুপুর বেলায় একলাটি থাকিতাম বলিয়া খুবই কষ্টে কাটিতে লাগিল ও বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়।

পল্লী স্বাস্থ্য—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত,—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশক বসু—২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন—কলিকাতা। গ্রন্থখানি ১১৩ পৃষ্ঠায় একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও বিষয় গৌরবে মহান্। গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া আমরা শেষ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য বিষয়ে যাঁহারা সদুপদেশ দিতে পারিবেন, তাঁহারাই আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের অভাবে আমাদের আহার্য্যাদি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সমূহ কিরূপ মহার্ঘ্য হইয়া পড়িতেছে তাহা অতি অল্প লোকেই অনুধাবন করিয়া থাকেন। চুনীবাবুর গ্রন্থখানি এ বিষয়ে একটী রত্নবিশেষ বলিলেও চলে। রত্নবিশেষ হইলেও ইহা Sacondary Schoolএর পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় লিখিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে চাই যে তিনি Primary Schoolএর উপযোগী করিয়া আলোচ্য গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়া একটী পুস্তিকা রচনা করুন এবং সেই পুস্তিকা তিনি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে Primary স্কুল সমূহের পাঠ্য পুস্তক স্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করুন। কেবল তাহাই নহে—আমাদের ইচ্ছা যে সেই পুস্তিকা প্রত্যেক জমীদার স্ব স্ব জমীদারির প্রজাগণের হস্তে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করুন। তাহার মূল্য সম্ভবমত অল্প করিলেই ভাল হয়। এ বিষয়ে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।

খাদ্য—ডাক্তার শ্রীচুনীলাল বসু রায় বাহাদুর প্রণীত। ৩য় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু—২৫ নং মহেন্দ্র বসুর লেন,—কলিকাতা। ইহার মূল্য কত কোথাও লিখিত দেখিলাম না। পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি অমূল্য। ইহাতে খাদ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সকলই আছে। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল প্রভৃতি মেডিকেল বিদ্যালয় সমূহে ইহা পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত, সে বিষয়ে দ্বিধা আসিতে পারে না। তবে, আমরা পল্লী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে চাহি। খাদ্য সম্বন্ধে নানা গবেষণা পূর্ণ তত্ত্ব বাদ দিয়া ছোট ছেলেদের পক্ষে Practicalভাবে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা করিয়া উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অন্যতররূপে নির্দ্দিষ্ট করাইতে পারিলে দেশের অশেষ মঙ্গল হয়। উপবাসের উপকারিতা, বিভিন্ন রোগে পথ্য নির্ণয় এবং পথ্য প্রস্তুত করণ, এই তিনটী অধ্যায় যেন সেই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাতে সংযুক্ত করা হয়। এরূপ পুস্তক সমূহের দেশব্যাপী প্রচার প্রার্থনীয়।

PREVENTION OF SMALL POX—By Dr. Chuni Lall Bose M. B. & C. S.—ভীষণ ইচ্ছাবসন্তের হাত হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ চাহেন অথবা ইচ্ছাবসন্ত হইলে কিরূপ পরিচর্য্যা করা আবশ্যক, তাঁহাদিগের এই পুস্তিকা পাঠ করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় পুস্তিকাখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহা বঙ্গভাষায় লিখিত হইলে দেশের অধিকতর উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই।

বলিদানের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত—শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। বিনা মূল্যে বিতরিত।

এই পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবে নিঃসন্দেহ। ইহাতে নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে পশুবলি প্রকৃতপক্ষে বলিদানের উদ্দেশ্য নহে। এমন কি, পশুবলির সহিত সংসৃষ্ট সকলেই নরকগামী হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ হইতে এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রকাশ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

ডাকের কথা—শ্রীভোলানাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য ।৷০ আনা। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকারের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মথুরাবাটী। নগরের কোলাহলের ভিতরে "ডাকের" কথা বড় শোনা যায় না। তাই লেখক পল্লীর নিভৃত নিলয় হইতে "ডাকের" কথা শুনাইয়াছেন। "ডাকের কথা" নামে কতকগুলি বচন আমাদের এই বঙ্গদেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত আছে। খনার রচনা যেমন "খনার বচন" বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ, তেমনি "ডাক পুরুষ" নামক জনৈক ব্যক্তির রচনা "ডাকের কথা" বলিয়া পরিচিত। বঙ্গ ভাষার প্রথম বিকাশের সময় তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার রচনা দেখিলে তিনি যে প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক এরূপ স্থির করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ পুরাতন ডাকের কথার লেখক ডাক পুরুষ অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রাগুক্ত ডাক পুরুষ জাতিতে গোয়ালা, এবং সম্ভবতঃ তিনি কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে, কৃষি কার্য্যে ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভোলানাথ বাবু যে "ডাকের কথা" শুনাইয়াছেন তাহা প্রাচীন "ডাকের কথার" অনুকরণে সহজ বাণীতে চলিত ভাষায় লিখিত হইলেও উহার সরল কবিত্ব, আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি সুদূর হইতে যে ডাক দিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার "ডাক" ব্যর্থ হয় নাই। এই কবিতা-পুস্তকখানিতে ধর্ম্ম ও নীতির কথা যথেষ্ট পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানাভাব না হইলে আমরা দু এক-স্থল উদ্ধৃত করিয়া ডাকের কবিত্ব দেখাইতে পারিতাম। লেখক পুস্তকখানি বর্দ্ধমান মহারাজকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

তান্ত্রিক বর্ণ বিবরণ।

(শ্রীগিরীশ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

তান্ত্রিক দর্শনের মতে বর্ণাবলী হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বর্ণবিবরণ বিষয়ে তন্ত্রের প্রভূত নিজস্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাগীশ্বরী শক্তি মাতৃকাবর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া শিবসান্নিধ্যবলে জগদুপাদান মায়ার সৃষ্টি করেন। তন্ত্রে অনেকস্থলে মাতৃকা শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃকা শব্দের নিরুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে উহার দুই প্রকার অর্থ প্রতিভাত হয়। জননী অর্থে মাতৃশব্দ সুপ্রসিদ্ধ, তাহার পর স্বার্থে ক প্রত্যয় ও তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গবিহিত আকার যোগে মাতৃকাশব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অক্ষর হইতেই জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব তাহাতে মাতৃত্বারোপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পরিমাপক অর্থেও মাতৃকাশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই বর্ণাবলীর দ্বারা ব্যাপ্ত, এমত প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বর্ণাবলীর দ্বারা জগৎ নিরন্তরই পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন, একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

বর্ণাবলীর শ্রেণীবিভাগে এবং সংখ্যা নির্দ্দেশে তন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হয়। ইহার মতে প্রথমতঃ বর্ণগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীতেই ব্যাকরণ প্রসিদ্ধির এবং লোকপ্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ এবং লোকপ্রসিদ্ধ স্বরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ বা ত্রয়োদশ। কিন্তু তন্ত্র মতে ষোড়শস্বর স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুস্বার বিসর্গও স্বর। এই মতে হ্রস্ব দীর্ঘ সংখ্যাও স্বতন্ত্র। অ ই উ ঋ ৯ এ ও এবং অনুস্বার, হ্রস্ব নামে এবং আ ঈ ঊ ৠ ৡ ঐ ঔ এবং বিসর্গ ইহারা দীর্ঘ নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ঋ ৠ ৯ ৡ এই চারিটি বর্ণের নপুংসক সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে।

এই মতে ব্যঞ্জনের সংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। দুইটি নকার স্বীকৃত হওয়ায় এবং ক্ষকারকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করায় ব্যঞ্জনের সংখ্যায় লোকপ্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়াছে। দুইটি নকারের মধ্যে একটি নকার ক্ষকারের পূর্ব্বে এবং অপরটী হকারের পর পঠিত হইয়াছে। এই মতে বর্ণসংখ্যা একপঞ্চাশৎ হইয়া থাকে।

সমস্ত বর্ণ অষ্টবর্গে বিভক্ত হইয়াছে *। যথা—

---

* বর্গানুক্রমযোগেন দেবতাষ্টকসংযুতা
অবর্গঃ প্রথমো দেবি বশিনী তত্র দেবতা ॥
তৎপরস্তু কবর্গোঽয়ং যত্র কামেশ্বরী স্থিতা
মোদিনী তু চবর্গস্থা টবর্গে বিমলা স্মৃতা ॥
অরুণা তু তবর্গস্থা পবর্গে জয়িনী তথা
সর্ব্বেশ্বরী যবর্গে তু শবর্গে কৌলিনীতি চ ॥
(রামকেশ্বর তন্ত্রে। ১। পৃ ৮০-৮৫)

অবর্গ কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ যবর্গ ও শবর্গ। এই মতে সমস্ত স্বরবর্ণ অবর্গের অন্তর্গত। যকার হইতে বকার্ পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ যবর্গ, শকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি শবর্গ নামে অভিহিত।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারের উপক্রমে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণকে সপ্তবর্গে বিভক্ত করিয়াছেন *। অন্যত্রও সপ্তবর্গের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে প্রয়োজনানুসারে এই দুই প্রকার বর্গ-বিভাগ বিবেচিত হইয়াছে। সপ্তবর্গমতে যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি যবর্গের অন্তর্গত। ভগবান শঙ্কর যে সপ্তবর্গের দ্বারা বিশ্বমূর্ত্তির শরীর বিরচিতরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে পঞ্চাশদ্বর্ণ গৃহীত হইয়াছে। এই মতে হকারের পরবর্ত্তী নকার গৃহীত হয় নাই। এইস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক যে কথিত দুইটি নকারের মধ্যে একটি দন্ত্য, অপরটি মূর্দ্ধণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

বর্ণাবলীর সৌম্যাদি বিভাগ।

বর্ণ সমষ্টির মধ্যে অকারাদি স্বরবর্ণগুলি সৌম্য অর্থাৎ সোম (চন্দ্র) হইতে উৎপন্নতা নিবন্ধন সোম-স্বভাবযুক্ত। (শীতল) স্পর্শ বর্ণগুলি সূর্য্য হইতে উৎপন্ন সুতরাং তীক্ষ্ণস্বভাব। য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণগুলি "ব্যাপক" নামে অভিহিত, এইগুলি আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নি হইতে উৎপন্ন।

হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণগুলি যথাক্রমে শিবশক্তিময়রূপে বিবেচিত হইয়াছে। ইহাও কথিত হইয়াছে যে অনুস্বার রবিরূপী পুরুষ, এবং বিসর্গ চন্দ্রাত্মিকা শক্তি।

স্বরবর্ণের মধ্যে হ্রস্ব বর্ণগুলি পিঙ্গলা নাড়ীতে, দীর্ঘ বর্ণগুলি ইড়ানাড়ীতে ও নপুংসক বর্ণগুলি সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত, এমত বুঝিতে হইবে। স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের অভিব্যক্তি হইতে পারে না; অতএব সমস্ত বর্ণই শিবশক্তি-ময়রূপে বিবেচিত হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—স্বরবর্ণের শিবশক্তি-ময়ত্ব কথিত হইয়াছে; ব্যঞ্জনের উচ্চারণও স্বরের অধীন, অর্থাৎ স্বরসম্বন্ধ, সুতরাং তাহাতেও শিব-শক্তিময়ত্ব বুঝিতে হইবে।

বর্ণের পাঞ্চভৌতিকত্ব।

বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান যে পঞ্চভূত, তাহাদের কারণ শিবশক্তি। বর্ণগুলি শিবশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এই সকল বর্ণও পঞ্চভূতাত্মক। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বর্ণ আকাশাত্মক, কতক বায়বীয়, কতক আগ্নেয়, কতক জলীয় এবং কতক-গুলি ভৌম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দীক্ষা-প্রকরণে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা এস্থলে উপেক্ষিত হইল।

জগৎকারিণী বিশ্বনিয়ন্ত্রীর দেহ বর্ণাত্মক। তাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব বর্ণের দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণের প্রত্যেকেরই আবার বিপুল আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাঘবভট্ট প্রত্যেক বর্ণের ধ্যেয় রূপপ্রতি-পাদক যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, অকারের বর্ণ স্বর্ণের মত, উহার অষ্ট হস্তে শূল ও গদা শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার মুখ চারিটি, শরীর অতি বৃহৎ এবং কূর্ম্ম উহার বাহন। এইরূপ প্রত্যেক বর্ণেরই নানাপ্রকার আকৃতি অস্ত্র শস্ত্রও বর্ণিত হইয়াছে। ষট্‌চক্র নিরূপণেও বর্ণের নানাপ্রকার আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও সেই প্রকরণে প্রদর্শিত হইবে।

মাতৃকাবর্ণগুলি সৌম্য, সৌর ও আগ্নেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রাদির যে প্রসিদ্ধ কলা (অংশ বা শক্তিবিশেষ) তাহাই তত্তদ্বর্ণের কলা বলিয়া কথিত হইয়াছে। চন্দ্রের ষোড়শ কলা যথাক্রমে—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা এই ষোড়শ নামে অভি-হিতা। এই সকল কলা স্বরবর্ণ হইতে সঞ্জাত।

সূর্য্যের দ্বাদশ কলা যথাক্রমে—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা, এই দ্বাদশ নামে অভিহিতা। ইহারা ক হইতে ভ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি ব্যঞ্জন বর্ণ হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে ককার হইতে যথাক্রমে ঠকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ এবং ভকার হইতে ব্যুৎ-ক্রমে ডকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বুঝিতে হইবে।

* অকচটতপযাদ্যৈঃ সপ্তভি র্বর্ণবর্গৈ
র্বিরচিত মুখবাহাপাদমধ্যাখ্য হৃৎকা।
সকলজগদধীশা শাশ্বতী বিশ্বযোনি
র্বিতরতু পরিশুদ্ধিং চেতসঃ সারদা বিঃ। ১।১

বহ্নির দশকলা যথাক্রমে ধূম্রার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যাবহা ও কব্যাবহা এই দশ নামে অভিহিতা। এই দশ কলা যকারাদি বর্ণ হইতে উৎপন্ন।

উক্ত ত্রিবিধ কলাকে যথাক্রমে শ্বেতবর্ণ পীতবর্ণ ও রক্তবর্ণরূপে এবং বরাভয়হস্তরূপে চিন্তা করিতে হয়।

পঞ্চাবয়বঘটিত ওঁকারের পঞ্চাশৎ কলা কথিত হইয়াছে। অকার, উকার, মকার নাদ ও বিন্দু, ওঁকারের এই পাঁচটি অবয়ব। উক্ত পঞ্চাবয়ব যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর ও সদাশিব স্বরূপ। ওঁকারান্তর্গত পঞ্চাশৎ কলার মধ্যে ক-চ বর্গের দশকলা, ট-ত বর্গের দশকলা, প-য বর্গের দশকলা, শ-ষ-স-হ ল ইহাদের চারিকলা এবং স্বরবর্ণের ষোড়শকলা। এই গণনায় ক্ষকার গৃহীত হয় নাই, সুতরাং তাহার কলারও উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ন্যাসবিশেষে অনন্তা নামক ক্ষকার-কলারও উল্লেখ দেখা যায়।

এইস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রপঞ্চসারে ওঁকারের সপ্তাবয়ব কথিত হইয়াছে। তত্রত্য সপ্তাবয়ব—অকার, উকার, মকার, বিন্দু, নাদ, শক্তি ও শান্তি। পরিগণিত সপ্তাবয়বের মধ্যে শক্তি ও শান্তি, এতদুভয়ের সহিত প্রদর্শিত বর্ণোৎপত্তিপদ্ধতির সম্পর্ক নাই। প্রপঞ্চসারেও ভূতগত অর্থাৎ পঞ্চভূতসম্বন্ধ ওঁকারের পঞ্চাবয়বসংসৃষ্ট বর্ণ হইতেই সর্ব্বব্যাপক পঞ্চাশৎ কলার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে।* বিশেষত কোন্ অবয়ব হইতে কোন্ কলার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রপঞ্চসারে তাহারও বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশ কলা অকার হইতে উৎপন্ন; জগতের সৃষ্টির জন্য এই দশ কলা ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। জরা, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি ও দীর্ঘা উকারজাত; এই দশকলা বিষ্ণু হইতে সমুৎপন্ন। জগতের স্থিতির জন্য ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণা, রৌদ্রী, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুৎ, ক্রোধিনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু মকারপ্রভব; এই দশকলা জগৎসংহারের জন্য রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু হইতে পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা এই চারি কলার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নাদ হইতে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, অমৃতা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী, ব্যোমরূপা ও অনন্তা এই ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়। ইহারা ভোগমোক্ষপ্রদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

* অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারো বিন্দু রেবচ।
নাদশ্চ শক্তিঃ শান্তিশ্চ তারভেদাঃ সমীরিতা। ২।৬
বর্ণেভ্যএব তারস্য পঞ্চভেদৈস্তু ভূতগৈঃ।
সর্ব্বগাশ্চ সমুৎপন্নাঃ পঞ্চাশৎ সংখ্যকাঃ কলাঃ। ১২-১৩

ওঁকারের ঘটকবর্ণ হইতে পঞ্চাশৎ সংখ্যক শক্তি, পঞ্চাশৎ সংখ্যক বিষ্ণুমূর্ত্তি, পঞ্চাশৎ সংখ্যক মাতৃমূর্ত্তি, পঞ্চাশৎ রুদ্রমূর্ত্তি ও পঞ্চাশৎ ওষধি উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তির নাম প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে কথিত হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা এইস্থলে উপেক্ষিত হইল।

প্রদর্শিত বর্ণবিবৃতির মধ্যে তান্ত্রিকদর্শনের গূঢ় অভিপ্রায় অপরিস্ফুটভাবে নিহিত রহিয়াছে। বৈদান্তিকগণ ওঁকারকেই জগদুপাদান ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। তন্ত্রও এই মতটি আরও কিছু সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিজেকে ত্রিগুণিত করিয়া যখন কামাগ্নি নাদাত্মক গূঢ় মূর্ত্তিরূপে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুবিদ্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "তার" এবং "ও মাত্রা" অর্থাৎ ওঁকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অন্যে তাঁহাকেই শক্তি ও পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনিই ত্রিগুণা, ত্রিদোষা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকা, ত্রিমূর্ত্তি এবং ত্রিরেখা এই সমস্ত সংজ্ঞায় বিশেষিত হইয়া থাকেন।

ওঁকাররূপী বিভু প্রদর্শিত পদার্থের তারণ অর্থাৎ উদ্ভাবন করেন, এই হেতু তার নামে এবং সৃষ্টিপদার্থে শক্তিরূপে অবস্থান করেন, অতএব শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।*

* প্রত্যোং তারণাত্তারঃ শক্তি তদ্ভিত্তিশক্তিতঃ।

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বার-য়্যাট-ল)

স্ত্রী পুরুষের চিরন্তন অন্যোন্য-আকর্ষণই বিবাহের ভিত্তি। প্রজা-প্রজননই স্ত্রীপুরুষ-সংযোগের প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য। সভ্যজগতে বিবাহের

প্রচুর প্রচলন দেখিয়া বিবাহ স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে বিবাহ কৃত্রিম, স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে, সভ্যাসভ্য সর্ব্বজন-সমাজে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই ইহার প্রচার থাকিত। এইরূপ চিরপ্রচারের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরঞ্চ দেখা যায়, আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহপ্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। অদ্যাপিও অসভ্যদিগের মধ্যে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা বিদ্যাসুন্দরের romantic বা উপন্যাস সুলভ প্রেম অজ্ঞাত। এমন কি পৃথ্বীরাজ যেরূপ সংযুক্তার সঙ্গপ্রিয় ছিলেন, অসভ্যদিগের মধ্যে তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গ-প্রিয়তাও অতি বিরল। আদিম অসভ্য অবস্থায় লোকে বৃষাদির ন্যায় সাময়িক মত্ততাপ্রযুক্ত স্ত্রীতে উপগত হইত। এইরূপ স্ত্রীসংযোগই পৈশাচিক "বিবাহ"—স্ত্রী হইলেই হইল. বর্ণাবর্ণ গোত্রাগোত্রের সূক্ষ্মবিচার তৎকালে ছিল না।

বৃষাদির ন্যায় আদিম অসভ্যগণ স্ত্রীপ্রাপ্তির জন্য মারামারি লড়ালড়ি করিত। প্রেমরাজ্যে জোর যার স্ত্রী তার। অসভ্যেরা শীকার মারিয়া খাইত, শীকার না পাইলে অনাহারে মরিত বা নরমাংস ভক্ষণ করিত। ইহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত হইত। "ভর্ত্তা" বা পতি অর্থে "স্ত্রীপালন করা", আদিম অসভ্য অবস্থায় এইরূপ "স্ত্রীপালন"-ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। কালক্রমে যখন অসভ্যেরা নানা কৌশলে অধিক পরিমাণে শীকার ও অন্যান্য খাদ্য আহরণ করিতে সমর্থ হইল, তখনই তাহারা দু একটী স্ত্রী ধরিয়া বা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিল। অন্য অসভ্যেরা অধিক বলবান হইলে এই স্ত্রীলোক-দিগকে জোরজবরদস্তি হরণ করিয়া লইয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের মরণানন্তর যাদবরমণীরা এইরূপে অপহৃত হইয়াছিলেন। এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ concubinage বা "সেবাদাসী" গ্রহণ প্রথা ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রথমে রমণীরা উপপত্নী, পরে পত্নীরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের এই প্রথম সূত্রপাত। "গান্ধর্ব্ব বিবাহ" এই concubinage প্রথার রূপান্তর মাত্র। এইরূপ বিবাহে মন্ত্রপাঠও নাই, হোমযজ্ঞও নাই, সপ্তপদীও নাই। "কন্যা-কর্ত্তা হন কন্যা, বরকর্ত্তা বর। পুরোহিত, ভট্টাচার্য্য হন পঞ্চশর।" দুষ্মন্তশকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিবরণে বৈবাহিক পদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্ভবত গান্ধার দেশের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেই প্রথমে প্রচলিত ছিল, "গন্ধর্ব্ব" এই নামেতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

আদিম অসভ্যেরা জোরজবরদস্তি পূর্ব্বক স্ত্রী-সংগ্রহ করিত। "রাক্ষস বিবাহ" ইহাকেই বলে। নামেতেই বোঝা যায় যে, এইরূপ স্ত্রীসংগ্রহ প্রথা অসভ্যদিগের মধ্যেই প্রথম প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস-সংমিশ্রিত বিবাহ প্রথারও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বীর্য্য দ্বারা স্ত্রীগ্রহণ প্রথাই পূর্ব্বে সাধারণতঃ প্রচ-লিত ছিল। বীরত্বই পতিত্বের কারণস্বরূপ দাঁড়াইয়া-ছিল। যেখানে বীরত্ব খাটিত না সেখানে দুর্ব্বল অস-ভ্যেরা বলবান অসভ্যদিগের নিকট হইতে স্ত্রী ক্রয় করিয়া লইত। "বীর্য্যের" মূল্য ধরিয়া দিত। কন্যা-শুল্ক এই বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর মাত্র। কন্যাশুল্ক পিতারই প্রাপ্য ছিল, স্ত্রীলোকেরা ধনসম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল। কালক্রমে যখন কন্যা স্বয়ংদত্তা হইতে লাগিল, (গান্ধর্ব্ব বিবাহে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়) তখন হইতে কন্যাই এই [illegible]র অধিকারিণী হইল। এইরূপ বিবাহ "আসুর" বিবাহ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "আসুর" শব্দেই বোঝা যাইতেছে যে এইরূপ বিবাহ প্রথা অসভ্যদিগের মধ্যেই প্রথম প্রচলন ছিল। কন্যাশুল্ক বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর। স্বয়ম্বর প্রথাও বীর্য্যশুল্কের রূপান্তর মাত্র।

ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা বীরত্বের পরিচয় বা পরীক্ষা দিয়া কন্যাপ্রাপ্তি, বীর্য্যশুল্ক ছাড়া আর কি হইতে পারে? শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া এবং অর্জ্জুন জল মধ্যে ছায়া দেখিয়া ঘূর্ণায়মান মৎস্যের চক্ষু বাণবিদ্ধ করিয়া বীরত্বের বা সমরকৌশলের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে রামচন্দ্র সীতা ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-স্থল হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা লইয়া যাওয়ারও উদা-হরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুভদ্রাহরণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপে হরণ করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বলপূর্ব্বক স্বয়ম্বরস্থল হইতে কন্যাহরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গৌরব-

জনক।” ভীষ্ম তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য স্বয়ম্বরস্থল হইতে দুইটী কন্যা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—অম্বার আখ্যান কে না পড়িয়াছে? পৃথ্বীরাজও কনৌজদুহিতা সংযুক্তাকে স্বয়ম্বরস্থল হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়ের আধিপত্যকে অভিভূত করিল। “বীর্য্যের” পরিবর্ত্তে “বিদ্যার” গৌরব বাড়িল। “বীর্য্য” শুল্কের স্থলে “বিদ্যা”শুল্ক আদৃত হইতে লাগিল। এই কালে কন্যাগণ পণ্ডিতদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য বীর্য্য বা সমরকৌশলের পরিবর্ত্তে বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য পরীক্ষা “বীর্য্য” শুল্কের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিল। “বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য।” কালিদাস শারদানন্দন রাজর্ষির কন্যা বিদ্যোত্তমাকে তর্কে হারাইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যও এইরূপে বিদ্যার পরীক্ষা দ্বারা ভানুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের গল্পেও “বিদ্যাশুল্কের” পরিচয় পাওয়া যায়। স্বায়ম্বরিক বা বীর্য্যশৌল্কিক বিবাহও তদ্‌-রূপান্তর স্বরূপ—বিদ্যাশৌল্কিক বিবাহ আসুর বিবাহের অনুরূপ। ভাল হউক বা মন্দ হউক, কুশ্রী হউক বা সুশ্রী হউক, [illegible]হউক বা অসবর্ণ হউক, ধনী হউক বা নির্ধনী হউক, “বীর্য্যশুল্ক বা “বিদ্যাশুল্ক” দ্বারা যে কোন ব্যক্তিই কন্যা লাভ করিতে পারিত—আসুর বিবাহের ন্যায় এইরূপ বিবাহ কন্যার মতামতের উপর নির্ভর করিত না। কন্যাশুল্কই হউক বা বীর্য্যশুল্কই হউক বা বিদ্যাশুল্কই হউক, শুল্কই সর্ব্বেসর্ব্বা। স্বয়ম্বরকালেও কন্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর রাজার গলে মাল্যপ্রদান করিতে বাধ্য হইতেন—যে রাজাকে তিনি হয়ত ভালবাসিতেন স্বয়ম্বরে হয়তো তাঁহার নিমন্ত্রণ নাও হইত। স্বয়ম্বরের নাম শুনিয়া একটী রাজকন্যা শঙ্কিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

ব্রাহ্মণের আধিপত্য অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের বা বিদ্যাশুল্কের গৌরবকালে রাজকুমারীগণ ঋষিকুমারের সহিত বিবাহ করিতেন। শর্য্যাতি রাজার কন্যা চ্যবন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদর্ভ রাজার কন্যা অগস্ত্য মুনিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা লোমপাদের কন্যা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। রাজা তৃণবিন্দুর কন্যা পুলস্ত্য ঋষির ও রাজা ভগীরথের কন্যা কৌৎস ঋষির পত্নী হইয়াছিলেন। শ্যাবাশ্ব নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রথবীতি রাজার কন্যা অর্চ্চনাকে বিবাহ করিতে বাসনা করেন। শ্যাবাশ্ব ঋষি ছিলেন না, এই কারণে রাজমহিষী বিবাহে আপত্তি করিয়া বলিলেন “আমাদের বংশের সকল কন্যারই ঋষিদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। শ্যাবাশ্ব! তুমি ঋষি নহ, তোমার সহিত রাজকুমারী অর্চ্চনার বিবাহ হইতে পারে না।” শ্যাবাশ্ব কঠোর তপস্যা করিয়া ঋষিত্বপদ লাভ করিলেন, তখন রাজমহিষী তাঁহার সহিত অর্চ্চনার বিবাহ দিলেন।

এইখানে বলিয়া রাখা যাউক যে, দৈব ও আর্ষ বিবাহ আসুর বিবাহের রূপান্তরমাত্র। দৈব বিবাহে পুরোহিতপ্রাপ্য দক্ষিণা বা বেতন এবং আর্ষ বিবাহে একজোড়া বলীবর্দ্দ “কন্যাশুল্ক” ছিল। তখনকার কালে গোধনই ধন ছিল, শুল্ক অর্থদণ্ড প্রভৃতি গরুর দ্বারাই প্রদত্ত হইত। আসুর বিবাহের প্রভেদ এই যে, এই বিবাহে কোন পরিমিত শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল না। দৈব ও আর্ষ বিবাহের শুল্কের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, আসুর বিবাহের মত অপরিমিত ছিল না। প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক উপেক্ষিত হইত।

---

* "My mother bids me seek a spouse,
To whom to give my maiden vows;
Râjàs and Thakoors, waiting near,
Abide my choice twixt hope and fear.
"Within my heart a gem lies hid,
For him 'twill glow who lifts the lid;
Within my breast a fountain sleeps,
For him 'twill gush who opes its deeps.
"Within my soul I feel a power,
To love through every changeful hour;
But none has waked that slumbering might,
Or kindled that still sleeping light.
"A vision visits oft my dreams,
A bright and manly form it seems;
But when the expectant crowd draw near,
Will such a form mid them appear?
"Then, who shall wear the nuptial wreath,
If none can wake affection's breath,
No, rather let me still abide
A maiden by my mother's side!"

পাণিগ্রাহী স্বয়ং আসিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিত। কন্যাপিতা এই বলিয়া কন্যা দান করিতেন—"তোমরা উভয়ে দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন কর।" ব্রাহ্মবিবাহে বিদ্যাশুল্ক ত আছেই, ব্রাহ্মবিবাহে বেদজ্ঞ বরকেই কন্যাদান করা হইত। কন্যাকর্ত্তা বরকে আহ্বান করিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কারে কন্যাকে ভূষিত করিয়া কন্যাদান করিতেন। এই কারণে প্রাজাপত্য বিবাহ অপেক্ষাও ব্রাহ্মবিবাহের এত গৌরব। প্রাজাপত্য বিবাহে শুল্ক নাই, সুতরাং গৌরবও নাই।

ব্রাহ্মবিবাহে বিদ্যাশুল্ক আছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ছাড়া কোন বিবাহে কন্যা স্বাধীনভাবে হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিতে পারে না। যেখানে এইরূপ ante-nuptial love বা বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ নাই, সে বিবাহ স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনমতে গৌরবান্বিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত। আসুর বিবাহও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা "আসুর ব্রাহ্ম"রূপ মিশ্রিত বিবাহ। আজ কাল কন্যাশুল্ক স্থলে "বরশুল্ক" দাঁড়াইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে কন্যাদান কালে যে সুবর্ণদান প্রথা আছে, এ "বরশুল্ক" সেই সুবর্ণদানের রূপান্তর স্বরূপ। "বরশুল্ক" বন্ধ করিতে হইলে পূর্ব্বে হিন্দু আইনের পরিবর্ত্তন হওয়া চাই। পুত্র বর্ত্তমানে বিবাহিত কন্যা এক কপর্দ্দকেরও অধিকারী নহে। হিন্দু আইনের এই inequitable বা ন্যায়বিগর্হিত ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন শত শত "স্নেহলতা" আত্মহত্যা করিলেও "বরশুল্কে"র রোধ হইবে কি না সন্দেহ।

আধুনিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ম বিবাহেরই বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। এককাল ছিল যখন আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা আদৌ ছিল না। উদ্দালক-শ্বেতকেতুযুগে বিবাহ প্রথা ছিল না। এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-সহবাস (promiscuity) প্রথাই প্রচলিত ছিল। যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীর "পাণিগ্রহণ" করিয়া অর্থাৎ হাত ধরিয়া লইয়া যাইত। নহুষপুত্র ক্ষত্রিয় যযাতি, ব্রহ্মর্ষি শুক্রের কন্যা দেবযানীর "পাণিধারণ" করিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাহা "পাণিগ্রহণ" (অর্থাৎ বিবাহ) স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ একটা জনশ্রুতি আছে। "বিবাহ" শব্দের অর্থই বহন করা,—ইহা রাক্ষস বিবাহের স্মৃতি। বিবাহকালে বর যে কন্যার "পাণিগ্রহণ" করে, তাহা শ্বেতকেতুযুগের "পাণিগ্রহণের" অনুকরণ, আর শ্বেতকেতুযুগের যে "পাণিগ্রহণ", তাহা রাক্ষস বিবাহের কন্যা "বহনের" রূপান্তরমাত্র। "পাণিগ্রহণ" বিবাহের প্রথম অঙ্গ বা অঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অসভ্য গণ্ডজাতির মধ্যেও "পাণিগ্রহণ" বিবাহের প্রধান অঙ্গ। কোন গণ্ডযুবক বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোন্ রমণীকে গ্রহণ করিবে, তৎসম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। পরে দলবল লইয়া যেখানে তাহার ভাবী স্ত্রী অন্যান্য রমণীর সহিত ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, তাহার সন্নিকটস্থ জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। যখন সুবিধা দেখে তখন একাকী সে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সেই স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা পালাইতে থাকে, সেও তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়ায়। যতক্ষণ সে তাহার ভাবী স্ত্রীর "পাণিগ্রহণ" অর্থাৎ হাত ধরিতে না পারিবে, ততক্ষণ তাহার সঙ্গীরা আসিয়া তাহাকে সেই কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার সহায়তা করিবে না। একবার যদি সে কন্যার "পাণিস্পর্শ" করিতে পারিল, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। গণ্ডসমাজের এই রীতি।

শ্বেতকেতুই প্রথম এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষসহবাস প্রতিষেধ করিয়াছিলেন, এবং একরকম বিবাহ প্রথার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত এই প্রাচীন কথা একেবারে অলীক হইতে পারে না। ঋষি দীর্ঘতমার সম্বন্ধেও এইরূপ বিবাহসংস্কারের কথা বর্ণিত আছে।

অর্থশাস্ত্রে যেমন the supply is adjusted to the demand অর্থাৎ প্রয়োজনের সহিত বস্তুযোগের সামঞ্জস্য হয়, সেইরূপ প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্য হইলে উভয়ের মধ্যে একটা না একটা সামঞ্জস্য আসিয়া পড়ে। উদাহরণ—পুরুষ অপেক্ষা মেয়ের সংখ্যা অত্যধিক কম হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে promiscuity অর্থাৎ একস্ত্রীর একাধিক পুরুষসহবাস অনিবার্য্য। যে সকল ভারতীয় কুলি ভারতবর্ষের বাহিরে কার্য্য

করিতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীকুলির সংখ্যা সচরাচর কম হওয়াতে, এই কুলি স্ত্রীদিগকে শেষে বহুপুরুষের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইতে হয়।

Promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিকপুরুষ সহবাস প্রথা দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—unlimited promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাস, এবং limited promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাস। শ্বেতকেতুযুগের বহুপুরুষ সহবাস প্রথম শ্রেণীর, দ্রৌপদীর বহু-পুরুষ সহবাস দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। সত্যকাম মাতা জবালার কথা প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ।

গৌতমবংশীয়া জটিলাও বহুভর্তৃকা ছিলেন। বাক্ষী নাম্নী ঋষিকন্যা সাতটী ঋষির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মারিষা নাম্নী কন্যাকে প্রচেতারা দশ ভ্রাতায় বিবাহ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যাকে জয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, ঋক্‌বেদে বর্ণিত আছে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত নির্দ্দিষ্ট বহুসহবাস অর্থাৎ এক স্ত্রীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পুরুষের সহিত সহবাসের দৃষ্টান্ত। Limited Promiscuityকে Polyandry বা বহুভর্তৃকতা বলে।

Unlimited Promiscuity বা বহু পুরুষ সহবাস উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় সোপান।

Polyandry অর্থাৎ বহুভর্তৃকতা Polygamy বা বহুপত্নীকতা বা এক পুরুষের একাধিক স্ত্রীগ্রহণ প্রথার বিপরীত। পুরুষ অপেক্ষা মেয়ে কম হইলে কিন্তু অত্যধিক কম না হইলে Polyandry বা বহুভর্তৃকতা (এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-গ্রহণ প্রথা) প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। তিব্বত প্রভৃতি উষর পার্ব্বত্যপ্রদেশে দ্রৌপদীর আদর্শের বহুভর্তৃকতা প্রচলিত আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে খাদ্য উৎপাদন বা আহরণ করা দুষ্কর বলিয়া তত্রত্য দেশবাসীরা কন্যার সংখ্যা বাড়িতে দেয় না, কন্যাহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দুই কারণে পার্ব্বত্য প্রদেশে polyandry অর্থাৎ বহুভর্তৃকতার প্রচার দৃষ্টিগোচর হয়।

পাণ্ডবেরা বনবাসকালে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জঙ্গলে খাদ্যাভাব হইয়া থাকে, এই কারণেই নল রাজা দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অনুমান হয়। অরণ্যে খাদ্যাহরণ দুষ্কর ভাবিয়াই বোধ হয় পঞ্চপাণ্ডবে মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ-পাণ্ডব মিলিয়া পাঞ্চালীকে যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার অন্য এক কারণ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। তৎকালে পাঞ্চালদেশে pentarchy অর্থাৎ পঞ্চরাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল—পাঁচ রাজায় মিলিয়া রাজত্ব করিত। সচরাচর ইহারা ভাই হইত। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রী গ্রহণ করিলে পাছে রাজ্য লইয়া স্বস্ব পুত্রদিগের মধ্যে ঝগড়া হয়, তাই পাঁচ ভাইয়ে মিলিয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করিত। এই প্রথানুসারেই বোধ হয় পঞ্চপাণ্ডবেরা পাঞ্চালীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঞ্চাল অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। পাঞ্চাল-দিগের সাহায্যেই বনবাসী পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পুনরায় পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ, সে প্রকৃত পক্ষে কুরুপাঞ্চালেরই যুদ্ধ। এই বিবাহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে।

Promiscuity অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিক পুরুষ-সহবাস প্রথা matriarchal বা মাতৃপ্রধান হয়। মাতাই সর্ব্বেসর্ব্বা, মাতৃগৃহেই মাতা বহুপুরুষের সহিত সহবাস করে। এইরূপ বহুপুরুষের সংসর্গে পুত্রের পিতার সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, * কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না, তাই মালাবারের কোন কোন জাতির মধ্যে "ভাগিনেয়াধিকার" দৃষ্টিগোচর হয়। Matriarchal "বিবাহ"তে মায়ের দিক দিয়াই উত্তরাধিকার নির্ণীত হয়।

Limited Promiscuity বা Polyandry অর্থাৎ বহুভর্তৃকতা. উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তৃতীয় সোপান।

আবার স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অত্যধিক কম হইলে Polygamy অর্থাৎ এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। Polygamy বা বহুপত্নীকতা অতি পুরাতন প্রথা। মনুসংহিতা ও তৎপূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদের

* জবালা—কথায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সূত্রকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কক্ষীবান এক রাজার দশ কন্যাকে বিবাহ করেন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। শিব ঠাকুর সম্বন্ধে একটা ছেলে ভুলানো গান আছে—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বাণ; শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যা দান; এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যা খান" ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায়—"এক স্ত্রী রাঁধেন বাড়েন, এক স্ত্রী উপনিষদ পড়েন।" উর্ব্বর প্রদেশে শিশু (কন্যা) হত্যা করিবার প্রয়োজন হয় না। বরঞ্চ, ঘরের ও বাহিরের কার্য্যের জন্য মজুরের পরিবর্ত্তে সস্তায় একাধিক স্ত্রী রাখাতে লাভ। তাই উর্ব্বর দেশে বহুপত্নীকতা দৃষ্ট হয়। কুমাঁয়ুনবাসীরা একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে, একজন রান্না করে, একজন হাটবাজার করে, একজন ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য করে ইত্যাদি। রাজ-রাজড়াদের ত কথাই নাই। প্রথমতঃ বিলাসিতার জন্য তাঁহারা অন্তঃপুরে সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। দ্বিতীয়তঃ সেকালে রাণীরা living hostages বা সজীব প্রতিভূ স্বরূপ ছিলেন। রাজারা ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া শক্তিশালী সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। Exchange of cards অর্থাৎ "পরিচয়"বিনিময়ের মত রাজকন্যারও বিনিময় হইত। বহুরাণীগ্রহণের ফলে অনেক রাজ্য ধ্বংসও হইয়া যাইত। "তোমার ছেলে রাজা হইবে" এইরূপ পণ করিয়া রাজারা কখন কখন বিবাহ করিতেন। পণ না রাখিলে যুদ্ধবিগ্রহ বাঁধিত। এইরূপ পণ করিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পণ রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়াই বোধ হয় শকুন্তলার সহিত পূর্ব্ববিবাহ প্রথমে স্বীকার করেন নাই। দশরথের নিকটেও কৈকেয়ী যথাসময়ে এইপ্রকার একটী পণ আদায় করিয়াছিলেন। এইরূপ পণ করিয়া বিবাহ না করিলে কালিদাসের অমর গ্রন্থ অভিজ্ঞান শকুন্তল লিখিত হইত না এবং বাল্মীকির রামায়ণ হইতেও জগত বঞ্চিত থাকিত। শান্তনু এই পণ করিয়া বিবাহ করাতে ভীষ্ম চিরকৌমার্য্যরূপ ভীষণ পণ করিয়াছিলেন।

বহুপত্নীকতা প্রথা থাকাতে পুত্রেরা পিতৃসম্পত্তির সমান ভাগ পাইবার অধিকার পাইল। পূর্ব্বে বড় ছেলে সব পাইত। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা ছিল। বহুপত্নীকতা হেতু সে প্রথা বন্ধ হইল। ছোট স্ত্রীকে হয়ত স্বামী বেশী ভালবাসিত—পিতা তাহার পুত্রকে একবারে বঞ্চিত না করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভুলাইয়া তাহাকেও কিঞ্চিৎ দিত। আবার বড় স্ত্রীর পুত্র শেষে হইলে তাহার মান্যের জন্য তাহার পুত্রকেও বঞ্চিত করিতে পারিত না। এই সকল কারণে সম্ভবত হিন্দু আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন সর্ব্ব পুত্রেরই সমান অধিকার। বিশ্বামিত্র দেবদত্তকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিবার জন্য তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহাতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; তাই তিনি তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

Polygamy বা বহুপত্নীকতা স্বাভাবিক। কথায় বলে,"Man is a polygamous animal" Polygamy বা বহুপত্নীকতা একটা না একটা রূপে চিরকালই থাকিবে। অষ্টম হেন্‌রীর মত ঘন ঘন divorce বা স্ত্রীপরিত্যাগ এবং ঘন ঘন বিবাহ polygamyরই রূপান্তর ছাড়া আর কি হইতে পারে? Polygamy বা বহুপত্নীকতা উদ্বাহতত্ত্বের ক্রমবিকাশের চতুর্থ সোপান।

পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান হইলে monogamy অর্থাৎ এক পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণ এবং এক স্ত্রীর এক পুরুষ গ্রহণ প্রথা আপনা আপনি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। স্ত্রী বা স্বামী মরিয়া গেলে দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ না করাকে "strict monogamy বা কঠোর একৈকক স্ত্রী পুরুষগ্রহণ প্রথা বলে। Monogamy patriarchal অর্থাৎ পিতৃপ্রধান হয়। পিতার দিক দিয়া উত্তরাধিকার স্থির করা হয়। Monogamy বা একৈকক স্ত্রীপুরুষ গ্রহণ প্রথা বিবাহের শেষ সোপান।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

ভৈরবী—একতালা।

দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ যামিনী কেমনে কাটা'ব আমি।
তুমি যদি মাঝে মাঝে দেখা না দাও স্বামী।

ফিরি আমি সদা পাগলের পারা,
তোমা তরে আমি কেঁদে হই সারা,
তিলেক শান্তি না পাই জীবনে দুঃখসাগরে নামি।
ডাকিছে তোমার আকাশ আলো,
পুষ্প নদী বাতাস জল
গন্ধে বর্ণে ছন্দে গীতে পাগল করে দিন-যামী।
এসো তুমি এসো রেখো না ফেলিয়া,
তোমারে দেখিব নয়ন মেলিয়া,
জীবন মরণ ধন্য করিব এ চিতদহন যাবে থামি॥

সাহিত্যিকগণের প্রতি নিবেদন।

আজ ৮ বৎসর যাবৎ আমি সাধক শ্রীরামপ্রসাদের জীবনী ও সটীক পদাবলী সংগ্রহ করিতেছি। সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থ এখন ছাপা হইতেছে। যদি কোন সদাশয় ব্যক্তি আমাকে নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেন এবং আমাকে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ১২৬০ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' (১লা পৌষ সংখ্যা) রেজেষ্টরী ডাকে পাঠাইয়া দেন অথবা উহা কোথায় পাইতে পারি তাহা দয়া করিয়া জানান, তাহা হইলে আমার এবং বঙ্গসাহিত্যের পরমোপকার সাধন করা হইবে।

প্রশ্ন :—

১। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদকে ১৪/ বিঘা অথবা ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে দলিলাদির প্রমাণ চাই। জনশ্রুতিতে কাহারও মতে ১৪/ বিঘা, কাহারও মতে ১০০/ বিঘা ভূমিদানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

২। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রসাদকে যে দানপত্র দিয়াছিলেন ঐ মূল দানপত্র কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন কি না? কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অথবা প্রসাদের বংশধরদের নিকট উহা নাই।

৩। ঐ নিষ্কর ভূমির স্থান নির্ণয় এখনও করিতে পারি নাই। কেহ বলেন হালিসহরে এবং কেহ বলেন তেতুলিয়া গ্রামে। প্রকৃত সংবাদ কেহ জানিলে আমাকে জানাবেন।

৪। আমার অনেক সাহিত্যবন্ধু লিখিয়াছেন প্রসাদের হস্তলিখিত খাতা ভূকৈলাসের রাজবাটীতে আছে। আমি অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। কেহ জানিলে আমাকে জানাবেন।

৫। প্রসাদের অপ্রকাশিত নূতন পদাবলী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বি—২০ ডোরাণ্ডা
পো. আ. রাঁচি সেক্রেটারিয়ট
রাঁচি।

শোকসংবাদ।

ভাই দীননাথ মজুমদার—আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, নববিধান-সমাজের অন্যতর প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার গত ৩০শে আশ্বিন লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য একজন অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক আবশ্যক। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে যথার্থই ভাল বাসেন এবং তাহাকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে চাহেন, তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ পরিচয়সহ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলে বাধিত হইব।

একমেবাদ্বিতীয়ং

উনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৩ সংখ্যা ১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

আগে ও এখন।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

(ওমা) আগের্ মত তুই, কথা কস্‌নে কেন ॥ (ধুয়া)

(আগে) মুখভরা, দেখতেম্ হাসি,

(এখন্) রাগ্ ভরেতে সদাই বসি',—

(যদি) দোষই কোন, করেই থাকি,

আমায়্ তুই না বুঝাস্ কেন ?

(আগে) ভয়্ হলে তো, যেতেম্ ছুটে,

(এখন্) যাবার্ নামে প্রাণ্ ভয়ে টুটে,

(তুই) ঘা কতক আমায়্, মেরে ধরে,

কোলে তুলে ফের্ নিস্‌নে কেন ?

(আগে) মায়ে পোয়ে হ'ত, কতই কথা,

সুখের্, দুখের্ প্রাণের্ ব্যথা,

(এখন) এতই বা দোষ, করেছি কি মা

বারেক্ সাড়া দিস্‌নে কেন ?

কুপুত্র যদি বা, হয়েই থাকি,

ক্ষমা তুই আর্ করবি না-কি ?

তোর ছেলে তুই, মারিস্ যদি

(সবে) মা বলে আর্ ডাক্‌বে কেন ॥

ধর্ম্ম ও সুখদুঃখ।

বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এবং উৎসবঋতুর প্রারম্ভ-ভাগে ভক্তগণকে ঋষিদিগের অমোঘ ও অমূল্য মহাবাণীর অতিরিক্ত আর কি উপহার দিব জানি না। তাঁহাদের উপদেশ এই—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্ম ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় জীবনে ধর্ম্মের মধুময় ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করিলে এমন সবল ও সরল সত্যবাণী তাঁহাদের হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইত না। সেই মধুময় ভাব আমরাও প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে আমাদেরও জীবনে ধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া লইতে হইবে।

ধর্ম্ম কি ? সমস্ত জগতসংসার সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে শক্তিবলে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে তাহাই ধর্ম্ম। সেই মহাশক্তি ধর্ম্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকের ভিতরে যথোপযোগী আকারে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রত্যেককেই মঙ্গলের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছে। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই আকাশের গ্রহনক্ষত্র সকল আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করে এবং কক্ষের বাহিরে পদার্পণ করিলেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। ধর্ম্ম আছে বলিয়াই আমরা পুণ্যাচরণে কত আনন্দ প্রাপ্ত হই এবং পাপের প্রতিঘাতে আকুল হইয়া পড়ি।

এই মহাশক্তি আপনাপনি আসে নাই। ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহাকেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিয়া নমস্কার করি এবং তাঁহার সহিত জগতের যে যোগ, তাঁহার সহিত প্রত্যেক জীবের যে যোগ, তাহাকেই প্রধানত ধর্ম্ম বলা যায়। আমরা যাহাকে জড় বলি, পশুপক্ষী প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা চেতন বলি, এই যোগের বিষয় জানিয়া শুনিয়া ইহার পথ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকার তাহাদের আছে কি না জানি না। কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যেক মানবাত্মার যে একটী বিশেষ যোগ আছে, তাহা জানিয়া সেই যোগের পথে চলিবার অধিকার আমাদের আছে, তাহা আমরা জানি। এই কারণে পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগকে আমরা বিশেষভাবে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করি, এবং তাহারই অনুষঙ্গে, যে সকল কার্য্য, যে সকল চিন্তা, যে সকল আচার অনুষ্ঠান সেই যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সহায়তা করে, আমাদিগকে তাঁহা হইতে অবিচ্ছিন্ন রাখে, সেগুলিকেও অবান্তরভাবে ধর্ম্ম বলিয়াই উল্লেখ করি।

পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে আমরা কখনই আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। কিন্তু আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই প্রকৃতিবশেই আমরা কখনও বা আপনাদিগকে সেই যোগের অনুকূলে ভাসাইয়া দিই, আর কখনও বা তাহার প্রতিকূলে চলিবার চেষ্টা করি। আমরা যখন সেই যোগের অনুকূলে চলি, আমাদের সকল কার্য্য সকল ভাবনা তাহার অনুকূলে নিয়মিত করি, তখনই গভীর শান্তি ও আনন্দ আসিয়া আমাদের সমুদয় হৃদয়কে অধিকার করে এবং আমরা আপনা হইতেই বলিয়া উঠি যে সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর রসস্বরূপ। তখনই জ্ঞানেতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি যে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। ঋষিরা সেই আনন্দ সাগরে অবগাহন করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মই ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। ধর্ম্মের পথে চলিলে, যোগের অনুকূলে চলিলে জীবনটাকে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, আমাদের প্রত্যেক নিশ্বাসই মধুময় মঙ্গলময় হইয়া উঠে।

ধর্ম্মের প্রতিকূলে চলিলে সেই মহাশক্তির যে স্রোত এই জগতসংসারকে সিক্ত করিয়া কোমল শ্যামল করিয়া তুলিতেছে, সেই স্রোতে প্রতিকূলতার অনুপাতে প্রবল প্রতিঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই প্রতিঘাতের ফলে কালভৈরব তরঙ্গরাজি উঠিয়া মানবাত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং তাহার প্রতিকূল ভাবসকল বিনষ্ট করিয়া তাহাকে পুনরায় ধর্ম্মের অনুকূল পথে পরিচালিত করিয়া দেয়। প্রলয়কালে বা পরিণামে সকলকেই ধর্ম্মের পথে, পরমাত্মার সহিত যোগের পথে চলিতেই হইবে।

প্রতিকূল ভাব আসে কেন? আমাদের যখন পার্থিব সুখের অভাব হয়, কিম্বা যখন অতিরিক্ত পার্থিব সুখের সেবার ফলে অতৃপ্তি আসে, মোটামুটি হিসাবে বলিতে গেলে যে কারণেই হউক, পার্থিব সুখশান্তির উপরে আঘাত পড়িলেই সাধারণত ধর্ম্মের প্রতিকূল ভাব সকল জাগিয়া উঠে। অনেক সময়েই কেবল কল্পনারই কারণে আঘাতের বেগ বড়ই অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। যাই হৌক, আমাদের উপর ঐপ্রকার আঘাত পড়িলে সময়ে সময়ে এই ধর্ম্মবিরোধী প্রশ্ন আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মাকে বড়ই উদ্বেজিত করিয়া তুলে যে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিয়া লাভ কি? ধর্ম্মকে ধরিয়া যখন আমাদের ইচ্ছামত সুখশান্তি পাওয়া যায় না, তখন কথায় কথায় ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিবার কথা বলিয়া লাভ কি? এই প্রকার প্রশ্নের আকারে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে উদ্যত হয়।

যেই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা যে কোন আকারে হউক না কেন, আসিয়া আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইবে, তখনই সদুত্তররূপ অস্ত্রের দ্বারা সেই অশ্রদ্ধাকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলাই আমাদের কর্ত্তব্য। এবিষয়ে নিজেকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অবহেলা পূর্ব্বক অশ্রদ্ধাকে অন্তরে বর্দ্ধিত হইতে দিলে দুষ্ক-

পুষ্ট কালসর্পের ন্যায় তাহার হস্তে পরিণামে আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

পার্থিব সুখসমৃদ্ধি লাভ হয় না বলিয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবার ভাব পাশ্চাত্য ভাবের সংস্পর্শেই আমাদের দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য জাতিগণের মুখ্য ভাবই এই যে ধর্ম্ম বল, সত্য বল সকলকেই পার্থিব সুখের মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে হইবে। পার্থিব সুখের সাহায্য করিবে যেটুকু ধর্ম্ম তাহাই গ্রহণীয়, অবশিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যজ্য। এই ভাবের দ্বারা জীবনকে পরিচালিত করিলে যে কি বিষম বিষ উদগীরিত হয় তাহা বর্ত্তমান মহাসমর অগ্নিময় অক্ষরে সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশেও যে এ ভাবের এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর ভাবের কথা উঠে নাই তাহা নহে। চার্ব্বাক প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রকার ভাবসমূহ এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ঈশ্বরের ইহা পরম করুণার পরিচয় যে এই পুণ্যভূমি ভারতের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাব তাহাদের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া সেই সকল ভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পার্থিব সুখসমৃদ্ধি হস্তগত না হইলে ধর্ম্মপথ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মপথে চলিবার অপরিহার্য্য পরিণামফল পার্থিব সুখসমৃদ্ধি কি না। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা অন্তত অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইতাম যে ইহজগতের ধনী মানী ব্যক্তিগণই ধর্ম্মপথেও অনেকদূর অগ্রসর। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ঠিক তাহার বিপরীত। এ জগতে পার্থিব ধনে মানে যাহারা পূর্ণোদর, তাহাদেরই অধিকাংশ ধর্ম্মপথে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল মধ্যাহ্নসূর্য্যকেও আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ পার্থিব সুখসম্পদও ধর্ম্মের পথ অনেক সময়ে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে দেখা যায়। যে মহাশক্তি সত্য ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সমস্ত জগতসংসারকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, যে সত্য দেশকালের অতীত, সে ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামফল পৃথিবীর সুখ দুঃখ হইতে পারে না—পৃথিবীর সুখ দুঃখ তো দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন, অবস্থা প্রভৃতি পার্থিব পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বার্থ—যাহার অপর নাম মঙ্গল, আর পার্থিব সুখ দুঃখের ক্ষেত্র হইল তোমার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ। ধর্ম্মসাধনের পরিণামে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখও আসিতে পারে, দুঃখও আসিতে পারে। কিন্তু পার্থিব সুখ বা দুঃখ, কোনটীই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার অপরিহার্য্য পরিণামফল হইতে পারে না। কোনটীই অবিচ্ছিন্ন বা অনন্ত আকারে আমাদের সঙ্গী হইতে পারে না, কারণ উভয়ই প্রকৃতিবশেই সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতিতে এমন একটী কলকাঠি লাগানো আছে, যাহা তোমাকে পৃথিবীর সুখে কখনই চিরসন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। মিষ্টদ্রব্য তোমার প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে তোমার সহ্য শক্তির সীমা অতিক্রম করিলে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আনয়ন করে। সুখের উপকরণ সকল সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য আমাদের চিন্তা ও পরিশ্রমই তো আমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের পথে সর্ব্বপ্রধান বিঘ্ন। পার্থিব সুখসম্পদের মধ্য ডুবিয়া থাকিলেও সুখের প্রতি কিরূপ বিতৃষ্ণা জন্মে, আমাদের কর্ণে দুঃখের ক্রন্দন কিরূপ ধ্বনিত হইতে থাকে, আমেরিকার ক্রোরপতি জে গূল্ড তাহার জ্বলন্ত পরিচয় দিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যের কারণেই তাঁহার অন্তরে বিষাদের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে তিনি আত্মহত্যা করিলেন। ইহা তো জানা কথা যে কত লোকে সহসা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া পাগল হইয়া যায়, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

যেমন পার্থিব সুখের মধ্যে দুঃখের ধ্বনি জাগ্রত থাকে, মৃত্যুবীজ লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ পার্থিব দুঃখও অবিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। পার্থিব সুখের ন্যায় পার্থিব দুঃখও কাজেই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামফল হইতে পারে না। দুঃখের মধ্যেও আমরা সুখের আভাস দেখিতে পাই। দুঃখের মধ্যেও এই সুখ পাওয়া যায় বলিয়াই লক্ষকোটী জননী স্বীয় স্বাস্থ্য ও সুখের বিনিময়েও সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হয়, লক্ষ কোটী পিতা সন্তানগণের সুখের জন্য কঠোর পরিশ্রম সহকারে অর্থো-

পার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াও আরাম অনুভব করে। দুঃখের মধ্যেও সুখের মৃদু স্রোত জাগিয়া থাকে বলিয়াই লক্ষ কোটী লোক দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য অকাতরে ও আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগে অগ্রসর হইতে পারে।

পার্থিব সুখ দুঃখ ধর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামফল না হইলেও ধর্ম্মসাধনের পক্ষে যে তাহাদের উপযোগিতা নাই তাহা নহে। মহাশক্তির সাগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এই সুখদুঃখই ক্ষুদ্রতর নদীর আকারে ধর্ম্মকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার স্রোতে জীবনকে পরিচালিত করিবার একটী অবসর প্রদান করে। নদীর এক কূলে সুখের কাছাড় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উপরে নানাবিধ শস্যরাজি হাসিতেছে। সেই সকল ভূমি ও শস্যের অধিকারী তাহাতে ধর্ম্মসাধনের বাঁধন না দিলে সুখের মত্ততায় জানিতে পারে না যে সেই কাছাড় কবে নদীর পায়ে আছাড়িয়া পড়িবে। নদীর অপর কূলে দুঃখের চর পড়িয়া আছে। দিবারাত্র তাহা নদীর স্রোতে সিক্ত হইতে হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে শস্যশ্যামল করিবার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে ভগবৎপ্রেরিত শক্তি কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ আকারে কার্য্য করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় কক্ষে সুনিয়মে পরিচালিত করিতেছে। সেইরূপ সুখদুঃখও কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রানুগ আকারে কার্য্য করিয়া আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিয়া ধীরে ধীরে সেই মহাযোগের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। পার্থিব সুখ আমাদের জীবনের সকল কার্য্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ধর্ম্মপথ হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পার্থিব দুঃখকষ্ট আমাদের সমগ্র জীবনকে সংহত করিয়া আপনাকে আপনি দেখিতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার সহিত মহাযোগের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই প্রকারে সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতেই আমাদের প্রকৃত জীবন, মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে; তিলে তিলে পরমাত্মার সহিত আমাদের মিলন সাধিত হইতে থাকে। দুঃখের এই কেন্দ্রানুগ শক্তি থাকিবার কারণেই অধিকাংশ সাধকই দুঃখকে আত্মীয়রূপে বরণ করিয়া লয়েন। সেই কারণেই দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুঃখের বর ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে ধর্ম্মসাধনের পরিণামফল যখন অবিচ্ছিন্ন সুখ নহে, তখন কেবল অবিশ্রান্ত সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্মাচরণের কথা আসিতেই পারে না। ধর্ম্মাচরণের ফল হইতেছে সমগ্র জগতের নিয়ামক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা, সেই মহাশক্তিপ্রবর্ত্তক পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার মিলন সাধন করা এবং পরিণামে বিমল আনন্দসাগরে ডুবিয়া থাকা। এই কারণেই গীতা উপদেশ দিয়াছেন যে "সুখেতে বিগতস্পৃহ হইয়া এবং দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া" ধর্ম্মসাধন করিবে। ধর্ম্মসাধনের পথে একটী সোপানও অগ্রসর হইলে বুঝা যায় যে পৃথিবীর সুখে স্পৃহা করিবার মত, তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছুই নাই এবং দুঃখেতেও উদ্বিগ্ন হইবার মত সত্য সত্যই কিছুই নাই। সাধকেরা সত্যই জানেন যে ধর্ম্মপথে চলিলে মৃত্যুও অমৃতসোপান হইয়া উঠে।

ধর্ম্মসাধনের একমাত্র প্রকৃত পথ হইতেছে "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ" ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। অনেকে আক্ষেপ করেন যে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া, শাস্ত্রবিহিত নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করিয়াও জীবনে কোন শান্তি লাভ করেন না, তাঁহাদের জীবন সরস হইয়া উঠে না। শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, এ সকলই ধর্ম্মপথে চলিবার পক্ষে বিশেষ সহায় হইলেও এইগুলিই প্রকৃত পথ নহে। কিন্তু তাঁহারা এইগুলিকেই প্রকৃত ধর্ম্মপথ মনে করিয়াই ভুল করেন। বিভিন্ন পণ্ডিত শাস্ত্রসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন মার্গই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কোন্ মার্গ অবলম্বন করিব? দেশকালঅবস্থাবিশেষে ইষ্টকর কত প্রথা শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইলেও বর্ত্তমানে হয়তো সেগুলি অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি আমরা এখন অবলম্বন করিব কিনা? শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতি সূত্রে এইরূপ কতই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের বাণী শুনিবার অবসর দেয় না। কাজেই তাহাতে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং আমরা অশান্তির কূপে ক্রমশই নিমগ্ন হইতে থাকি।

ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ব্যতীত পূর্ণ শান্তি লাভের, প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় পথ নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। তাঁহাকে সত্যসত্য ভাল বাসিলে পার্থিব সুখের প্রতি তোমার স্পৃহা থাকিতে পারিবে না। তখন, তোমার ইষ্টদেবতার যে মঙ্গলবিধানে সমস্ত জগতসংসার নিয়মিত হইতেছে, সেই মঙ্গল বিধানের সহিত তোমার সকল ইচ্ছা মিলিত হইবে; তোমার সমুদয় কার্য্য, সকল আচার অনুষ্ঠান তাহারই অনুকূল হইয়া চলিবে। তোমার শান্তি ও আনন্দ অটুট থাকিবে।

এই ভালবাসা, এই ভগবদ্ভক্তি কেবল মুখের কথা হইলে চলিবে না। ঋষিরা যে সবল ঈশ্বরপ্রীতি দেখাইয়াছিলেন, তাহা যে পরিমাণে আমরা হারাইয়া বসিয়াছি, সেই পরিমাণেই দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে শত বিপর্য্যয়ের মধ্যে কত শত সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমিকে ভক্তিস্রোতে মধ্যে মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া শ্যামল করিয়া রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কিন্তু মুখের কথার উপর ধর্ম্মকে এতই অধিক দাঁড় করানো হইয়াছিল যে পরিণামে পার্থিব সুখের স্পৃহা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া মহাসমরসূত্রে ধর্ম্মের স্রোতে সম্পূর্ণ আত্মবলি প্রদান করিবার উপক্রম করিয়াছে। যদি পাশ্চাত্য জাতিগণের সুখস্পৃহা ইহাতেও না যথাযথ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে, তবে আবারও এই প্রকার প্রলয়ঙ্কর মহাসমর সংঘটিত হইবে নিঃসন্দেহ।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবের এই বিভিন্নতার কারণ প্রধানত এই যে আমরা শৈশবাবধিই ধর্ম্মপথে চলিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হই এবং পাশ্চাত্যগণ শৈশবাবধিই ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথে চলিবার শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। একথা আমরা বলিতেছি না, পাশ্চাত্যগণ নিজেরাই ইহা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন। * তাই তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীরই ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন—তাহার আমূল সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের দেশেও অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে এই কথা প্রচারিত হইতেছিল যে শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষা দিলে শিশুগণ অকালপক্ক হইয়া উঠিবে। আমরা কিন্তু আবহমান কাল শৈশবাবধি ধর্ম্মশিক্ষার উপকারিতা প্রচার করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান প্রলয়কালীন আন্দোলন আলোচনাও আমাদেরই প্রচারিত সত্যের যাথার্থ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে পটু করিতে ইচ্ছা করিলে শৈশবাবধি শিক্ষা দিবে; বালকদিগকে সুদূর ভবিষ্যতে সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে রণপটু করিবার জন্য শৈশবাবধি যথোপযুক্ত বিষয়সমূহের শিক্ষা দিবে। কিন্তু ধর্ম্মপথে সন্তানগণকে চালাইবার কথা হইলেই কি আমরা পরীক্ষিত সত্যের বিপরীত পথ অবলম্বন করিব? সমগ্র জগত হইতে সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার এক মহা কাতরধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে—সমগ্র শিক্ষিত জগতে এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যাইতেছে। আমরা ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদে, পিতৃপিতামহদিগের তপস্যার ফলে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল কি অবহেলার কারণে, আলস্যের কারণে হারাইয়া বসিব? কথায় কথায় ব্রহ্মের রূপকল্পনার কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন প্রাণপণে সেই প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহারই প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। তাঁহার আদেশ পালনের ফলে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ফলে যদি পার্থিব সুখ প্রাপ্ত হই, তবে তাহাকেও ধর্ম্মেরই অনুকূল করিয়া লইতে হইবে, পরমাত্মার সহিত মহাযোগের সহায় করিয়া লইতে হইবে। আর যদি দুঃখও পাই, তাহাতেও অবিচলিত থাকিয়া তাহাকেও সেই মহাযোগেরই অনুকূল করিয়া লইতে হইবে।

যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সত্যধর্ম্ম একসময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে পুণ্যময় করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার বলে ভারতভূমি শত মহাপ্রলয়েরও মধ্যে নিজের উন্নত মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হই-

* "No English school-boy is ever taught to speak the truth, for the very simple reason that he is never taught to desire the truth. From the very first he is taught to be totally careless as to whether a fact is a fact; he is taught to care only whether the fact can be used on his side, when he is engaged in playing the game. Passing of the Empire by H. Fielding Hall.

য়াছে, যাহার কণামাত্র প্রচারের ফলে আজ সমগ্র জগত ভারতের নিকট অবনতমস্তক হইয়াছে, ঋষিদিগের সবল সরল ও মধুস্রাবী বাণীতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য পরস্পরকে আমরা বলিতে চাহি—ধর্ম্মং চর ধর্ম্মং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্ম ভূতচরাচরের পক্ষে মধুস্বরূপ। ঈশ্বর আমাদের এই ধর্ম্মাচরণে নিত্য সহায় হউন।

করে যাব।

করে যাব কাজ আছে করিবার যাহা।
বলিবার থাকে যদি বলে যাও তাহা॥
অনন্তের মহাশক্তি নিত্য দেয় বল—
দৌর্ব্বল্য দৈন্যের যত ঘুচায়ে গরল॥
নিরানন্দ মলিনতা কোথা যায় চলে।
তাদের দলেছি দেখ এই পদতলে॥
তোমরা ঘুমাও কেন অচেতন প্রায়
নিশার আঁধার যবে আবরে ধরায়?
নাহিক ঘুমের লেশ আমার নয়নে—
দিন রাত খেটে যাব শকতি অর্জ্জনে॥
পিছনে চাব না কভু, চলিব এগিয়ে।
মায়ামরীচিকা সব থাক্ না পড়িয়ে॥
আঁধারের মাঝে দেখি প্রেমের আলোক।
ভুলায়ে দেয় যে তাহা শ্রান্তি ক্লান্তি শোক॥
অভয় হয়েছি আমি ধরিয়া অভয়ে।
বাহির হয়েছি তাই পৃথিবীর জয়ে॥
এধরার কাজ যবে হয়ে যাবে সারা।
অনায়াসে যাব চলি ছাড়ি এই কারা॥
সংসারের ওপারেতে সাথে দেবগণ
ধন্য হব তাঁর নাম গাহি অনুক্ষণ॥

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

বসু বিজ্ঞান মন্দির—গত ৩০ শে নবেম্বর বঙ্গের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন। ঐ দিবস সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের (Bose Research Institute) প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। ভারতের উন্নতির পথে এই মন্দির অন্যতর জয়স্তম্ভ। ইহা বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুর নাম ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় রাখিবে। সেই প্রতিষ্ঠার দিবস সার জগদীশচন্দ্র আমাদিগকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইয়া উঠে, নব আশায় নবজীবনের অনুপ্রাণনে আমাদের প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করিয়া এবং জড়-বিজ্ঞানবাদীদিগের অস্ফুট উপহাসধ্বনি অবিচলিত-ভাবে সহ্য করিয়া, সারাজীবন ধরিয়া একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় তিনি যে জ্ঞানরত্নের অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছিলেন এতদিন পরে তাহা তাঁহার করায়ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি যে রত্ন প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি সৃষ্টির শেষ দিবস পর্য্যন্ত অটল ও অচল ভাবে স্থায়ী রহিবে।

জড়ের সমস্যা-সমাধান করিতে গিয়া তিনি চৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন; মৃত্যুর যবনিকা উন্মোচন করিয়া জীবন-মরণের রহস্যলীলা দেখাইয়াছেন। আধ্যাত্ম জগতের যাহা সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য, দর্শনশাস্ত্রেও যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, সেই তত্ত্ব, মানবের সেই সনাতন রহস্য তিনি জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তুলিলেন। কত আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহাকে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের মত পথে কত সঙ্গীকে হারাইয়া বিজ্ঞানের তুষারকঙ্করাবৃত কঠোর পথ বাহিয়া দীর্ঘকাল পরে আজ তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। আজ সমগ্র বঙ্গদেশ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত—বঙ্গের জগদীশচন্দ্র এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন যে পদার্থদর্শন, রসায়ন বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, সব সম্মিলিত হইয়া একই মহানিয়মের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দর্শন ও বিজ্ঞান আজ একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে।

জগদীশচন্দ্র প্রথমেই বলিয়াছেন "আমি কেবল একটী বিজ্ঞান গৃহ নহে, কিন্তু একটী মন্দির উৎসর্গ করিতেছি" কথাটী খুবই সঙ্গত এবং ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর উপযুক্ত। তিনি যে বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাহার জন্য সত্যই একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক—যে মন্দিরে জড়বিজ্ঞান ঊর্দ্ধমুখে অধ্যাত্মদর্শনের সহিত মিলিবার জন্য ধাবিত হয় এবং অধ্যাত্মদর্শন স্নেহদৃষ্টিতে নামিয়া আসিয়া জড় বিজ্ঞানের সহিত একাত্ম হইতে চাহে। পাশ্চাত্য জাতিগণ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের জন্যই ভাল বাসেন—কেবল জড়বস্তুর সহিত মেলামেশা করিতে করিতে গভীরভাবে মগ্ন হইয়া যান এবং জড়ের ক্ষমতায়

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার সার জগদীশচন্দ্র বসু।
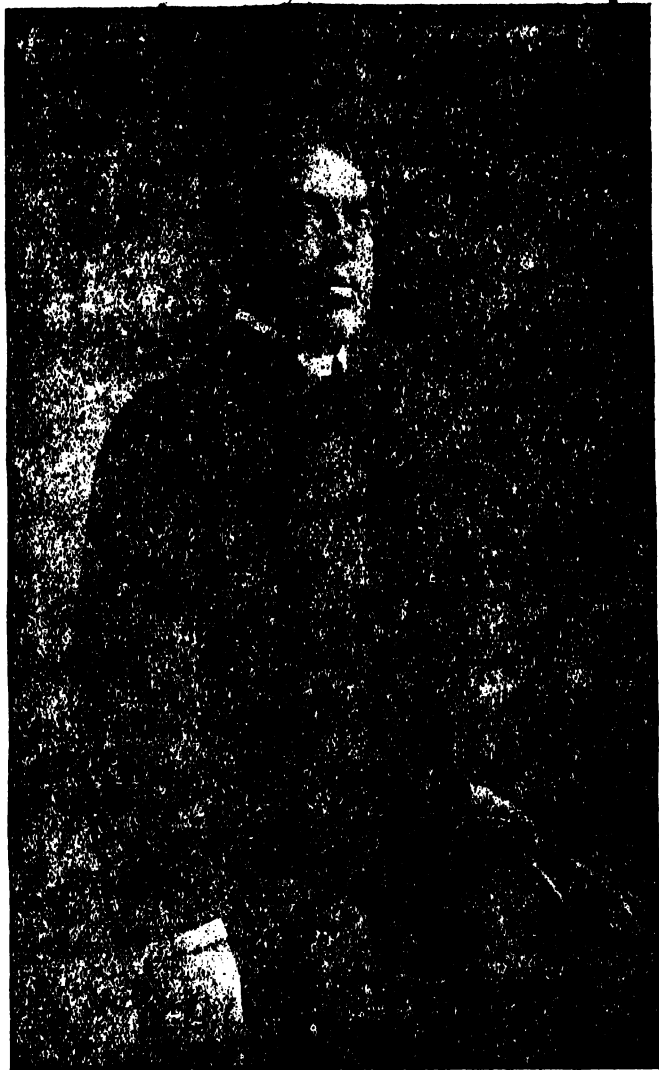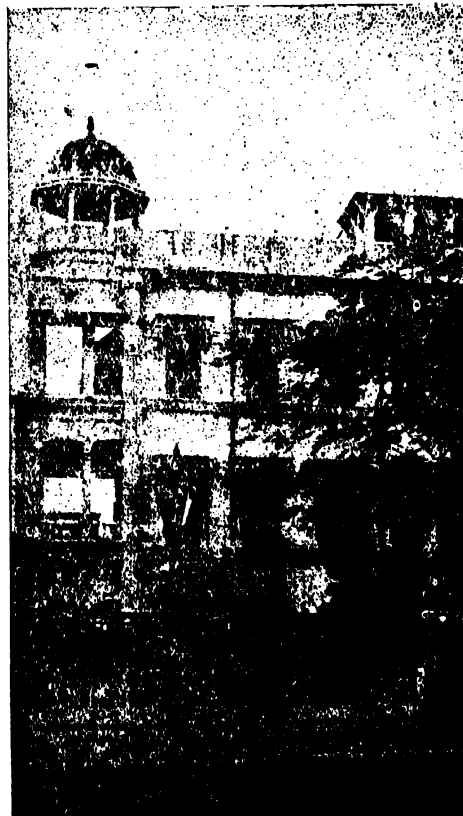
বক্তৃতা গৃহে সংলগ্ন পিত্তলপত্র—"আলোক ও অন্ধকারে বিরোধ।"

ল্যাবোরেটরির বক্তৃতাগৃহে রক্ষিত ছবি—"অনুসন্ধান"—বুদ্ধির সহযোগী কল্পনা।
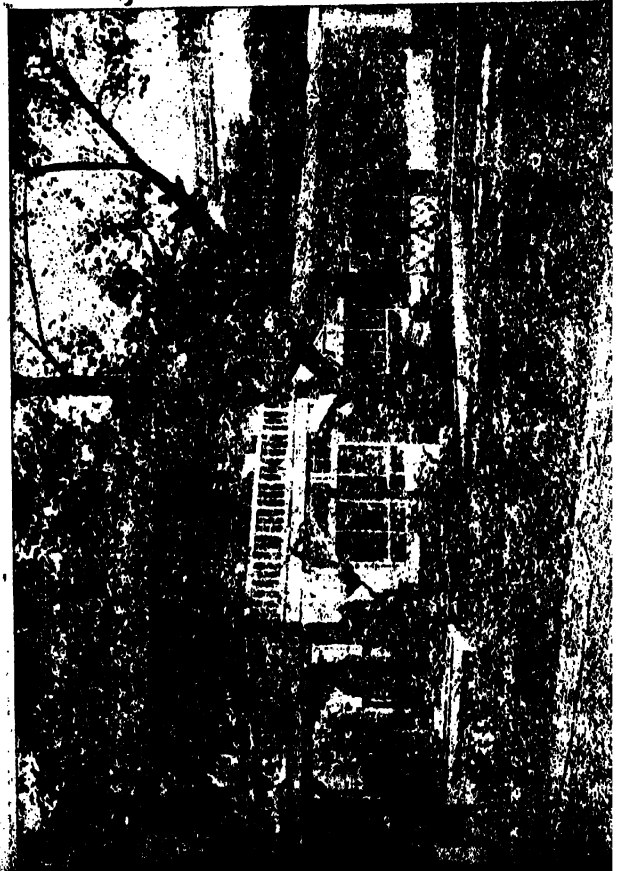
মুগ্ধ হইয়া অনেকস্থলেই পরের ধ্বংস সাধনে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ভারতবাসী যে বহির্জগত হইতে কেবলই অন্তর্জগতের সংস্পর্শ লাভে স্বভাবতই অগ্রসর হইতে চাহে, একথা জড়বাদে অনুরক্ত পাশ্চাত্য জগত ঠিক ধারণাই করিতে পারে না। কিন্তু পরিণামে এই ভাবই জয়লাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। কেবল তো বহির্জগত লইয়াই প্রকৃতি নহে, অন্তর্জগত ও বহির্জগত উভয় লইয়াই যে প্রকৃতি। এই অন্তর্জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কারণেই ভাই প্রতাপ-চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল অন্তর্জগত লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। আজ জগদীশ-চন্দ্র প্রত্যক্ষ পরীক্ষণের সাহায্যে বহির্জগতের ভিতর দিয়া অন্তর্জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস যে অচিরকালেই ভারতবর্ষ পুনরায় জ্ঞানবিজ্ঞানে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

আচার্য্য বলিয়াছেন, এই বিজ্ঞানমন্দিরে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চর্ব্বিত চর্ব্বণ আলোচিত হইবে না—সম্পূর্ণ নূতনতত্ত্ব, বিজ্ঞানের নবীনতম ধারা এখান হইতে প্রবাহিত হইবে। জগতের জ্ঞানান্বেষীগণ দেশবিদেশ হইতে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য এই বঙ্গদেশে আগমন করিবেন। আজ মনে পড়ে, ভারতের সেই অতীত বৌদ্ধ যুগের সম্পদের দিন—যখন ভারতের ললাটে জ্ঞানগরিমার অপূর্ব্ব তিলক অঙ্কিত ছিল; যখন নালন্দা ও তক্ষশিলার জ্ঞানের সৌরভ সমগ্র ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হইত। ভারতের জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য পূর্ব্বে চীন, জাপান, সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে যেমন নালন্দা ও তক্ষশিলায় আগমন করিতেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত আমরাও আজ আশা করিতে পারি যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতেও জ্ঞানান্বেষীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবেন—এই বসু বিজ্ঞান-মন্দির সময়ে সমগ্র জগতের বিদ্যার্থীগণের তীর্থস্থানে পরিণত হইবে।

জীবজগত এবং জড়জগত যে একই নিয়মে পরি-চালিত হইতেছে এই তত্ত্বটী বুঝাইবার প্রসঙ্গে বিজ্ঞা-নাচার্য্য যে দুইটী জাতির আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর সর্ব্বদা স্মৃতিপথে গাঁথিয়া রাখা উচিত। তিনি বলেন যে আমাদিগকে অবশ্য শিক্ষাবিস্তার ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কিন্তু মাত্র এই প্রকারের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ে কোন জাতির স্থায়িত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাশ্চাত্য জগতে ইহার ফলে শক্তি ও অর্থ পুঞ্জীভূত হইয়াছে বটে কিন্তু সে শক্তির কার্য্য স্থিতি অপেক্ষা ধ্বংসের দিকে অধিক। সংযমের অভাবে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ছিন্নমস্তার ন্যায় আপনার ধ্বংসের উপায় আপনিই প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। ভারতের আদর্শ শুধু পার্থিব উন্নতিতে নয়, শুধু শক্তিলাভের সাময়িক উত্তেজনায় পর্য্যবসিত নয়, ভারতের আদর্শ শক্তির পরিপাকে। জীবনসংগ্রামে আমরা যে মহাশক্তি অর্জন করিব, তাহাই আবার জগতের কল্যাণে নিঃশেষ পূর্ব্বক দান করিতে হইবে। জগতের কল্যাণময় দানযজ্ঞবেদীতে আমাদিগকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতি-হাসে এ আদর্শের উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ বিজ্ঞানাচার্য্যের নবপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দিরের সাধনার মূলমন্ত্র। তাঁহার সাধনা সিদ্ধির কল্যাণে সার্থক হউক।

সার জগদীশচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া অতুলনীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রাজা অশোকের আমলকী দান এবং দধীচি মুনির পরহিতার্থে অস্থি দানের উল্লেখ পূর্ব্বক স্বীয় অভিভাষণের সুন্দর উপসংহার করিয়াছেন।

আজ জগদীশচন্দ্রের গরিমায় সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত—কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে তাহাতেও বাঙ্গালীর হিংসা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ঈর্ষ্যাদগ্ধ ব্যক্তির তপ্ত নিশ্বাস উপেক্ষণীয়—ইহা লইয়া আলোচনা করাই ভ্রম।

কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ্—প্রতিদিনই ভারতের জাতীয় জীবনে উন্নতির নব নব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই নব যুগে ভারতবাসীকে যথার্থ শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মায়ের আহ্বানে আমাদের মিলিত হইতে হইবে। আজ তুচ্ছ বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া পর-স্পরের বিরোধ করিবার দিন নয়। আজ হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে। যাঁহারা স্বদেশবাসীগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইতে চাহেন, তাঁহারা সাধারণত কংগ্রেসকে হিন্দুপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা এবং হিন্দু শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও সংখ্যা অপরাপর অধিবাসীগণের তুলনায় অনেক বেশী, কাজেই স্বভাবতই কংগ্রেসে হিন্দু-দিগের প্রাধান্য হয়তো একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছে। তাই বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের কোনই কারণ দেখি না। বিবাদ বিসম্বাদের যে সত্যই কোন কারণ নাই, কংগ্রেস এবং মসলেম লীগ একযোগে শাসন-সংস্কারপদ্ধতির একটি প্রণালী উপস্থিত করিয়া তাহার

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা সেই প্রণালীর ভালমন্দ বিচার করিতে চাহি না। কংগ্রেস ও মুসলমান লীগ যে সর্ব্ববিষয়ে একমত হইয়া জন্মভূমির উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতেছেন ইহা দেখিয়াই আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং সেই কারণে ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। সর্ব্ববিষয়ে আমাদের এখন অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান হাতধরাধরি করিয়া সমগ্র জগতের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে হইবে। পার্থক্যের দিন, প্রভেদ বৈষম্যের দিন গত হইয়াছে—এখন সমগ্র বিশ্বকে একভাবে, একটি অখণ্ড সত্যরূপে অনুভব করিবার দিন আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় উদ্বোধনের নব সঙ্গীত আমাদের জাতির মর্ম্মদুয়ার উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে প্রচালিত করুক —.

নূতনযুগ সূর্য্য উঠিল ঘুচিল তিমির রাত্রি
তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী—
দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই?
গত গৌরব, হৃত আসন, নত মস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন কর নর সমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।

ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর মিলিত কণ্ঠের আবেদন তাঁহার সিংহাসনতলে উপস্থিত হউক।

আর্য্য সৌভ্রাত্র সম্মিলনী---বোম্বাই সহরে এই নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য নামেই প্রকাশ পাইতেছে। ইঁহারা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার অনুগামী হইয়া সমাজের বৈষম্য দূরীভূত করিয়া সাম্য প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতির অন্তরায় জাতিভেদকে ইঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে সচেষ্ট। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রাচীন হিন্দু প্রথা ও শাস্ত্র-সম্মত। সেই প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহারা উদ্বাহ প্রথা প্রচলনে ব্রতী হইয়াছেন; অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানের বর্ত্তিকা সাহায্যে উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় সে সুযোগ প্রদত্ত হইবে—ইঁহারা এইরূপ প্রস্তাব স্বীকার করিয়াছেন। ফলত যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে একভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য এই সম্মিলনী বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সভ্যগণ যদি সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন তবেই বুঝিব যে তাঁহাদের শিক্ষা ও স্বদেশপ্রীতি সার্থক। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জ্ঞান ও অজ্ঞানে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে—যতই জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি হইবে, অজ্ঞানতা কুসংস্কার ততই বিনষ্ট হইতে থাকিবে। বর্ত্তমানকালে যখন দেশে দেশে জাগরণের সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে তখন আর তুচ্ছ আত্মবিরোধ ও স্বকীয় অজ্ঞানতা-সৃষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দিন অতিবাহিত করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। এরূপ সভা যতই অধিক স্থাপিত হয় ততই ভাল। কিন্তু যতদিন না গভর্ণমেণ্ট আইনের দ্বারা সবর্ণ বা সগোত্র বিবাহ, আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রভৃতির বৈধতা স্থাপিত করিবেন, ততদিন এরূপ সভাসমিতি দ্বারা বিশেষ ফল হইবে বলিয়া আমরা আশা করি না। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে চাহি যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের ন্যায় কোন প্রকার নিরীশ্বর বিবাহ স্থাপিত করিতে উদ্যত হইলে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী, বিশেষত হিন্দুগণ তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবে কিনা সন্দেহ। এই আন্দোলনের জন্য আমাদের বোম্বাইবাসী হিন্দু ভ্রাতৃগণ সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন। সমাজ সংস্কারে তাঁহাদের আন্তরিকতা সফল হউক।

লবণের মূল্য বৃদ্ধি---বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মহাসমরের কুফলস্বরূপ এদেশে সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় নাই। কিন্তু আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন লবণের মূল্য অনায়াসেই হ্রাস হইতে পারে। লবণ ধনী দরিদ্রের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাহার উপর উহার মূল্য প্রায় তিন চারি গুণ বাড়িয়াছে। বাতাস ও জলের ন্যায় যাহা প্রকৃতি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা এরূপে অযথা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইলে দরিদ্র প্রজার বাস্তবিকই বিশেষ কষ্ট হয়। আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে স্থানে স্থানে লবণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাজার লুটপাট হইয়াছে। লবণ জীবজন্তুর একটি অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। এ রকম বস্তুকে গভর্ণমেণ্ট সহজলভ্য না করিয়া ভাল করিয়াছেন ব[illegible]নে হয় না। আমরা গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই পরামর্শ দিতেছি যে তাঁহারা এই বস্তু প্রস্তুত করিবার বাধা উঠাইয়া লইয়া সমগ্র ভারতবাসীর আশীর্ব্বাদভাজন হউন। তাঁহারা জানেন না যে এই রকম ছোটখাটো অথচ একান্ত

প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব হইলে কি প্রকার অসন্তোষ বিস্তারের কারণ হইয়া উঠে। সাধারণ ভারতবাসীগণ লবণ দিয়া যদি দুমুঠো ভাত খাইতে পায় তাহা হইলেই তাহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে বড় বেশী মনোযোগ দিতে চাহিবে না।

মদ্য কি ভারত হইতে তিরোহিত হইবে না?—এই সূত্রে আমরা বলিতে চাহি যে এই সঙ্গে সুরারাক্ষসীকে কি ভারত হইতে দূর করা যাইবে না? বর্ত্তমান মহাসমরের ফলে ইংরাজ জাতিই আমাদিগকে পদে পদে জানাইয়াছে যে মদ্যপানের ঘোর অপকারিতার কারণে আমাদের সম্রাট উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ফ্রান্স মদ্যপানের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছে এবং সমগ্র রুষিয়া হইতে সুরারাক্ষসী নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তাহার ফলে যতদূর কাগজপত্রে দেখি, তাহাতে জানিতে পারি যে রুষীয়গণ মদ্যপান পরিত্যাগ করিবার ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুখী। সমরপ্রাঙ্গন হইতেও লর্ড কিচনার হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সেনাপতিই একবাক্যে সুরানির্ব্বাসন ঘোষণা করিয়াছেন। তাই আমরা বলিতেছি যে যদি গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে মদ্য উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে মদ্যপানে ভারতবাসীর যে অর্থ অপব্যয় হইতেছে সে অর্থ ভারতবাসী অন্য সূত্রে গভর্ণমেণ্টকে দিতে যে দ্বিধা করিবে তাহা বোধ হয় না। মদ্যপানের ফলে মস্তিষ্কে যে তরলতা উপস্থিত হয়, কে বলিতে পারে যে বর্ত্তমানে যুবকদের অনেকের চঞ্চলচিত্ততা নবযুগের প্রথমাবস্থায় ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মদ্যপানের ফল নহে? তার পর, এক একটী লোকের চঞ্চলভাব যে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে তাহা বলা বাহুল্য। এই সকল আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট মদ্যপান রহিত করিয়া দিলে দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে।

মহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠক এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সার আশুতোষ মহম্মদীয় শিক্ষাবৈঠকের যে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইয়াছিল। তিনি ইউনিভারসিটি কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া অবশ্য সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হউক, মুসলমানগণ যে নির্ব্বিচারে একজন হিন্দুকে তাঁহাদের একটী প্রধান বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে ভারতে শত প্রতিবাদ চীৎকারের মধ্যেও প্রকৃত ভ্রাতৃভাব কিরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধের পর?—যুদ্ধের পর সমাজকে কি ভাবে গড়িতে হইবে, ইহা লইয়া বর্ত্তমানে পশ্চিম ভূখণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এই বিষয়ক সাহিত্য যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে মোটামুটি হিসাবে ঋষিদের প্রচারিত এবং প্রধানত মনুসংহিতার অনুগত সামাজিক ব্যবস্থা এবং উদার অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের প্রচার যতদিন না হইবে ততদিন প্রকৃত শান্তির আশা সুদূরপরাহত। আমাদের কথা যেন কেহ ভুল না বুঝেন। আমরা "মোটামুটি হিসাবে" কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের এমন কথা নয় যে শাস্ত্রীয় আচার পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আমাদের বক্তব্য এই যে আমাদের ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যগর্ভ মূলমন্ত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, সেই মূলমন্ত্রগুলির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সামাজিক বিধিব্যবস্থা করিলে তবে শান্তি লাভ সম্ভব। আর যদি প্রকৃত শান্তির পরিবর্ত্তে মৌখিক শান্তি পাইতে চাও, তাহা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতির বিধিব্যবস্থা তদ্বিষয়ে যথেষ্ট অনুকূল দেখিতে পাইবে।

ভারতে অশান্তির কথা।—সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে গেলেই ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিতেই হইবে। ভারত-বিষয়ক রাজনীতিসূত্রেও উন্নতি লাভের জন্য আমাদিগকে অনেক আঘাত অনেক প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। সে প্রকার আঘাত প্রতিঘাতের জন্য দুঃখিত হইলে চলিবে না। সার ব্যামফীল্ড ফুলার বিলাতের টাইমস কাগজে ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির মূলে সিবিল সার্ব্বিসের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবার কথা বলিয়া এই প্রকার একটি আঘাত দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।* তিনি এ প্রকার ভ্রান্ত ধারণা করাইবার চেষ্টা করিয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন। তিনি বিশেষরূপেই জানেন যে লর্ড কার্জ্জনের সময়ে বঙ্গবিভাগের কথা হইতেই বর্ত্তমান ভারতীয় অশান্তির উৎপত্তি। তখন কি সিবিল সার্ব্বিসের সম্মান বজ্রবৎ সুদৃঢ় ছিল না? সিবিল সার্ব্বিসের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা যে বড় বেশী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা নহে। তবে সিবিল সার্ব্বিসের অন্তর্ভুক্ত এক একটি লোকের অবিবেচনা, চর্ম্মের বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবহার-পার্থক্য, দেশের সম্মানিত লোকের প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহার, প্রভৃতি স্থানবিশেষে কালবিশেষে এই পুরাতন দেশের প্রাচীন সভ্যতামূলক ইতিহাসগর্ব্বে গৌরবান্বিত অধিবাসীগণের অন্তরে যে অসদ্ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে অশান্তির মূল কারণ। পরে সেই অশান্তিই প্রধূমিত হইতে হইতে বিস্তৃত

* Statesman Nov 18, 1917.

হইয়া পড়ে এবং যথাসময়ে উপযুক্ত উপকরণ পাইলেই প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া সকল শান্তি গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। বাহিরে বাহিরে দেখিলে এই প্রকৃত কারণের কেহই কোন সন্ধান পায় না। ফুলার সাহেব যদি সিবিল সার্ব্বিসের সভ্যগণকে এদেশবাসীর সহিত কেবল মৌখিক নহে, আন্তরিক সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এবং ভারতের উভয় দেশের এবং সমগ্র সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকার করিতেন।

সুন্দর।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী—টোড়ি-ভৈরবী।

দুখের কথা বল্‌ব যবে
তোমায় করবো অপমান
সুন্দর চিরসুন্দর হে
সুন্দর ভবে দে'ছ স্থান!

প্রভাতে কি আলোর ধারা
দিকে দিকে প্রাণের সাড়া
কুসুম ফোটে সুবাস ছোটে
কানন-পাখী তোলে সে তান!

জন্ম যে দিন দিয়েছিলে
কোন বারতা কয়েছিলে
"আনন্দের এই ধরা ওরে
পুণ্য মধুর শান্তির ধাম!

হেথা নিশীথ-রাতে ফুটবে তারা
ঝরবে প্রাতে আলোর ধারা
গাইবে পাখী দুলবে শাখী
ফুট্‌বে কুসুম উঠ্‌বে রে গান!

হেথা আছে প্রেম স্নেহ আছে রে সুখ
আছে বেদন-কাঁটা আছে রে দুখ
কুসুম হয়ে ফুটবে যে সব
এ যে আঁধার আলোর বিচিত্র এ তান!"

ওরে মন করিস্ নে তুই মিথ্যা সব
এত প্রেম স্নেহ এত কলরব
এত হাসি গান এত উৎসব
এত আনন্দ এত যে প্রাণ॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

ব্রহ্মলক্ষণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ।

মূলসূত্র। জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ২ ॥

অধিকরণ শ্লোক। দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিম্বাঽস্তি নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্ম স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি॥ ১৪ ॥

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌-ব্রহ্ম [তৈত্তি, ৩।১।১] ইতি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম [তৈত্তি, ২।১।১] ইতি বাক্যদ্বয়ং বিষয়ঃ। প্রয়ন্তি ম্রিয়মাণানীত্যর্থঃ। তত্র শ্রূয়মাণং ব্রহ্মলক্ষণং ন ঘটতে ঘটতে বা ইতি সংশয়ঃ। ন ঘটতে। তথাহি কিং জন্মাদিকং তল্লক্ষণং উত সত্যাদিকং। নাঽদ্যঃ তস্য জগন্নিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মসম্বন্ধাভাবাৎ। দ্বিতীয়েঽপি লোকপ্রসিদ্ধস্য সত্যজ্ঞানাদেঃ স্বীকারে ভিন্নার্থত্বাদ-খণ্ডং ব্রহ্ম ন সিধ্যেৎ অপ্রসিদ্ধস্য তু সত্যাদের্লক্ষণ-ত্বমযুক্তং। তস্মাৎ তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণং চ ন বিদ্যতে।

অত্রোচ্যতে—যল্লক্ষণং রূপানন্তর্ভূতং সৎ পদা-র্থান্তরব্যবস্থাহেতুঃ তত্তটস্থলক্ষণং। জন্মাদেরন্য-নিষ্ঠত্বেঽপি তৎকারণত্বং ব্রহ্মণি কল্পনয়া সম্বদ্ধং তটস্থলক্ষণং ভবিষ্যতি। যো ভুজঙ্গঃ সা স্রক্ ইতি-বৎ যজ্জগৎকারণং তদ্‌ব্রহ্ম ইতি কল্পিতেনাপি বস্তুনোপলক্ষয়িতুং শক্যত্বাৎ। ভিন্নার্থানামপি পিতৃ-সুতভ্রাতৃজামাত্রাদিশব্দানামেকদেবদত্তপর্য্যবসায়িত্বে যথা ন বিরোধঃ তথা লোকসিদ্ধভিন্নার্থবাচিসত্যাদি-শব্দানামখণ্ডব্রহ্মপর্য্যবসায়িত্বে স্বরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ। ইত্যুভয়মপ্যুপপন্নং॥

সূত্রানুবাদ। যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি।

দ্বিতীয় অধিকরণ সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকানুবাদ। ব্রহ্মের লক্ষণ নাই কিম্বা আছে? নাই। কারণ, জন্ম প্রভৃতি (ব্রহ্ম ভিন্ন) অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং সত্যাদি শব্দও (ব্রহ্ম-লক্ষণ হিসাবে) অপ্রসিদ্ধ। স্রগ্‌ভুজঙ্গের ন্যায়

(জগতের) কারণত্ব ব্রহ্মসম্বন্ধীয় লক্ষণ হইতে পারে। লৌকিক সত্যাদি শব্দই অখণ্ডকে নির্দ্দেশ করিতেছে।

টীকার অনুবাদ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম এবং সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই দুইটী শ্রুতিবাক্য (বর্ত্তমান অধিকরণের) বিষয়। "প্রয়ন্তি" শব্দের অর্থ ম্রিয়মাণ। উপরোক্ত শ্রুতি-বাক্যদ্বয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মলক্ষণ স্বীকৃত হইতে পারে কি না ইহাই হইল সংশয়। হইতে পারে না। আচ্ছা—জন্মাদি কি তাঁহার লক্ষণ অথবা সত্যাদি? প্রথম (জন্মাদি) নহে, কারণ তাহার জগতের সহিত সম্বন্ধ আছে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয় (সত্যাদি) লক্ষণেও, সাধারণত সত্যজ্ঞানাদি শব্দ যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সে অর্থে ঐ শব্দগুলিকে গ্রহণ করিলে ভিন্নার্থত্ব প্রযুক্ত (উহাদের দ্বারা) অখণ্ড ব্রহ্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। আর, যদি সত্যাদি শব্দের কোন অপ্রসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে প্রকার অপ্রসিদ্ধার্থ শব্দের দ্বারা (ব্রহ্মের) লক্ষণত্ব স্থির করা অসঙ্গত। সুতরাং, (ব্রহ্মের) তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপলক্ষণ, কোন প্রকার লক্ষণই দাঁড়াইল না।

এ বিষয়ে বলা যাইতেছে—যে লক্ষণ রূপের অন্তর্ভূত না হইয়া অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যবস্থা বা পৃথককরণের কারণ হয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ। জন্ম প্রভৃতি (ব্রহ্ম ভিন্ন) অন্য পদার্থের ধর্ম্ম হই-লেও তাহাদের কারণত্ব ব্রহ্মেতে কল্পনাসম্বন্ধ হইয়া তটস্থ লক্ষণ হইবে। যাহা ভুজঙ্গ তাহা পুষ্পমাল্য, ইহার ন্যায় যিনি জগৎকারণ তিনিই ব্রহ্ম এইটী কল্পিত বস্তু দ্বারাও উপলক্ষিত হইতে পারে। পিতা, সুত, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দ ভিন্নার্থ হইলেও একই দেবদত্তকে বুঝাইবার পক্ষে যেমন কোন বিরোধ হয় না, সেই প্রকার সত্য প্রভৃতি শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ বিভিন্ন হইলেও সেগুলি অখণ্ড ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হওয়ায় স্বরূপলক্ষণ সিদ্ধ হইল। এইরূপে উভয় লক্ষণই পাওয়া গেল।

তাৎপর্য্য। প্রথম সূত্রের আলোচনাতে স্থির হইয়াছে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসিতে পারে এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক বিচার আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। তাই প্রথম অধিকরণের নাম হইল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্ম-বিচার অধিকরণ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসিলেই অন্তরে প্রথম প্রশ্ন এই জাগিয়া উঠে যে ব্রহ্মের লক্ষণ কি, তাঁহাকে কি প্রকারে চিন্তা করা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মের পরিচায়ক লক্ষণের কথা আসিয়া পড়ে বলিয়া দ্বিতীয় অধিকরণের নাম হইল ব্রহ্মলক্ষণ অধিকরণ।

ব্রহ্মের লক্ষণ কি, এই প্রশ্নের সহজ উত্তরই এই মনে আসে যে তিনি জগতচরাচরের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। তাই দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে যে "যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম-প্রভৃতি।" কাজেই যে শ্রুতিমন্ত্রে এই জন্মাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই হইল বর্ত্তমান অধি-করণের বিষয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান অধিকরণের বিচার সেই শ্রুতিমন্ত্র অবলম্বনেই হইবে। সেই শ্রুতিমন্ত্রটী হইল—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞা-সস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" (যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম)। এই লক্ষণটী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ তট বা কিনারের লক্ষণ। এই লক্ষণ ব্রহ্মের পরিধি বা বহিঃপ্রকাশকে মাত্র স্পর্শ করে। বাহিরে বাহিরে ব্রহ্মকে জানিতে হইলে তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা বলিয়াই জানিতে পারা যায়। এ লক্ষণ ব্রহ্মের কেন্দ্রে পৌঁছিতে পারে না, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না।

যাই হোক, ব্রহ্মের এই সহজ তটস্থ লক্ষণেরও বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়বাদী এই প্রশ্ন উঠাইলেন যে ব্রহ্মকে যখন তোমরা সকলের অতীত বল, তখন তটস্থই হউক বা অন্য যাহাই হউক, জাগতিক সূত্রে অবলম্বিত কোন প্রকার লক্ষণের দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে কি না সন্দেহ। এই প্রশ্নটীই হইল বর্ত্তমান অধিকরণের অন্যতর অঙ্গ সন্দেহ। পূর্ব্বপক্ষ শ্রুতিমধুর যুক্তিসহকারে নিজেই নিজকৃত প্রশ্নের উত্তর দিলেন এই যে, ব্রহ্মকে জগতের জন্ম প্রভৃতির কারণ বলিয়া বলা যায় না, কারণ জন্মপ্রভৃতির সহিত জগতেরই সম্বন্ধ দেখা যায়, অর্থাৎ জাগতিক পদার্থেরই উৎপত্তি,

স্থিতি ও ধ্বংস দেখা যায়; ব্রহ্মের সহিত জন্ম প্রভৃতির কোনই সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নাই। সুতরাং যাঁহার সহিত যে বিষয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে সে বিষয়ের কারণরূপেও পাওয়া যাইতে পারে না; জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া যদি কাহারও পরিচয় দিতে হয়, তবে এই জগতেরই উপর সেই লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ তদুত্তরে তটস্থ লক্ষণকে পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা বাঁধিয়া লইয়া দেখাইতেছেন যে, জন্ম প্রভৃতি জগতের ধর্ম্ম হইলেও তাহার কারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। তটস্থ লক্ষণের পারিভাষিক সংজ্ঞা (ইহা পূর্ব্বপক্ষেরও স্বীকৃত বুঝা যাইতেছে) এই যে, "যে লক্ষণ (লক্ষ্য) রূপের অন্তর্ভূত না হইয়া অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যবস্থা বা পৃথক করণের কারণ হয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ।" দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একটী পুষ্পমাল্যকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইল। এখানে সর্পত্ব হইল মাল্যের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ দূর হইতে দেখিয়া বিশেষ সাদৃশ্যের কারণ মাল্যকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইয়াছে—মাল্যের স্বরূপ মাল্যত্ব দেখিবার অবসর হয় নাই। বাহিরে বাহিরে দেখিলে একভাবে বলিতে পারি যে সর্পত্বই মাল্যের পরিচায়ক লক্ষণ। এখন তটস্থ লক্ষণের পারিভাষিক সংজ্ঞার সহিত এই মাল্যকে ভুজঙ্গ বলিয়া ভ্রম করা ব্যাপারকে মিলাইয়া দেখা যাউক যে ভুজঙ্গত্ব কি ভাবে মাল্যের তটস্থ লক্ষণ হইল। এখানে পরিচায়ক লক্ষণ হইল সর্পত্ব। এই "সর্পত্ব" লক্ষণ উহার লক্ষ্য রূপ "মাল্যের" অন্তর্ভূত না হইয়া তাহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাই "সর্পত্ব" হইল "মাল্যের" তটস্থ লক্ষণ।

সিদ্ধান্তপক্ষের কথা এই যে, এই প্রকার তটস্থ লক্ষণের সাহায্যে ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও তাঁহাকে জগৎকারণ বলিয়া ভ্রম বা ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। যেমন মাল্যকে কল্পনাদৃষ্টিতে সর্প বলিয়া ধারণা করা গিয়াছিল, সেইরূপ কল্পনাচক্ষে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, ধরিয়া লও যে ব্রহ্ম জগৎকারণ, তাহার পরে তটস্থ লক্ষণের সংজ্ঞা অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে কি না। যদি এই প্রকার বিচারের ফলে জগকারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন বাধা দেখা না যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন না যে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে না। যদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হওয়া অসম্ভব না হয়, তখন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে জগৎকারণত্বকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলিতেও কোনই বাধা ঘটিবে না।

এখন, উপরোক্ত তটস্থ লক্ষণের সংজ্ঞা অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখা যাউক যে জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে কি না। এখানে "জগৎকারণত্ব" লক্ষণ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভূত না হইয়া তাঁহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, তাই জগৎকারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইল। এই জগৎকারণত্ব প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের সম্বন্ধে কল্পিত পদার্থ হইলেও তাহা দ্বারাই ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইল। একটা মাল্যকে যখন কল্পিত সর্পত্ব লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা গেল, তখন কল্পিত জগৎকারণত্বরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও ব্রহ্মকে উপলক্ষিত করানো অসঙ্গত হইতে পারে না। তটস্থ লক্ষণ অসঙ্গত না হইলেই সে লক্ষণটী যে কি, তাহা শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে সংক্ষেপে বলা হইল যে "যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়।"

যদিও সূত্রে প্রধানত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সেই সূত্রের ভিতরে যে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণও অন্তঃসলিলরূপে প্রচ্ছন্ন নাই তাহা নহে। সূত্রে আছে "যাঁহা হইতে ইহার জন্মাদি"। তাহাতে প্রশ্ন আসে যে তিনি কে, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? উত্তর হইল যে, পূর্ব্ব সূত্রে যাঁহাকে জানিবার কথা বলা হইয়াছে সেই ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তখন আবার প্রশ্ন আসিল এই যে, ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই ব্রহ্ম হইতে এই জগতের জন্মাদি ঘটিতেছে, কিন্তু সেই ব্রহ্ম কি প্রকার—তাঁহার

স্বরূপ কি? স্বরূপলক্ষণের অভাব হইলে তটস্থ লক্ষণের কথাই আসিতে পারে না। কাজেই যখন সূত্রে তটস্থ লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে ঐ সূত্রের দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই স্বরূপলক্ষণের জন্য অবশ্য শ্রুতিবাক্য অন্বেষণ করিতে হইবে। শ্রুতিতে আমরা দেখি যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" (সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ) বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই, এই শ্রুতিমন্ত্রকেও বর্ত্তমান অধিকরণের অন্যতর বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাও বর্ত্তমান অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়।

এ বিষয়েও পূর্ব্বপক্ষ বা সংশয়বাদী বলেন যে শ্রুত্যুক্ত সত্যংজ্ঞানমনন্তং মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকে সত্য বলিতে এক পদার্থ, জ্ঞান বলিতে অপর এক পদার্থ এবং অনন্ত বলিতে তৃতীয় এক পদার্থ বুঝিয়া থাকে। তিনটি শব্দের তিনটি পৃথক পৃথক অর্থ, তখন ঐ তিনটি শব্দ যে এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবে তাহা সম্ভবপর নহে। আর যদি বলা যায় যে, ঐ তিনটি শব্দের এমন এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, যাহার সাহায্যে ঐ তিনটি শব্দের দ্বারাই এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝা যাইতে পারে, তাহাও সঙ্গত নহে। সাধারণ্যে অপ্রচলিত অর্থযুক্ত কোন শব্দের দ্বারা কোন পদার্থের পরিচয় দেওয়া বা লক্ষণ স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে—সে অর্থ যখন সাধারণ লোকে জানেই না, তখন সাধারণ লোকে তাহা দ্বারা ব্যক্ত লক্ষণের বিষয়ই বা বুঝিবে কি প্রকারে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে পূর্ব্বপক্ষের এ কথার কোন মূল্য নাই। যখন দেখা যায় যে নানা শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক হইলেও সেগুলি একই ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তখন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত এই তিনটি শব্দের অর্থ পৃথক পৃথক হইলেও সেগুলি কেন না এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবে? পিতা, সুত, ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দের অর্থ তো এক নহে—পৃথক পৃথক, অথচ ঐ শব্দগুলি একই দেবদত্তকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইতে কি পারে না? নিশ্চয়ই পারে, তাহাতে কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সেই প্রকার এক অখণ্ড ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ভিন্নার্থবাচী তিনটী শব্দ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—প্রযুক্ত হইলেও কোনই বিরোধের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। এইরূপে যখন পূর্ব্বপক্ষ-প্রদর্শিত বিরোধের সম্ভাবনা খণ্ডিত হইয়া গেল, তখন সিদ্ধান্তপক্ষ শ্রুতি অবলম্বনে বলের সহিত স্থাপিত করিলেন যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"ই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

এই প্রকারে ব্রহ্মের তটস্থ এবং স্বরূপ এই উভয় প্রকার লক্ষণের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রদর্শিত হইল যে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা যাইতে পারে এবং ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ।

সন্ধ্যায়।

(কথক—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

অন্তরের অন্তস্তলে নিবিড় স্তব্ধতা
উঠিছে ঘনায়ে—গিরি-দরী মাঝে যথা
কুণ্ডলিয়া গাঢ় হয়ে উঠে অন্ধকার
মেঘাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে! বরষার
সন্ধ্যাবেলা আজি, আপনারে এত একা
করিতেছি অনুভব! যত স্মৃতি-লেখা
মুছে গেছে হৃদয় হইতে। মনে হয়
জনহীন, অন্ধকার এক শূন্যময়
জগতের মাঝে লভিয়া প্রথম জন্ম
উদাসীন, অর্থহীন—শিশুনর সম—
শুধু চেয়ে আছি, স্তব্ধ মৌন অপলক
ছায়া দৃশ্যপট হেরি' একাকী দর্শক।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিছক স্বার্থী, দূরদর্শী স্বার্থী ও উভয়বাদী বা জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থী,—এইরূপ আধিভৌতিক সুখবাদের যে তিন মার্গ আছে, সেই তিন মার্গ সম্বন্ধে এখনকার কালপর্য্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখ্য দোষগুলি কি তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও

সমস্ত আধিভৌতিক মার্গ শেষ হয় নাই। সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ মার্গ কি? না, "এক মনুষ্যের সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মনুষ্যেরই আধিভৌতিক সুখ-দুঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করা আবশ্যক"—এইরূপ মার্গই সাত্বিক আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একই কার্য্যে একই সময়ে সমাজের কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হইতে পারে না। একজন যাহা সুখ বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক। কিন্তু পেচকের আলোক ভাল লাগে না বলিয়া আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ বলে না, সেইরূপ, কোন বিশেষ লোকের পক্ষে কোন এক জিনিস লভ্যজনক না হইলেও তাহা যে সকলের পক্ষে হিতাবহ নহে—একথা কর্ম্মযোগ শাস্ত্রও বলিতে পারেন না; এবং এই কারণেই "সকল লোকের সুখ" এই শব্দগুলির "অধিক লোকের অধিক সুখ"—এইরূপ অর্থ এখন করিতে হয়। সারকথা,—"যাহাতে অধিক লোকের অধিক সুখ হয়—তাহাই নীতি দৃষ্টিতে ন্যায্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে"—এই মার্গের এইরূপ মত।

আধিভৌতিক সুখবাদের এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও স্বীকার করিয়া থাকে; অধিক কি, এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিকবাদীরা অতি প্রাচীনকালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করায়, আধিভৌতিকবাদীরা এক্ষণে, একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ করিয়াছে মাত্র—উভয়ের মধ্যে এইটুকু মাত্র ভেদ আছে, বলা যাইতে পারে। তুকারামের কথা অনুসারে "জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি। পরোপকারের জন্য তাঁহারা দেহকে কষ্ট দেন।" ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদ্‌গীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত,—কি না কর্ম্মযোগযুক্ত জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার সময় "সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধনেই তাঁহারা নিমগ্ন, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে (গী, ৫—২৫; ১২—৪)। ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ার্থেও আমাদিগের শাস্ত্রকার এই তত্ত্বকে গণনার মধ্যে আনিয়াছেন,—ইহা দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত "যদ্‌ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা" এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকার বলেন, "সর্ব্বভূত হিত" ইহা জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের আচরণের বাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ প্রসঙ্গ বিশেষে স্থূলভাবে উহার উপযোগ করা এবং ইহাকে নীতিমত্তার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া, অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্রের সমস্ত মজবুৎ ইমারত খাড়া করা এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। আধিভৌতিক পণ্ডিত অন্য মার্গ স্বীকার করিয়া, অধ্যাত্ম বিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহার এই কথা কতটা সযুক্তিক, ইহা আমাদিগের এখন দেখিতে হইবে।

'সুখ' ও 'হিত' এই দুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে; কিন্তু আপাতত ঐ ভেদ যদি একপাশে সরাইয়া রাখা হয় এবং 'সর্ব্বভূতহিত' অর্থাৎ "অধিক লোকের অধিক সুখ" ইহাকে লইয়াই কাজ চালান হয়, তথাপি, কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কাজে কেবল এই তত্ত্বেরই উপযোগ করিলে অনেক গুরুতর বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায়। বুঝিয়া দেখ, এই তত্ত্বের আধিভৌতিক উপদেষ্টা, অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে গেলে, তিনি কি তাঁহাকে উপদেশ দিতেন যে 'ভারতীয় যুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইলে, যদি অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীষ্মকে বধ করিয়াও যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য"? বাহ্য-দৃষ্টিতে এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে অপূর্ণতা ও বাধা আছে বলিয়া বুঝা যায়। অধিক অর্থে কত লোক? পাণ্ডবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লোক; পাণ্ডবদিগের পরাজয় হইলে, এই এগারো অক্ষৌহিণীর সুখ হইত,—এই যুক্তিবাদে, পাণ্ডবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে কি? শুধু ভারতী যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতিমত্তার নির্ণয় করা ভুল। লক্ষ দুর্জ্জনের সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন সজ্জনেরও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্য্য,—

ব্যবহারক্ষেত্রে সকল লোকই এইরূপ বুঝিয়া থাকে। এই ধারণা সত্য হইলে, এক সজ্জনের সুখকে লক্ষ দুর্জ্জনের সুখাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়; এবং ঐরূপ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখই" নীতিমত্তার পরীক্ষার সাধন, এই প্রথম সিদ্ধান্তটি ঐ পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে যে বিষয়কে কখন কখন সুখাবহ বলিয়া মনে করে তাহাই দূরদর্শী ব্যক্তির মতে,—পরিণামে সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা—সক্রেটিস্ ও যিশুখৃষ্ট। দুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত অনুসারে কল্যাণকর উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশভাইরা তাঁহাদিগকে "সমাজের শত্রু" মনে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য "দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত" ব্যবস্থা করিলেন। জনসাধারণ ও জন-নায়ক উভয়েই, "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্ব ধরিয়াই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু এই-বার সাধারণ লোকের আচরণ ন্যায্য হইয়াছিল, এইরূপ এক্ষণে আমরা বলি না। সার-কথা, "অধিক লোকের অধিক সুখ"ই নীতির মূলতত্ত্ব—ইহা যদি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করা যায় তথাপি, লক্ষাবধি লোকের সুখ কিসে হয় এবং কি করিয়া তাহা স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, উহার দ্বারা এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় না। সাধারণ প্রসঙ্গে, যে সকল লোকের সুখদুঃখসম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই সব লোকের হস্তেই ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ প্রসঙ্গে, এতটা "হ্যাঙ্গাম হুজ্জুৎ" করিবার কারণ হয় না; এবং কোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গে, নিজের সুখ কিসে হয় ইহার নির্ভুল বিচার করা সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে. সুতরাং ভূতের হাতে জ্বলন্ত কাঠ দিলে যে পরিণাম হয় "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই নীতিতত্ত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে ঐরূপ পরিণামই হইয়া থাকে,—ইহা উপরি-উক্ত দুই উদাহরণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। "আমাদের এই নীতিধর্ম্মের তত্ত্বটি আসলে সত্য, কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা যদি তাহার অপব্যবহার করে, আমরা তাহার কি করিব?" এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন তত্ত্ব সত্য হইলেও তাহার উপযোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী ইহার উপযোগ কখন্ করিবে ও কেমন করিয়া করিবে,—ইত্যাদি নিয়মও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ, সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণয় করিতে আমরা সমর্থ—এইরূপ অনর্থক ভুল বুঝিবার দরুণ, অর্থ অনর্থে পরিণত হওয়াই সম্ভব হইয়া থাকে।

কেবল সংখ্যা ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয় না এবং অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিবার কোনো বাহ্য সাধন নাই; এই দুই আপত্তি ছাড়া, এই মার্গ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি আনা যাইতে পারে। উদাহরণ যথা—কোন কার্য্যের শুধু বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই সেই কার্য্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসাও অনেক সময় করিতে পারা যায় না,—একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে। কোন ঘড়ি ঠিক্ সময় রাখে কি না—ইহা ধরিয়াই ঐ ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণয় হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু মনুষ্যের কার্য্যে এই ন্যায় প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্য শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। সজ্জন মাত্রেই জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু উল্টাপক্ষে, যে-কোন লোক কল্যাণার্থে চেষ্টা করে সেই প্রত্যেক ব্যক্তি সাধুই হইবে এইরূপ নিশ্চয়াত্মক উল্টা অনুমান করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের অন্তঃকরণটি কিরূপ তাহাই দেখা আবশ্যক। যন্ত্র ও মনুষ্যের মধ্যে যে বড় রকম তফাৎ আছে তাহা ইহাই; এবং সেই জন্যই, অজ্ঞান কিংবা ভুল ক্রমে যদি কাহারো অপরাধ হয় আইনে তাহা মার্জ্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়৭ তাৎপর্য্য,—কোন কর্ম্ম ভাল কি মন্দ, ধর্ম্ম্য কি অধর্ম্ম্য, নীতিমূলক কি অনীতিমূলক, শুধু বাহ্য ফল বা পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক সুখ হইবে কি না দেখিয়া তাহার নির্ণয় হইতে পারে না। উক্ত কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, বা হেতু কিরূপ সেই সম্বন্ধেই দেখিতে

হইবে। আমেরিকার এক বড় সহরে সকল লোকের সুখ সুবিধার জন্য ট্রামওয়ে করা আবশ্যক হইয়াছিল; কিন্তু সেই কার্য্যে, অধিকারী কর্ম্মচারীদিগের মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল। তখন ট্রাম্‌ওএর কর্ম্মকর্ত্তা, অধিকারী পুরুষকে কিছু টাকা ঘুস দিবামাত্র তখনি মঞ্জুরী পাইলেন এবং তখনি ট্রামওয়ের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সুবিধা ও উপকার হইল। কিছু দিন পরে এই কথা প্রকাশিত হওয়ায়, কর্ম্মকর্ত্তার উপর ফৌজদারী মোকদ্দামা রুজু হইল। প্রথম "জুরি" একমত না হওয়ায়, অন্য "জুরি" নির্ব্বাচিত হইল; এবং সেই জুরি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করায় ট্রামওয়ে কর্ম্মকর্ত্তার দণ্ড হইল। এই স্থলে, অধিক লোকের অধিক সুখ এই নীতিতত্ত্ব ধরিয়া নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঘুস দিবার দরুণ ট্রামওয়ে হইল—এই বাহ্য পরিণামে অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার কথা; কিন্তু এইরূপ ঘুস্ দিয়া কার্য্য উদ্ধার করাটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। * আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করা, কিংবা কীর্ত্তির জন্য বা অন্য কোন ফলকামনায় দান করা—এই দুই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম হইলেও প্রথম প্রকারের দান সাত্ত্বিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক—ভগবদ্‌গীতায় এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে। (গী. ১৭—২০, ২১); এবং ঐ দান কুপাত্রে প্রদত্ত হইলে তামসিক বা গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন গরীব লোক কোন ধর্ম্মকার্য্যে চারি পয়সা ও সেই একই কার্য্যে কোন ধনবান ব্যক্তি একশো টাকা দিলেও উভয়ের নৈতিক যোগ্যতা জনসাধারণের মধ্যে সমান বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু কেবল "অধিক লোকের অধিক হিত" এই বাহ্য সাধনের দ্বারা যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে এই দুই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান যোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয়।

"অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক নীতিতত্ত্বের একটা মস্ত দোষ এই যে, কর্ত্তার মনোগত অভিপ্রায় কিংবা বুদ্ধির কোন বিচার উঠাতে হয় না; এবং মনোগত অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বাহ্য সুখই নীতিমত্তার কষ্টিপাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক ব্যক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্ত্তৃক প্রণীত আইন বা নিয়ম উচিত কি অনুচিত ইহার বিচার করিবার সময় তাহাদের অন্তঃকরণ কিরূপ ছিল তাহা দেখিবার কোন হেতু থাকে না; তাঁহাদের কৃত আইন হইতে, অধিক লোকের অধিক সুখ হইবে কি না, এই বাহ্য বিচার করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু অন্য স্থলে ঐ ন্যায় খাটে না,—ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। "অধিক লোকের অধিক হিত বা সুখ" একেবারেই অনুপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ্য বিষয়ের বিচার কর্ত্তব্য হইলে ইহা অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন বিষয় নীতিদৃষ্টিতে ন্যায্য বা অন্যায্য ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, এই বাহ্য তত্ত্ব ব্যতীত, অনেক প্রসঙ্গে, অন্য বিষয়েরও বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং নীতিতত্ত্বনির্ণয় শুধু এই তত্ত্বের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত ও নির্দ্দোষ তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক, ইহাই আমার বক্তব্য। "কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" (গী, ২—৪৮) এই যে কথা গীতার আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় ইহাই। শুধু বাহ্য কর্ম্ম দেখিতে গেলে, তাহাতে অনেক সময় ভ্রম হইয়া থাকে। "স্নান, সন্ধ্যা, তিলক, মালা" এই বাহ্য কর্ম্ম স্থির রাখিয়া, "অন্তরে ক্রোধের জ্বালা" হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু উল্টাপক্ষে অন্তরে বুদ্ধি শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্ম্মের কোন গুরুত্বই থাকে না, সুদামের প্রদত্ত চিড়া দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প বাহ্য কর্ম্মের ধার্ম্মিক কিংবা নৈতিক যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক সুখদায়ী ২০ মণ অন্নের সমান,—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া থাকে। তাই, জর্ম্মন তত্ত্বজ্ঞানী কাণ্ট, * কর্ম্মের বাহ্য ও প্রত্যক্ষ পরিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া কর্ত্তার নিজের বিবেচনা ও শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি-

* পল্ কেরসের "The Ethical Problem" গ্রন্থ হইতে এই উদাহরণ গৃহীত হইয়াছে।

* Kants' Theory of Ethics (Tran. by Abott) 6th Ed. P. 6.

শাস্ত্রের আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক সুখবাদের মধ্যে এই ত্রুটি প্রধান ;—ইহা আধিভৌতিকবাদী-দিগের নজরে পড়ে নাই এরূপ নহে। মনুষ্যের কর্ম্ম, তাহার স্বভাবের দ্যোতক হওয়া প্রযুক্ত, যে অর্থে সাধারণ লোকে উহা নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়া বুঝে, সেই অর্থে বাহ্য পরিণাম ধরিয়া উহা স্তুত্য কিংবা নিন্দনীয় ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না, এই কথা হিউম স্পষ্ট বলিয়াছেন।† এবং "কর্ত্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের নীতিমত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নির্ভর করে" এই কথা মিল্ সাহেবের অভিমত। কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থনার্থ মিল্ এই সম্বন্ধে এইরূপ কূটতর্ক করেন যে, "যে পর্য্যন্ত বাহ্য কর্ম্মের মধ্যে কোন ভেদ না হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তার উহা করিবার কোন-রূপ বাসনা হইলেও তাহার দ্বারা কর্ম্মের নীতিমত্তার কোন ইতরবিশেষ হয় না।" ‡ মিলের এই তর্ক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের তর্ক। কারণ, বুদ্ধি পৃথক্ হওয়া প্রযুক্ত, দুই কর্ম্ম দেখিতে এক হইলেও, তত্ত্বতঃ উহা একই মূল্যের কথনই হইতে পারে না। তাই "যে পর্য্যন্ত (বাহ্য) কর্ম্মের মধ্যে ভেদ না হয়" ইত্যাদি মিলের নিয়মটিও নির্ম্মূল হইয়া পড়ে, এইরূপ গ্রীনসাহেব উত্তর দিয়াছেন। § গীতার অভিপ্রায়ও তাহাই। কারণ, দুই ব্যক্তি একই ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য একই রকমের দান করিলেও—উভয়ের বুদ্ধিভেদমূলে, এক দান সাত্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলনা করিবার সময় করিব। কর্ম্মের নিছক্ বাহ্য পরি-ণামের উপর নির্ভরকারী আধিভৌতিক সুখবাদের শ্রেষ্ঠ ভিত্তিও নীতিনির্ণয়কার্য্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ, ইহা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; অতএব মিলের উপরি-উক্ত স্বীকৃতি, আমাদের মতে ইহার উত্তম ত্রুটিপূরক।

"অধিক লোকের অধিক সুখ" এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোন বিচারই হয় না, ইহা সব চেয়ে বড় দোষ। কারণ মিলের যুক্তিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, কেবল বাহ্য ফল ধরিয়া যে তত্ত্ব নীতিনির্ণয় করে তাহা একটা সীমার মধ্যে বদ্ধ সুতরাং একদেশদর্শী ; সব সময়ে তাহার একই প্রকার উপযোগ করা যাইতে পারে না, ইহা মিলের লেখা হইতেই সপ্রমাণ হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা আপত্তি এই-রূপ আছে যে, স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ শ্রেষ্ঠ কেন, কিংবা কিরূপে স্থির করা যাইবে, তাহার কোন যুক্তি না বলিয়া এই তত্ত্বকে শুধু মানিয়া লইয়া সমস্ত বিচার করাপ্রযুক্ত জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থকে সামনে আনিবার সুবিধা হইয়াছে। স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্ত্বই মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে স্বার্থ অপেক্ষা "অধিক লোকের হিত" এই তত্ত্বের বেশী গুরুত্ব আমি কেন মানিব ? "অধিক লোকের অধিক হিত" আমরা কেন করিব, ইহাই মূল-প্রশ্ন। লোকের হিত করিলে প্রায় আপনারও হিত হয় বলিয়া এই প্রশ্ন সর্ব্বদা উপস্থিত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় ভিত্তি হইতে এই শেষের অর্থাৎ চতুর্থ ভিত্তির যে প্রভেদ আছে তাহা এই যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের মার্গ অনুসরণ না করিয়া, স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ সাধনের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, ইহা শেষের আধিভৌতিক মার্গের লোকেরা মনে করে। এই আধিভৌতিক মার্গের যে এই বিশেষত্ব তাহার

† "For as actions are objects of our moral sentiment, so far only as they are indications of the internal character, passions and affections, it is impossible that they can give rise either to praise or blame, where they proceed not grom these principles, but are derived altogether from external objects."—Hume's Inquiry concerning Human Understanding, Section VIII. Part II. (P. 368 of Hume's Essays, the World Library Edition.)

‡ "Morality of the action depends entirely upon the intention, that is, upon what the agent wills to do. But the motive, that is, the feeling which makes him will so to do, when it makes no difference in the act, makes none in the morality." Mill's Utilitarea nism, P. 27.

§ Green's Prolegomena to Ethics § 292 note. P. 348. 5th Cheaper Edition.

কি কোন যুক্তি দেখাইতে হইবে না? এই বাধাটি এই মার্গের এক আধিভৌতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ায়, ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া তিনি শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে-হেতু আপনার মতোই আপনার সন্তানসন্ততি ও জ্ঞাতি-দিগকে পরিপোষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট না দিয়া আপন ভাইদিগকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করা—এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিকাধিক ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়,—অতএব সজীব সৃষ্টির আচরণের ইহাই মুখ্য ভাব, এইরূপ বলিতে হইবে। সজীব সৃষ্টির এই ভাবটি প্রথমত সন্ততি উৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায়। স্ত্রীপুরুষ এই ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতিসূক্ষ্ম কীটজগতের মধ্যেও কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়া গিয়া উহা দুই কীটে পরিণত হয়; কিংবা সন্ততির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসর্জ্জন করে বলিলেও চলে। সেইরূপ আবার, সজীব সৃষ্টির মধ্যে এই কীটের উপর উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরু-ষাত্মক প্রাণীও এইরূপ আপন সন্ততি রক্ষণার্থ স্বার্থত্যাগে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া, নিতান্ত বন্য অসভ্য সমাজের মধ্যেও মনুষ্য শুধু আপন সন্ততিকে নহে, আপন জ্ঞাতিভাইদিগকেও আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, পরার্থের কাজেও স্বার্থের মতই সুখ অনুভব করা সমস্ত সৃষ্টির এই যে মুখ্য ভাব—এই ভাবটিকে আরও সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান বিরোধটি একেবারে বহিষ্কৃত করিবার প্রযত্ন সজীব সৃষ্টির শিরোমণি—মনুষ্যের কর্ত্তব্য। * এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক। পরোপকার এই সদ্‌গুণ, মূক-সৃষ্টির মধ্যেও সন্ততি-রক্ষণব্যাপারে নজরে আসায়, উহার পরমোৎকর্ষ সাধন করাই জ্ঞানবান মনুষ্যের পুরুষার্থ, এই তত্ত্ব কিছু নূতন নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান অধুনা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় এই তত্ত্বের আধি-ভৌতিক সিদ্ধান্ত এক্ষণে বেশী বিবৃত করা বাহুল্য মাত্র। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে

> অষ্টাদশ পুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
> পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

"পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়াই পাপ—ইহাই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা" এইরূপ কথিত হই-য়াছে; এবং ভর্তৃহরিও "স্বার্থোযস্য পরার্থ এব স পুমান্ একঃ সতাং অগ্রণীঃ" পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সে-ই সমস্ত সজ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এই-রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে আনিলে, এইরূপ আর এক প্রশ্নও বাহির হয় যে, পরোপকারবুদ্ধি, দয়া, বিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, তর্ক, শৌর্য্য, ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ইত্যাদি অন্য সাত্ত্বিক গুণেরও কি বৃদ্ধি হইয়াছে? এই বিচার মনোমধ্যে উদয় হইলে, অন্য সজীব প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্‌গুণের উৎকর্ষ হইয়াছে, এই কথা বলিতেই হয়। এই তাত্ত্বিক গুণসমূহের সমুচ্চয়কে আমরা অচিরাৎ "মানবিকতা" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। পরোপকার অপেক্ষা "মানবিকতা"কে এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিলে পর, কোন কর্ম্মের ঔচিত্য অনৌচিত্য কিংবা নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্ম্মের পরীক্ষা, কেবল পরোপকারবুদ্ধির দিক দিয়া করা অপেক্ষা "মানবিকতার" দৃষ্টিতে—অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখা যায়, সেই সমস্ত গুণের দৃষ্টিতে,—উক্ত কর্ম্মের পরীক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং কেবল এক পরোপকারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষা সমস্ত মনুষ্যের "মনুষ্যপণা" কিংবা "মানবিকতা" যে কর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা "মানবিকতা" যাহার দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাই সৎকার্য্য কিংবা তাহাই

* এই মতবাদ স্পেনসরের Data of Ethics গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। নিজের মত ও মিলের মতের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের মধ্যে বিবৃত হওয়ায়, ঐ পত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। PP. 57, 123, Also see Bain's Mental and Moral Science, PP. 721, 722 (1875).

নীতিধর্ম্ম,—এক্ষণে এইরূপ বলিতে হইবে; এবং এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অনুসরণ করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখ" উক্ত দৃষ্টির একটা স্বল্প অংশ হওয়ায় কেবল সেই দৃষ্টিতেই সমস্ত কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর করা যায় না; সুতরাং "মানবিকতার" দিকেও তাকাইতে হয়—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। "মানবিকতা বা মনুষ্যপণা" কিরূপ পদার্থ তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই প্রশ্ন স্বভাবতই উৎপন্ন হয়। নীতিশাস্ত্রের বিচারক এক আমেরিকান গ্রন্থকার, এই সমুচ্চয়াত্মক "মানবিকতার" ধর্ম্মকেই 'আত্মা' এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

নিছক স্বার্থ কিংবা নিজের বিষয় সুখ, এই কনিষ্ঠ পদবী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে আধিভৌতিক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মানবিকতা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু "মানবিকতা" বলিলেও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের বাহ্য বিষয়সুখেরই কল্পনা প্রধান হওয়ায়, অন্তঃশুদ্ধি ও অন্তঃসুখের বিচার আমলে না আনায়, এই শেষের পদবীও আমাদিগের অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রকারের মতে নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই। মনুষ্যের সমস্ত চেষ্টা-প্রযত্ন, সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবারণার্থ হইয়া থাকে—ইহা সাধারণত স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্য-সুখ আধিভৌতিক অর্থাৎ ঐহিক বিষয়োপভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণয় ব্যতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষই গ্রাহ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক—ইহা আধিভৌতিকবাদীও স্বীকার করেন। পশুরা যে-যে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত সুখ আমি তোকে দিতেছি, এইরূপ বলিয়া কাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুই পশু হইতে রাজি আছিস্ কি?" —একজন মনুষ্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না। সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানের গভীর বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে এক প্রকার শান্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, ঐহিক সম্পত্তি কিংবা বাহ্য উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক একথা জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিতে হইবে না। ভাল; লোকমতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীতিমত্তা শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না; মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা আধিভৌতিক সুখের জন্যই করে, আধিভৌতিক সুখই তাহার পরম সাধ্য,—সাধারণ লোকেরা এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে মানে না।

শুধু বাহ্য সুখ কেন—জীবনের পরোয়া না রাখিয়াও প্রসঙ্গ বিশেষে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, তাহা অপেক্ষা অধিক যোগ্য সত্যাদি নীতিধর্ম্ম পালনে যে মনোনিগ্রহ করিতে হয় তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি; এবং অর্জ্জুনের প্রশ্নও, যুদ্ধ করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে এইরূপ না হওয়ায়, "আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহা আমাকে বল" (গী, ২—৭; ৩—২) এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আত্মার এই নিরন্তর—শ্রেয় কিংবা সুখ, আত্মার শান্তিতে আছে। তাই ঐহিক সুখ কিংবা সম্পত্তি যতই পাওয়া যাক্ না কেন, শুধু তাহাতে এই আত্মসুখ কিংবা শান্তিলাভের আশা নাই—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে (বৃ, ২—৪—২); কঠোপনিষদে, নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পশু ধান্য দ্রব্য প্রভৃতি বহু প্রকারের ঐহিক সম্পত্তি দিবার জন্য মৃত্যু প্রস্তুত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট জবাব দিলেন—"আমি আত্মবিদ্যা চাই, আমি সম্পত্তি চাই না;" প্রেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক যে ঐহিক সুখ এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রকৃত কল্যাণ এই দুয়ের মধ্যে ভেদ করিয়া—

> প্রেয়শ্চ শ্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তিধীরঃ।
> শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগ-
> ক্ষেমাদ্‌বৃণীতে॥

"প্রেয় (ক্ষণিক বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখ) ও শ্রেয় (প্রকৃত ও চিরন্তন কল্যাণ) এই দুই মনুষ্যের সম্মুখে আসিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য ঐ দুয়ের মধ্যে বাছাই করিয়া থাকে। সুবুদ্ধি যে, সে প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে অধিক পছন্দ করে; এবং মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের নিকট আত্মকল্যাণাপেক্ষা প্রেয় অর্থাৎ বাহ্য সুখই অধিক

প্রিয়,"—এইরূপ কথিত হইয়াছে (কঠ, ১-২-২)। তাই, সংসারের ইন্দ্রিয়গম্য বিষয় সুখই এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য, এবং মনুষ্য যাহা কিছু করে তাহা কেবল বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক সুখার্থ কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া থাকে—এরূপ মনে করা ঠিক নহে। ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অন্তঃসুখের কিংবা আধ্যাত্মিক সুখের যোগ্যতা অধিক, শুধু তাহা নহে; বিষয়সুখ আজ আছে, কাল নাই—অর্থাৎ বিষয় সুখ অনিত্য। নীতিধর্ম্মের কথা তাহা নহে। অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম বাহ্য উপাধির উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ বাহ্য সুখদুঃখকে অবলম্বন করিয়া নাই; সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপ্রসঙ্গে উহা একই প্রকার, উহা নিত্য, এইরূপ সকল লোকেই মানিয়া থাকে। বাহ্য বিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে না সেই নীতি-ধর্ম্মের নিত্যত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার কারণ কি,—আধিভৌতিকবাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে, সুখ দুঃখ অবলোকন করিয়া, কোন একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখ দুঃখ স্বভাবতই অনিত্য হওয়ায়, উহাদের নরম ভিত্তির উপর নির্ম্মিত নীতি-সিদ্ধান্তও ঐরূপ কাঁচা অর্থাৎ অনিত্য হইবে; এবং সেইজন্য সুখদুঃখের বিচার না করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল—এইরূপ, ত্রিকাল-অবাধিত সত্যধর্ম্মের যে নিত্যতা তাহা "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই তত্ত্বের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। সাধারণ ব্যবহারেও, সত্যের জন্য প্রাণ দিবার সময় উপস্থিত হইলে, বড় বড় লোকও অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ সময়ে খুব টানিয়া ধরেন না, এইরূপ যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে সত্যাদি ধর্ম্ম নিত্য বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই—এইরূপ কেহ কেহ তর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদ ঠিক নহে। কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যাহার সাহস হয় না কিংবা সহজসাধ্য হয় না এরূপ ব্যক্তিও এই নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব নিজ মুখে স্বীকার করিয়া থাকে। এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুষার্থ যাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই ব্যবহারিক ধর্ম্মের বিচার আলোচনা করিয়া শেষে ভারতসাবিত্রীতে (এবং বিদুর নীতিতেও) ব্যাসদেব—

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যঃ হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

"সুখ দুঃখ অনিত্য, কিন্তু (নীতি) ধর্ম্ম নিত্য; অতএব, সুখেচ্ছায়, ভয়ে লোভে, কিংবা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও, ধর্ম্মকে কখনই ছাড়িবে না। মূলতঃ জীব নিত্য, তাহার হেতু অর্থাৎ সুখদুঃখাদি বিষয়ই অনিত্য"—অতএব, অনিত্য সুখদুঃখের বিচার করিতে না বসিয়া, ধর্ম্মের সঙ্গেই নিত্য জীবকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ সকলকে উপদেশ করা হইয়াছে, (সভা, স্ব, ৫, ৬০; উ, ৩৮, ১২, ১৩)। ব্যাসের এই উপদেশ কতটা যোগ্য ইহা দেখিবার জন্য, সুখদুঃখের প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং নিত্য সুখ কাহাকে বলে,—এক্ষণে ইহার বিচার করা আবশ্যক।

ইতি চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

কলঙ্ক।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

কাঁদিলাম যদি জনম অবধি
কলঙ্ক রটিবে তব নামে।
তব অপযশ উঠি দিকে দশ
বজর হানিবে মম প্রাণে ॥১
শুনিবার আগে দীন হীন মাগে
করিতে করিতে তব নামে।
চলে যাই যেন দেহ ছাড়ি হেন
মরণে বাঁধিয়া বঁধু-মানে ॥২
চরণের পরে চিরদিন তরে
বাঁধা রহি যেন ভুলি আনে।
সকলি ছাড়িয়া আকুলিত হিয়া
ধায় সেথা—বাধা নাহি মানে ॥৩
যাহা কিছু করি চলি আর বলি
আঁখি থাকে যেন তব পানে।
তুমি ধ্রুবতারা নয়নের তারা
আলো তুমি আঁধার যেথানে ॥৪
কেন আর মোরে রাখ মোহ-ঘোরে ?
আছাড়ি পড়িছি দুখবানে।
কবে পাব বল মুকতি উজল—
হাসিয়া চলিব তোমা পানে ॥৫

স্বরলিপি।

(শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা)

জয়জয়ন্তী—একতালা।

"শরণাগত"

বহু দূর হ'তে আসিয়াছি প্রভো তোমার দুয়ারে আজ হে।
দীরঘ নিদাঘ-বেলা অবসান ধীরে এলো ঐ সাঁঝ হে॥
তপত এ তনু ভানুর কিরণে, কণ্টক কত ফুটেছে চরণে,
এসেছি অবশ শ্রান্ত পরাণে তব দ্বারে জ্যোতিরাজ হে॥
এসেছে কাঙ্গাল শুনে তব নাম, হেথা দীন দুঃখী পায় সুখধাম,
শুনেছি জেনেছি আছে কল্পতরু তব নিকেতন মাঝ হে।
কেহ ত হতাশ ফিরে না হেথায়, আমি কি হে শুধু মরম-ব্যথায়
ফিরে যাব আজ নিরাশ শূন্য হৃদয়ে হানিবে বাজ হে॥
আমি—দূরিত দুরিত-পীড়িত ঘৃণ্য, কে লবে আর কোলে তুমি ভিন্ন,
তব স্নেহ-কোল সদা প্রসারিত দূরিত দীনের লাজ হে॥
যাহা ইচ্ছা কর র'ব দ্বারে প'ড়ে, নীরবে কাঁদিব চিরকাল ভ'রে
তোমা বিনা নাথ ধরমে করমে, মরমে মম কি কাজ হে॥

২´ ৩ ০ ১
II { মা মা মা। গ-মগা গা রা। সা নস্‌রা রা। রা রা রা I
ব হু দূ ০র হ তে আ সি০০ য়া ছি প্র ভো

২´ ৩ ০ ১
I গরা গা মা। পা পধা -মগা। রগা -রগা -মা। মা -া -া } I
তো মা র দু য়া০ ০রে আ০ ০০ জ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I মা মা মগা। রগমা গরা সা। রমা মা -পনা। না না -র্সা I
দী র ঘ০ নি০০ দা০ ঘ বে০ লা ০অ ব সা ন

২´ ৩ ০ ১
I নর্সরা সর্রর্সা নর্সণা। ণধা পধণধা ধপা। -মগা -রগা -রগা। মা -া -া II
ধী০০ রে০ এ০ লো০ ঐ০০০ সাঁ০ ০০ ০০ ঝ০ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
[না -না না]
II { মা -পা পনা। না না না। র্সা র্সা র্সা। র্সনা র্সা র্সা I
ত প ত০ এ ত নু ভা নু র কি০ র ণে

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সনা। ধা ধর্রা র্রা। র্রা র্রা -র্জ্ঞনা } I
ক ণ্ট ক ক ০ ত০ ফু টে০ ছে চ র ণে০

২´ ৩ ০ ১
I না না না। র্সা -না র্সা। সর্রা সর্রর্সা র্সা। ণা সণা -ধপা I
এ সে ছি অ ব শ শ্রা০ ০০ স্ত প রা ০ণে

২´ ৩ ০ ১
I পা -ধা পধপা। পা মা -মগা। রগা -রগা -রগমা। মা -া -া II
ত ব দ্বা০ রে জ্যো ০তি রা০ ০০ জ০০ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II { মা মা গা | গমা রা সা | ন্সা সা ন্সরা | রা রা রা I
(১) এ সে ছে কা০ ঙা ল শু নে ত০০ ব না ম
(৯) আ মি দু ০রি ত দু রি ত পী০ড়ি ত ঘু ণ্য

২´ ৩ ০ ১
I রগরা গা মা | পা পধা পা | মা গা রগরা | গা মা মা I
(২) হে ০ থা দী ন দুঃ খী পা য় সু ০ খ ধা ম
(১০) কে ০ ন বে আ র কো লে তু মি ০ ভি ন্ন ন

২´ ৩ ০ ১
I মা গমা -রা | মা পা পা | মা পা পনা | না র্সা র্সা I
(৩) শু নে ছি জে নে ছি আ ছে কল্ প ত রু
(১১) ত ব মে হ কো ল স দা প্র সা রি ত

২´ ৩ ০ ১
I নর্সর্রা র্সর্রসা র্সণা | ণধা ধা পা | মাঃ -গঃ -রগমা | মা -া -া } I
(৪) ত০০ ব০ নি০ কে০ ত ন মা ০ ০০ঝ হে ০ ০
(১২) ধূ০০ রি০ ত০ দী০ নে র লা ০ ০০জ হে ০ ০

২´ ৩ ০ ১
[না না না]
I { মা পা পা | না না না | না র্সা র্রর্সা | না র্সা র্সা I
(৫) কে হ ত হ তা শ ফি রে না০ হে থা য়
(১৩) যা হা ই চ্ছা ক র র, মু ছা০ রে প ড়ে

২´ ৩ ০ ১
I পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -র্সনা | ধা ধর্রা র্রা | র্সনা র্রা -র্সনা } I
(৬) আ মি কি ভে শু ০ধু ম র০ ম ব্য০ থা ০র,
(১৪) নী র বে কাঁ দি ০ব চি র০ কা ল০ ভ ০রে

২´ ৩ ০ ১
I না না না | র্সাঃ -নঃ র্সা | না র্সর্রা সা | র্সর্রা -া ণধা I
(৭) ফি রে যা ব আ জ নি রা০ শ শূ০ ০ন্য০
(১৫) তো মা বি না না থ ধ র০ মে ক০ র মে০

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা | মা মা গা | রগা -রগা -রগমা | মা -া -া II II
(৮) হৃ দ য়ে হা নি বে বা০ ০০ জ০০ হে ০ ০
(১৬) ম র মে ম ম কি কা০ ০০ জ০০ হে ০ ০

তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব বিলোপ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মগোল এবং গৃহের গণ্ডগোল অতিক্রম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তো হিমালয় প্রবাসে যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সেই প্রবাসকালে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও নিতান্ত প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে, দেবেন্দ্রনাথের পরিপোষণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থার ফলে, রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, এবারে ব্রাহ্মসমাজ অবনতির পথে ততটা নামিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। রামমোহন রায়ের অনুপস্থিতিকালে সমাজের সভা আহ্বান, কর্ম্মচারীনিয়োগ প্রভৃতি বৈষয়িক কর্ম্ম বলিতে গেলে সম্পূর্ণই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রবাস জনিত অনুপস্থিতিতে সমাজের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায় নাই। রামমোহন রায়ের নিযুক্ত ট্রষ্টীগণের মধ্যে একমাত্র রমানাথ ঠাকুরই জীবিত ছিলেন। অপর ট্রষ্টীদ্বয় রাধাপ্রসাদ রায় এবং বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী পরলোকগত হইয়াছিলেন। রমানাথ ঠাকুরই সমাজের বৈষয়িক কর্ম্ম চালাইয়া লইতেন।

রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডীড অনুসারে আদিম ট্রষ্টীদিগের মধ্যে কাহারও স্থান কোন কারণে খালি হইলে ডীডকর্ত্তাদিগের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন তিনি অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন পশ্চিমাঞ্চলে, সেই সময়ে রমানাথ ঠাকুর পরলোকগত ট্রষ্টীদ্বয়ের স্থলে অপর দুইজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। যথারীতি বিজ্ঞাপন দিয়া অন্যান্য কয়েকটী কার্য্য নিষ্পত্তির সঙ্গে ট্রষ্টীদ্বয়ের মনোনয়ন করিবার জন্য ১৭৭৮শকের ২৯শে পৌষ ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা আহূত হইল। ঐ সভায় রমানাথ ঠাকুরই সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্যামাচরণ সরকারের পোষকতায় সভাপতি মহাশয় সভাকে জানাইলেন যে অন্যতর ডীডকর্ত্তা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ট্রষ্টী পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মত হইল।

এই বৎসর তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন দুইজন—রমাপ্রসাদ রায় এবং অমৃতলাল মিত্র। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর (১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন) তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত করিয়া তাহার অধিকাংশ ব্যয় স্বয়ং বহন করিতেছিলেন। সভা সংস্থাপিত হইবার প্রায় বৎসর দুই পরেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার মিলন সাধিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলে, সেই মিলন অবধি তত্ত্ববোধিনী সভা স্বীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াও অধ্যক্ষদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ব্রাহ্মসমাজ, উভয়ের কর্ম্মচারী পৃথক ছিলেন, বিত্তসংস্থান পৃথক ছিল এবং উভয়ের অধিবেশনাদিও পৃথক হইত, কিন্তু উভয়েই মূলত একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত। উভয়ের মিলনের ঠিক পরেই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিতে দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সেই উৎসাহ ধীরে ধীরে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিতে লাগিল। তবে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ন্যায় মহদাশয় সভ্যগণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মিতরূপে দিতেন এবং সময়ে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

১৭৭৮ শকের আশ্বিন মাসে দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিম যাত্রা করেন। এই বৎসরের পৌষমাসের পত্রিকাতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। এদিকে এই পৌষমাসেই এক সাধারণ সভায় রমাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রষ্টী মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি যে এই বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের পর অবধি রমানাথ ঠাকুর সমাজের কার্য্যে আর কোনরূপ মনোযোগ দিতেন না। আমরা জানি না যে এই পৌষ সংখ্যার পত্রিকা দেবেন্দ্রনাথের হস্তগত হইয়াছিল কিনা এবং

তিনি সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা।

ঠিক এক বৎসর পরে ১৭৭৯ শকের পৌষমাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিধবাবিবাহের সমর্থক আর একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিধবাবিবাহ বিষয়ক এই দুইটী প্রবন্ধ তদানীন্তন পত্রিকা-সম্পাদকগণের অনুমোদনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহের বিপক্ষে এবং বিধবাবিবাহের সপক্ষে সংগ্রাম করিয়া এবং বিধবাবিবাহকে বৈধ ও যুক্তিসম্মত দাঁড় করাইয়া প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে সম্পাদকগণ তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। আমরা শুনিয়াছি যে বিধবাবিবাহ-সমর্থক এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের কারণে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকগণ স্বীয় পদ পরিত্যাগে উৎসুক হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে সভার সম্পাদককেই পত্রিকা যথাসময়ে বাহির করিবার এবং উহার পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিতে হইত।

পর বৎসর (১৭৮০ শকে) ২৭ বৈশাখ তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছিল। ইহা সর্ব্ববিদিত যে সভামাত্রেরই প্রায় সাম্বৎসরিক অধিবেশনেই নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবত তত্ত্ববোধিনী সভার উক্ত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পূর্ব্বতন সম্পাদকদ্বয় পদত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ১লা শ্রাবণের পত্রিকাতে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পদকপদে বরিত হইবার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। এই সংখ্যার পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-সমর্থক আর একটী স্বলিখিত প্রবন্ধ এবং পরবর্ত্তী দুই সংখ্যায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে কয়েকটী সম্বাদ স্বীয় দায়িত্বে প্রকাশ করেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিবার মুখে। আষাঢ় মাসের প্রথমেই সিমলার উত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতপ্রদেশ হইতে সিমলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সিমলাতে প্রত্যাগমন অবধি দেবেন্দ্রনাথের আদেশমত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে প্রেরিত হইত। পত্রিকাতে বিধবাবিবাহসমর্থক প্রবন্ধাদি দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা জানি যে তিনি কখনই বিধবাবিহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহার উপর, আমরা শুনিয়াছি যে প্রাচীনপন্থী কয়েকজন ব্রাহ্ম তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন যে এরূপ প্রবন্ধাদি পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মসমাজের উপর হিন্দুসমাজের আস্থা চলিয়া যাইবে এবং হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবে।

হিমালয় প্রবাস হইতে ১লা অগ্রহায়ণ দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌঁছিবার পর, আমরা যতদূর জানি, এই বিষয়ে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তর্কবিতর্ক হয়। দেবেন্দ্রনাথের মতে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সভার সম্পাদকলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া উক্ত প্রবন্ধোক্ত মতামতের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকেও একপ্রকার বাঁধিয়া ফেলা হইতেছে এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সাধারণের সহানুভূতি হারাইতেছে। যে সকল সামাজিক বিষয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে গুরুতর মতদ্বৈধ আছে, এরূপ বিষয়ের সমর্থক প্রবন্ধ সকল পত্রিকাতে ব্যক্তিবিশেষের মতরূপে প্রকাশ না করিয়া সাধারণভাবে প্রকাশ করিলে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে যে সে সকল বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণই একমত। এই কারণে বিধবাবিবাহ প্রভৃতির ন্যায় দ্বন্দ্বসূচক বিয়য়ের সমর্থক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজের মত জানাইলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধেই লেখকের নাম সংযুক্ত থাকিত না—তাৎপর্য্য এই ছিল যে পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র এবং তাহাতে প্রকাশিত প্রত্যেক প্রবন্ধোল্লিখিত মতামত কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত নহে, ব্রাহ্মসাধারণের মতামত বলিয়া স্বীকার্য্য। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয়ই দেবেন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে পারেন নাই—সম্ভবত তিনি এবিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সভার মতামত জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন নাই।

বিধবাবিবাহ বিষয়কই বল বা অন্য যে কোন দ্বন্দ্বসূচক প্রবন্ধই বল, তাহা পত্রিকাতে প্রকাশের বিরুদ্ধে

দেবেন্দ্রনাথের আপত্তি থাকিলেই বা কি? তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইলেও উভয়ই এখন সাধারণের সম্পত্তি এবং সেই সাধারণের সভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনের ভার পাইয়াছেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ নিজের মতানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কার্য্য করাইবার কোনই অধিকার রাখিতেন না। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে যতদিন তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক থাকিবে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অবান্তরে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হইলেও মুখ্যভাবে সেই সভারই মুখপত্র থাকিবে, ততদিন তত্ত্ববোধিনী সভার নিযুক্ত সম্পাদকের কার্য্যে তাঁহার কোন অধিকার নাই। অথচ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সাহায্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্মসমাজেরই মুখপত্ররূপে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন যে পত্রিকাখানি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িতেছে।

অনুমান হয় যে বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রের তর্কবিতর্কের ফলে ১৭৮০ শকের ১লা মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত নিম্নের বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছিল :--

"অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে অবগত করিতেছি যে সভার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে কোন কোন বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য আগামী ১৮ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে সভাস্থ হইবেন।"

হিমালয়প্রবাস হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রত্যাগমনের পরেই কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেকগুলি বাল্যবন্ধুও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার বাল্যবন্ধুগণের অনেকেই আবার তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন—দেখা যায় যে, সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ প্রায় সকলেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভারও সভ্য হইতেন। কেহ কেহ বলেন যে দেবেন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ অধিকতর লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তাড়াতাড়ি কেশব-সহচরদিগকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলেও, যে কার্য্যের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর অনিষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বৈধপ্রণালীতে তাঁহার লোকসংগ্রহ করাতে আমরা কোনই অসঙ্গতি দেখিতে পাই না। কিন্তু, মোটের উপর ধর্ম্মসমাজের ভিতর কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রণালী অবলম্বনের আমরা পক্ষপাতী নহি। দেবেন্দ্রনাথ যদিবা ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও আমরা শতবার বলিব যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের মধ্যে এই সাহায্যগ্রহণের অবসর না আসিলেই ভাল হইত।

সভার নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে নবনির্ব্বাচিত অনেকগুলি সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। শোনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না—কেহ বলেন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত ছিলেন, এবং কাহারও মতে তিনি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কেশবপ্রমুখ নবসম্প্রদায়ের সকলেরই ইচ্ছা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজই যেন একমাত্র প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়ায়; তত্ত্ববোধিনী সভার ন্যায় পৃথক এক শক্তি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে বিভক্ত হইতে দেওয়া তাঁহাদের মতে অসঙ্গত। এবিষয়ে কেশবের সহিত যে দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ হয় নাই তাহা বলা যায় না। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে মূর্ত্তিপূজাবলম্বিত দীক্ষামন্ত্রগ্রহণে অসম্মত দেখিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত আত্মীয়রূপে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পদিনের ভিতরেই কেশবের উপর তাঁহার এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। "দেবেন্দ্র বাবু কেশব বাবুকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন, নির্জ্জনে বসিয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করত মনের সকল অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিতেন।" সুতরাং এক্ষেত্রে কেশবদলের ইচ্ছাকে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্ত ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি মাত্র বলিতে পারি।

নির্দ্দিষ্ট অধিবেশন দিবসে নবনির্ব্বাচিত সভ্যদিগের সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাদেরই মতানুসারে

স্থির হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত দুইটী মুদ্রাযন্ত্র এবং তাহার উপকরণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষরাদি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজে দান করিবেন। কাজেই তত্ত্ববোধিনী সভার অস্তিত্ব বিলোপই সভার এই অধিবেশনের অনুমোদিত হইল বলিতে হয়।

সভার এই সিদ্ধান্ত অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই। তাই অধ্যক্ষদিগের অনুমতি লইয়া তিনি সেই সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারার্থ ২০শে ফাল্গুন পুনরায় এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু বুঝাই যাইতেছে যে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যই মত দিতে রাজী হয়েন নাই। সভ্যগণের অনুপস্থিতির কারণে নির্দ্দিষ্ট দিনে সভার বিশেষ অধিবেশন হইল না। ১৭৮০ শকের ২২শে চৈত্র এবং ১৭৮১ শকের ১৬ই বৈশাখ, এই দুই দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও দুইবার উক্ত সিদ্ধান্তের পুনর্বিচারার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা এক প্রকার উঠিয়া যাওয়াতে ১৭৮১ শকের প্রারম্ভ হইতেই কেশব বাবুর অভ্যুত্থানের অবসর ঘটিল। ইতিপূর্ব্বেই ১৭৮০ শকের চৈত্রমাসে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৭৮১ শকের ১৬ই বৈশাখে সম্ভবত উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। সম্ভবত নবনির্ব্বাচিত সভ্যগণের আধিক্যবশত এই অধিবেশনে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত স্থিরতর হইয়াছিল। আমরা দেখি যে ১৬ই বৈশাখের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের পরে ২৬ বৈশাখ বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই স্বাক্ষরিত আহ্বানের দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার এক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। ইহাই তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সাধারণ সভা।

তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব যখন উহার সভ্যগণের অনুমোদিত হইল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তি যে তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের দোষ দেখিবেন অথবা অভিমানভরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা আমরা মনেও স্থান দিতে পারি না। আর প্রকৃতই যে তিনি ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের দোষ দেখেন নাই অথবা ব্রাহ্মসমাজের উপর কোন দোষারোপ করেন নাই, তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি উপরোক্ত ঘটনার পরে অন্তত দুই বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা নিয়মিত দিয়া আসিয়াছিলেন।

এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ১৭৬১ শক অবধি ১৭৮০ শক পর্য্যন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্র বাস করিয়া নানা প্রকারে তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া অবশেষে ব্রাহ্মসমাজেরই ক্রোড়ে দেহত্যাগ করিল।

রসায়ন বিজ্ঞানে পরমাণুর আকৃতি।

(৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জড় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ গুণ ও বিশেষ গুণ আছে। বিশেষ গুণের ইয়ত্তা নাই। বিশেষ গুণের আলোচনা করিতে গেলে সীমা পাওয়া যায় না। ঈশ্বরে যেমন একতার মধ্যে বিচিত্রতা, তেমনি তাঁহার সৃষ্ট এক একটী বস্তুতেও অসীম বিচিত্রতা প্রকাশ পায়—ইহার এই গুণের সঙ্গে ইহার এই গুণের বিশেষ, উহার ঐ গুণের সঙ্গে উহার ঐ গুণের প্রভেদ ইত্যাদি। বিশেষ গুণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন সাধারণ গুণগুলি আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে লক্ষবিধ পদার্থ আছে বলিয়া তাহার লক্ষবিধ উপাদান বলিলে অন্যায় হয়। সেইরূপ নানা প্রকার গুণ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গুণ হয় তো এক সাধারণ গুণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। আমরা এই-এইরূপ বিশেষ বিশেষ গুণকে অন্তর্গত করিয়া এক সাধারণ গুণ বলিতে চাহি। তাহা হইলে এবিষয় আমাদের বেশী মনে থাকিবে।

জড়পদার্থের প্রথম সাধারণ গুণ এই যে, যাহা কিছু পদার্থ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি তাহাদের কোনটাই একটী অংশহীন অখণ্ড পদার্থ নহে, কিন্তু পরমাণুর সমষ্টি। পরমাত্মা যেমন নির্ব্বিশেষে এক অথবা প্রত্যগাত্মা এবং আত্মা যেমন বিশেষ বিশেষ এক, জড় পদার্থ তেমনি এক হইলেও বিশেষ বিশেষ পরমাণুর সমষ্টি। এই কাগজকে প্রত্যক্ষ কর। এটী এক নহে। ইহাকে যে

বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাহা নহে। এই কাগজে কত অাঁশ আছে, সেই এক একটী অাঁশ আবার কত অংশের সমষ্টি। এই কাগজকে লক্ষ লক্ষ ভাগে বিভক্ত করিয়া যাওয়া যায়—চরমে এক প্রকার পরমাণুতে আসা যায়, যাহার আর ভাগ হইতে পারে না। সেই সূক্ষ্মতম পরমাণুর সমষ্টি এই কাগজ। সেই পরমাণুর সমষ্টি সমস্ত বস্তু। বস্তু ভাগ হইতে হইতে ভাগের শেষ যাহা, অথবা যাহার আর ভাগশেষ হইতে পারে না, তাহাই পরমাণু।

এ বিষয়েও মতান্তর আছে। এই পদার্থকে দশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার বিশভাগ করিলাম, তাহাকে আবার চল্লিশভাগ করিলাম—এইরূপে অসীমভাগ হইতে পারে, তাহার আর অবশিষ্ট থাকে না। যেমন, ৮ কে যদি ২ দিয়া ভাগ করা যায়, তাহার ভাগফল হইবে ৪ ; কিন্তু অনন্ত যদি ভাজক হয়, ভাগক্রিয়া শূন্য হইবে—যেমন, ২)৮(৪; ৪)৮(২; ৮)৮(১; অনন্ত)৮(০। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ভাজকটা যত ছোট হয় ভাগফল তত বড় হয়, ভাজক যত বড় হয় ভাগফল তত ছোট হয়। এক খণ্ড বস্তু, যেমন এই খড়িখানি হইল যেন ১০ ; এই ১০ কে যদি কুড়ি ভাগ করা যায়, ভাগফল হইবে $\frac{১}{২}$ অর্থাৎ দুই ভাগের একভাগ। ১০ কে যদি ১০০ ভাগ করা যায়, তবে ভাগ ফল হইবে $\frac{১০}{১০০}$ অর্থাৎ $\frac{১}{১০}$। এইরূপ ভাজককে বড় করিতে করিতে ভাগফল ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হইতে হইতে ক্রমে অনন্ত ভাজক হইলে ভাগফল অনন্তগুণে ছোট হইবে অর্থাৎ শূন্য হইবে, যেমন অনন্ত)১০(০। এই মত ধরিলে পরমাণু শূন্যে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহাই কি সত্য ? যদি কিছু না থাকে, তবে কিছু না হইতে কিছু হয় কি প্রকারে ? কাজেই অনন্তগুণে ভাগ করিবার কথা বলা বৃথা। প্রত্যেক পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে এমন ভাগে পৌঁছিতে পারা যায়, যে রাশির আর ভাগ হইতে পারে না। সেই সূক্ষ্মাংশের নাম পরমাণু। পরমাণু যদি না থাকে, তবে পরমাণুর সমষ্টির ফলে বস্তু হইবে কেমন করিয়া ? অতএব স্থির হইতেছে যে বস্তু পরমাণু-সমষ্টি। ভৌতিক পদার্থ পরমাণু-সমষ্টি, এইটী হইল প্রথম তত্ত্ব।

সেই পরমাণুর আকার আছে, ভার আছে, ক্রিয়া আছে। পরমাণুর গুণেতেই বস্তুর গুণ প্রকাশ পায়। পরমাণু যদি নির্গুণ হয় বস্তুও নির্গুণ হইবে। পরমাণু কারণ, বস্তু কার্য্য। কারণের গুণ না থাকিলে কার্য্যের গুণ থাকিতে পারে না।

ভৌতিক পদার্থের আর একটী সাধারণ গুণ বিস্তৃতি। বিস্তৃতির অর্থ স্থান ব্যাপিয়া থাকা। স্থান কাহাকে বলে ? এই বায়ু যে আছে, ইহা স্থান নহে ; এই যে দেওয়াল আছে, ইহা স্থান নহে। ইহারা স্থানেতে আছে মাত্র। এই ঘর হইতে সমস্ত জিনিস যদি বাহির করিয়া লওয়া যায়, তাহাই স্থান। শূন্য যাহা পড়িয়া থাকিবে, সেই স্থান ব্যাপিয়া থাকা, এই একটী ভৌতিক গুণ। যেমন,খড়ি এখানে রহিয়াছে—ইহা যত বড়, ততটুকু আপনার মত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহা যেটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সে স্থানে আর কিছু নাই। সেই স্থান যতটুকু যে ব্যাপিয়া থাকে সে-ই স্থান তাহার আকার। বোর্ডের এই সমস্তটাই যেন স্থান, তাহার মধ্যে আমি কখঘগ আঁকিলাম। কখঘগ বোর্ডের এইটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানের যাহা প্রান্ত, সেই প্রান্তের সমষ্টি লইলেই উহার আকার পাওয়া গেল। এটী চতুষ্কোণ। কোন আকার ত্রিকোণ হয়, কোনটা গোল হয়। স্থান-ব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়।
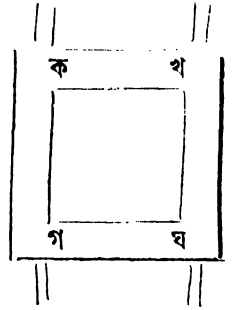
যেমন এই বইটী বইয়ের মত স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তেমনি ইহার সূক্ষ্মতম পরমাণুও কি স্থান ব্যাপিয়া নাই ? অবশ্যই আছে। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর অংশে বই হইল, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা এত বড় স্থান হইল। ব্যাপিত্ব হইতেই আকার হয়। স্থূল পদার্থ যেমন স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, জলও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, বায়ুও তেমনি স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অণুও স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাহাতেই বিভিন্ন আকার হইতেছে।

আকার দুই রকমে হয়। এক, স্থানের যেমন যেমন সীমা, বস্তুর তেমনি আকার হয়। আর আকার হয় কি করিয়া,—পরমাণুর আকার যেরূপ, বস্তুর আকার সেইরূপ হয়। পরমাণুর আকার কি দেখা যায় ? তাহার আকার চক্ষে দেখা যায়

না বটে, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। রাজমিস্ত্রী যখন গোল থাম গাঁথে, গোল গোল ইট দিয়া গাঁথে বলিয়া থাম গোল হয়। বইটা চতুষ্কোণ, ইহাতে স্থূলতা আছে, এই জন্য জানিতেছি যে ইহার পাতগুলিও চতুষ্কোণ এবং সেগুলিতেও অল্প-পরিমাণে স্থূলতা আছে। বস্তুত, পাতের চতুষ্কোণতা ও স্থূলতা থাকাতেই পাতের সমষ্টি যে এই বই, ইহাও চতুষ্কোণ ও স্থূল হইয়াছে। আরও যদি এই বইয়েতে পাত দেওয়া যায়, বই আরও স্থূল হইবে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, পরমাণুপুঞ্জ যেমন যেমন স্থান লইয়া থাকে, বস্তুও তেমনি আকার ধারণ করে। যদিও দেখা যাইতেছে যে, এই খড়ির আকার এক রকম, এই টেবিলের আকার এক-রকম—ইহা কেবল পরমাণু যেরূপে স্থানে সাজানো রহিয়াছে, সেই অনুসারে ইহাদের আকার বিভিন্ন হইয়াছে।

আবার, এই টেবিলটাকে বেশ মসৃণ সমতল দেখিতেছি—বাস্তবিক ইহা মসৃণও নহে, সমতলও নহে, কিন্তু কেবলই এবড়ো-খেবড়ো অর্থাৎ উচু-নীচু। প্রবল অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে গোল গোল 'ল'য়ের মত উচু দেখা যাবে— ጦጦ। আবার এই বইটা রহিয়াছে—ইহার ধার বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু ঠিক ইহার ধার নাই। ধারটাও ঐরূপ গোল গোল। আবার দেখা যায়, জগতের প্রায় সকল বস্তুই গোলাকার—গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী হইতে ক্ষুদ্র জলবিন্দু পর্য্যন্ত সবই গোল। গাছ গোলাল—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে মাথা নাড়ী সকলই গোল। জলকে সমতল বলিয়া বোধ হয়—তাহার উপরিভাগও ঢেউয়ের মত গোল; সেই জলের আবার একবিন্দু যদি উঠাইয়া ধরা যায়, তাহাও গোল। পারা ধাতু—তাহাকে যদি টেবিলের উপর ফেলিয়া দাও, সব গোল গোল হইয়া গড়াইয়া যাইবে। যদি কোন বস্তু চতুষ্কোণ হয়, তাহার ঠিক ছুঁচলো কোণ থাকিবে, তাহার ধার থাকিবে। সেই ধারকে এইরূপে আঁকা যাইতে পারে <। কিন্তু এ রকম কোন ধার জগতের মধ্যে দেখা যায় না। যেখানে < এমনি, সেইখানে ⌒ এমনি গোলত্ব আছে। অতএব ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পরমাণুর প্রাকৃতিক আকার গোল। পরমাণুর পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, তাহার ভাগও হইতে পারে না, তাহাকে চাঁচাও যায় না—*ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই আছে*—সেই আকার গোল।

কেহ কেহ বলেন ভিন্ন রকম পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন আকার। মিছরিতে দানা বাঁধিয়া যায়, জলে লবণ ফেলিয়া দিলে জল উবিয়া গেলে তাহাতে দানা বাঁধে। দানার পার্শ্ব আছে। সেই সব পার্শ্ব মিলিয়া দানা বাঁধে। অতএব, পরমাণুর সংহতি দ্বারা যখন দানা বাঁধে, তখন পরমাণুরই আকার দানার আকারের মত, অর্থাৎ পরমাণুতে ধার আছে এবং কোণ আছে।

কিন্তু অণুবীক্ষণ দ্বারা দানার প্রতি পার্শ্ব দেখিলে সেখানে 'ল'য়ের মত উচু উচু আছে দেখা যায়—খালি চক্ষে যেখানে ছুঁচলো বোধ হয়, তারও ভিতর ⌒ গোল আছে দেখা যায়। আবার দেখা যায় যে, একই বস্তুকে রকম রকম অবস্থায় ফেলিলে রকম রকম দানা বাঁধে। সুতরাং পরমাণুর আকার দানার আকারের মত হইতে পারে না, কারণ পরমাণুর আকারের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তবে যে দানা বাঁধে, তাহা কেবল গোল পরমাণুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমাণুমাত্রের ঈশ্বর-প্রদত্ত আকার গোল। গোলত্ব হইতে বিভিন্ন আকার হইতেছে, তাহারও মধ্যে গোলত্ব রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে, পরমাণু যদি গোল হয়, তবে বস্তু সকল কেমন করিয়া চতুষ্কোণ হয়, ত্রিকোণ হয়? কেল্লাতে যেরূপে কামানের গোলা সাজায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, এক গোল হইতে সব রকম আকার হইতে পারে। গোলা দ্বারাও চৌক হয়, যেমন ⁘⁘ । আবার এই চৌকর প্রত্যেক অণুই গোল, এইজন্য ঐ সকল গোল যদি একত্র থাকে, তাহা হইলেই বস্তুর উপরিভাগ সকল 'ল'-আকার ጦጦ এইরকম দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি পরমাণু চতুষ্কোণ হইত, তাহা হইলে উচুনীচু থাকিবার প্রয়োজন থাকিত না—যেমন, ⊞ আবার গোলাদ্বারা ত্রিকোণ হইতে পারে—যেমন, ∴ । এই যুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে পরমাণুর আকার আছে এবং তাহা সম্ভবত গোল। তাহা দ্বারা বিভিন্ন রকম আকার প্রস্তুত হয়। বস্তুগত আকারের সকল বিভিন্নতার ভিতর সাধারণত্ব দেখা যাইতেছে—গোল।

প্রথম বিস্তৃতির কথা হইল। বিস্তৃতি হইতে আকৃতির কথা আসিল এবং দেখা গেল যে পরমাণুর আকৃতি গোল।

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৭৪ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

মাতৃপূজা।

(প্রসাদী পদচ্ছায়া)

মিলেছি মা তোর আজি মধুর ডাকে ॥
(মোরা) হিংসা দ্বন্দ্ব গেছি ভুলে,
প্রাণ্ আমাদের্ গেছে খুলে,
এসেছি মা পূজা দিতে
ছুটে তাইতে মিলে তোকে।
মান অভিমান ছোটখাটো,
ফেলেছিল চোখে কুটো,
এতদিন তাই দেখিনিকো,
(এখন) ভরেছে প্রাণ তোরে দেখে।
(এবার) পূজায় যেন বুঝতে শিখি,
তুই মা মোদের্ সবার্ একই ;
ভায়ে ভায়ে যেন ভালবেসে
হাসি আনতে পারি মুখে।
শক্তিময় তোর দুগ্ধ খেয়ে
চলেছি মা মানুষ হয়ে ;
শত বাধায় আর ফিরতে না হয়,
এই-মত বল দে মা বুকে।
ত্রিশ কোটী তোর্ ছেলে মিলে
অভ্রভেদী মহান সুরে
(তোরে) ডাক্‌বে যবে মা মা বলে,
সাড়া পড়্‌বে বিশ্বলোকে ॥

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধৃতি।

(শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত)

প্রতিজনের আচরণে কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপাল্য অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কি, তদ্বিষয়ে ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীম্মনুঃ ॥ মনু ১০-৬৩

ইহার অর্থ এই যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য্য, শুচিতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সংক্ষেপে ইহাই ধর্ম্ম, মনু তাহা চতুর্বর্ণকে বলিয়াছিলেন।* উপরোক্ত চারি প্রকার সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম ব্যতীত মনু ধর্ম্মের বিস্তারিত দশ লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥ মনু ৬-৯২

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্ম লক্ষণ।

---

* "মনু বলিয়াছিলেন" এই কথা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রচলিত মনুসংহিতার পূর্ব্বে আরও একটা মনুপ্রণীত বলিয়া কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদ বা স্মৃতির প্রামাণ্যতার কোন কথাই ইঙ্গিত দেখা যায় না। তাহাতে অনুমান হয় যে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্যতার কথা অনেকগুলি স্মৃতি রচিত হইবার পরে প্রচারিত হইয়াছিল। মনুসংহিতার "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলিও আমাদের এই কথার সমর্থন করে বোধ হয়। মনুসংহিতাই যদি আদি স্মৃতি হয়, তবে এখানে "স্মৃতিঃ" শব্দের সার্থকতা কোথায় ? সম্ভবত উত্তরকালে এই শ্লোকটি মনুসংহিতার ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথবা ইহা দ্বারা প্রচলিত মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্মৃতি ইঙ্গিত-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তং বোং সং।

ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ হইল ধৃতি। ধৃতি শব্দের মুখ্যার্থ হইল ধৈর্য্য এবং গৌণার্থ হইল ধারণ বা ধারণা এবং সন্তোষ। ধৈর্য্য শব্দে ধীরতা, স্থিরতা বা অচঞ্চলতা বুঝায়। বিপদ বা দুঃখে পতিত হইয়াও যে ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র চঞ্চলতা উপস্থিত হয় না এবং বুদ্ধি স্থির থাকে, তাহাকেই ধীর বা ধৈর্য্যবান পুরুষ বলা যায় এবং ধীর পুরুষের মনের অবস্থাকেই ধৈর্য্য বলা যায়। নীতিশাস্ত্রকারগণও বিপদ আপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবার জন্য বারম্বার উপদেশ দিয়াছেন। কোন মহাত্মা উপদেশ দিয়াছেন—

বিপদমে ধৈর্য্য ধরো প্রাণ রহে সুখ ঢের।
নলপাণ্ডব রঘুবীর পুনঃ পায় রাজ সুখের॥

বিপদকালে ধৈর্য্য ধরিবে, অধীর হইয়া হতাশ হইয়া পড়িও না; প্রাণ রক্ষা করিলে অনেক সুখপ্রাপ্তির আশা থাকে। নলরাজা, পাণ্ডবগণ, রামচন্দ্র, ইহাঁরা ধৈর্য্য ধরিবার ফলে অনেক বিপদের পরেও সুখের রাজ্য পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে জগতে যথার্থ সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনও সহজ হয় না। যিনি সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাহসের সহিত তৎসমুদয় অতিক্রম করিবার জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তিনিই অধিকাংশ স্থলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া জগতে আদর্শ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। যিনি নানা প্রকার বিপদ, দুঃখ বা অসুবিধা প্রাপ্ত হইয়াও নিজ পুরুষকার দ্বারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও ক্ষমতাশালী বলিয়া কথিত হয়েন। ইংরাজীতে ইহাকে survival of the fittest বলে। এই নিয়ম জীবজন্তু উদ্ভিদ মনুষ্য সর্ব্বত্রই সমভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

যিনি কষ্টসহিষ্ণু নহেন এবং বিপদে পড়িলে ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া তাহার প্রতীকারে যত্ন করেন না, ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন, তিনি কদাপি কোন বিষয়ে লাভবান হইতে পারেন না। শাস্ত্রে এইজন্য উপদেশ আছে—"তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং, আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতং"—যে পর্য্যন্ত ভয়জনক কোন কিছু না আসে, সেই পর্য্যন্ত ভয়কে ভয় করিবে অর্থাৎ যাহাতে ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে; কিন্তু ভয়জনক কোন কিছু উপস্থিত হইলে তাহার যথোচিত প্রতীকার করিবে।

সংসারে প্রতি পদেই আমাদিগকে আঘাত পাইতেই হয়। সেই আঘাতের প্রতিঘাতেই ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির ধৈর্য্য পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সুগন্ধি দ্রব্য পেষণের আঘাত পাইলেই তাহার সুগন্ধ সম্যক বাহির হয়। বৃক্ষাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাঁটিয়া দিলে তবে তাহা শাখাপ্রশাখায় ফুলে ফলে ভরিয়া উঠে। স্বর্ণকে যতই দগ্ধ ও ঘর্ষণ দ্বারা পালিশ করা যাইবে ততই তাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতে থাকে। চন্দন কাষ্ঠকে যতই অধিক ঘর্ষণ করিবে ততই তাহার সুগন্ধ অধিক পরিমাণে বাহির হইবে। সেইরূপ প্রকৃত সাধুব্যক্তি যতই অধিক পীড়িত হইবেন, ততই তাঁহার সাধুতা অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইবে।

সাধুগণ অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার প্রিয় পুত্র। তাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গৌরব প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জাগতিক সমস্ত অনিত্য সুখভোগের পরিণাম দুঃখময় জানিয়া ইহজগতের সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমভাবে দুঃখময় জ্ঞান করেন। তাঁহারা যতই কেন কষ্টে পতিত হউন না, তৎসমুদয় স্বীয় ধৈর্য্যবলে অকাতরে সহ্য করিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহারা যত অধিক দুঃখে পতিত হয়েন, ততই তাঁহাদিগের জীবনে ধর্ম্মাচরণ ও সাধুতার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বলিতে কি, সাধু পুরুষেরা জানেন যে তাঁহারা যে কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন, তাহা ঈশ্বর তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এবং ধর্ম্মসাধনের দ্বারা শক্তি অর্জ্জনের একটী সুযোগ স্বরূপে প্রেরণ করেন।

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং॥
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতিবিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং॥

ভর্ত্তৃহরি।

অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ড যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্ত্তন করা হউক না কেন, তাহার মিষ্টতা নষ্ট হয় না, চন্দনকাষ্ঠকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহার মনোহর গন্ধ চলিয়া যায় না, সুবর্ণ শতদগ্ধ হইলেও

তাহার কান্তিবর্ণ হীন হয় না এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলেও উত্তম ব্যক্তিদিগের স্বভাবের বিকৃতি হয় না।

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ জগতের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সাধারণ লোকে পূর্ব্বপ্রচলিত কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া তাঁহার সাধুকার্য্যে প্রতিপদেই বাধা প্রদান করে; এমন কি, অনেকস্থলে এই প্রকার সাধুব্যক্তিকে নিহত করিতেও জনসাধারণ অগ্রসর হয় দেখা যায়। প্রকৃত সাধুগণ নির্ভীকচিত্তে আপনার মহান উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর থাকেন এবং ধৈর্য্য সহকারে সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। কিন্তু ইহা জানা কথা যে তাঁহাদের মহান উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জনও ব্যর্থ হয় না। তাই গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, জগতে যদি কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগে বঞ্চিত হইয়া শরীর ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার অসম্পূর্ণ কর্ম্ম কি নষ্ট হইয়া যায়, অথবা তাহার কোন স্থায়ী ফল থাকে। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, হে পার্থ, তুমি নিশ্চয় জানিও যে সাধু কর্ম্মের ফল কি ইহকালে কি পরকালে বিনষ্ট হয় না, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন না।

বর্ত্তমান কালে মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বামী দয়ানন্দ যে কি কষ্ট, কি লাঞ্ছনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সত্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। তিনি স্বীয় জীবনে ধৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জ্জনকেও অতি তুচ্ছ বোধ করিতেন।

সাধুদিগের জীবন ধৃতিসাধনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন একজাতীয় কীটাণু জ্বলন্ত অগ্নিতেও দগ্ধ না হইয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সাধু ব্যক্তিগণ সংসারের ক্লেশতাপে বারম্বার দগ্ধ হইলেও ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা সহকারে সে সকল অনায়াসে সহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট তাঁহাদিগকে তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার ন্যায়বিচারে মানবকে যে দুঃখ ক্লেশ প্রদান করেন, তাহার ফলে মানব বিশুদ্ধি ও মঙ্গল লাভ করে। যেমন কোন বক্র কাষ্ঠখণ্ডকে সরল করিতে হইলে জ্বলন্ত অগ্নিতে তাহাকে স্বেদ দিতে হয়, তদ্রূপ মানবেরও আত্মার অন্তরায় সকল দূর করিয়া তাহার সদ্গুণ সকল প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য মানবকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

ধৈর্য্য অবলম্বনের পরিচয় গ্রীসদেশীয় মহাত্মা সক্রেটিস যেরূপ দিয়াছেন, এরূপ অতি অল্পলোকেই দিয়াছেন। তাঁহার জীবন সত্য ও ধর্ম্মাচরণের মহোচ্চ আদর্শ। সত্য ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে কতদূর নির্ভীক হওয়া যায়, সক্রেটিস তাহা স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসহ্য কষ্ট অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য্যবলে সে সকলই অক্লেশে সহ্য করিয়া জগতকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশবাসীগণ অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার বিচারকগণকে বলিলেন যে আপনারা আমার এই নশ্বর শরীরকে যদৃচ্ছা বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু আমার আত্মা অবিনাশী, তাহার কোনই অনিষ্ট করিতে পারেন না। শিষ্যগণ তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে আজ না হয় কাল মরণ তো আছেই, তাহার জন্য ভীত হইবার কারণ নাই। তাঁহাকে যখন বিষ প্রদান করা হইল, তিনি অকুতোভয়ে তাহা পান করিলেন এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে আমাদিগকে

সর্ব্বপ্রথম ধৃতিসাধনা দ্বারা ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। এই পথে অনেক সময়ে আত্মীয়স্বজনেরাও পর্ব্বত সমান বিঘ্ন উপস্থিত করে, ধৈর্য্যসহকারে সে সকল অতিক্রম করা আবশ্যক। ধৃতিশীল ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও স্বীয় লক্ষ্যচ্যুত না হওয়া। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিঘ্নকারীগণের জন্য অন্তরের সহিত প্রার্থনা করেন এবং ধৈর্য্যবর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের হস্ত হইতে নিজের রক্ষাসাধন করেন। কোন প্রকার লাভের আশায় বা বাধ্যবাধকতার কারণে নিজের ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্যধারণে অক্ষম হইয়া কেহ কেহ কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে সুখ লাভের প্রতি ধাবিত হয়েন, এবং কেহ কেহ বা মৌনং সম্মতিলক্ষণং অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভাবসম্মতি (passive consent) দিয়া থাকেন। আবার, কেহ কেহ বা আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহস করেন না। এভাবে চলিলে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। এরূপ উপেক্ষার ভাবে আত্মা প্রকৃত মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ছাইচাপা আগুনের ন্যায় সুখের আশায় চাপা ধর্ম্মভাবের দ্বারা বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। যাঁহাদের ধর্ম্মভাব এরূপ আচ্ছন্ন থাকে, তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধন সুদূরপরাহত। তাঁহাদিগকে প্রায় সর্ব্বদাই অন্তরাত্মার প্রেরণার বিরুদ্ধে চলিতে হয়। এইরূপ মনুষ্যের জীবন বহুরূপীর জীবন বলা যাইতে পারে। দুইকূল রাখিবার পরামর্শ রাজনীতির অপভ্রংশ জর্ম্মনির দুর্নীতির পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণই অনুপযোগী। ধর্ম্মজীবন চালাইতে হইলে কিছুতেই ধর্ম্মরূপ লক্ষ্য হইতে স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। উভয়কূল রক্ষা করিতে চাহিলে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারা যায় না। ধৈর্য্যের সহিত বীরের ন্যায় অধর্ম্ম ও তৎসহায় শত সহস্র বিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে ভগবানের চরণে উপস্থিত হইতে হইবে।

মিলন গীত।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—একতালা।

তোমার মিলন লাগি
আকাশ আছে চেয়ে;
মণিরতন আলোয়
আঙ্গিনা তার ছেয়ে।
কুসুম ফুটেছে বনে
বহে গন্ধ পবনে
গীতি-মুখর নিখিল ধরা
মিলনের গান গেয়ে'।
আজি আমার চিত্তমাঝে
শঙ্খ ধ্বনি বাজে
কুহু কুহু স্বরে মুহু মুহু
ডাকে বসন্তরাজে।
ঐ থেমেছে রথ দ্বারে
দেখি আমি আজি কারে
বিশ্বরাজ পুরোহিত সাজে
এসেছেন আজি ধেয়ে।
তাঁহারি পায়ে নমিয়া
মিলে যাক্ দুটী হৃদয়ে
প্রেমের বন্যা বহিয়া যাক্
নিখিল ধরণী বেয়ে।
নির্ভয়ে চল পথে
রাখি তাঁরে হৃদি-রথে
নিশিদিন রহ তাঁহারি কাজে
তাঁরই প্রসাদ পেয়ে॥

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল, বার-এট-ল)

আর্য্য-সমাজের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধের ক্রমোন্নতির সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। আর্য্য-বিবাহের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের তিনটী stage বা স্তর দেখা যায়। প্রথম অর্থাৎ আদিম অবস্থায় স্ত্রীরা "বে-ওয়ারিস্" অর্থাৎ "স্বতন্ত্রা" বা অস্বামিকা ছিল—"কামাচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চ"। রতিসুখার্থ যে-সে পুরুষের

সহিত সংসর্গ করিত। এইরূপ স্ত্রীপুরুষসহবাস সাময়িক ছিল—পতি-পত্নীত্ব-রূপ চির-সম্বন্ধ ছিল না। উদাহরণ—উদ্দালক-দীর্ঘতমা যুগের স্ত্রীরা "বে-ওয়ারিস" অর্থাৎ "স্বতন্ত্রা" বা অস্বামিকা ছিল এবং "গো-গণের" ন্যায় যাহার তাহার সহিত উপগত হইত। উদ্দালকের মতে ইহাই তৎকালে "ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ"—"সনাতন ধৰ্ম্ম"—ছিল।

আর্য্য বিবাহের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় stage বা স্তরে স্ত্রীগণ গোধনাদি অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইতে লাগিল। সুতরাং কোন না কোন পুরুষের অধীনে আসিয়া পড়িল—"স্বামী" (অর্থাৎ 'মালিক') শব্দ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমৰ্হতি"—বোধ হয় ইহা এই যুগেরই বীজ-মন্ত্র। পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ এযুগেও দৃঢ়বদ্ধ হয় নাই, তবে স্ত্রীপুরুষসহবাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত।

আর্য্যবিবাহের ক্রমবিকাশের তৃতীয় stage বা স্তরে স্ত্রীগণ গোধনাদি অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় পরিগণিত হইত না। স্ত্রীপুরুষদিগের হৃদয়ে পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধের সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি এই যুগেই বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। পতির স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মাইল। পতি নাম এই যুগেই সার্থক হইল—"পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।" পূর্ব্ববর্ত্তীকালে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ বিপরীত দেখা যায়। দীর্ঘতমার স্ত্রীই স্বামীর ভরণপোষণ করিতেন। দীর্ঘতমা তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছ কেন?" তদুত্তরে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"পতি পালন করেন, তজ্জ-ন্যই তিনি পতি নামে আখ্যাত। আমিই তোমার ভরণপোষণ করিতেছি অতএব তুমি আমার পতি নহ।" *

আর্য্যবিবাহের ক্রমবিকাশের তৃতীয় stage বা স্তরে স্ত্রী ধৰ্ম্মপত্নী অর্থাৎ জায়া-বাচ্যা হইলেন,—'পত্নীর' 'উপ'-পত্নীত্ব বিলুপ্ত হইল। জায়া বা ভাৰ্য্যা শব্দে যে-সে স্ত্রী বুঝায় না। 'যূপকাষ্ঠ' বলিলে যেমন যা তা কাঠ বুঝায় না, বেদমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত কাষ্ঠ-বিশেষ বুঝায়—জায়া বা ভাৰ্য্যা শব্দেও যে সে স্ত্রী বুঝায় না, বেদমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃতা অর্থাৎ পাণিগৃহীতা স্ত্রীবিশেষ বুঝায় *। এইরূপে 'দম্পতি বা জায়া-পতিত্ব' সম্বন্ধ-জ্ঞানের উপলব্ধিই প্রকৃত ধৰ্ম্ম্যবিবাহ। এই যুগেই পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থায়িত্বভাব ধারণ করিল। একমাত্র পতিই স্ত্রীলোক-দিগের যাবজ্জীবনের আশ্রয় হইল—"এক এব পতির্নাৰ্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম।"

মনুপ্রমুখ শাস্ত্রকারগণ Monogamy বা একৈকস্ত্রীপুরুষগ্রহণ প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে পুরুষের পক্ষে স্ত্র্যন্তর গ্রহণ এবং স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ—এই মনুস্মৃতির মত। স্ত্রীর পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণরূপ সত্য-যুগের নিয়ম—"কলৌ নিষিদ্ধঃ।"

'Ancestor-worship বা বৈদিক পিতৃ-যজ্ঞের' † পৌরাণিক সংস্কার বা রূপান্তর, শ্রাদ্ধ বা

---

* পালন করে বলিয়া "পতি" নাম—পালন করিতে অক্ষম হইলে "পতিত্বেরও" শেষ হইবে—দীর্ঘতমার স্ত্রীর কথার ভাবে এইরূপ মনে হয়।

* রঘুনন্দন।

† ঋগ্বেদে "পিতৃযজ্ঞের" কথা আছে। ঋগ্বেদে 'পিতৃন্' শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পিতৃন্' শব্দ দ্বারা আর্য্য-দিগের tribal ancestors বা পূর্ব্বপুরুষগণের সমষ্টি বুঝায়। এইকালে 'সপিণ্ড' 'সমানোদক' "সাকুল্য" "গোত্র" প্রভৃতি নানা জাতীয় পিণ্ডের দাবীদারের আবির্ভাব বা উপদ্রব হয় নাই। এ সব "সূত্র" যুগে হয়।

"ব্রাহ্মণ" যুগে যাগযজ্ঞাদি ব্রাহ্মণগণ একচেটে করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের 'অভ্রভেদী অভিমান' এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন। এমন কি ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি অন্য কাহারও করিবার অধিকার ছিল না—ব্রাহ্মণ না হইলে দেবতাগণ যজ্ঞান্ন গ্রহণ করিতেন না। যজ্ঞ ব্যাপার এত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, মন্ত্রের "পান" হইতে মন্ত্রের "চুণ" খসিলে সে যজ্ঞ নিষ্ফল হইত। (ঐঃ ব্রাঃ, ৮।৫, ২৪, ২৬)।

ঋগ্বেদে (১০।১৬,১০) একস্থানে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ ব্যব-হৃত হইয়াছে—ইহা দৈনিক পিতৃতর্পণাদি ছাড়া আর কিছুই নহে। বাজসনেয় সংহিতায় (১৯।৩৬,৩৭) পিতৃন্ শব্দের সহিত "স্বধা" (অর্থাৎ খাদ্য) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-মহেরও উল্লেখ প্রথম দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে (৯।২।৭) যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম পিতৃলোকের উল্লেখ করেন। ঋগ্বেদের একস্থানে সোমই পরকালের সুখদাতা—সোমই সুখকর—বলিয়া বর্ণিত আছে। এইরূপে চন্দ্রলোকে পিতৃলোক কল্পিত হইয়াছে। গোতম (১৫) ও আপস্তম্বের মতে (প্রশ্ন ২) তিন ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা পিণ্ডাধিকারী, মনুর মতে ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ পিণ্ডাধিকারী। তদূর্দ্ধতন সাতপুরুষ

পিণ্ডদাতৃত্বই, আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিবাহের ভিত্তি বা আদি কারণ—এক কথায় মূল বলিয়া অনুমিত হয়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনং"—এই শাস্ত্রোক্তিই এই মতের প্রমাণ। 'Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞের দুইটী stage বা স্তর দেখা যায়। প্রথম স্তরে স্ত্রীলোকের সাধ্বী-সতীত্ব সম্বন্ধে আর্য্যদিগের মত অত্যন্ত Crude বা অসংস্কৃত ছিল। এই কালেই 'ক্ষেত্রজ' 'সহোঢ়জ' 'কানীন' প্রভৃতি উপ-পুত্রের ছড়াছড়ি—মহাভারতের কোন কোন প্রধান নায়ক ক্ষেত্রজ বা কানীন পুত্র। Ancestor-worship এর দ্বিতীয় stage বা স্তরে উপ-পুত্র, উপপত্নী, উপ-বিবাহ ইত্যাদি তিরোহিত হইল এবং ব্রাহ্মাসুর বিবাহ ও দত্তকৌরস পুত্র একমাত্র রহিল।

Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধই যে আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিবাহের মূল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন বৈদেশিক শাস্ত্রে পাগল ও নপুংসকের বিবাহের কথা নাই। অথচ মনুর মতে নপুংসক, ক্লীব ও পাগলের বিবাহের কোন শাস্ত্রবাধা নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রবিধি আছে (মনু ৯।২০১,২০৩)। পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ হইলে 'দেবরেণ সুতোৎপত্তি'-কার্য্য চলিতে পারে। 'দেবর' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'দ্বিতীয় বর'। 'মিত্বর' বা 'মিত্রবর' এই পূর্ব্ব প্রথার স্মারক, বা অনুকরণ বা রূপান্তরমাত্র। পুত্রাভাবরূপ "আপদি"—আপদকালে-দেবরই মিত্র হইতেন অর্থাৎ নিয়োগ বিধানে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া মিত্রের ন্যায় ভ্রাতার ঐহিক ও পারলৌকিক উপকার সাধন করিতেন। দেবর অভাবে সপিণ্ডেরাই সুতোৎপত্তির নিমিত্ত নিযুক্ত হইত।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রে বিধি আছে, কিন্তু পতি স্বয়ং রতিশক্তিহীন হইলে নিয়োগরূপ প্রথার দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে অন্য কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনের বাধা ছিল না। এইরূপে একাদশ সংখ্যক ক্ষেত্রজ পুত্র এক বা একাধিক পুরুষদ্বারা উৎপাদন করিবারও শাস্ত্রবিধি ছিল—উপপত্নীত্ব (concubinage) বা বহুপুরুষ সহবাস (promiscuity) ছাড়া ইহা আর কি হইতে পারে? পাছে পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ পায় তজ্জন্য 'overinsurance' করা চাই, অর্থাৎ "যেন তেন প্রকারেণ" পুত্রোৎপাদন বা পুত্রসংগ্রহ করা দরকার—এই কারণে ত্রয়োদশ বা তদধিক পুত্রেরও উল্লেখ দেখা যায় যথা, "কানীন" (কর্ণ), ক্ষেত্রজ (পঞ্চপাণ্ডব) ইত্যাদি।

পিতৃগণ "অসপিণ্ড" বা পরহস্তপ্রদত্ত পিণ্ডোদক গ্রহণ করেন না, তাই কোনরকমে তাঁহাদিগকে ভুলাইবার জন্য 'আসল' পুত্রের অভাবে 'নকল' পুত্রের প্রয়োজন। রক্তের সহিত সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক পিতাপুত্র সম্বন্ধ হইলেই হইল। দত্তক পুত্র অপেক্ষা ক্ষেত্রজ পুত্র শ্রেষ্ঠ—ক্ষেত্রজ পুত্রের সমধিক আদর ছিল; কেননা ক্ষেত্রজ পুত্র নিয়োগকর্ত্তার "ক্ষেত্রে" অর্থাৎ ভার্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হইত। দত্তকপুত্র একটা fiction বা কল্পনামাত্র, নিয়োগকর্ত্তার স্ত্রীর সহিত তাদৃশ পুত্রের রক্তমাংসের যোগ নাই। এই কারণে উপপুত্রের অর্থাৎ নকল পুত্রের তালিকায় দত্তকপুত্রের স্থান ক্ষেত্রজ পুত্রের নীচে দৃষ্ট হয়।

নিয়োগবিধি লঙ্ঘন করিয়া যে পর-"ক্ষেত্রে" পুত্রোৎপাদন করে সে "দিধিষু-পতি" নামে অভিহিত হইত। নিয়োগ প্রথা কালক্রমে বিধবা বিবাহে পরিণত হইল। উদাহরণ—বালীর মৃত্যুর পর তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব ভ্রাতৃজায়া তারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন,রামায়ণে আছে—এইরূপ দেবর-ভ্রাতৃজায়া-বিবাহ ইংরাজীতে Levirite নামে আখ্যাত (মনু ৯। ৬৯, ৭০)। ঈদৃশ বিধবা বিবাহ তৎকালে দোষজনক ছিল না। পতি মরিলে পতির সঙ্গে সঙ্গে 'জায়াত্ব' অর্থাৎ 'জনি'-ত্বের শেষ হয়। ঋগ্বেদে একস্থানে দেবর ভ্রাতৃজায়ার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে আহবান করিতেছে—"হে প্রেতপত্নী! যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া সর্ব্ব কার্য্য শেষ করিয়াছেন। তোমার জায়াত্বও শেষ হইয়াছে। তুমি আমার

সমালোচক। কিন্তু মনু মাতৃপক্ষের পূর্ব্বপুরুষের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। মিতাক্ষর স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য (১২৪১) প্রথম মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগকে পিণ্ডপ্রাপ্তির অধিকারী করিলেন। ঋগ্বেদে অধস্তন পুরুষেরা উর্দ্ধতন পুরুষ কর্ত্তৃক (অর্থাৎ ancestors কর্ত্তৃক) উপকৃত হইতেন; আধুনিক শাস্ত্রে ইহার বিপরীত অর্থাৎ অধস্তন পুরুষেরা উর্দ্ধতন পুরুষদিগের স্বর্গের সিঁড়িস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সহিত এস। * সম্ভবত নিয়োগ যুগের স্মৃতি স্বরূপ এখনও বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছোট ভাই "ভার্য্যা" বা "ভাজ" বলিয়া থাকে।

সপিণ্ডের নিয়োগ বিধান দ্বারা সপিণ্ডেরই "ক্ষেত্রে" সুতোৎপত্তি করিবার অধিকার ছিল। ক্রমে ক্রমে এইরূপে বিধবা বিবাহের সূত্রপাত হইল। পর-বর্ত্তীকালে শ্রাদ্ধের উৎকর্ম সাধন হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহ স্থগিত হইল। কারণ স্ত্রী স্বামীর "অর্দ্ধাঙ্গী"। স্বামীর মরণান্তর স্বামীর পারলৌকিক সুখের জন্য বিধবা স্ত্রীর যাবজ্জীবন পিণ্ডোদকদান করা প্রয়োজন। "একবার কদলী বৃক্ষ ফলধারণ করে, একবারই স্ত্রীলোকের সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ হয়",—কালক্রমে এইরূপ কঠোর বিধি হইল। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গী—অর্দ্ধাঙ্গীর পুনর্বিবাহ ধর্ম্মচক্ষে polyandry বা একাধিক-পুরুষগ্রহণ প্রথা-স্বরূপ গৃহীত হইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসাদি উপবিবাহ ও পৌনর্ভব ক্ষেত্রজাদি উপ-পুত্র সকল তিরোহিত হইল। আজ কাল একমাত্র মিশ্রিত আসুর-ব্রাহ্মবিবাহ প্রশস্ত এবং একমাত্র ঔরস ও দত্তক পুত্রই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার যোগ্য বা অধিকারী। সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডারও বিবাহ নিষিদ্ধ, কেন না সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডার রক্তের সংযোগ আছে। এইরূপ বিবাহ incest স্বরূপ বা পাপ বিবাহ। এই রকম বিবাহে "পিণ্ডসংমিশ্রনের" ভয় আছে—"উদোর" পিণ্ড "বুদোর" মুখে পড়িতে পারে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনং। এই কারণেই "গার্হস্থ্যধর্ম্ম" সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রেতে আদৃত।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—অতএব স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। তাই স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পতির অন্য স্ত্রী গ্রহণের শাস্ত্রাদেশ আছে। 'বন্ধ্যা' অর্থে একেবারে বন্ধ্যা বা barron নহে—কেবল মাত্র কন্যা-প্রসবিনীও 'বন্ধ্যা'বাচ্য।

স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে সে স্ত্রীও পরিত্যজ্যা—ব্যভিচারিণী বলিয়া নহে (নিয়োগযুগে সতীত্ব ডুম্বুর ফুলসদৃশ অদৃশ্য ছিল)—ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ঔরসজাত বা জারজ এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ তাদৃশ স্ত্রী পরিত্যজ্য। ঔরসজাত না হইলে সে পুত্রের পিণ্ডোদক দানের অধিকার নাই অর্থাৎ পিণ্ডোদক দান করিলেও পিতৃগণ তদ্প্রদত্ত পিণ্ডোদক গ্রহণ করিবেন না। সপিণ্ডই সপিণ্ডের পিণ্ড দিতে পারে।

ভ্রাতৃহীন কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, কেননা তাহার গর্ভজাত পুত্র, কন্যার পিতারই শ্রাদ্ধাদির কার্য্যে লাগিত; জন্মদাতার পিণ্ডোদকক্রিয়ায় নিযুক্ত হইত না। অতএব ধনী হইলেও ভ্রাতৃহীন কন্যার বিবাহ করা না করা একই—বিবাহের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। এইরূপ কন্যাকে 'যমজায়া' বলিত কেননা তাহাকে আমরণ অনূঢ়া থাকিতে হইত।

অজ্ঞাতকুলশীলা কন্যার বিবাহও নিষিদ্ধ—সবর্ণা কি অসবর্ণা, সগোত্রা কি অসগোত্রা না জানা থাকিলে তদগর্ভজাত পুত্র সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। সত্য সত্যই অবিবাহ্যা হইলে সেরূপ কন্যার গর্ভজাত পুত্র সঙ্কর পুত্র হইবে। 'সঙ্কর' পুত্র পিণ্ডোদক দানের অধিকারী নহে। সঙ্কর পুত্র হইলে পিণ্ডোদক লোপ হইবে, অর্জ্জুন এই ভয়ে ভারত যুদ্ধের প্রারম্ভেই স্বজন বিনাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। পুরুষেরাই যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পুরুষেরা মরিলে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম হয়, এবং তৎকারণবশত স্ত্রীরা বর্ণাবর্ণবিচার না করিয়া বিবাহ করে বা ব্যভিচারিণী হয় বা হইতে পারে। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"—স্বস্ব পতি বা পালক বা তত্ত্বাবধারক অভাবে ইহাদিগকে কোন না কোন পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। স্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হইলে সঙ্কর জাতির উৎপন্ন হয়। সঙ্কর বা জারজ পুত্র পিণ্ডোদক দানের অনধিকারী। *

---

* মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রমহিষী শৈব্যা রোহিতাশ্ব নামক পুত্র প্রসব করিয়া "জায়াত্ব" নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন—"হে রাজন্! আমার গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে। সাধুগণ পুত্রের নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইবেন তাহাই ব্রাহ্মণকে (অর্থাৎ বিশ্বামিত্র ঋষিকে) দক্ষিণা দান করুন।"

"রাজন্ জাতস্পত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তৎ মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম॥

* "পুনর্জন্ম" ও "শ্রাদ্ধ" theory পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে কুলনাশ হয়। কুলনাশে পিণ্ডোদক যাগযজ্ঞাদি লোপ হয়। পিণ্ডোদক লোপ হইলে পিতৃগণ স্বর্গভ্রষ্ট হন এবং যাগযজ্ঞাদি লোপ হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণের সোমরস হব্যাদি বন্ধ হইয়া যায়। যজ্ঞ না করিলে দেবতারা জলবর্ষণ করিবেন না। দেবতারা জলবর্ষণ না করিলে শস্য উৎপন্ন হইবে না শস্য উৎপন্ন না হইলে সৃষ্টি নাশ হইবে, (গীতা ৩।১৪) অতএব "পুত্রং দেহি পুত্রং দেহি ন কুর্য্যাৎ যুদ্ধবিগ্রহং" * অর্জ্জুন এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারত যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সঙ্কর পুত্রের ভয়ে adultery বা অভিমর্ষণতার শাস্তি পুরাকালে অতি শক্ত ছিল—স্ত্রীকে কুকুর দিয়া খাওয়াইত। স্ত্রী উচ্চ বর্ণের হইলে ব্যভিচার-দোষী পুরুষের শাস্তি গুরুতর হইত। রক্ষিতা ও অরক্ষিতা হইলে শাস্তি-রও কিঞ্চিৎ তারতম্য হইত। এই কারণে গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর উপর বিশেষ "নজর" রাখিতে বলিয়াছেন। বোধ হয় পর্দ্দা system বা প্রথার সৃষ্টি ইহা হইতে। মনু বলেন—

"He who preserves his wife from *vice*, preserves his offspring from *suspicion of bastardy*, his ancient usages from *neglect*, his family from *disgrace*, himself from *anguish*, and his duty from *violation*.†

দৈব পৈত্রাদি ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্মমাত্রই পিতা এই ত্রিঋণ হইতে মুক্ত হন, অতএব জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃধনের একমাত্র অধিকারী। তিনিই প্রকৃত "ধর্ম্মজ" পুত্র। অন্য পুত্র "কামজ" এই মন্বাদি শাস্ত্র-কারদিগের মত। এই কারণে জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা পূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রচলিত হয়। গৌতম ও মনুর মতে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইলে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও multiplied বা একাধিকবার হয় এবং "ধর্ম্মবিভাগ" অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মকর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। ইহাকে "Partition theory" কহে। কতকটা এই কারণে, কতকটা বহুবিবাহ থাকাতে, জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথার লোপ হইল এবং সকল পুত্রগণ পিতৃধনের সমান অধিকারী হইল।

কালক্রমে আর্য্যবিবাহ একটী জটিল শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। একদিকে "বহির্বিবাহিক" (Exogamy) অর্থাৎ "অ-সগোত্রে", অপরদিকে "অন্তর্বিবাহিক" (Endogamy) অর্থাৎ "স-বর্ণে" বিবাহ প্রচলিত হইল। শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিণ্ডের সহিত দাতৃত্বসম্বন্ধ, অতএব শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদূর্দ্ধতন ছয় পুরুষ পরস্পর সপিণ্ড। এই সাতজন ও ইহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধই সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ। সপিণ্ডের সহিত সপিণ্ডার বিবাহ নিষিদ্ধ। সমানপ্রবরের সহিত সমানপ্রবরারও বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

তাহা ছাড়া সামুদ্রিক শাস্ত্রেরও উল্লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। অশ্বাদি ক্রয় করিবার সময় অশ্বের শুভা-শুভ চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। পাত্রী নির্ব্বাচন কার্য্যে সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্যে পাত্রীর শুভাশুভ চিহ্ন বা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যে রমণীর করতলে শঙ্খ পদ্ম মৎস্যাদি চিহ্ন থাকে সে নারী সৌভাগ্যবতী, যে রমণীর পদতলে রেখা থাকে সে রাজরাণীসদৃশ। এই সব লক্ষণাক্রান্ত কন্যা বিবাহ করিলে পতি ভাগ্যবান হইবে। 'খড়মপেয়ে, চিরুণদাঁতী, বেরাল চোখো' প্রভৃতি কন্যা অবিবাহ্যা (মনু ৩।৮)। 'পটল চোখো' মেয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে বা উপশাস্ত্রে কোন বিধান নাই! গঙ্গা যমুনা বা লতাপাতার নাম থাকিলেও তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করা অনুচিত। এই গেল সামুদ্রিক পীড়ন; ইহার উপর

উদাহরণ (১) 'ক' মরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিল: এদিকে 'ক'র পুত্র পৌত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল। এ শ্রাদ্ধ বৃথা।

উদাহরণ (২) খ একটী বিবাহিতা স্ত্রী, ১৫ বৎসরে মরিয়া গেল। স্বামী পরলোকে মৃতা স্ত্রীর সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন না। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুনর্জ্জন্ম করিয়া বিবাহ করিয়া ঘর-কন্না করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যং অতঃপরং। চার্ব্বাকপ্রমুখ Epicurean সম্প্রদায়িক ঋষিরা "মরা গরু ঘাস খায়না" এই প্রবচন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন।

"মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারকং।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাং"

"শ্রাদ্ধ যদি মৃত জন্তুর তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে, তাহা হইলে তৈল দানে নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা কেন জ্বলিয়া উঠে না?"

* মহাভারতে আছে জরৎকারু ঋষি অগৃহীতদার থাকায় তাঁহার যাযাবরাখ্য পিতৃপুরুষগণ "পুন্নামনরকমুখী" হইয়া ঊর্দ্ধপদে লম্বমান ছিলেন।

† Manu-Ch. IX.

আবার জ্যোতিষেরও উপদ্রব আছে। নরগণ কি রাক্ষসগণ দেখিতে হইবে—"মৃত্যুর্মানুষরাক্ষসে" অর্থাৎ নররাক্ষসে বিবাহ হইলে বাঘও ছাগের সদৃশ হইবে। লগ্নও ঠিক থাকা চাই, লগ্ন পার হইলে বিবাহ না-মঞ্জুর *। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ছিলেন। যাতে লীলাবতীর বিবাহ শুভলগ্নে হয় সেই জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ভাস্করাচার্য্য বরকন্যার নিকট স্বনির্ম্মিত একটী Hour cup বা "হোরাপাত্র" লগ্ন নির্ণয়ার্থে জলাধারের উপর স্থাপন করিলেন। Hour cup বা হোরাপাত্রের নিম্নে একটী ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্র দিয়া হোরাপাত্রে বিন্দু বিন্দু জল প্রবেশ করিতেছিল। এইরূপে যখন পাত্রটী জলপূর্ণ হইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে, তখনই বিবাহের শুভলগ্ন বুঝিতে হইবে। লীলাবতী কৌতূহলবশত ঝুঁকিয়া হোরাপাত্রের ভিতর জল প্রবেশ দেখিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার কর্ণমূলের ফুল হইতে একটী ক্ষুদ্র মুক্তা খসিয়া পাত্রাভ্যন্তরে পতিত হইল ও ছিদ্রমধ্যে আবদ্ধ হইল। হোরাপাত্র মধ্যে জলপ্রবেশ বন্ধ হইয়া গেলে, হোরাপাত্র ভাসিতেই লাগিল। অনেক সময় গত হইলেও যখন হোরাপাত্র জলপূর্ণ হইল না, ভাস্করাচার্য্য দেখিলেন ছিদ্রটী একটী মুক্তার দ্বারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুভলগ্ন অতিবাহিত হইয়া গেল, লীলাবতীর আর বিবাহ হইল না। ভাস্করাচার্য্য তখন লীলাবতীকে বলিলেন "লীলাবতি! তুমি অদৃষ্টদোষে দাম্পত্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইলে কিন্তু আমি তোমার নামে একটী পুস্তক রচনা করিয়া তোমার নাম জগতে জাজ্বল্যমান রাখিব।" তিনি তাঁহার কথানুযায়ী "লীলাবতী" নামক অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রোপশাস্ত্ররূপ 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়াও "বাঁশবনে ডোম কানা" সম বিশ কোটী হিন্দুর পক্ষে পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনকার্য্য অতি দুষ্কর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে বঙ্গ-কুলীনেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুবালিকাকে 'tray' বা থালায় বসাইয়া গঙ্গাযাত্রী 'বরের' সহিত 'বিবাহ' দিয়া তাহার "আইবড়ত্ব" ঘুচাইত। বেদে একটী বিবাহ মন্ত্র আছে—

"Who gave her? To whom he gave her? Love gave her. Love gave her to love. হায়! হিন্দু বিবাহে "Hymen is seldom attended at the nuptial ceremony by Cupid.

(ক্রমশঃ)

* শুভলগ্নে বিবাহ হইলেও দাম্পত্যসুখ নাও হইতে পারে। উদাহরণ—সীতা "সদাগৃহ্ণে শুভগ্রহে বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঽপি জানকী-দুঃখভাজনম্।" গরুড়-পুরাণম্।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

পঞ্চম প্রকরণ।

সুখদুঃখবিবেক।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।*

গীতা ৬, ২১।

সুখ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে, কিংবা প্রাপ্ত সুখের কিরূপে বৃদ্ধি হইবে এবং কিসে দুঃখ নিবারণ হইবে কিংবা দুঃখের লাঘব হইবে, এই জন্য প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে সদাই চেষ্টা করিয়া থাকে; এই সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রকারদিগেরও অভিমত। "ইহ খলু অমুষ্মিংশ্চ লোকে বস্তুপ্রবৃত্তয়ঃ সুখার্থমভিধীয়ন্তে। ন হ্যতঃপরং ত্রিবর্গফলং বিশিষ্টতরমস্তি।" ইহলোকে কিংবা পরলোকে, সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত; ইহার ওদিকে ধর্ম্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, এইরূপ শান্তিপর্ব্বে ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিয়াছেন (সভা. শা. ১৯০.৮)। কিন্তু আমাদের প্রকৃত সুখ কিসে হয় ইহা না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বাঁধিয়া তাহাই খাঁটি মনে করিয়া, কিংবা, আজ না হয় কাল সুখ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, মনুষ্য যখন জীবনের দিন কাটাইতে থাকে, সেই সময় তাহার উপর মৃত্যু অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেও, সে সাবধান না হইয়া পুনর্ব্বার তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই ভাবে এই ভবচক্র চলিতে থাকায়, প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, সে ইহার কিছুই

* "যাহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় তাহাই আত্যন্তিক সুখ"।

বিচার করে না—শাস্ত্রকারেরা এইরূপ বলেন। সংসার কেবল দুঃখময়, কিংবা সুখপ্রধান বা দুঃখ-প্রধান, এই সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের মধ্যে খুবই মতভেদ আছে। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কোন পক্ষ গ্রহণ করিলেও, প্রত্যেক মনুষ্য আপন দুঃখের অত্যন্ত নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখ লাভের উপায় করায় তাহার কল্যাণ আছে, এসম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই।

'সুখ' এই শব্দেব পরিবর্ত্তে প্রায় 'হিত', কিংবা 'কল্যাণ' এই শব্দ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। তথাপি, 'সুখ' শব্দের ভিতর সর্ব্বপ্রকারের সুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, সাধারণত সুখের নিমিত্ত প্রত্যেকের প্রযত্ন হইয়া থাকে,—এই মত সকলেরই গ্রাহ্য, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার মূলে "যদিষ্টং তৎসুখং প্রাহুঃ দ্বেষ্যং দুঃখ-মিহেষ্যতে"—আপনার যাহা কিছু ইষ্ট তাহাই সুখ এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা চাহি না তাহাই দুঃখ—এইরূপ সুখ দুঃখের যে লক্ষণ মহাভারতের অন্তর্গত পরাশর গীতায় বিবৃত হইয়াছে (সভা, শাং, ২৯৫—২৭,) শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ ইষ্ট বস্তু কিংবা পদার্থ এইরূপ হইলেও হইতে পারে; এবং এই-রূপ অর্থ ধরিলে, ইষ্ট পদার্থকেও সুখ বলিবার প্রসঙ্গ পাওয়া যাইবে। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, 'জল' এই বাহ্য পদার্থকে 'সুখ' নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা মানুষ সুখে ডুবিয়াছে এইরূপ বলিতে হয়! জল পানে যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় তাহাই সুখ। মনুষ্য এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করে সত্য; কিন্তু তাহার জন্য মানুষ যাহা চাহে তাহা সমস্ত সুখই হইবে এইরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। তাই, নৈয়ায়িকেরা "অনুকূল-বেদনীয়ং সুখং" যে বেদনা আমাদের অনু-কূল তাহাই সুখ এবং "প্রতিকূল-বেদনীয়ং দুঃখং"—যে বেদনা আমাদের প্রতিকূল তাহাই দুঃখ, এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়া সুখ ও দুঃখ ইহা একপ্রকার বেদনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং কেবল অনুভবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা সুখদুঃখের কোন সুন্দরতর লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। এই বেদনারূপ সুখদুঃখ, কেবল মনুষ্যের ব্যাপারাদিতেই সমুদ্ভূত হয় এরূপ নহে। কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্তও, কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া সেই রোগে মনুষ্যকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই, বেদান্তগ্রন্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যা-ত্মিক—সুখদুঃখের এই তিন ভেদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে যে সুখদুঃখ অনুভূত হয় তাহাকে "আধিভৌতিক" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়; বাহ্য জগতের মধ্যে, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতাত্মক পদার্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া শীতোষ্ণাদিমূলক যে সুখদুঃখ হয় তাহাকে "আধিভৌতিক" এই নাম দেওয়া হয়; এবং এই প্রকারের বাহ্য সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত সুখদুঃখ "আধ্যাত্মিক" নামে অভি-হিত হয়। সুখদুঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে শরীরান্তর্ভূত বাতপিত্তাদি দোষের পরি-মাণ বিগড়াইয়া গিয়া যে জ্বরাদি দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং সেই পরিমাণ ঠিক্ থাকিলে শরীরপ্রকৃতির যে স্বাস্থ্য উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যাত্মিক সুখদুঃখের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ, এই সুখদুঃখ পঞ্চ-ভূতাত্মা শরীরান্তর্ভূত হইলেও অর্থাৎ শারীর হই-লেও, শরীরের বাহিরের পদার্থসংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, সব সময়ে এইরূপ বলা যাইতে পারে না; এবং সেই জন্য, বেদান্তদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখেরও কায়িক ও মানসিক এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা পুনর্ব্বার আবশ্যক হয়। কিন্তু সুখ দুঃখাদির কায়িক ও মানসিক এইরূপ ভেদ করিলেও, আধিদৈবিক সুখদুঃখ স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ, দেবতার প্রসাদে কিংবা কোপে সমুৎপন্ন সুখ দুঃখও, নিজের শরীরে কিংবা মনে মনুষ্যকে ভোগ করিতে হয়, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। তাই বেদান্তগ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে সুখদুঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়া উহাদের বাহ্য কিংবা কায়িক, এবং আভ্যন্তর কিংবা মানসিক এইরূপ দুই বর্গই কল্পনা করিয়া, প্রথম অর্থাৎ সর্ব্ব-

প্রকার কায়িক সুখদুঃখকে "আধিভৌতিক" এবং সমস্ত মানসিক সুখদুঃখকে "আধ্যাত্মিক" এই নামে আমি আমার গ্রন্থে অভিহিত করিয়াছি। বেদান্ত গ্রন্থের পরিভাষা অনুসারে 'আধিদৈবিক' বলিয়া স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাই। কারণ, আমার মতে সুখদুঃখের শাস্ত্রীয় বিচার করিবার পক্ষে এই ত্রিবিধ বর্গীকরণই অপেক্ষাকৃত অধিক সহজ। সুখদুঃখের পরবর্ত্তী বিচার পড়িবার সময়, বেদান্তগ্রন্থের পরিভাষা ও আমার পরিভাষার ভেদ সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক।

সুখদুঃখ দ্বিবিধই স্বীকার কর, বা ত্রিবিধই স্বীকার কর, তন্মধ্যে দুঃখ কেহই চাহে না। তাই, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং আত্যন্তিক ও নিত্য সুখ অর্জ্জন করা ইহাই মনুষ্যের পুরুষার্থ, এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১ ; গী, ৬—২১, ২২)। এইরূপ আত্যন্তিক সুখই পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ করা সাধ্যায়ত্ত কি না, সাধ্যায়ত্ত হইলে কিরূপে ও কখন্ লাভ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের বিচার সহজভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং এই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এইরূপ প্রশ্ন উঠে যে, নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণ অনুসারে সুখ ও দুঃখ এই দুই বিভিন্ন স্বতন্ত্র বেদনা, অনুভূতি কিম্বা বস্তু, অথবা "আলোক, না হইলেই অন্ধকার" এই ন্যায়সূত্র অনুসারে এই দুই বেদনার মধ্যে একের অভাবই কি দ্বিতীয়ের সংজ্ঞা? "তৃষ্ণায় ঠোঁট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ নিবারণার্থ আমরা মিঠা জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, সুগ্রাস অন্ন খাইয়া সেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসনা প্রদীপ্ত হইয়া দুঃসহ হইলে স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা তাহা তৃপ্ত করি" এই কথা বলিয়া ভর্ত্তৃহরি শেষে এইরূপ বলিতেছেন—

"প্রতীকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ।"

অর্থাৎ—কাহারও ব্যাধি বা দুঃখ হইলে, তাহার নিবারণই সুখ, লোকে ভ্রমক্রমে এইরূপ বলিয়া থাকে! দুঃখনিবারণ ছাড়া সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। মনুষ্য স্বার্থের জন্য যে ব্যবহার করে তাহার প্রতিই এই ন্যায় প্রয়োগ হয় এরূপ নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার দুঃখ দেখিয়া আমাদের অন্তরে জাগৃত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইতে থাকে এবং সেই দুঃসহত্বের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আমরা পরোপকার করি,—এইরূপ আনন্দগিরির মত পূর্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার করিলে মহাভারতের একস্থানে—

"তৃষ্ণার্ত্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্ত্তিপ্রভবং সুখং।"

অর্থাৎ—কাহারও তৃষ্ণা প্রথমে উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্ণার পীড়া হইতে দুঃখ এবং সেই দুঃখের পীড়া হইতে পরে সুখ উদ্ভূত হয়—এইরূপ যে সুখ-দুঃখের বর্ণনা আছে, তাহাই যথার্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে (শাং, ২৫। ২২ ; ১৭৪। ১৯)। সার কথা, মনুষ্যের মনে প্রথমত কোন আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, উক্ত দুঃখের নিবারণই সুখ ; সুখ বলিয়া স্বতন্ত্র পৃথক বস্তু নাই, এই মার্গের এইরূপ উক্তি। অধিক কি, মনুষ্যের সাংসারিক সমস্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক বা তৃষ্ণাত্মক হওয়া প্রযুক্তই সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মের ত্যাগ ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না ; তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না, এইরূপ, ইহার পূর্ব্বে, অন্য সিদ্ধান্তও এই মার্গের লোকেরা বাহির করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে বিকল্পভাবে (বৃ, ৪। ৪। ২২ ; বেসূ, ৩। ৪। ১৫,) এবং জাবাল সন্ন্যাসাদি উপনিষদে মুখ্যভাবে এই মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এবং অষ্টাবক্র গীতাতে (৯। ৮ ; ১০। ৩-৮) ও অবধূত গীতাতে (৩। ৪৬) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখ কিংবা মোক্ষ লাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে যত শীঘ্র হয় সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করা আবশ্যক—ইহাই এই মার্গের চরম সিদ্ধান্ত ; এবং স্মৃতি গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিযুগে স্থাপিত শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গ এই তত্ত্বের উপরেই ভর করিয়া বাহির হইয়াছে। স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সুখ বলিয়া যদি কোন বাস্তবিক পদার্থ না থাকে, যাহা কিছু আছে তাহা দুঃখ এবং তাহাই তৃষ্ণামূলক, তাহা হইলে এই তৃষ্ণাদিরই বিকার প্রথমত সমূলে উৎপাটিত করিয়া

ফেলিলে, স্বার্থের কিংবা পরার্থের সমস্ত কচ্‌কচি বিলুপ্ত হওয়ায় মনের মূল সাম্যাবস্থা কিংবা শান্তিই শুধু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; এবং এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত পিঙ্গল গীতায় ও সেইরূপ মঙ্কিগীতাতেও

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥

অর্থাৎ "ইহলোকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃপ্তিতে যে সুখ হয় সেই সুখ, এবং স্বর্গের যে মহৎ সুখ— এই দুই সুখের যোগ্যতা, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের যোল কলা পরিমাণেরও সমান নহে" এইরূপ কথিত হইয়াছে (শাং, ১৭৪। ৪৮; ১৭৭। ৪৯)। পরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে বৈদিক সন্ন্যাস মার্গের অনুকরণ করা হইয়াছে। তাই, এই দুই ধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে উপরি উক্ত বচনের অনুরূপ তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ও ত্যাজ্যতা—আরও একটু সরস করিয়া—বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ ধম্মপদের অন্তর্ভূত তৃষ্ণাবর্গ দেখ)। তিব্বত দেশস্থ বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে উপরি উক্ত মহাভারতের শ্লোকও, গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর, তাঁহারই মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। *

উপরি-উক্ত তৃষ্ণার দুষ্পরিণাম ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হয় নাই এরূপ নহে। তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত হওয়ায়, উক্ত সুখদুঃখের উপপত্তি সম্বন্ধে একটু সূক্ষ্ম বিচার করা আবশ্যক। সমস্ত সুখ, তৃষ্ণাদি দুঃখের নিবারণ হইতে উৎপন্ন হয় এই সন্ন্যাস মার্গের উক্তিও প্রথমে সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কোন অনুভূত (দেখা শোনা প্রভৃতি) বস্তু পুনর্ব্বার অনুভব করিতে চাহিলে, এইরূপ মনে করাকে 'কাম', 'বাসনা' বা 'ইচ্ছা' বলা হইয়া থাকে; এবং ঈপ্সিত বস্তু শীঘ্র না পাইবার দরুণ দুঃখ হইয়া, এই ইচ্ছা আরও তীব্র হইতে থাকে, কিংবা প্রাপ্ত সুখ পূর্ণ মাত্রায় না হওয়ায়, উত্তরোত্তর উহা যেন আরও অধিক হয় এইরূপ মনে হইলে সেই ইচ্ছাই এই নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেবল ইচ্ছা এইরূপে তৃষ্ণার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যদি সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় তবে তজ্জনিত সুখ তৃষ্ণাদুঃখের ক্ষয় হইতে হইয়াছে এইরূপ বলিতে পারা যায় না। উদাহরণ যথা—প্রতিদিনের আহার সময়মত প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে দুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের অনুভব নহে। সময় মত আহার না মিলিলে, প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ হইবে না। ভাল; তৃষ্ণা ও ইচ্ছায় এরূপ ভেদ না করিয়া দুই-ই সমানার্থক এইরূপ স্বীকার করিলেও সমস্ত সুখ তৃষ্ণামূলকই এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় না। উদাহরণ যথা—এক ছোট ছেলের মুখে অকস্মাৎ মিছ্‌রির এক টুক্‌রো আসিলে, তাহা হইতে তাহার যে সুখ হয় সে সুখ পূর্ব্ব-তৃষ্ণার ক্ষয়প্রযুক্ত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না। সেইরূপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীয় উদ্যান হইতে কোকিলের মধুর ডাক কানে আসিলে, তৎপ্রযুক্ত যে সুখ হয় সেই সুখ, প্রথমে উক্ত বস্তু প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা উৎপন্ন না হইলেও, আমাদের মনে অনুভূত হইয়া থাকে। এই উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে এইরূপ বলিতে হয় যে,—সন্ন্যাস মার্গের অন্তর্ভূত সুখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভাল মন্দ পদার্থের উপভোগ করিবার স্বাভাবিক যে শক্তি আছে তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন ব্যাপার সম্পাদন করিবার সময়, কোন সময়ে তাহাদের অনুকূল ও কোন সময়ে তাহাদের প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া গোড়ায় তৃষ্ণা বা ইচ্ছা না থাকিলেও, আমাদের সুখ দুঃখ হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হয়। এই অভিপ্রায়েই, "মাত্রাস্পর্শের" দ্বারা শীতোষ্ণাদির অনুভব ঘটিয়া সুখদুঃখ হয়, এইরূপ গীতাতে কথিত হইয়াছে (গী, ২। ১৪)। সৃষ্টির অন্তর্গত বাহ্য পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে—মাত্রা। ইন্দ্রিয়াদির সহিত এই বাহ্য পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হইলে সুখ কিংবা দুঃখ রূপ বেদনা উৎপন্ন হয়, এইরূপ ইহার অর্থ। এবং উহা কর্ম্মযোগশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত। কর্কশ আওয়াজ

---

* Rockhill's Life of Budha, P. 33.—উদান নামক পালী গ্রন্থে (২।২) এই শ্লোকটি আছে। কিন্তু উহা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সময়, বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে—এইরূপ বর্ণনা নাই। অতএব এই শ্লোক আদিবুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হয় নাই এইরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

কেন, অপ্রিয় এবং জিহ্বায় মধুর রস কেন, প্রিয় কিংবা নেত্রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কেন আনন্দদায়ক মনে হয়, ইহার কারণ কেহই বলিতে পারে না। জিহ্বা মধুর রস পাইলে পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। আধিভৌতিক সুখের স্বরূপ, এইরূপে কেবল ইন্দ্রিয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের এইরূপ ব্যাপার চলিতে থাকিলেই সুখ অনুভূত হয় ;—পরে তাহার পরিণাম যাহাই হোক্ না কেন। উদাহরণ যথা—কোন চিন্তা মনে আসিলে মুখ দিয়া কখন কখন যে শব্দ সহজে বাহির হয়, তাহা কিছু কাহাকে জানাইবার জন্য নহে। উল্টা, কত সময় এই সকল স্বাভাবিক ব্যাপারে, মনের গুপ্ত অভিপ্রায় কিংবা মৎলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে। ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন অকারণ যে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় ; তাহার কারণ, চলন ক্রিয়াতেই সেই সময় তাহাদের আমোদ বোধ হয়। তাই, দুঃখেরই অভাব সমস্ত সুখ এইরূপ না বলিয়া, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ" (গী, ৩। ৩৪) ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের শব্দস্পর্শাদি বিষয়—ইহাদের মধ্যে প্রিয় ও দ্বেষ্য এই দুই-ই 'ব্যবস্থিত' অর্থাৎ গোড়াতেই স্বতন্ত্রসিদ্ধ—এইরূপ বলিয়া, এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কল্যাণদায়ক হয় কিংবা কল্যাণলাভে আমাদিগকে সমর্থ করে এইটুকুই আমাদের দেখিতে হইবে এবং সেই জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে চেষ্টা না করিয়া, উক্ত বৃত্তি বরং আমাদের উপকারী হওয়ায় মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অধীনে রাখিবে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না,—এইরূপ ভগবানের উপদেশ। এই উপদেশ এবং তৃষ্ণা কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করা—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জগতের সমস্ত কর্তৃত্ব কিংবা পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে এইরূপ গীতার তাৎপর্য্য নহে ; বরং আঠারো অধ্যায়ে (১৮। ২৬) সমবুদ্ধির সহিত ধৃতি ও উৎসাহ এই গুণ থাকা চাই, এইরূপ গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা পরে করিব। এক্ষণে, সুখ ও দুঃখ এই দুই ভিন্ন বৃত্তি কিংবা তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র, এইটুকুই আমাদের বিবেচ্য। এবং এই বিষয় সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতার অভিপ্রায় কি, তাহা উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। 'ক্ষেত্র' বস্তুট কি ইহা বলিবার সময় সুখ ও দুঃখ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে (গী, ১৩। ৬)। শুধু তাহা নহে, সুখ সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও তৃষ্ণা রজগুণের লক্ষণ এই কথা বলিয়া, সত্ত্ব ও রজের গুণ পৃথক ধরা হইয়াছে ; এই অনুসারেও সুখ ও দুঃখ উভয়ে পরস্পরের উপযোগী কিন্তু দুই পৃথক বৃত্তি,—এইরূপ গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে স্পষ্টই দেখা যায়। আঠারো অধ্যায়ে "কোন কর্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া তাহা ত্যাগ করিলে, ত্যাগের ফল লাভ হয় না, এই ত্যাগ রাজসিক" (গী ১৮। ৮) এইরূপ যে রাজসিক ত্যাগের ন্যূনতা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও—"সমস্ত সুখই তৃষ্ণাক্ষয়-মূলক", এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ।

সমস্ত সুখ তৃষ্ণাক্ষয়রূপ কিংবা দুঃখ-অভাবরূপ নহে এবং সুখ ও দুঃখ এই দুই স্বতন্ত্র বস্তু এইরূপ স্বীকার করিলেও এই দুই বেদনা পরস্পরবিরুদ্ধ কিংবা প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত, যাহার দুঃখের একটুও অনুভব নাই, সে সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে কি না, এইরূপ ইহার পরে আর এক প্রশ্ন আছে। কেহ কেহ বলেন, দুঃখানুভব প্রথমে না হইলে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি করা যায় না। উল্টাপক্ষে, স্বর্গস্থ দেবতাদিগের নিত্য সুখের দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতেরা এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখের পূর্ব্বানুভব অত্যাবশ্যক নহে। লবণাক্ত পদার্থের আস্বাদন ব্যতীত, মধু, গুড়, চিনি আম, কলা ইত্যাদি পদার্থের পৃথক্ মিষ্টত্ব যেরূপ অনুভব করা যায়, সেইরূপ সুখেরও অনেক প্রকার ভেদ আছে ; তুলার গদির পর পালঙ্কের গদি কিংবা পাল্কীর পর তাঞ্জাম—এইরূপ সুখের পর্য্যায়ে বিরক্তি না জন্মিয়া, পূর্ব্বদুঃখানুভব ব্যতীতও সব সময়েই সুখানুভব হওয়া অশক্য নহে। কিন্তু এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্কও নিরর্থক, এইরূপ দেখা যায়। পুরাণে দেবতাদিগেরও সঙ্কটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে, পুণ্যাংশ

চলিয়া গেলে, স্বর্গসুখও কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব স্বর্গসুখের দৃষ্টান্ত উপযোগী নহে ; এবং উপযোগী হইলেও স্বর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী ? "নিত্যমেব সুখং স্বর্গে" এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার পরেই "সুখং দুঃখমিহোভয়ম্" (সভা, শা, ১৮০। ১৪)—এই সংসারে সুখ ও দুঃখ দুই মিশ্রিত হইয়া থাকে—এইরূপ কথিত হইয়াছে ; এই কথা অনুসরণ করিয়াই ইহার সমর্থনেও "জগতে সর্ব্বসুখী কোন্ জন, বিচারিয়া দেখ্‌রে মন।" এইরূপ আমদের অনুভূতি বলিয়াছে। তা ছাড়া—

"সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি"

অর্থাৎ—সুখের দ্বারা সুখ কখন মেলে না ; সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়" (সভা, বন, ২০৩। ৪), এইরূপ যাহা দ্রৌপদী সত্যভামাকে উপদেশ দিয়াছেন ইহা লোকের অনুভূতি অনুসারে সত্য, এইরূপ বলিতে হয়। কারণ জাম ঠোঁটেতে পড়িলেও মুখের ভিতর দিতে হয়, এবং মুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া চিবাইতে হয়। অন্ততঃ এইটুকু নির্ব্বিবাদ যে, দুঃখের পর প্রাপ্ত সুখের মিষ্টতা এবং সব সময়ে বিষয়ভোগে নিমগ্ন ব্যক্তির সুখের মিষ্টতা, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য সুখভোগে সুখানুভব করিবার যে ইন্দ্রিয়শক্তি তাহারও তীব্রতা মন্দীভূত হয়—

"প্রায়েন শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্য্যন্তে দরিদ্রাণাং চ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ—শ্রীমন্তদিগের সুগ্রাস অন্নের সেবনেও প্রায় শক্তি থাকে না এবং দরিদ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া যায়—(সভা, শা, ২৮। ২৯), এই কথা প্রসিদ্ধ আছে। তাই, ইহলোকের বিচার কর্ত্তব্য হইলে, দুঃখ ব্যতীত সুখ সব সময়ে অনুভূত হয়, কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়া বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল নাই। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্" (বন, ২৬০। ৪৮, শা, ২৪। ২৩) সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ লাগিয়াই আছে। কিংবা কালিদাস মেঘদূতে (মে, ১১৪) যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥"

অর্থাৎ—কাহারই নিয়ত সুখ কিংবা নিয়ত দুঃখ, এইরূপ অবস্থা না হওয়ায়, সুখদুঃখের দশা চক্রগতির ন্যায় একবার নীচু, একবার উপর হইয়া থাকে। এই ক্রম সর্ব্বদাই চলিতে থাকে। পরে এই দুঃখ, আমাদের সুখের মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, কিংবা প্রকৃতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ আছে। বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া বিষয়সুখের উপভোগও নিত্য একই প্রকার প্রাপ্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে ; কিন্তু দুঃখ একেবারে বিনষ্ট হইয়া কেবল সুখের নিত্য অনুভূতি, অন্ততঃ এই কর্ম্মভূমিতে সম্ভব নহে।

জগতের ব্যবহার নিছক সুখময় না হইয়া যদি সুখদুঃখাত্মক হয়, তবে সংসারে সুখ অধিক কি দুঃখ অধিক এই তৃতীয় প্রশ্ন পরে যথাক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকে। আধিভৌতিক সুখই পরম সাধ্য এই কথা যাঁহারা মানেন সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কথা বলেন যে সংসারে সুখাপেক্ষা যদি দুঃখই অধিক হয় তবে সংসারের গোলযোগের মধ্যে না থাকিয়া, সকলে না হৌক অনেক লোকেই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যেহেতু মনুষ্য জীবনে বিরক্ত হইয়াছে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব সংসারে দুঃখাপেক্ষা সুখভোগই অধিক হইয়া থাকে ; এবং মনুষ্যও সুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ও এই মাপকাঠিতে করিয়া থাকে। কিন্তু সংসারসুখের সহিত আত্মহত্যার সম্বন্ধটা প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য নহে। কোন প্রসঙ্গে কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এরূপ নহে ; কিন্তু লোকে তাহা অপবাদ বা পাগ্‌লামির মধ্যে গণনা করে। এই সম্বন্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করা, কি না করা—সংসার-সুখের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া, সাধারণ লোকে ইহাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া মনে করে,—এইরূপ দেখা যায় ; এবং সুসভ্য মনুষ্য যে অসভ্য-সমাজকে খুব কষ্টময় বলিয়া মনে করে সেই অসভ্য মনুষ্যসমাজের বিচার করিয়া

দেখিলেও এই অনুমানই নিষ্পন্ন হয়। প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ চার্লস্ ডার্বিন আপন প্রবাস-গ্রন্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যে সব অসভ্য লোক দেখিয়া আসিয়াছিলেন সেই অসভ্য লোকদিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ লিখিতেছেন যে, এই অসভ্য লোক—পুরুষ ও স্ত্রী স্বকীয় অত্যন্ত শীতদেশে বারো মাস বিনা বস্ত্রে বেড়িয়া বেড়ায় এবং নিকটে অন্নের সংগ্রহ না থাকা প্রযুক্ত, কত দিবস তাহাদিগকে বিনা অন্নেই কালাতিপাত করিতে হয়; তথাপি তাহাদের সন্তান সন্ততি বাড়িয়াই চলিয়াছে! * কিন্তু এইরূপ অসভ্য মনুষ্যও প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, ইঁহার এই কথা ধরিয়া, তাহাদের সংসার সুখময়, এইরূপ কেহ অনুমান করে না। তাহারা আত্মহত্যা করে না, একথা ঠিক্; কিন্তু তাহার কারণ কি, সূক্ষ্মবিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, "আমি পশু নহি, আমি মনুষ্য" ইহাতেই প্রত্যেক ব্যক্তি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করে; এবং আর সমস্ত সুখ অপেক্ষা মনুষ্য হওয়ারূপ সুখের পরিমাণ এত বেশী বলিয়া মনে করে যে, সংসার যতই কষ্টময় হোক্ না কেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ আনন্দ হারাইবার জন্য সে কখনই প্রস্তুত থাকে না। মনুষ্য কেন, পশুপক্ষীও আত্মহত্যা করে না। তাই, তাহাদের সংসারও সুখময় হইয়াছে কি? সুতরাং মনুষ্য কিংবা পশুপক্ষী প্রাণ বিসর্জ্জন করে না, এই বলিয়াই তাহাদের সংসার সুখময় এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক্ অচেতনের সচেতনে পরিণত হওয়াতেই অনুপম আনন্দ আছে, এবং তাহাতে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই সত্য সিদ্ধান্তই উহা হইতে বাহির হয়, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

* Darwin's Naturalist's Voyage round the World. Chap XI.

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (যাহার সুসংস্কৃত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্ত্তা এবং কর্ত্তাদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ" এইরূপ, শাস্ত্রে যে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণনা আছে তাহা এইভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে (মনু, ১, ৯৬, ৯৭; সভা, উদ্যো, ৫, ১ ও ২); এবং এই নীতি অনুসারে ৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যে নরদেহ শ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে মুমুক্ষু ও মুমুক্ষুর মধ্যে সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ—এইরূপ প্রাকৃত গ্রন্থাদিতেও কথিত হইয়াছে। "সব্‌সে জীব প্যারা" এই যে চলিত কথা আছে তাহার তাৎপর্য্যই এই; এই কারণেই সংসার দুঃখময় হইলেও, কেহ আত্মহত্যা করিলে, লোকে তাহাকে পাগল ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাকে পাপী বলিয়া মনে করে (সভা, কর্ণ, ৭০, ১৮); এবং আত্মহত্যার চেষ্টা আইনে অপরাধ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। মনুষ্য আত্মহত্যা করে না—এই কথা ধরিয়া, সংসারের সুখময়ত্বের সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, সংসার সুখময় কি দুঃখময় এই প্রশ্নের নির্ণয়ে, পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কোন বিশেষ পদবীতে পতিত নরদেহ প্রাপ্তির নৈসর্গিক ভাগ্য, একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, তদুত্তরকালীন অর্থাৎ সংসার-ঘটিত বিষয়েরই আমাদের এক্ষণে বিচার করা আবশ্যক। মনুষ্য জীবন বিসর্জ্জন করে না, কিংবা জীবন্ত থাকে,—ইহাই সংসার প্রবৃত্তির কারণ; আধিভৌতিক পণ্ডিত বলেন, তদনুসারে সাংসারিক সুখদুঃখের পূর্ণতা হয় না। কিংবা, এই অর্থই অন্য শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইলে, এইরূপ বলিতে হয় যে, প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবার বুদ্ধি নৈসর্গিক,—সাংসারিক সুখদুঃখের তারতম্য হইতে উৎপন্ন নহে; এবং সেই জন্যই সংসার সুখময় এই কথা উহা হইতে সিদ্ধ হইতে পারে না।

কেবলমাত্র মনুষ্যজন্মের মহদ্‌ভাগ্য এবং তৎপরে মনুষ্যের সংসার এই দুয়ের ভ্রান্তিজনক মিশ্রণ না করিয়া, মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যের সংসার অর্থাৎ নিত্য ব্যবহার, এই উভয়কেই পৃথক করিয়া সংসারে শ্রেষ্ঠ নরদেহধারী প্রাণীর সুখ অধিক, কি দুঃখ অধিক, এই প্রশ্ন সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যেক মনু-

ষ্যের "উপস্থিত" বাসনার মধ্যে কত বাসনা সফল ও কত বাসনা নিষ্ফল হয়, ইহা দেখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 'উপস্থিত' এইরূপ বলিবার কারণ এই, যে সব জিনিস সভ্য অবস্থায় সকলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা নিত্য ব্যবহারে আসায়, তদুৎপন্ন সুখ আমরা ভুলিয়া যাই; এবং যে বস্তুর গরজ নূতন উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কোন্‌টা পাওয়া গেল তাহা দেখিয়া এবং তাহা ধরিয়াই আমরা সংসারের সুখদুঃখের নির্ণয় করিয়া থাকি। বর্ত্তমান কালে আমরা কত সুখসাধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার তুলনা করা এবং আজিকার মুহূর্ত্তে আমি সুখী কি সুখী নই তাহার বিচার করা—এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। উদাহরণ যথা—শত বৎসর পূর্ব্বে, গরুর গাড়িতে ভ্রমণ করা অপেক্ষা এখনকার আগ্‌-গাড়ীতে ভ্রমণ করা খুবই সুখদায়ক, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আগ্‌গাড়িতে ভ্রমণ-সুখের এই সুখত্ব এক্ষণে আমরা ভুলিয়া যাওয়ায়, কোনদিন গাড়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকে চিঠি পাইতে বিলম্ব হইলে আমাদের বড় খারাপ লাগে। তাই, উপলব্ধ সুখসাধন ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া, মনুষ্য উপস্থিত গরজ অনুসারে উপস্থিত সুখদুঃখের বিচার করিয়া থাকে। এবং এই গরজ যাহাই হউক না কেন, একবার দেখা দিলে, তাহার আর শেষ হয় না, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এক ইচ্ছা সফল হইলে পর, কাল সেই জায়গায় নূতন ইচ্ছা উৎপন্ন হয় এবং এই নূতন ইচ্ছা সফল করিতে হইবে, এইরূপ মনে হইতে থাকে; এবং মানুষের ইচ্ছার এই দৌড় প্রায়ই এক পোয়া মাত্রা এগাইয়া যাওয়ায় মানুষের অদৃষ্টে দুঃখ আর ছাড়ে না। 'সমস্ত সুখই তৃষ্ণাক্ষয়রূপ এবং যতই সুখলাভ হোক্ না কেন, মনুষ্য আবার অসন্তুষ্ট হয়, এই দুই বিষয়ের ভেদ এই স্থানে ঠিক লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রত্যেক সুখদুঃখ-অভাবরূপ না হওয়ায়, সুখ ও দুঃখ, ইন্দ্রিয়ের এই দুই স্বতন্ত্র বেদনা, এ কথা আলাদা; এবং এক সময়ে কোন প্রাপ্ত সুখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিয়া আরও সুখলাভ করা চাই বলিয়া অসন্তুষ্ট থাকা আলাদা। প্রথম তর্ক সুখের বস্তুস্বরূপ লইয়া; এবং প্রাপ্ত সুখে পূর্ণ তৃপ্তি হয়, কি হয় না—ইহ আর এক প্রশ্ন। বিষয়বাসনা সর্ব্বদাই সমান বাড়িয়া যায় বলিয়া প্রতিদিন নূতন নূতন সুখ লাভ না হইলেও পূর্ব্ব সুখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিব এইরূপ মনে করিয়া মনের আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ভিটেলিয়স্ নামে এক রোমক সম্রাটের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, জিহ্বার সুখ পুনঃ পুনঃ লইবার জন্য উদরস্থ অন্ন বাহির করিয়া ফেলিবার ঔষধ সেবন করিয়া প্রতিদিন তিনি অনেকবার ভোজন করিতেন! কিন্তু এই প্রসঙ্গে যযাতি রাজার কথা ইহা অপেক্ষা আরও জ্ঞানপ্রদ। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলে সেই জরা অন্যকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার তারুণ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া শুক্রাচার্য্য কৃপা করিয়া তাহার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন নিজ পুত্রের যৌবন লইয়া, যযাতি এক হাজার বৎসর সমান বিষয় সুখ উপভোগ করিলে পর, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ একজন মনুষ্যের সুখবাসনা তৃপ্ত করিতে অসমর্থ এইরূপ তাঁহার উপলব্ধি হইল; এবং

> ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ "সুখের উপভোগে বিষয়বাসনার তৃপ্তি না হইয়া হবন দ্রব্যের দ্বারা যেরূপ অগ্নি সেইরূপ উপভোগে বিষয়বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়"—তাঁহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল, এইরূপ মহাভারতের আদিপর্ব্বে ব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন (আ, ৭৫।৪৯); এবং এই শ্লোকই মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ২।৯৪)। সুখসাধন যতই অধিক হউক না কেন, ইন্দ্রিয়ের লালসা সতত বর্দ্ধিত হওয়া প্রযুক্ত কেবল সুখভোগের দ্বারা সুখেচ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না, সুখেচ্ছার তৃপ্তিসাধনের জন্য আর একটা কোন বিষয়সুখ আবশ্যক হয়, ঐটি ইহার বীজ; এবং এই তত্ত্ব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থকারদিগের অভিমত হওয়ায়, প্রত্যেক ব্যক্তির কামোপভোগে সংযম অবলম্বন করা আবশ্যক, ইহাই তাঁহাদের প্রথম বক্তব্য। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা এই আনুভবিক সিদ্ধান্তের প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই তাঁহাদের মতের অসারতা তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে। বৈদিক ধর্ম্মের

এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্মেও স্বীকৃত হওয়ায় যযাতির পরিবর্ত্তে মান্ধাতা নামক পৌরাণিক রাজার মুখ দিয়া মৃত্যুকালে—

ন কহাপণবস্‌সেন 'ত্তি কামেসু বিজ্জাতে।
অ'প দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ—কর্ষাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও কামের তৃপ্তি হয় না, এবং স্বর্গসুখ মিলিলেও কামী পুরুষের কামের নিবৃত্তি হয় না,—এইরূপ কথা বাহির হয়,—এইরূপ বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (ধর্ম্মপদ ১৮৯, ১৮৭)। এইরূপ কখন না কখন বিষয়োপভোগের পূর্ণতা আবশ্যক হওয়ায় প্রত্যেক মনুষ্য মনে করে—"আমি দুঃখী"; মনুষ্যমাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতের উক্তি অনুসারে—

সুখাদ্‌বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক। (শা, ২০৫।৬; ৩৩০।১৬) কিংবা তুকারাম বাবার বর্ণনা অনুসারে (তুকা, গা, ২৯৮৮)—

"সুখপাহতা জবাপাতেঁ। দুঃখ পর্ব্বতাএবঢেঁ॥"

অর্থাৎ—সুখ যব প্রমাণ, দুঃখ পর্ব্বত প্রমাণ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হয়। উপনিষৎকারদিগেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত; (মৈত্র্য, ১০২-৪)। গীতাতেও মনুষ্যের জন্ম অ-শাশ্বত ও 'দুঃখের ঘর' এবং পৃথিবীতে সংসার অনিত্য ও সুখহীন (গী, ৮। ১৫; ৯।৩৩) এইরূপ কথিত হইয়াছে। জর্ম্মন পণ্ডিত শোপেন্‌হৌয়েরও এই মত হওয়ায়, উহা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনুষ্যের সমস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত সুখের ইচ্ছা সফল হয় সেই পরিমাণে আমরা তাহাকে সুখী মনে করি; এবং সুখোপভোগ সুখেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই মনুষ্যকে সেই পরিমাণে দুঃখী বলি। ইহা গণিতের রীতিতে দেখাইতে হইলে, সুখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া ভগ্নাংশরূপে এইরূপ লিখিতে হয় যথা—$\frac{\text{সুখোপভোগ}}{\text{সুখেচ্ছা}}$ কিন্তু এই ভগ্নাংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার বিভাজক অর্থাৎ সুখেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা বরাবরই অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকায় এই ভগ্নাংশ প্রথমে $\frac{১}{২}$ ও পরে $\frac{৩}{১০}$ হইলে, বিভাজ্য তিন গুণ ও বিভাজক পাঁচ গুণ বাড়িয়া অধিকাধিক ভগ্নাংশই থাকিয়া যায়! অতএব মনুষ্যের পূর্ণ সুখ আশা করা ব্যর্থ। প্রাচীনকালে, সুখ কি পরিমাণ হয় তাহার বিচার করিবার সময় এই ভগ্নাংশের বিভাজ্যেরও আমরা স্বতন্ত্র বিচার করি বলিয়া, বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়াছে সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি না। কিন্তু কালের অপেক্ষা না করিয়া মনুষ্যপ্রাণী সুখী কি দুঃখী ইহারও যখন নির্ণয় করিতে হয় তখন বিভাজ্য ও বিভাজক এই দুয়েরই বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক হয়; এবং পরে এই অপূর্ণক কখনই পূর্ণ হইতে পারে না এইরূপ উপলব্ধি হয়। "ন জাতু কামঃ কামানাং" এই মনু বচনের (২, ৯৪) অর্থই এই। সুখদুঃখ মাপিবার উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ সুখদুঃখের তারতম্য বিন্যাস কেহ কেহ গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু এই যুক্তিক্রমে সংসারে মনুষ্যের সুখ অধিক ইহা প্রমাণ করিবারও কোন মাপযোগ নাই। তাই উভয়পক্ষের সাধারণ এই আপত্তির দ্বারা উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ সুখোপভোগাপেক্ষা সুখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কোনও বাধা হইতে পারে না। স্পেন দেশে যখন মুসলমান রাজ্য ছিল সেই সময় তৃতীয় আবদুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমী সম্রাট নিজের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনামচা রাখিতেন এবং সেই রোজনামচা অনুসারে, তাঁহার রাজত্বের ৫০ বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র পূর্ণ সুখে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইরূপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত হইয়াছে; এবং জগতে ও বিশেষতঃ য়ুরোপখণ্ডে, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন তত্ত্বজ্ঞানীদের মত যদি দেখা যায় তবে, "সংসার সুখময়"-প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা ও "সংসার দুঃখময়"-প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা—এই দুই সংখ্যাই সমান

* Moors in Spain, P. 128. (Story of the Nations series).

দেখা যায়, এইরূপ একজন লিখিয়াছেন। * এই সংখ্যার উপর হিন্দু-তত্ত্বজ্ঞানীর মতের ভার চাপাইলে, তৌল কোন্‌দিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে হইবে না।

সাংসারিক সুখদুঃখের উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সন্ন্যাসমার্গী ব্যক্তি আবার এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যে, "সুখ বাস্তবিক পদার্থ না হওয়ায় তৃষ্ণাত্মক সমস্ত কর্ম্ম না ছাড়িলে শান্তি নাই", এই কথা তুমি স্বীকার না করিলেও, তোমার কথা অনুসারে তৃষ্ণা হইতে অসন্তোষ ও অসন্তোষ হইতে পরে যদি দুঃখ হয়,তাহা হইলে নিদেন এই অসন্তোষ দূর করিবার জন্য মনুষ্য, তৃষ্ণা ও তৃষ্ণার সহিত সমস্ত সাংসারিক কর্ম্ম—তাহা পরোপকারের জন্যই হৌক্ বা স্বার্থপ্রীত্যর্থেই হৌক—ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবে এইরূপ বলিতে বাধা কি? মহাভারতেও "অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্"—অসন্তোষের অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ—এইরূপ বচন আছে (সভা, বন, ২১৫, ২২) জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তিও এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে শোপেন্ হোয়ের এই মত অর্ব্বাচীন কালে প্রতিপাদন করিয়াছেন। † কিন্তু ইহার উল্টাপক্ষে এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া, জিহ্বার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? কিংবা অগ্নির দ্বারা কখন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি, সমস্ত অগ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া লোকে রাঁধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে কি? অগ্নির কথা কি, বিদ্যুৎশক্তিকেও যোগ্য সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা যদি তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, তবে তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করা অসাধ্য নহে। অসন্তোষ যদি সর্ব্বাংশে কিংবা সর্ব্বপ্রসঙ্গে অ-লাভজনক হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিচারান্তে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অসন্তোষ অর্থে নিছক আকাঙ্ক্ষা বা হাহুতাশ এরূপ নহে। এই অসন্তোষ শাস্ত্রকারেরাও গর্হিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত অবস্থাতে কেবলি আক্ষেপ করিতে না থাকিয়া শান্ত ও সমচিত্ততার সহিত যথাশক্তি ঐ অবস্থার উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছা তাহারই মূলভূত যে অসন্তোষ তাহা গর্হিত বলিয়া কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। চাতুর্ব্বর্ণ্যের বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের, ক্ষত্রিয় যদি ঐশ্বর্য্যের ও বৈশ্য যদি ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সমাজ শীঘ্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায়ই মনেতে আনিয়া ব্যাস "যজ্ঞো বিদ্যা সমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি" (শাং ২৩।৯)—অর্থাৎ—"যজ্ঞ, বিদ্যা, উদ্যোগ ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অসন্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ"—এইরূপ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। সেইরূপ বিদুল আপন পুত্রকে উপদেশ করিবার সময় "সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি" (সভা, উ, ১৩২।৩৩) অর্থাৎ—সন্তোষে ঐশ্বর্য্যনাশ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। "অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং" (সভা, ৫৫।১১), এইরূপ অন্য এক প্রসঙ্গেও এই কথা বলা হইয়াছে। * ব্রাহ্মণধর্ম্মে সন্তোষকে গুণ বলা হইয়াছে; তথাপি তাহার অর্থ চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মানুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা ঐহিক ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ ইহাই অভিপ্রেত।

আমি যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট এইরূপ যদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজের সর্ব্বনাশ করে; এবং বৈশ্য কিংবা শূদ্র আপন আপন ধর্ম্মানুসারে যাহা পাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহারও এইরূপ দশা হয়। সারাংশ,—অসন্তোষই সর্ব্বভাবে উৎকর্ষ, প্রযত্ন, ঐশ্বর্য্য ও মোক্ষের বীজ; এবং এই অসন্তোষ যদি আমরা সর্ব্বাংশে বিনষ্ট করি তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকেও আমাদের ভাল হয় না, ইহা প্রত্যেকের সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিবার সময় "ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্" (গী,

---

* Macmillan's Promotion of Happiness. P. 26.

† ইংরাজীতে ইহাকে Enlightened Self-interest বলে। তন্মধ্যে enlightened ইহার ভাবান্তর আমি 'উদাত্ত' কিংবা জ্ঞানদীপ্ত এইরূপ করিয়াছি।

* cf, "Unhappiness is the cause of progress". Dr. Paul Carus' The Ethical Problem, P. 251 (2nd Ed).

১০, ১৮)—অর্থাৎ "তোমার অমৃতবৎ কথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, তোমার বিভূতির কথা পুনঃ পুনঃ আমাকে বল"—এই কথা অর্জ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার বিভূতির কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন; তুমি আপন ইচ্ছা সম্বরণ কর, অতৃপ্তি বা অসন্তোষ যোগ্য নহে, এইরূপ উপদেশ তিনি করেন নাই। ইহা হইতে দেখা যায়, ভাল কিংবা কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসন্তোষ হওয়া ভগবানেরও অভীষ্ট এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে; এবং "যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ" অর্থাৎ অভিরুচি হওয়া চাই যশের অভিরুচি, ব্যসন হওয়া চাই বিদ্যার ব্যসন,—তাহা গর্হিত নহে; এইরূপ ভর্ত্তৃহারিরও এক শ্লোক আছে। কামক্রোধাদির বিকারানুসারে অসন্তোষকেও অসংযত হইতে দেওয়া ঠিক্ নহে। অসংযত হইলে তাহা সর্ব্বস্ব নাশ করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়; এবং এই হেতু কেবল বিষয়ভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর তৃষ্ণা কিংবা আশার উপর আশা চাপাইয়া ঐহিক সুখের সম্মুখে একেবারে ছুটিয়া চলে যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তির সম্পদকে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে "আসুরী সম্পৎ" বলা হইয়াছে। এইরূপ অসংযত লালসার দরুণ মানবমনের সাত্বিক বৃত্তির উচ্ছেদ হইয়া মনুষ্য শুধু অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণাও কখনও তৃপ্ত হইতে না পারায় কামোপভোগ-বাসনা অধিকাধিক বাড়িয়া গিয়া তাহাতেই শেষে মনুষ্যের বিনাশ হয়। কিন্তু উল্টা পক্ষে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের এই দুষ্পরিণাম পরিহার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণা ও সেই সঙ্গে একেবারে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করাও সাত্বিক মার্গ নহে। উপরি উক্ত কথা অনুসারে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষই ভাবী উৎকর্ষের বীজ; তাই চোরের ভয়ে নির্দ্দোষকে মারিবার প্রযত্ন না করিয়া কোন্ তৃষ্ণা হইতে কিংবা অসন্তোষ হইতে দুঃখ হয় তাহার ঠিক বিচার করিয়া সেইরূপ দুঃখজনক আশা, তৃষ্ণা বা অসন্তোষ ত্যাগ করাই যুক্তির মধ্যমার্গ স্বীকার করিতে হইবে। সেই জন্য সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিবার কারণ নাই। দুঃখজনক আশা ছাড়িয়া দিয়া স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিবার যে এই যুক্তি বা কৌশল তাহাকেই 'যোগ' বা 'কর্ম্মযোগ' বলে (গী, ২।৫০); এবং তাহাই গীতাতে মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় গীতাতে কোন্ প্রকারের আশা দুঃখজনক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

গত পৌষমাসে কলিকাতায় একটা প্রাণের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি বিরাট সম্মিলনসমূহে যে প্রকার উৎসাহ, যে প্রকার জীবন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আশাতীত—কেহই তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যে এখনও মরে নাই এবং শীঘ্র যে মৃত্যুমুখে পড়িবে না, এবারকার এই প্রাণতরঙ্গের প্রকাশে তাহার বহুল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস—কংগ্রেস ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য সম্মিলন হইতে উন্নতির ভিত্তিস্বরূপে এই এক মহাবাণী লাভ করিয়াছি যে উন্নতির অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে চাহিলে তোমার একেলা ছুটিয়া চলিলে বিশেষ কোন লাভ হইবে না—তোমার পরিবারকে, তোমার সমাজকে তোমার দেশকে সঙ্গে লইয়া সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে হইবে। ঐ যে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যে বিরোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যদি তাহা স্থির থাকিত, তবে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের উন্নতি যে অনেক বৎসর পিছাইয়া যাইত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? কাহাকে কংগ্রেসের সভাপতি করিলে ভাল হইত, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা একটী ধর্ম্মসমাজের মুখপত্রের ক্ষেত্রবহির্ভূত বলিয়া সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিরস্ত রহিলাম। কিন্তু এই সভাপতি নির্ব্বাচনে পরিণামে দলাদলি ঘুচিয়া গিয়া ভারতের সকল দল, সকল জাতি মিলিত হইয়াছে, ইহাতেই আমরা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ আশান্বিত হইতে পারিতেছি এবং আনন্দে আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত হইতেছে। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে দু'একটি কথা না বলিলেও ঠিক হয় না—এবিষয় লইয়া এবার এতই কোলাহল উঠিয়াছিল। অনেক কোলাহল কলরবের পরিণামে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতের সকল দল, সকল জাতি একমত হইয়াই তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কেবল ইঙ্গভারতীয় কয়েকটী সংবাদপত্র এবং তাহাদের অনুগামী বিলাতের কয়েকটী সংবাদ পত্র এই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল।

সেই সকল কথার মধ্যে দুইটী বিষয় লইয়া বড় বেশী নাড়াচাড়া হইয়াছিল। একটী হইতেছে—শ্রীমতী বেসান্ট পাশ্চাত্য মহিলা এবং দ্বিতীয়টী হইতেছে, তিনি রমণী। সেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত না হইলে এই দুইটী বিষয় লইয়া এত হৈ চৈ করিবার প্রবৃত্তিই তাঁহাদের আসিত না। ধর্ম্মের উন্নত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে একজন পাশ্চাত্য মহিলাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার কারণে কংগ্রেস অশুদ্ধ হইতে পারে না। যে মহিলা আজ বহুবৎসর ধরিয়া স্বদেশের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষকে আপনার দেশ করিয়া লইয়াছেন, এই দেশের সেবায় যিনি "তন-মন-ধন" উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকে পাশ্চাত্য বলিয়া জাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা কিছুতেই অসঙ্গত নহে, নিযুক্ত না করাই অসঙ্গত। শ্রীমতী বেসান্টকে যদি বিদেশীয় বলিয়া দেশের কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করা অনুচিত হয়, তবে যে পার্শি সম্প্রদায় বহুশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়াও পরিচ্ছদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে নিজেদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও ভারতের কোন কার্য্যে আহ্বান করা সঙ্গত নহে। এরূপ প্রস্তাব যেমন অসঙ্গত তেমনি হাস্যাস্পদ।

দ্বিতীয় কথা এই যে শ্রীমতী বেসান্ট রমণী। যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসনে রাখিয়া শান্তির আবাসভূমি করিতে পারিলেন, তখন কংগ্রেসের সভাপতি একজন শক্তিশালী রমণী হইতে পারিবেন না কেন, তাহার কারণ তো বুঝিলাম না। আসল কথা এই যে, প্রতিবাদকারী সম্পাদকগণের ভয় এই যে, সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে নানাবিধ অত্যাচার অবিচারের কথা খুলিয়া বলিবেন, এবং সে কথা বিলাতের সাধারণত ন্যায়নিষ্ঠ জনসাধারণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ভারতে সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

স্বায়ত্তশাসন—এবারকার কংগ্রেসের প্রধানতম মন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল "হোমরূল"। এই শব্দের অর্থ কেহ করেন স্বরাজ, কেহ বা করেন স্বায়ত্তশাসন। আমাদের মনে হয় স্বায়ত্তশাসন রাখিলেই ভাল হয়, কারণ স্বরাজ প্রভৃতি শব্দ গভর্ণমেণ্ট পছন্দ করেন না। যাই হোক, হোমরূল বল, স্বায়ত্তশাসন বল, বা স্বরাজই বল, ইহাদের মূলভাব এই যে আমাদের দেশকে সত্যসত্য এই সুবৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ বলিয়া ধরা কর্ত্তব্য, কেবলমাত্র শাসনের বস্তু বলিয়া ধরিলে চলিবে না; সেই সঙ্গে আমাদের দেশকে দেশের লোকের দ্বারা শাসন করাইতে হইবে। কতকগুলি ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র ইহার বিরোধী, কারণ ইহাতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িবার খুবই সম্ভাবনা। আমরা কিন্তু আমাদের সেই উন্নত ভূমিতে দাঁড়াইয়া যতদূর সম্ভব ভগবানের দৃষ্টিবিন্দু হইতে এ বিষয় আলোচনা করিতে চাহি।

ভগবান তাঁহার কার্য্যপ্রণালী প্রকৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিতে আমরা দেখি যে, ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে পৃথক পৃথক এক একটি শরীর দিয়াছেন। সেই শরীর ভাল আছে কি মন্দ আছে, সেটা তো আমরা নিজেরাই বেশী বুঝিব, বাহিরের লোকে সে বিষয়ে এমন কি বুঝিবে? অবশ্য শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসা চাই, অথবা ছোট শিশু চলিতে শিখিলে সাহায্য পাইলে সুবিধা হয়। ভারতবাসীর ন্যায় একটি প্রাচীনতম জাতিকে যে নূতন করিয়া হাঁটিতে শিখিতে হইতেছে না তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহার অঙ্গে অনেক ক্ষত হইয়াছে, তাহার চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টরূপ বাহিরের সাহায্য আবশ্যক। কিন্তু কেবল বাহিরের চিকিৎসার উপর আপনাকে ফেলিয়া রাখিলে কোন ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। একদিকে আমাদের যত্নমূলক স্বায়ত্তশাসনও চাই, অপর দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাসাহায্যও চাই।

ভারতের ব্রহ্মবাদী সম্মিলন—কংগ্রেসে এবার সত্য সত্য একটা কাজ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে (Theistic Conference এ) কি কাজ হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজী ভাষায় লম্বাচৌড়া কয়েকটী বক্তৃতা করিলেই, অথবা ছেলেছোকরার খুব একটা হট্টগোল হইলেই যদি আমরা মনে করিতে চাহি যে মস্ত একটা কাজ হইয়াছে; তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে এবারকার Theistic Conference সার্থক হইয়াছে। কিন্তু যদি ভারতের ব্রহ্মবাদীগণের প্রকৃত সম্মিলন এই সভার উদ্দেশ্য হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধীয় বিশেষ ভাবে আলোচনা যদি ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের মতে এবারকার Theistic Conference ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতের ব্রহ্মবাদী সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমগ্র ভারতে প্রচারের এত বড় শুভ অবসর কেন যে ছাড়িয়া দিলেন তাহা আমরা বুঝিলাম না। আমরা দেখি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই সম্মিলনকে কতকটা যেন নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মোদ্যোগ প্রশংসনীয় তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রহ্মবাদী সম্মিলনের ন্যায় মিলনমূলক বস্তুকেও ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখারই নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা কিছুতেই প্রশংসনীয় বলা যাইতে পারে না।

দেশ বিদেশ হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিভিন্ন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দেওয়া সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ছিল। সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট দিনের বহুপূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাসমূহের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে, বিভিন্ন শাখায় কোন্ কোন্ নেতা দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হইবে, এবং সম্মিলনের কাল, স্থান প্রভৃতি বিষয় স্থির করিলে ভাল হইত। এভাবে কাজ অবশ্য করা হয় নাই।

সম্মিলনের বক্তৃতা সম্বন্ধেও দুএকটী বক্তব্য আছে। কেহ দেখিলেন না যে কে কোন্ বিষয়ে কি বক্তৃতা দিবেন, কি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন; কেবল নামের খাতিরে, বক্তৃতা দ্বারা জমাট বাঁধাইবার খাতিরে বক্তৃতা দেওয়ান হইল। হয় তো কোন বক্তৃতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্বের বিরুদ্ধে গেল, আর হয় তো কোন বক্তৃতা প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত খুঁজিলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের, এমন কি ব্রহ্মনামের পর্য্যন্ত নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। সে সকল বক্তৃতা ভাল হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে এরূপ বক্তৃতা হইলে লোকের ভুল ধারণা জন্মিবে—লোকেরা বুঝিতেই পারিবে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, ব্রাহ্মসমাজ কি চায়। সে সকল বক্তৃতার জন্য অনেক স্থান ছিল এবং আছে। শুনিলাম যে একজন বক্তা একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন যে "সম্মিলিত মানব সমাজ বা মানবত্ব হইতেছে ঈশ্বর।" সাধারণ সমাজের একজন প্রাচীন নেতা এই বিষয় আমাকে বলিয়া বলিলেন—'মহাশয় হোল কি? আগে ছিল সোঽহং, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি, আর এখন হোল সোঽবয়ং—আমরা সকলে মিলে একটী ঈশ্বর হইলাম।"

ব্রহ্মবাদী সম্মিলনে শ্রীমতী সরোজিনী নেইডু মহাশয়াকে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, কারণ তিনি একজন সুবক্তা। সকলেই বলিলেন যে 'চমৎকার বলেন'; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বা Theism সম্বন্ধে কি বলিলেন, তাহার উত্তরে সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে সে সম্বন্ধে তিনি নাকি একটী কথাও বলেন নাই। এইভাবে সম্মিলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার চেষ্টা মহাভুল। ইহাতে বরঞ্চ বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা—জনসাধারণের চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইবে, তাহারা বুঝিতে পারিবে না যে তাঁহাদের কঃ পন্থা, এবং কাজেই পরিণামে তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া অন্য creed-defined গণ্ডীবদ্ধ পথ অবলম্বনে বাধ্য হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমরা এতগুলি কথা বলিলাম।

গোরক্ষা সম্মিলন—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে জষ্টিস উড্রুফ মহোদয়ের নেতৃত্বে ভারতের গোরক্ষা সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গোরক্ষার জন্য যে একটা চেষ্টা হইতেছে, ইহাই সুখের বিষয়। যখন জষ্টিস উড্রুফ, মাননীয় পেল সাহেব প্রভৃতি ইংরাজগণও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন গোরক্ষার একটা না একটা উপায় আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, যদি হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কয়েকজন নেতাদিগকে লইয়া এ বিষয়ে ভালরূপ আলোচনা করা হয় তবেই এই উপায় অতি সহজে আবিষ্কৃত হইবে। আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে একা কলিকাতার নিউ মার্কেটে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ গরু নিহত হয়। শুনিয়াছি যে যাহারা নিউ মার্কেটের মাংসের দোকান ভাড়া লয়, তাহাদিগকে একটা এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় যে তাহারা প্রতিদিন অন্তত এতগুলি গরু বা ভেড়া বা খাসীর মাংস বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যদি মাননীয় পেল সাহেবের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশন গোহত্যা নিবারণে পথপ্রদর্শন করেন, তবে তো জনসাধারণ একটুকুও দুগ্ধ ঘৃত খাইয়া বাঁচিতে পারিবে, তবেই তো কৃষকেরা চাষ আবাদ করিবার জন্য গরুর অভাব বোধ করিবার অবসর পাইবে না। আমাদের বর্ত্তমান নীতি এই যে বর্ত্তমান সুখই আমাদের সর্ব্বস্ব। একটুখানি দূরদৃষ্টি করিলেই গোরক্ষার উপকারিতার পরিমাণ উপলব্ধ হইবে। প্রাচীনকালের ন্যায় গরুকে সংসার গোধনরূপে জানিয়া সেবাশুশ্রূষা দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিলে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব।

ভারতের মহিলা সম্মিলন—মহিলা-সম্মিলনে যে সকল প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা হইয়াছিল, তন্মধ্যে গত ৬ই জানুয়ারির ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রে The Orient Pearls নামক গ্রন্থের রচয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবীর স্ত্রীশিক্ষার ভবিষ্যৎবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে অনেকগুলি চিন্তার বিষয় আছে। তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে আমাদের কন্যাগণকেও পুরুষদিগের ন্যায় জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব বলিয়া তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের অনুকূল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। একথা যে অনেকাংশে ঠিক তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা কন্যা-

দিগকে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার উপযুক্ত হাতে-হেতেড়ে কাজ শিক্ষা দিবার নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। তবে এইটুকু বলিতে চাহি যে কন্যাগণকে ভাতরাঁধা ডাল তরকারী রাঁধা, সুতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিদ্যা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখাইতে গেলেই অর্থকরী বিদ্যাসকলও আপনিই আয়ত্ত হইবে। কিন্তু কেবল অর্থকর বলিয়াই যে কোন বিদ্যা শিখিতে হইবে সে মতের আমরা কিছুতেই পক্ষপাতী হইতে পারি না। এ মতে চলিতে গেলে পাশ্চাত্যদেশের অশান্তি আনয়ন ব্যতীত অন্য কোন ফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শোভনা দেবী এদেশে স্ত্রী শিক্ষার অভাবের কারণস্বরূপে আইনের দোহাই দিয়াছেন। তাহা ঠিক মনে হয় না। মেয়েরা বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয় না বলিয়া কি তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না? আমাদের তো তাহা মনে হয় না। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার এক আত্মীয়ের কন্যাকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করাতে কন্যার উত্তরকালে বিধবা হইবার আশঙ্কা করিয়া তাহার মাতা শিক্ষাদানে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যদি তাহাতে সম্মতি দিতেন, তাহা হইলে কি উত্তরাধিকারের আইন সে বিষয়ে বাধা দিত? আমার মতে অত্রিসংহিতা প্রভৃতির ন্যায় আধুনিক স্মৃতি-গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদিগের বামাচার কদাচার অনাচার সকল স্ত্রীশিক্ষা বিলোপের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শিল্পকলা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস যে কন্যাগণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী শিল্পশিক্ষা করিতে গেলেই বাধ্য হইয়া অর্থকরী নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে থাকিবে—কাজেই তখন কুমারী বল আর বিধবা বল, কাহাকেও বোধ হয় পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না। আমাদের মনে হয়, শোভনা দেবী তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম অংশটি সহরের অধিবাসী রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু সহরের অধিবাসী রমণীগণ সমগ্র দেশের রমণী-সংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

প্রবন্ধে কন্যাদিগের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু বর্ত্তমানে স্কুলকলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহার ফলে অধিকাংশ স্থলে কন্যাগণের শরীর এমন অপটু হইয়া উঠে যে তাহারা এতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয় না এবং বিবাহের পর হয়তো দু'একটি সন্তান প্রসব করিয়াই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়দিগের চক্ষে গৃহের একটি অকর্ম্মণ্য জীবরূপে পরিগণিত হয়, সে প্রণালী আমরা এতটুকুও সমর্থন করি না।

ভারতের নির্ম্মাদক সম্মিলন—এই সম্মিলনের সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ রায়বাহাদুর ডাক্তার চুনী লাল বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার মত সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তির নেতৃত্ব পাইয়া এই সম্মিলন যে মাদক নিবারণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু তাঁহাকে একটী অনুরোধ করি যে তিনি ভারতের যে কয়টী ধর্ম্মসমাজ আছে, সকলগুলিকেই তাঁহার এই সম্মিলনের সাহায্য করিতে আহ্বান করুন। তাহাতে সম্মিলনের বিশেষ বলসঞ্চয় হইবে। তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক ইচ্ছাই হইল মাদক নিবারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ যে একটী আবগারি বিভাগ আছে, তাহার কর্ম্মচারীদিগের বাহাদুরী লইবার অত্যুগ্র চেষ্টার ফলে গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছাও অনেক সময়ে ব্যর্থ হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট হয় মার্কিন বা রুষিয়ার গভর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী আদেশ দিয়া মাদক দ্রব্যের আমদানী বা প্রস্তুত করা রহিত করিয়া দিন, অথবা তাহা যদি না ইচ্ছা করেন, তবে স্পষ্টাক্ষরে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়া দিন যে গভর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগ হইতে একটী পয়সাও আয়ের প্রত্যাশা করেন না, তবেই একমাত্র মাদকদ্রব্য নিবারণ হইতে পারে। আর, পুরাকালের ন্যায় ব্যবস্থা করিলেও চলিতে পারে যে, বড় বড় নগরের শেষপ্রান্তে মাত্র শৌণ্ডিকালয় প্রভৃতি থাকিতে পারিবে। যত দিন না তাহা হয়, ততদিন ভারতবাসীর এ সন্দেহ দূর হইবে কি না সন্দেহ যে গভর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগকে আয়ের অন্যতর পথ বলিয়া ধরেন। চুনী বাবু উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব—কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের প্রত্যেককে এবিষয়ে নিজের যত্ন প্রয়োগ করিতে হইবে।

এই অবসরে আমরা বঙ্গগভর্ণমেণ্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি যে তাঁহারা পরীক্ষা স্বরূপেও আগামী ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরের জন্য কলিকাতার জনবহুল একটী কেন্দ্রাংশে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ কার্য্যই গভর্ণমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়।

ভারতে শিক্ষা বিস্তার—বিগত ১৮ই নভেম্বরের সংখ্যায় একটি চিত্র দ্বারা ষ্টেটসম্যান কাগজ দেখাইয়াছেন যে ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কত অল্প; এবং তাহা উল্লেখ করিয়া স্বায়ত্তশাসন-প্রার্থীগণের প্রতি একটু উপহাসকটাক্ষ করিতে ভুলেন নাই। ইহাকে ভারতের উন্নতি চেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নগণ্য আঘাত বলিয়া আমরা

উপেক্ষা করিতে পারি। এই শিক্ষিত সংখ্যার অল্পতার কারণ তো স্বায়ত্তশাসনপ্রার্থীগণ নহেন। স্বায়ত্তশাসন প্রার্থী বা অপ্রার্থী ভারতবাসীমাত্রেই, অন্তত অধিকাংশ ভারতবাসীই চাহেন যে ভারতে শিক্ষাবিস্তার হউক। কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণ প্রদর্শনে সেই শিক্ষা-বিস্তারেরই পথে পর্ব্বতসমান বিঘ্নসমূহ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং এখনও যে হইতেছে না এমন কথা বলিতে পারি না। দেশশুদ্ধই তো চাহে যে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধ্য করা হউক অথবা এক কথায় compulsory education প্রবর্ত্তিত হউক। গবর্ণমেন্ট কি তাহা অনুমোদন করিবেন? বরোদা রাজ্যে তো এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফলে সেখানে ইষ্ট বা অনিষ্ট হইয়াছে? আমাদের স্থির বিশ্বাস যে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে—না করিলে গবর্ণমেন্ট ভুল করিবেন। কাজেই যত শীঘ্র তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে ততই সকল হিসাবেই মঙ্গল। তারপর, শিক্ষাবিস্তার প্রতিহত হইবার অন্যতর কারণ বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান। এ বিষয়ে এত বক্তব্য আছে যে আমরা এখানে সে বিষয়ে কিছুই বলিলাম না।

অন্তর্হরণ (intern) করিবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।—আমাদের দেশে ভারত রক্ষা আইন অনুসারে অনেক ব্যক্তিকে অন্তর্হরণ করা হইয়াছে এবং স্বভাবতই তজ্জন্য দেশে একটা তুমুল আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। বলা বাহুল্য যে তজ্জন্য একটা গভীর অসন্তোষের অন্তঃসলিল স্রোত প্রবাহিত হইতে উপক্রম করিয়াছে। বঙ্গলাটের ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে অন্তর্হরণের পক্ষে গবর্ণমেন্টেরও প্রবল যুক্তি আছে। কিন্তু অনেক স্থলে ভুল হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে ইহাই কি অশান্তি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়? এইখানে আমরা আবার বলিতে চাহি—যাহা আমরা আবহমান কাল বলিয়া আসিতেছি যে, ব্রহ্মচর্য্যমূলক সত্যধর্ম্মভিত্তি শিক্ষা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হউক এবং বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে বাধ্য করা হউক। গবর্ণমেন্ট অন্য অনেক বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া শিক্ষাবিস্তারে মুক্তহস্ত হউন,—দেখিবেন, কি সহজে শান্তি সংস্থাপিত হয়। তারপর, অন্তর্হৃত বালকগণের শিক্ষায় বিশেষভাবে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহারা ভাবে যে তাহাদের কার্য্য খুব ন্যায়সঙ্গত। উপযুক্ত লোকের দ্বারা তাহাদের সেই ভুলটিই ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উচিত। সকল শান্তির মূল—সত্যধর্ম্ম বা ভগবানে নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে শিক্ষাদান এবং অকাতরে জ্ঞানদান। এ কথাতো স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে যেরূপ দ্রুতবেগে অশান্তি আসিতেছে, অনেক স্বাধীন দেশে অশান্তি সেরূপ বেগে ছুটিতেছে না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেন্টের উচিত এদেশেও সেই সকল উপায় প্রয়োগ করা। গবর্ণমেন্ট যদি কেবল শাসক ও শাসিতের চক্ষে এদেশকে দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। তাঁহারা যদি এদেশকে স্বায়ত্তশাসিত বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া দেখেন এবং সেই ভাবে আইন কানুন, আচার ব্যবহার প্রভৃতি নিয়মিত করেন, তবেই উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল এবং বর্ত্তমান অশান্তির মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

কৃষি চর্চ্চা। বঙ্গসাহিত্যে কৃষিবিষয়ক চর্চ্চা বিশেষভাবে হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। আমাদের সাঙ্গোপাঙ্গ কৃষি যত দিন না অবলম্বিত হইবে ততদিন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কৃষিতে অবশ্য হাতেহেতেড়ে কাজই বেশী। তবু বলিতে হইবে যে সাহিত্যে কৃষিবিদ্যা বিশেষভাবে স্থান পাওয়াই একটি সুলক্ষণ। ভাব ছড়াইয়া পড়িলে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র কে রুদ্ধ রাখিতে পারিবে?

দেশীয় রাজন্যবর্গ। বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণের একটি বিশেষ সুলক্ষণ দেখিতেছি যে দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে শিক্ষিত হইয়া উন্নত আদর্শে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যেরও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিলিতভাবে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। মহীশূর, বরোদা প্রভৃতি রাজ্যের অধীশ্বরগণ স্বরাজ্যে বাল্যবিবাহ প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রথাসমূহ উঠাইয়া দিয়া এবং অবাধ শিক্ষা প্রভৃতি ইষ্টকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে যে মহান্ আদর্শ স্থাপিত করিতেছেন তাহার ফলে যে কি সুমহান্ মঙ্গল উৎপন্ন হইবে তাহা বর্ত্তমানে আমাদের কল্পনাতেও আসিতে পারে কিনা সন্দেহ। দেশীয় রাজন্যবর্গ, যে মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া সাম্রাজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনায় যোগ দিতেছেন, ইহাতেও তাঁহারা পরিণামে যে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যশাসনের সভায় আসন পাইবার অধিকারী হইতেছেন তাহা বলা বাহুল্য।

রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রগণের যোগদান নিষেধ—আজকাল গভর্ণমেন্টের মনে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠিয়াছে যে ছাত্রগণ রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া পাছে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাই তাঁহারা ছাত্রগণকে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করিতে একপ্রকার নিষেধই করিতেছেন। আমাদের দেশে সেকালে গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া ছাত্রেরা যেরূপ অধ্যয়ন করিত সে প্রথা থাকিলে

এরূপ নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন শত শত সংবাদপত্রে রাজনীতিচর্চ্চা ও মতামত প্রকাশ উন্মুক্তভাবে চলিতেছে, তখন এ প্রকার নিষেধাজ্ঞার নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ। বরঞ্চ, আমাদের মনে হয়, ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকিলে আলোচ্য বিষয়ের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা তর্ক বিতর্ক শুনিয়া একটা সাধু সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে। ইহার ফলে ছাত্রগণের রাজবিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত বলিতে পারি না।

পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্মভাবের জাগরণ—গীতাতে একটি অমূল্য সত্যবাণী উক্ত হইয়াছে যে, যখনই জগতে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান নিজের সংসার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ভগবান যে নামিয়া আসিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? প্রথমে তিনি সমরাগ্নিতে অগ্নিবিস্তার সমগ্র ধরণীকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। তাহার পরে, পাশ্চাত্য জগতের অন্তরে সত্য সত্য এক বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ মাসাধিক হইল মার্কিন রাজ্যের প্রেসিডেন্ট উইলসনের সাময়িক বক্তৃতাতে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, 'জর্ম্মনির অন্যায় করিবার শক্তি আমাদিগকে ভাঙ্গিতেই হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া জর্ম্মনির উপর প্রতিশোধ তুলিতে কখনই যাইব না।' এই ভাবের কথা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সে কথাগুলি যেন ভাসা ভাসা লাগিয়াছিল, আর উইলসন যাহা বলিয়াছেন, পড়িলেই বুঝা যায় যে তাহা হৃদয়ের গভীর অন্তস্তল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতেছি যে, এইবার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান সত্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য তাঁহার সংসারে নামিয়া আসিয়াছেন।

ব্যবসায়ের উন্নতি—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে মহীশূর রাজ্যে চন্দন তৈলের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে। এই মহাসমরসূত্রে সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষকেও দুর্মূল্যতার কারণে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তথাপি আমাদের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা যে ভাবে ব্যবসায় করি, তাহা মন্দের ভাল। তোমার কাছে জিনিস কিনিয়া অল্পলাভে তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিলাম। তাহাতে বিশেষ কি লাভ হইল? সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বরঞ্চ মনে হয় যে তাহাতে দেশের লোকসান—কেবল পরস্বত্ব রক্তশোষক কীটাণুর ন্যায় একজনের হাতে কতকগুলো টাকা আসিয়া জমে, দেশটা দারিদ্র্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু দেশের কাঁচা জিনিস হইতে যদি দেশের ব্যবহার্য্য এবং জগতের ব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত করিয়া দেশে বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই প্রকৃত পক্ষে দেশের লাভ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে দেশের এবং গভর্ণমেণ্টের উভয়েরই লাভ। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যদি বা কোন বিষয়ে সাহায্য দানে অগ্রসর না হয়েন, তথাপি দেশের লোকের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর নাই। পরস্পরকে প্রতারিত করিতে যাইব না এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করিব, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া আমাদিগকে কার্য্যে বাহির হইতে হইবে। সামান্য মূলধন হইতেও অধ্যবসায়ের ও বুদ্ধিপ্রয়োগের ফলে যে কি বৃহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার শত সহস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। জাপান অবসর বুঝিয়া আমাদের মুখের ভাত কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। অতীতের স্বপ্নে আর কাল কাটাইও না, পরস্পরের মধ্যে ভেদবুদ্ধিকে স্থান দিওনা। জন্মভূমিকে সত্যই সেই পরম মাতার প্রতিনিধি জানিয়া তাহার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হও।

কর্ম্মাভাবের কথা—বর্ত্তমানে শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মাভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায় যে একটি বিরাট অভাব সৃষ্ট হইতেছে এবং কাজেই অনেক সময়ে তাহাদের কুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার যে একটি সম্ভাবনা দাঁড়াইতেছে, নূতন বস্তুর প্রস্তুতমূলক ব্যবসায় বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে সেই অভাবের পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

রাণাডের-স্মৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

সরকারী কাজে প্রথম পরিভ্রমণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

এই কার্য্যক্রম চারিমাস কাল চলিবার পর, "এ্যাসিষ্টাণ্ট স্পেসিয়াল জজ" এই পদে আমাদের বদলী হইল। ইহার ফলে, আফিসসহ আমার স্বামীকে আটমাস ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাকে সঙ্গে লইবার মতলব ছিল না। কারণ, স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইবার সুবিধা কিরূপ, নামিয়া কোথাও থাকিবার সুবিধা কিরূপ এই সম্বন্ধে প্রথম বৎসরে পথযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, "দ্বিতীয় বৎসরে তোমাকে লইয়া যাইব।" সুতরাং এই কথা কোন প্রকারেই আমার ভাল লাগে নাই, প্রত্যুত অত্যন্ত খারাপ লাগিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে আমাদের পদবৃদ্ধির দরুণ যে আনন্দ হইবার কথা তাহা কোন্‌দিক দিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এখন আমি একাকী কেমন করিয়া দিন কাটাইব, আমার ইংরেজি শেখা বন্ধ হইয়া যাইবে, পাঠাভ্যাসে যে সময় কাটিবে তাহারও জো ছিল না এবং বিশ্রামের স্থান ত ছিলই না। আমার স্বামীর বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমি কি করিয়া দিন কাটাইব, এইরূপ শব্দ আমার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই আমার চোখ্ দিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল,—কতবার সম্বরণের চেষ্টা করিলাম, সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমার কান্না কমিয়া গেছে দেখিয়া উনি অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে কিছু দিন একটু জোর করিয়া মন বাঁধিয়া থাকো। তোমার ইংরেজি পড়া বন্ধ হবে না। ইংরেজি শিখাইবার জন্য কাল কোন মাষ্টারণী মহিলার তল্লাসের তদ্‌বির করিব। সকাল সন্ধ্যায়, ঘরকন্নার কাজেই তোমার সময় যাইবে। এখন বাকি রহিল দুপর বেলা। ঐ ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টাদেড়েক তাঁহার কাছে শিক্ষা করিতেই কাটিয়া যাইবে এবং আরও দেড়ঘণ্টা তিনি যাহা পাঠাভ্যাস করিতে দিবেন, তাহা অভ্যাস করিয়া রাখিতেই কাটিয়া যাইবে। যে শব্দ বা বাক্য আটকাইবে তাহা "আবা" কিংবা "বাবা"র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। এখন, বাড়ীর মেয়েরা নিজের চির-অভ্যাস অনুসারে কথা বলাবলি করিবেই করিবে। তাহার উপায় নাই। তাহা সহ্য করিতে হইবে। কিছুদিন শ্বাশুড়ীর, আর কিছুদিন বৌ-র। আপনা হইতে তাঁহাদের সহিত উদ্ধতভাবে ব্যবহার করা উচিত নহে। আমাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তাহার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। এই কথা বলিবার দুই তিন দিন পরে "বানবড়ী"র জেনানা-মিশনের অন্তর্ভূত "সিষ্টর্‌স্"দের মধ্যে মিস, হরফর্ড নামক এক মহিলাকে আমার শিক্ষার জন্য রাখা হইল। এবং তিনি ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত শিখাইতে লাগিলেন। কাজেকাজেই এই বিষয় বাড়ীর বয়স্ক মেয়েদের নারাজি হইবার কারণ হইল। ইহার দরুণ আমার উপর তাঁহারা অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। এবং বাড়ীর কেহই আমার সহিত গরজ অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না এইরূপ চুপি চুপি সকলকে তাকিদ দেওয়া হইল। ইহারা ছিল অ-বোলী ছোট ছোট ভাই বোন্। মিস্ হরফর্ড আমাকে শিখাইবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিবার পর, ৮ দিনের মধ্যে, আমার স্বামীকে আফিস-সহ সাতারা জিলায় ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য যাইতে হইল। পরে ৮।১০ দিন ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া ক্রোধাগ্নি হইতে ধীরে ধীরে শিখা বাহির হইতে লাগিল। প্রথম, তুই মেমকে ছুঁইয়া, গা না ধুইয়া, কেবল কাপড় ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করিস, এটা আমাদের ভাল লাগে না। গা ধোয়া না হইলে তুই উপর-তলাতেই বোসে থাকিস। আমরা তোর খাবার থালা উপরেই পাঠিয়ে দেব। এখন তুই ইংরেজি শিখে মেম হতে যাচ্ছিস। এখন তোকে পাদ্রিনী ও মেমের পোষাকেই অধিক শোভা পাবে! নীচের ঘরে কষ্ট করিবার জন্য আমরাইত তোমার দাসী চাকরাণী আছিই—এই প্রকার অনেক কঠোর কথা আমাকে শুনাইবার জন্য তাঁরা আমার নিকট বলিয়া পাঠাইতেন। আমি এই সমস্ত কথা আগেই শুনিয়াছিলাম বলিয়া বার্ত্তাবাহিনী রমণীকে কোন উত্তরই দিলাম না। দ্বিতীয় দিন হইতে মেম আমাকে শিখাইয়া চলিয়া গেলে পর চুপি চুপি উঠিয়া স্নান করিতাম। চৌবাচ্চা ছোঁয়া হইবে না বলিয়া কুয়ায় গিয়া স্নান করিতাম। বাড়ীতে চৌবাচ্চা বাঁধিয়া রাখায় ও জলের নল আনায় কাজেই কুয়ার জলের খরচ খুব কমিয়া গিয়াছিল, এবং জলও খুব বাড়িয়াছিল। একে ত কার্ত্তিক মার্গ শীর্ষের মাস, তাতে আবার তিন প্রহরে ঠাণ্ডা জলে স্নান—আমার সহ্য হইল না। ২০।২২ দিনের মধ্যেই আমার জ্বর আসিতে লাগিল। ৩।৪ দিনের পর "বহিনী রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন বলিয়া তাঁর জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার "বিশ্রামের" ঔষধ চলিতেছে, কিন্তু এখনও ঘাম হইতেছে না এবং জ্বরও কমিতেছে না।"—এইরূপ উদ্বেগ জন্মাইবার কোন কথা "আবা" ভাই বোধ হয় আমার স্বামীকে লিখিয়া থাকিবে। এইখানে বলা আবশ্যক যে, বাড়ীর বড় মেয়েরা যদিও এই প্রকারে আমাকে বড়ই জ্বালাতন করিত, কিন্তু আমার দুই দেওর আমার সহিত ভায়ের মতন ব্যবহার করিত। তাহারা কখন কখন আপন স্কুলের মজার মজার কথা ও মেয়েদের কিরূপ পৃথক্ পৃথক্ জটলা হয় তাহা বলিয়া আমোদ করিত। আমার পাঠাভ্যাসে তাহারা শুধু যে সাহায্য করিত তাহা নহে, নীচের তলার লোকদের কেহ কিছু আমার নিন্দা করিলে তাহার সহিত অথবা কোন মেয়ে আমার বিরুদ্ধে কথা বলিলে আমার পক্ষ লইয়া তাহার সহিতও ঝগড়া করিত। এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে এই দুই জন আমার পক্ষাবলম্বী ছিল, ইহাতেই আমার যাহা কিছু সান্ত্বনা। এইরূপ তাহারা আমার স্বামীকে পত্র পাঠাইবার পর দুই এক দিনের মধ্যেই আমার স্বামী পুণায় আসিলেন। আট দিন আমি শয্যাগত ছিলাম। ইতি মধ্যে আমি একটু ভাল বোধ করিলাম। জ্বর ভাল হইয়া গেলে, "উনি" সেখানে থাকিতে থাকিতেই,

মিস্ হরফর্ড আমাকে শিখাইবার জন্য আসিতে লাগিলেন। আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, হরফর্ডকে ছুঁইবার দরুণ স্নান করিবার দরকার নাই। কাপড় ছাড়িয়া ফেলিলেই হইল। এরূপ করিলেও তবু যদি সকলে রাগ করে, তাহা হইলে মেমের সহিত বেশি ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া বসিবে না; একটু পাশে সরিয়া বসিয়া কাজ করিবে। যখন সকল বাধার বিরুদ্ধে শিক্ষা আরম্ভ করা হয়েছে, তখন যাই ঘটুক না কেন শিক্ষার মাঝখানে ছাড়িয়া দিবে না,—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা রাগ করিয়াছে বলিয়া কিংবা বকিয়াছে বলিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া কিংবা আর কিছু করিয়া আপনার শরীর খারাপ করিবে না। স্নান করিবার দরুণ এখন তাহারা তোমাদের কষ্ট দিবে না। আমি আবার এক মাসের মধ্যেই আসিব, ইতি মধ্যে তুমি শান্তমনে বেশী করিয়া পাঠাভ্যাস করিয়াছ যেন দেখিতে পাই,—এইরূপ নানা কথা "উনি" বলিলেন। দুপর বেলায় মেম্ শিখাইতে আসিলে পর আমি গা ধুইব কি, কি করিব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই ৫।১০ মিনিট সেই রূপই বসিয়া রহিলাম। ইতি মধ্যে আমার ননদ লোকদিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে—"তাকে বলিবে কুয়ায় যাইয়া গা হাত ধুইয়া আমাদের জন্য আর ব্যামো বাধাতে হবে না। আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে। তাহার মধ্যে তোমার ব্যামো সারাবার জন্য আমাদের সময় নেই। যেমন ইচ্ছে নাচো, আরও বেশী কিছু করতে পার।" এই কথা শুনিয়া আমার মন একটু শান্ত হইল। কারণ আমার স্বামী বলিয়াছিলেন, "গা ধুইও না", সেই জন্য আমি এতক্ষণ ভাবনায় পড়িয়াছিলাম. এখন আপনা আপনিই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। তাহার পর একমাস পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস বেশ চলিতে লাগিল। বাড়ীর লোকেরা শান্ত হওয়ায় আমার মনও শান্ত হইল।

ভাষার-উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব)

কিরূপে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে মানবের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সকল দেশে প্রাচীন মনীষিগণ এই প্রশ্নের একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিলেও এ বিষয়ে সকলেরই একমত; তাহা এই,—যেদিন মানবের সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিনই স্রষ্টা স্বয়ং গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রবীজের ন্যায় এই ভাষাকেও মানব শিশুর কর্ণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভাষা ও মানবের সৃষ্টি একই সময়ে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রকৃতি সুন্দরী তাহার হৃদয় কপাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া অনেক নূতন তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যাহা মানবের চিন্তাস্রোতকে এক নূতন পথে প্রধাবিত করিয়া দিয়াছে। ছয় দিনে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এবং তজ্জনিত অত্যধিক পরিশ্রমবশতঃ স্রষ্টা ক্লান্ত দেহভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া সপ্তম দিবসে পালঙ্কশায়ী হইয়াছিলেন অথবা মানবের কুকীর্ত্তিজনিত গুরুতর ভার বহনে অক্ষম হইয়া বসুন্ধরা দেবী নারায়ণ সম্মুখে আবেদন পত্র হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলে চক্রীর চক্রাস্তমূলে যখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছিল তখন নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রে মুদ্রিত লোচনে বিশ্রাম সম্ভোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন আর নারায়ণী পদমূলে বসিয়া সতী-জনোচিত কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, এই সব কথাতে অপোগণ্ড শিশুর মনও আর প্রবোধ মানিতেছেনা। নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে স্বাভাবিক কার্য্যনিচয়ের মধ্যে কোন প্রকার হঠকারিতা কিম্বা ক্ষিপ্রহস্তের বিন্দুমাত্রও নিদর্শন নাই। এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছয় দিনে সৃষ্ট হয় নাই। চব্বিশ ঘণ্টার কথা দূরে থাকুক, এক নিমেষ কালের জন্যও স্রষ্টা তাঁহার চক্ষুকে মুদ্রিত করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। মানব ছয় হাজার বৎসর কিম্বা ষাট হাজার বৎসর কাল মাত্র পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিতেছে এ কথাও ঠিক নহে। কত কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যে আদি মানব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এক দিনেও সৃষ্ট হয় নাই, অথবা দৈহিক কি মানসিক গুণে একেবারেই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি লাভ করে নাই।

সৃষ্টিপ্রকরণ এক আশ্চর্য্য রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। সামান্য ইষ্টক খণ্ডের সমষ্টি দ্বারা যেমন অত্যাশ্চর্য্য মনোহর গগনস্পর্শী রাজপ্রাসাদনিচয় নির্ম্মিত

হইয়া থাকে তেমনই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের দৃষ্টি-শক্তি-বহির্ভূত জীবাণু লইয়াই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে মানবাকারে ব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই উন্নতি ও অভিব্যক্তি ব্যাপারে প্রকৃতিকে যে কতদূর সাবধানতার সহিত চলিতে হইয়াছে ইহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অনধিগম্য। সৃষ্টিকার্য্য যুগ যুগান্তরব্যাপী, নীরবে জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে অতি সাবধানতার সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে জননীর জঠরদেশে অবস্থান কালে তাহার শরীর কি প্রকারে গঠিত হয় ভ্রূণ-তত্ত্ব (Embryology) শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতি কি সাবধানতার সহিত না তথায় কার্য্য করিতেছে। শোণিত ও শুক্রের সংযোগ সংঘটন দ্বারা সামান্য কীটাণুটীকে (Spermatoze) কত গণনাতীত-রূপের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া অবশেষে ইহাকে মানবের দেহ প্রদান করিয়াছে এ বিষয় যতই চিন্তা করা যায় ততই একদিকে যেমন আমরা সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানকৌশল দেখিতে পাই, অপর-দিকে কিরূপ সাবধানতার সহিত এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহা দেখিয়া আমাদের চিত্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করে। শিশু ভূমিষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হইলে প্রসূতিকে কতই না যাতনা ভোগ করিতে হয়। মানবশিশুর সৃষ্টিকার্য্য যেমন চক্ষুর অন্তরালে জননীর জরায়ুপিণ্ডের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে জননীকে দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, তেমনি নৈসর্গিক জগতে প্রত্যেক নূতন জীবের আগমনের পূর্ব্বে তাহার সৃষ্টিকার্য্য নিভৃত স্থানে সম্পন্ন হইতে এবং প্রসূতির গর্ভবেদনার ন্যায় প্রকৃতিও নিজে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া তাহার এই অভিনব সন্তানকে প্রকাশিত করেন। একদিনে কিংবা ইচ্ছামাত্রেই কোন পদার্থের সৃষ্টি হয় নাই এবং অতি কষ্টলব্ধ ধন বলিয়া জননীর নিকট তাহার সন্তানের যেরূপ আদর, প্রকৃতিও প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থকেই তেমনি আদরের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্য্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এবং বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও উদ্যোগে সম্পন্ন হয় ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। "ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল" কবিত্বের হিসাবে এই কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি প্রকারে এবং কত সময়ব্যাপী চেষ্টার ফলে যে এই ভানু প্রকাশিত হইয়াছে মানবের পক্ষে কি তাহা ধারণা করা সম্ভব? সৃষ্টি প্রকটন ক্রমোন্নতিতে এই ক্রমোন্নতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া যেমন জগতের ধারণা ছিল, তেমনি ভাষা-কেও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিশেষ দানরূপে আমরা লাভ করিয়াছি এই সংস্কার ছিল। Archbishop Trench তাঁহার "The Study of Words" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "The true answer to the inquiry how language arose is this :—God gave man language just as He gave him reason, and just because He gave him reason ; for what is man's word, but his reason coming forth that it may behold itself ? They are indeed so essentially one and the same that the Greek language has one word for them both. He gave it to him, because he could not be man, that is, a social being, without it."

(ক্রমশঃ)

শোক-সংবাদ।

পরলোকগত কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—

এখনকার নবীন সাহিত্যিকগণ হয় ত বা কবি গোবিন্দ-চন্দ্রের নাম সর্ব্বদা স্মরণ না করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা প্রবীণ সাহিত্যিক, তাঁহারা এখনও গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম সর্ব্বদা মনে করেন। এখন অনেক স্বদেশী গান রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন ঠাকুর বাড়ীর 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখ সাগর সাঁতারে পার হবে' বাঙ্গালীর প্রধান স্বদেশ-সঙ্গীত ছিল। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম, তখনই কবি গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে' গান বাহির হইয়াছিল এবং তাহার অব্যবহিত পরে বা সেই সময়েই তাঁহার 'যমুনা লহরী' কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।' কবিতা তখন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই

তখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। সে বহুদিনের কথা। তাহার পর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরা নগরীতে সেই ঋষিকল্প কবিকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছিলাম; আগরার যমুনাতীরে বসিয়া কবির 'যমুনা-লহরী' গান করিয়াছিলাম। সেই বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি, সুদূর আগরা-প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় আর ইহলোকে নাই। পরিণত বয়সে তিনি অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। কবি গ্রে যেমন 'এলিজি' লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র তেমনই 'কতকাল পরে বল ভারত রে'! ও 'যমুনা-লহরী' লিখিয়াই অমর হইয়াছেন। তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গোবিন্দচন্দ্রের নাম থাকিবে। 'যমুনা-লহরী'র কবি বলিলেই গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় হয়; তবুও তাঁহার অন্য একটা পরিচয় দিই। ঢাকার সর্ব্বপ্রধান উকিল, স্বদেশ-হিতব্রত, জননায়ক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় গোবিন্দ বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। গোবিন্দ বাবু যৌবন-কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আগরায় গমন করেন এবং সেখানে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি আগরাতেই জীবন কাটাইয়াছেন এবং আগরার যমুনাতীরেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় এখন কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমরা কবি গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ও অন্যান্য পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। (ভারতবর্ষ)।

৺ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ—বিগত ১৫ পৌষ ভুবনডাঙ্গা বোলপুরনিবাসী হেমেন্দ্রনাথ সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। হেমেন্দ্র বাবু একজন প্রতিভাশালী সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত "প্রেম" বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি আরও কয়েকখানি সুচিন্তিত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রপিতামহ ভুবনমোহন, পিতামহ প্রতাপনারায়ণ—মহর্ষিদেবের সহিত ইঁহাদের বহু কালের যোগ। কতক কাল পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাটীতে ব্রহ্মোৎসব করিয়া আসিয়াছেন। হেমেন্দ্রনাথকে মহর্ষিদেব অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। হেমেন্দ্রনাথের শরীর গত দুই বৎসর হইতে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভবানীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির ইংরাজি অনুবাদ বিলাত ছাপাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ৬ পুত্র ও ২ কন্যা, পত্নীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রেমানন্দ এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী ও মাতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব জানি না। ঈশ্বর তাঁহাদের কাতর প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার প্রেমের ক্রোড়ে স্থান দিন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৺ শক্তিপতি মুখোপাধ্যায়—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজের এক জন নিয়মিত উপাসক। তাঁহার মত লোক জগতে বড় বিরল। তিনি মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের একটি হরিসভার সম্পাদক ও আর একটি হরিসভার সহকারী সম্পাদক হইলেও প্রতি বুধবার তিনি তাঁহার আবাসনিকেতন ফতেপুর হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। চারি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হওয়া এক জন ৭০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতির এবং তথায় প্রদত্ত উপদেশের তিনি বিশেষ অনুরাগী। তাঁহার হৃদয়ের উদারতা অনুকরণীয়। তিনি সংপ্রতি শক্তিপতি পুত্ররত্নকে হারাইয়াছেন। পুত্রটির বয়স প্রায় ৩০ বৎসর। তিনি উপার্জ্জনশীল ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে পঞ্চানন বাবু অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। আমরাও এই সাধু পিতার জন্য নিতান্ত কাতর। পঞ্চানন বাবু নিজে ধর্ম্মপ্রাণ। ভগবান তাঁহার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন এবং পিতামাতার ক্রোড় হারাইলেও সেই পরমপিতা এই পরলোকগত পুত্রের আত্মাকে স্বীয় চরণে স্থান দান করুন, ইহাই আমাদের মিনতি।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর তাঁহার প্রণীত তিন খানি গ্রন্থ আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন—(১) খাদ্য; (২) Prevention of Small Pox; এবং (৩) পল্লীস্বাস্থ্য।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, কাশী যোগাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আদিব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন—(১) ভক্তি ও উপাসনা; (২) A simple means of mass education; (৩) গীতাশতকং; (৪) ছন্দোবোধিকা; (৫) তত্ত্বচিন্তার; (৬) ত্রিগুণ গাথা; (৭) জ্ঞানোদয়; (৮) শ্রীকৃষ্ণ সৎকথামৃত।

অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা-সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

মাঘোৎসব সংখ্যা।

উনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৫ সংখ্যা | ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

ব্রহ্মযোগ।

(মাঘোৎসবের উদ্বোধন)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১০ই মাঘের সান্ধ্য উপাসনায় বিবৃত)

সম্বৎসর পরে আজ আবার উৎসবের সম্মুখে আমরা বন্ধুবান্ধবের সহিত ভক্তজনগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি। আজিকার এই উৎসবে এই শুভ পবিত্র সময়ে ভগবানের নামে আমরা পরস্পরকে উৎসাহ দিয়া বলিতে চাহি—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—উঠ—উঠ—উঠ—জাগ্রত হও।

এই সেদিন ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলন উপলক্ষে এই মহানগরীতে—এই মহানগরীতে বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কি একটা মহান্ প্রাণতরঙ্গ চলিয়া গেল। যদি রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আমরা এই আশ্চর্য্য উৎসাহ, এই আশ্চর্য্য জাগরণ দেখাইতে পারি, তবে এই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমিতে আধ্যাত্মিক অধিকার লাভের জন্য অন্তত সেইটুকু উৎসাহ, সেইটুকু জাগরণও কি দেখাইতে পারিব না? কেবলি কি টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করিয়া, কেবলি কি গাড়ীঘোড়া ঘরবাড়ীর বিষয় চিন্তা করিয়া জীবনকে ক্ষয় করিতে থাকিব? তাহাতে মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা কোথায়? মনুষ্যত্ব লাভ দূরে থাক, যে শান্তির আশায় আমরা বিষয়কর্ম্মে নিজেকে ঢালিয়া দিই, সেই শান্তিরও আশা সুদূরপরাহত। কেবল অর্থসঞ্চয় করিব, কেবল ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিব, এই আশা লইয়া পাশ্চাত্য জাতিরা ধর্ম্মের সহিত হৃদয়ের বড় একটা সম্বন্ধ রাখে নাই। তাহার ফলে তাহারা এ পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তির আস্বাদ অনুভব করে নাই। পরিণামে তাহাদের অন্তরের অশান্তি যখন সমস্ত সীমা অতিক্রম করিল, তখনই তাহা সমাজরক্ষা দেশরক্ষার বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একটী সুবৃহৎ অগ্নিদগ্ধ কটাহে পরিণত করিল। আমরা কি সেই অশান্তি চাই, অথবা ভগবানের চরণে কাঁদিয়া পড়িয়া শান্তি ভিক্ষা করিতে চাই?

সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বরের পথে না চলিলে কখনই প্রকৃত শান্তির আশা করিতে পারি না। মতামত লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া, কথা কাটাকাটি ছাড়িয়া দিয়া, সকল শাস্ত্র, সকল দেশের সকল লোকে সকল যুগ ধরিয়া যাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেবদেবের চরণে আমাদিগকে আছড়াইয়া পড়িতে হইবে। এই অর্থদরিদ্র কিন্তু ধর্ম্মধনী ভারতভূমিতে যে জাগরণ আসিয়াছে, ঈশ্বরকে প্রাণে ধরিবার, তাঁহার পতাকা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, কুটীরে কুটীরে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন শুভ অবসর হারাইলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঈশ্বরের পথে চলিবার

পথ কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। যোগসিদ্ধ ঋষি-মুনিগণ তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সিদ্ধ মন্ত্র সকল সেই পথে দীপ্ত প্রদীপ স্বরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা সেই সকল মন্ত্র আমাদিগের প্রতিদিনের ব্যবহারে আনিবার জন্য আশ্চর্য্য ব্যবস্থা সকলও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। শত রাষ্ট্রবিপ্লব, শত সমাজবিপ্লব, শত মতবাদ সেই মন্ত্রদীপগুলি নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই, সে ব্যবস্থাও মুছিয়া দিতে পারে নাই। আমরা যদি কেবল কতকগুলি মুখস্থ মন্ত্র না আওড়াইয়া যথার্থ হৃদয়ের সহিত পূর্ব্বপুরুষগণের তর্পণ করিতে চাহি, তবে আমাদের প্রত্যেককে সেই অক্ষয় মন্ত্র সকল অবলম্বনে সেই অক্ষয় পুরুষের সহিত অখণ্ড যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার ফলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিব যে আমাদের দেশ একদিকে শান্তির পথে, অপরদিকে পূর্ব্বতন গৌরবের পথে কি প্রকার দ্রুতপদে অগ্রসর হয়।

আমরা আজ এই প্রশ্ন করিতে চাহি, আমাদের মধ্যে কয়জন ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে সংবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়াছি? আমাদের মধ্যে কয়জন আগামী উৎসবকে সার্থক করিতে যত্নবান হইয়াছি? তর্ক বিতর্ক করিয়া আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা কয়জন সত্যসত্য ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি? আমরা ভুলিয়া যাই যে আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত কার্য্যকে একমুখী—ব্রহ্মের অভিমুখী করিতে হইবে। ইহার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি কোন কার্য্যে, কোন অবস্থায় ঈশ্বরের আদেশের সহিত সংসারের বিরোধ ঘটে, তবে সেই কার্য্যে সেই অবস্থায় সংসারকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে হইবে—সংসারের ভয় ও প্রলোভনকে পায়ের তলে দলিয়া ফেলিতে হইবে। ব্রহ্মপরায়ণ গৃহস্থ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারের দাসত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা স্বাধীন ঈশ্বরের স্বাধীন সন্তান। সেই পিতার সহিত, এই আকাশের অধিপতি মহান্ পুরুষের সহিত, এই আত্মার অধিপতি পরমাত্মার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছাকে একেবারে মিলাইয়া দিতে হইবে। তবেই আমাদের মঙ্গল, তবেই আমাদের গৌরব, তবেই আমাদের উৎসব সার্থক।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, আমাদের জীবনকে ব্রহ্মময় করিয়া তুলিতে চাহিলে আমাদের অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বরকে যন্ত্রী এবং আমাদের নিজেকে তাঁহার যন্ত্র বলিয়া প্রাণের ভিতরে জানিতে হইবে। আগুনের সহবাসে যেমন ঘৃত গলিয়া যায়, ভগবানের সহবাসে আমাদের নিজেকে তেমনি গলাইয়া ফেলিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, ইহা কেবল জ্ঞানেতে জানিলে চলিবে না। তাঁহাকে প্রেমেতে জানিয়া আমাদের জীবনকে এমন প্রস্তুত করিতে হইবে যে তাঁহার নামেমাত্র আমাদের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠে। ঐ যে সকল কার্য্যে আমি-কে দেখিতে চাহি, সকল কথায় আমি-কে ধ্বনিত শুনিতে চাহি, এই আমি-কে ভগবানের চরণে না বলি দিলে নবজীবন পাইবার আশা বৃথা। এক আর এক-এ দুই হয় যেমন নিশ্চয় জানি, ঈশ্বরের সহবাসেই জীবন, এবং তাঁহার সহিত বিচ্ছেদেই মৃত্যু, ইহাও তেমনি করিয়া আমাদের অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে।

আজ এই উৎসবের প্রদোষে, এস, আমরা নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই পরমদেবতার অপরাজিত পতাকার তলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ছুটিয়া চলি। এই সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে তিনি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আমাদের সেনাপতি হইয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার অধীনে দাসত্ব করিতে যাইব? তাঁহার মত আর কে আমাদের অভাবসকল সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া পূর্ণ করিতে পারে? তিনিই আমাদের সংসারপথে একমাত্র বন্ধু। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের জীবনে কত আঘাত পাইতেছি; কত আত্মীয়স্বজনকে হারাইয়া শোকে অধীর হইতেছি, বন্ধুবান্ধবের নিকট কতবার মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইতেছি; কিন্তু এ সকলই সহ্য হইতেছে, কেবল সেই প্রাণের বন্ধু পরমেশ্বর যথাসময়ে সকল আঘাতের উপরেই তাঁহার মধুময় শান্তিবারি বর্ষণ করেন বলিয়া।

আজ এই উৎসবের প্রারম্ভে, এস, আমরা সকলে মিলিত কণ্ঠে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকি। তাঁহাকে ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি কখনই নিস্তব্ধভাবে স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন না। হৌক না কেন তাঁহার সুবৃহৎ আকাশব্যাপী স্বর্ণ-সিংহাসন, হৌক না কেন তাঁহার শত শত চন্দ্রসূর্য্য-খচিত মুকুটরাজি, মানুষের—একটীও মানুষের ব্যাকুল হৃদয় তাঁহার নিকট সেই স্বর্ণসিংহাসন, সেই মুকুটরাজি অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান। তাঁহাকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তিনি সকলই পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্র মানবসন্তানের হৃদয়ে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইলে তোমার শোকতাপ বিপদআপদ থাকিতেই পারিবে না—তিনি তাঁহার করুণাকোমল মাতৃহস্তে তোমার চক্ষের জল নিশ্চয়ই মুছিয়া দিবেন। আজ তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া, এস, আমাদের জীবনকে ধন্য করি, আমাদের মনপ্রাণ শীতল হৌক। এই শুভ মুহূর্ত্তে, এই পবিত্র স্থানে তাঁহার করুণাবারি অজস্রধারে বর্ষিত হৌক। এই স্থান এখনই ঋষিদিগের পুণ্য তপোবনে পরিণত হৌক।

অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

মাঘোৎসব আসিল ও চলিয়া গেল। এবারকার উৎসবে একটি গভীর ও পবিত্র ধর্ম্মভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে গত কয়েক বৎসর বোলপুর হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মনাম গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিত, কিন্তু গত বৎসরে তাহারা কলিকাতায় আসিবার পর তাহাদের মধ্যে দুএকজন অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবার তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের কলিকাতায় আসা সম্বন্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ উৎসবের তিন চারি দিন পূর্ব্বে বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেও বোলপুরের ছাত্রগণকে লইয়া শান্তিনিকেতনে উৎসব করিবার জন্য দুর্ব্বল দেহেই তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনা মহর্ষিদেবের বাটিতে সুসম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদীর আসন গ্রহণ করেন। সুধীন্দ্র বাবুর উদ্বোধন এবং চিন্তামণি বাবুর উপদেশ সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রাত্রের উপাসনায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করেন। উৎসবক্ষেত্র পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বেদগান হইয়া যথা-সময়ে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বেদগানের সময়ে শ্রোতাগণ সকলেই দণ্ডায়মান হওয়াতে এক স্বর্গীয় দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল। সে দৃশ্যে আমরা প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু উদ্বোধন, এবং ক্ষিতীন্দ্র বাবু উপদেশ দান করেন। প্রাতে ও সায়াহ্নের উপাসনা সকলকেই তৃপ্তিদান করিয়াছিল। এ বৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী, শোভনা দেবী, গার্গী দেবী, বাণী দেবী ও মেধা দেবী কয়েকটী গান গাহিয়া সমস্ত লোককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। রাম-প্রসাদী সুরের দুইটি সঙ্গীত বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেই দুইটি গান (প্রণাম এবং মাতৃপূজা) ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ায় পুনরায় সেগুলি প্রকাশ করা হইল না। উপরোক্ত দুইটি গান ব্যতীত আর একটি নূতন গান গীত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নূতন গান।

(শ্রীসরলা দেবী)

রাগিণী মেঘমল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

আজিকে মম বক্ষ ভরি
উঠিছে একি ক্রন্দন!
না জানি পরশ-অতীত কারে চাই!

মহাকাশের চন্দ্রমা সে
নিখিল-জগ-বন্দন!
তারে চাই, তারে চাই,
তারে আমি চাই!

যদিও বা অশক্ত আমি,
শক্তিময় হৃদয়স্বামী
আপন প্রেমে আসিয়ে নামি
করেন যদি নন্দন!
কিবা চাই, কিবা চাই,
আর কিবা চাই!

ইচ্ছা জাগে যার ইচ্ছায়
যোগ্যতায় সেই সাজায়
আপন হাতে যদি পরায়
দীনতা-ফুলচন্দন!
যারে চাই, যারে চাই,
যারে আমি চাই!

মানবজীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

(উদ্বোধন)

(শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

আজ উৎসব-আরম্ভে আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। তাঁর অযোগ্য সন্তান হ'লেও বৎসরান্তে এই দিন সকলে একত্র সমবেত হ'য়ে যে, আমরা তাঁর নাম করতে, তাঁর নাম শুনতে, তাঁকে ডাকবার অবসরটুকুও পাই এইই আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্লাঘার কথা, গৌরবের কথা, অসীম বল ভরসা আশা আশ্বাসের কথা এই যে, এমন যে ত্রিভুবনপতি পরমেশ্বর তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। 'তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান' একথাটা অতিশয় ছোট ও পুরাতন হ'লেও এর মধ্যে যে শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত আছে তাইই এ জগতের একমাত্র রক্ষা-কবচ। এর স্মরণে, অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে মহাদুঃখী যে সে তার দুঃখ ভুলে যায়, দুর্ব্বল মৃতপ্রায় যে সে নবশক্তি লাভ করে, পাপী যে সে আশার কিরণ, পরিত্রাণের উপায় দেখতে পেয়ে জীবনকে নূতন পথে ফিরিয়ে নেয়। 'তিনি আমাদের সকলেরই পিতা, আমরা সকলেই তাঁর সন্তান' আজ এই কথাই স্মরণ করে' প্রাণে বল পেয়ে এই আসন গ্রহণ করে' আমি দুই একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছি।

মানবজীবনকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। জীবনের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ।

জীবনের আরম্ভে আমরা যখন শিশু থাকি, তখন আমরা আপনা হ'তে আপনার সব চেয়ে বড় মঙ্গলটি কেমন করে' বুঝে নিই, পৃথিবীতে সব চেয়ে আমাদের নিরাপদ স্থান কোথায় তা' ঠিক করে' নিয়ে সেইটিকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' থাকি। তাই শিশুকালে আমরা আমাদের মা'র কোলে বাঁচি ও দিনে দিনে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে অপূর্ব্ব মনুষ্যত্ব লাভ করি। শিশুকালে আমরা একমাত্র আমাদের মাকেই চিনি ও চাই, আমাদের প্রাণের কেবল একটি ডাক 'মা' নাম, আমাদের একটি আশ্রয় মা'র কোল। ভগবানের কি কৌশল, কি করুণা, যে নিতান্ত অসহায় দুর্ব্বল, তাকে প্রেরণার বলে তার মঙ্গলকে গ্রহণ করিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন।

তারপর ক্রমে ক্রমে যখন আমাদের জীবন ফুটে উঠতে থাকে, চোখ মেলে এ জগতের দিকে আমরা একবার ভাল করে' চেয়ে দেখি, তখন আমরা জানতে পারি যে, এই পৃথিবীর মা'ই আমাদের সর্ব্বস্ব নন, আমাদের আর এক মা আছেন যিনি জগৎকর্ত্রী জগদ্ধাত্রীরূপে এ জগৎ আলো করে' বিরাজ ক'রছেন। তাঁকে আমরা চোখে দেখতে পাইনে, তাঁর কথা আমরা কানে শুনতে পাইনে, তাঁর স্পর্শ আমরা দেহে অনুভব করিনে, তবুও তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর সত্তা আমরা যেমন নিকটতম ঘনিষ্ঠতমভাবে উপলব্ধি করি জগতে এমন আর কোন কিছুরই করিনে। তখন এই অরূপের দিকে আমাদের মন ধায় কিন্তু স্থির থাকতে পারে না, আকাঙ্ক্ষা যখন জ্বলে' ওঠে, সংসারের কোথা হ'তে দমকা বাতাস এসে তাকে তখনি নিভিয়ে দেয়। তখন আমরা যেমন ছিলুম আবার তেমনি থাকি। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন এই বাতাস হ'তে ঝড় ওঠে, তুফান ছোটে, ধূলায় আকাশ ভরে' যায়, অন্ধকারে আমরা আশ্রয় খুঁজে হাহাকার করে' বেড়াই, তখন এই অরূপের রূপই অন্ধকারে আলো হয়ে' নির্ভয় আশ্রয় দিয়ে আমাদের রক্ষা করে। এখানেও ভগবানের আশ্চর্য্য করুণা আমরা দেখতে পাই,—সংসারের মাকে দিয়ে তিনি আমাদের বাঁচান ও চোখের জলে আমাদের জীবন ধুয়ে নিয়ে তাঁকে দিয়ে আনন্দে আমাদের জন্ম সার্থক করেন।

তারপর জীবনের শেষ দশায় যখন আমাদের শরীর মন ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, গর্ব্ব মান সব

টুটে যায়, তখন সেই পরমাশ্রয়কেই লাভ করবার জন্য আমাদের মন আপনা হ'তেই ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। সময় থাক্‌তে যা আমরা বুঝিনি, অন্তিমে তা বুঝতে পারি—এ অকূল-ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী ভগবান, তিনি ছাড়া আমাদের গতি নেই, আর গতি নেই। ভগবানও তখন শিশুর মত আমাদের অসহায় দেখে' আপনা হ'তেই ধরা দেন, আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান, জীবন বৃন্তচ্যুত হ'য়ে তাঁরই চরণে অবসান লাভ করে।

মানবের এই তিন অবস্থার মধ্যে আমরা দেখলুম, শিশুই একমাত্র গোড়া থেকে অনন্যমন হ'য়ে একেকেই ধরে থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মও এই শিশুর মত একান্তুগত ধর্ম্ম, মানবপ্রাণের সহজ ও সরল ধর্ম্ম। ভগবানের সঙ্গে ব্যবধানরহিত অবিচ্ছিন্ন প্রাণের যোগের কথাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল কথা। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নয়, ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতের একমাত্র সত্যধর্ম্ম, মানবের প্রাণগত চিরন্তন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মগ্রহণের উপর ধর্ম্মের সারবত্তা বলবত্তা নির্ভর করে না, সত্যের উপরই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্ম ধর্ম্মেরই জন্য। আমরা জানি এদেশে ব্রাহ্মের সংখ্যা অত্যল্প, তবুও বল্‌ব ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, জগতের একমাত্র ধর্ম্ম। আর যদি ঠিক সত্য কথা বল্‌তে হয়, তবে এটা আমরা বেশ জানি কেবল সমাজ ও লোকাচারের ভয়ে আমরা প্রকাশ্যে এ ধর্ম্মকে গ্রহণ করিনে, কিন্তু মনে মনে আমরা সকলেই এ ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করি ও অন্তরে এ ধর্ম্মকেই বরণ করে' নিয়েচি।

তুমি বল্‌চ, ভগবানকে তুমি চোখে দেখ্‌তে পাওনা, কেমন করে' তাঁর অস্তিত্বে তুমি বিশ্বাস করবে, তাঁকে ধারণা করবে? কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন তোমার মনে ব্যথা পাও আর সে কথা অন্যকে জানাও, তখন যদি সেই ব্যক্তি তোমাকে 'জিজ্ঞাসা করেন তোমার মন কোথায়, তোমার ব্যথাই বা কি, তখন তুমি কি তোমার মনকে দেখাতে পার, না তোমার ব্যথার স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে পার? তবুও তুমি মনে ব্যথা পেয়েছ একথা সত্য। ভগবানও তেম্‌নি বাহিরের বস্তু নন, তিনি অন্তরের বস্তু, প্রাণের বস্তু, অন্তরের অন্তরতলস্থিত আত্মার একমাত্র ভোগ্য। তিনি যাকে অন্তরে জানান্ দেন, তার আর রক্ষা নেই, সে তাঁকে পাবার জন্য একেবারে পাগল হ'য়ে যায়। তিনি এম্‌নি সত্যবস্তু।

আজ এই উৎসবক্ষেত্রে ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা ভগবানকে আমাদের অন্তরে দেখতে পাই, তবেই আমাদের সকলি চরিতার্থ হবে, তাঁর প্রীতি যদি ক্ষণকালের জন্যও আমরা প্রাণে আস্বাদন করতে পারি তবেই আমাদের জীবন মধুময় হয়ে যাবে। দেখ, রমণীয় প্রাতঃকাল তাঁর পূজা-উপকরণে কেমন আরও রমণীয় হ'য়েছে। তিনি আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য এখানে আবির্ভূত হ'য়েছেন, এস, আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে তাঁর পূজা করে' জীবনকে সার্থক করি।

হে ভগবান! হে এক! তুমিই একমাত্র আমাদের ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী, তুমি ভিন্ন আমাদের গতি নেই, আর গতি নেই। আমরা দুর্ব্বল, তুমিই একমাত্র আমাদের বল, ভরসা; আমরা বিভ্রান্ত, তুমিই একমাত্র আমাদের জীবনের শান্তি, আলো; আমাদের আর কেহ নেই, করুণাময় তুমি আছ বলেই আমরা বেঁচে আছি, আমরা তোমারই কৃপার ভিখারী। আজ আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের নিকটে এস, আমাদের বিভ্রান্ত মনকে শান্ত কর, আমাদের অন্তরের সমস্ত বিষাদ মলিনতাকে দূর করে দাও, আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর, এ উৎসবকে সার্থক কর। তোমাকে অধিক আর কি জানাব,—দয়া কর, তুমি দয়া কর। তোমার চরণে ভক্তিভরে আমরা বারবার প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভারতের ধর্ম্মতরঙ্গ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনায় বিবৃত)

ভারতের এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ধর্ম্মের কত তরঙ্গ যে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে। তরঙ্গ তো চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতি তরঙ্গ পশ্চাতে এক একটি স্তর রাখিয়াছে। সেই অতি প্রাচীন বৈদিক যুগে যে তরঙ্গ সমুত্থিত

হইয়াছিল, আমরা সেই তরঙ্গ-পরিত্যক্ত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই ? না, প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ বজ্র বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ুর শক্তির ভিতরে ভগবৎ-দর্শনের আকুল চেষ্টা। তাহার অব্যবহিত পরে উপনিষদের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহার অবসানে স্তরের ভিতরে কি রহিয়াছে ? না, অন্তরের ভিতরে, আত্মার অভ্যন্তরে ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। কালবিলম্বে দর্শনের যে তরঙ্গ চারিদিক হইতে উত্থান করিল, তাহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে ? না, ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান উপলব্ধি করিবার জন্য নিদারুণ সাধনা; কোথাও বা দেখিতে পাই ঈশ্বরই সত্য এবং আর যাহা কিছু দেখি সমস্তই মায়া বা মিথ্যা, এই বোধ আনয়ন করিবার জন্য আকুলতা। বুদ্ধদেব যে তরঙ্গ ছুটাইয়া দিলেন, সেই তরঙ্গপরিত্যক্ত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই ? না, বাসনা নিবৃত্তি, নির্ব্বাণ লাভের জন্য আয়োজন এবং জীবে দয়া। গীতার তরঙ্গের ভিতরে কি দেখিতে পাই ? না, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধন ও ফলকামনাত্যাগ। তন্ত্রের রহস্যময় তরঙ্গ যে স্তরটি রচনা করিয়া দিল, তাহার সকল মর্ম্ম বুঝিবার আমাদের সামর্থ্য না থাকিলেও বুঝি যে মাতৃভাবে ভগবানের সাধন উহার অন্যতম উপাদান। দিগন্ত-ব্যাপী পুরাণের তরঙ্গ, যাহা এই পুণ্যক্ষেত্রের উপর এখনও চলিতেছে, সেই তরঙ্গ-বিরচিত স্তরের ভিতরে কি দেখিতে পাই ? না, কাহিনীর ভিতর দিয়া, কল্পনার ভিতর দিয়া, আদর্শ-চরিত্রের ভিতর দিয়া, দয়া প্রেম, নীতি শ্রদ্ধা ও ত্যাগধর্ম্মের বিপুল প্রচার চেষ্টা। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত তরঙ্গের এখনও বিরাম হয় নাই, কিন্তু সেই তরঙ্গের অন্তরালে কি দেখিতে পাই ? না, ভক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস।

এই সমস্ত প্রবল তরঙ্গের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট অনেক তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া আমাদের দেশের প্রাণকে সুকোমল করিয়া রাখিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস, অসংখ্য ধর্ম্মতরঙ্গের ইতিহাস। আমাদের দেশের প্রকৃত সংগ্রাম চরিত্র-সংগঠনে এবং অন্তরের রিপুকুল-বিজয়ে। আমাদের জয়োল্লাস ত্যাগে, শান্তিতে, নিষ্ঠায়, বিনয়ে এবং সাধনে।

যখন কোন একটি ধর্ম্মমত বা তাহার সাধনার ভাব ব্যাপক কাল ধরিয়া কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমরা দেখিতে পাই, কালক্রমে মনুষ্যের দুর্ব্বলতা উহাকে কীটদষ্ট কাষ্ঠ-খণ্ডের মত জীর্ণ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা পায়। বৈদিক সময়ে প্রকৃতির শক্তির ভিতরে ব্রহ্মদর্শনের আকুল চেষ্টা চলিয়াছিল; কিন্তু অগ্নি বায়ু চন্দ্র সূর্য্য, সাধকের দুর্ব্বলতায়, ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিবার যখন উপক্রম করিল, উপনিষদের জ্ঞানোন্নত ঋষিদিগের সমুচ্চ কণ্ঠ ঘোষণা করিয়া দিল, "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ" সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অগ্নি ত দূরের কথা। বাহিরে, প্রকৃতিকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শনের বিভীষিকা আছে দেখিয়া, উপনিষদ প্রচার করিলেন "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্য" আত্মার মধ্যে পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট হও।

উপনিষদ্ যখন "সত্যং জ্ঞানং মনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন, দর্শনের ঋষিগণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। গায়ক গান করিতে করিতে যখন তন্ময় হইয়া যান, তাঁহার কণ্ঠ হইতে তান আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে; তাঁহার স্বর উচ্চ হইতে সমুচ্চ গ্রামে সমুত্থিত হইতে থাকে। ঠিক সেই ভাবে ঋষিরা ভগবানের সত্য-ভাব যখন গভীররূপে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, যে তিনিই একমাত্র সত্য, আর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই মিথ্যা, সবই মায়া। ইহাই একভাবে অদ্বৈতবাদের মূল। কিন্তু সাধক আবার অন্যদিকে তাঁহার সহিত উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ ভুলিতে চায় না, তাই আবার দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি। যজ্ঞে পশুবধ যখন বুদ্ধদেবের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল এবং যাজ্ঞিকের ফল-কামনা তাঁহার অন্তরে আঘাত দান করিল, আধিব্যাধি-সঙ্কুল জরা-বার্দ্ধক্যপরিপূর্ণ মনুষ্য-জীবনের চিত্র চক্ষুপীড়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি অহিংসার উপরে, বাসনাত্যাগের উপরে তাঁহার ধর্ম্মের পত্তন করিলেন। ফল-লাভের লোভ যখন কর্ত্তব্যজ্ঞানকে মলিন করিবার উপক্রম করিল,

গীতাকার আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, কর্ত্তব্যের জন্যই তাহা সংসাধন করিতে হইবে, সুকৃতির লোভ তাহার নিয়ামক হইলে চলিবে না। ক্রমে যখন এদেশে জ্ঞানের আলোচনা খর্ব্ব হইয়া আসিল, বৌদ্ধ-বিপ্লব আসিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিল, সেই সময় হইতে কাহিনী-মুখে কল্পনার সাহায্যে বৈদিক যুগের সত্য প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে পৌরাণিক যুগের সূত্রপাত হইল। লোকে এতদিন ভগবানকে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা এই পিতৃ-নামে সম্বোধন করিয়া আসিয়াছিল, তন্ত্রের যুগ তাঁহাকে পরম-মাতা, বিশ্বজননীরূপে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। সন্তানের কল্যাণকামনায় পিতার স্নেহের ভিতরে একটু কাঠিন্য আছে বলিয়া আপাতত মনে হইতে পারে, কিন্তু মাতার হৃদয়ে কেবলই স্নেহ, কেবলই দয়া, কেবলই মার্জ্জনা। সাধক যখন চারি-দিকে আপনার দুর্ব্বলতা দেখে, তখন ভগবানকে মাতৃরূপে সম্বোধন না করিয়া সে আর থাকিতে পারে না। মাতৃরূপে ডাকিয়া সে অভয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই তন্ত্রের বিশেষত্ব। ঈশ্বরের নিকট শক্তি-লাভের আশায় যখন পশুবধ আরম্ভ হইল, যখন পশুরক্তে ধরণীর গাত্র কলঙ্কিত হইতে লাগিল, বাহ্য-উপকরণ বাহিরের আয়োজন যখন পূজার স্থান অধিকার করিল, গৌরাঙ্গদেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রেম ও ভক্তির বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিলেন। নাম-সাধন, পূজার আড়ম্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতে এই পুণ্য ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আবার যখন বিগত শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষার ও দীক্ষার প্রভাবে এদেশে সম্পূর্ণ নূতন আলোকের সম্পাত হইল, রামমোহন রায় আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি বেদ-বেদান্তের কীটনিষ্কুষিত পুঁথি উদ্ঘাটন করিতে আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টীয় ও মুসলমানী ধর্ম্ম-সাহিত্য পাঠ করিলেন, আমাদের গতিমুক্তির পথ সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। উপনিষদের উপরে, বেদ বেদান্তের উপরে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে, এই আড়ম্বর-বিহীন ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সার্ব্বজনীন ভাব ইহার সহিত মিলিত করিয়া দিলেন, বিশ্ব-জনীন সত্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সুর মিলাইয়া দিলেন, এবং আমাদিগকে জাতীয়ত্বে অথচ সত্যে রক্ষা করিবার পথ প্রমুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা-রই প্রচারকল্পে অদ্যকার পবিত্র দিনে আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। তাই আজ সত্য-ধর্ম্ম ঈশ্বরের নামে এবং রাজা রামমোহন রায়ের নামে আমরা এখানে মিলিয়াছি। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিলেন, তাঁহাকেও আজ এই ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ঈশ্বরের সঙ্গে স্মরণ করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি।

আমাদিগকে এক্ষণে আলোচনা করিতে হইবে, যে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সম্যকরূপে বিকশিত করি-বার জন্য অতীতের স্তর হইতে কি কি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। আমরা লইয়াছি বৈদিক সময়ের নিখিল প্রকৃতির ভিতরে ব্রহ্ম-দর্শনের ভাব। তাই "ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু" যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা, ইহাই আমাদের উপাসনার প্রথম মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" এই মন্ত্র লই-য়াছি। ঈশ্বরের পিতৃভাব বেদ হইতে, তাঁহার মাতৃভাব তন্ত্র হইতে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সখ্য ভাব আমরা বেদ ও পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি, অহিংসার ভাব আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতির ভাব এবং চরিত্রের আদর্শের ভাব আমরা পুরাণ হইতে লাভ করিয়াছে। পরিশুদ্ধ অহেতুকী ভক্তির ভাব আমা-দের ভিতরে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে স্থান পাইয়াছে। অথচ সকল ধর্ম্মের সারভূত অমূর্ত্ত ঈশ্বরের পূজার ভাব আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি। অথচ এ ধর্ম্ম যে সংগ্রহের ধর্ম্ম তাহা নহে। এই ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোকে সময়েরই আহ্বানে আপনা হইতে বিক-শিত, অথচ ইহাতে অন্যান্য ভাবের যুগপৎ-মিলন। স্বদেশীয় ভাব হইতেই ইহার উৎপত্তি এবং দেশীয় ভাবেরই উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা, অথচ বিজাতীয় সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম-কথার সহিত ইহার আশ্চর্য্য মিলন।

আমাদিগকে এই উৎসবের দিন আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্য সত্যই কি পাইয়াছি। ইহাতে যদি আমাদের জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে, ভক্তির উৎস উৎসারিত হইয়া যদি আমাদের প্রাণকে সুকোমল করিয়া থাকে, আমাদের চরিত্রকে বিমল করিয়া থাকে, শান্তির পিপাসাকে আরও বিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে, আমাদের অহঙ্কারকে বিচূর্ণ করিয়া থাকে, আমাদিগকে সাধন-প্রবণ করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব তিরোহিত করিয়া থাকে, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্যের পথ প্রমুক্ত করিয়া থাকে, তবে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ে আমরা জয়-যুক্ত। আমাদের অন্তরকে চিন্তাকে ধারণাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বিকশিত করিয়া দিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রহ্মের দিকে চিত্তের বৃত্তিকে স্থির করিয়া দিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। মনুষ্য এবং জীবজন্তুর উপরে মৈত্রী ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। ধ্যান ধারণা ও সমাধির ভাবকে জাগ্রত করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। এই ধর্ম্ম পালনের সকল অবস্থাতেই ইহাই আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার জ্ঞানোন্নত ভাবকে খর্ব্ব করিলে চলিবে না। ইহার ভক্তি-সমুন্নত ভাবকে ম্লান করিলে চলিবে না। সংস্কারের কোলাহলে কলরবে প্রকৃত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। ঈশ্বরই আমাদের পরম লক্ষ্য, তিনিই আমাদের পরম গতি, ইহাই অন্তরে ধরিয়া আমাদিগকে এই ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

হে পরমাত্মন্। তুমি কৃপা করিয়া এই সমুন্নত ধর্ম্ম আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছ। বল দাও আমাদিগকে, যাহাতে তোমার এই ধর্ম্মকে সম্যক ভাবে পালন করিতে পারি। নিষ্ঠা দাও, যাহাতে ইহাকে জীবনে রক্ষা করিতে পারি। জ্ঞান দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমাদের চেষ্টা বহির্মুখী হইয়া যাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ আনয়ন করিতে না পারে, তুমি তাহার সহায় হও। রোগে শোকে জ্বালায় যন্ত্রণায়, দুর্ভিক্ষে, পীড়নে, হতাশায়, আমরা ম্রিয়মান হইতেছি। তুমি আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হও, তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর, তোমার আলোক বিতরণ কর, নূতন প্রাণের নব চেতনার সঞ্চার কর, নিত্য নব দীক্ষা দান কর, ইহাই অদ্যকার দিনে তোমার চরণপ্রান্তে আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মাতৃপূজা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের সান্ধ্য উপাসনায় বিবৃত)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবতা সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিত আছেন, সেই দেবতাকে বারম্বার নমস্কার করি।

যে দেবতা মাতৃরূপে এই সমগ্র ভূতচরাচর, এই সূর্য্যচন্দ্রগ্রহউপগ্রহসমন্বিত বিরাট ব্রহ্মাচক্রকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া লালন পালন করিতেছেন, যাঁহার আদেশে এই জগৎসংসারের প্রত্যেক নিমেষ নিয়-মিত হইতেছে, যে জগজ্জননী তাঁহার নিতান্ত পঙ্গু সন্তানকেও অত্যুচ্চ গিরিপর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের সামর্থ্য প্রদান করেন, আজ সেই জগজ্জননীর, সেই বিশ্ব-বিধাতা অখিলমাতার প্রেরণায় আমার ন্যায় নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তিকেও ভক্তদিগের এই মহাসম্মিলনে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। জগজ্জননীর সম্মুখে দাঁড়াইবার কারণে ভক্তজনগণের প্রাণে যে পবিত্র-ভাব আজ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই তরঙ্গ আমারও এই দুর্ব্বল হৃদয়ে আসিয়া আঘাত প্রদান করিতেছে, এবং পরমমাতার মধুময় মাতৃনাম এই ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ঘোষণা করিবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করিতেছে।

মা নামের ন্যায় মধুর নাম আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু সেই মধুর নাম আমিই বা কি ঘোষণা করিব? জন্মগ্রহণ করিলেই তো মা-নাম সকল জীবের, পশু মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রাণীরই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া স্বভাবতই মুখে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মাতার প্রতি দৃষ্টি আমাদের এতই স্বাভাবিক যে সেই দৃষ্টিকে হৃদয়ে না লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিতেই পারি না। যে মাতা আমাদের হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিবার এই স্বাভাবিক ইচ্ছা একেবারে গাঁথিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহারই মধুর আহ্বানে এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি।

যে বিশ্বপিতা অখিলমাতার নামে বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত গায়ত্রীমন্ত্রপূত এই প্রশস্ত প্রাঙ্গনে আমরা প্রতি বৎসর সম্মিলিত হই, আজ যখন সম্বৎসর পরে তাঁহারই নামে আবার এখানে সমাগত হইয়াছি, তখন একবার প্রাণ ভরিয়া মায়ের নাম কীর্ত্তন করত আজিকার এই উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতেই হইবে। আমাদের মাতাকে, আমাদের আপনার মাকে পূজা করিবার এমন শুভ অবসর পাইয়াছি, এই শুভ অবসরে বন্দনাগীতে তাঁহার আরতি করিয়া, প্রীতি-অর্ঘ্যের দ্বারা তাঁহার চরণপূজা করিয়া আজিকার উৎসবকে সার্থক না করিয়া কিছুতেই গৃহে প্রতিগমন করিব না।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে কত শত বৎসর আমরা আমাদের মাতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। মা যে আমাদের অন্তরে থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মঙ্গলের পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ উপদেশ দিয়াছিলেন, অমঙ্গলের পথে অসত্যের পথে চলিবার নিষেধবাণী আমাদের অন্তরে নিয়তই দিতেছিলেন, সে আদেশ উপদেশ, সে নিষেধবাণী আমরা অবহেলা করিয়া শুনি নাই—শুনিতে চাহি নাই। এই যে মাতা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছেন, এই যে চন্দ্রসূর্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রতিদিন দিনে নিশীথে আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, এই যে বাতাসের ভিতর দিয়া তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের গাত্র স্পর্শ করিতেছে, এই যে সর্ব্বংসহা ও বিশ্বধারিণী ধরণীতে তাঁহার মাতৃমূর্ত্তি জীবন্তভাবে প্রতি নিমেষে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে, আর এই যে ভক্তমণ্ডলীর কমনীয় মুখজ্যোতিতে তাঁহার অপরূপ রূপ একেবারে সাক্ষাৎ করিতেছি, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে মাতার এই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি আর কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে কি না সন্দেহ। আমরা আমাদের মাকে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম। এমন কি, মাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া আমাদের অন্তরে সকল অমঙ্গলের নিদান, সকল বিষময় ভাবের আকর, মাতার প্রতি একটা বিষম অনাস্থা পোষণ করিয়াছিলাম। সেই অনাস্থা পোষণের কারণে সমগ্র দেশটা বলিতে গেলে এক মহা উষর ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চারিদিকে অনাচার, কদাচার, নীচের প্রতি অত্যাচার অবিচারমূলক উপধর্ম্মের রাশি রাশি কণ্টকময় বিষবৃক্ষ সকল গজাইয়া উঠিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। ধর্ম্মের শক্তিময় আহার পাইবার অভাবে দেশবাসীগণ পূর্ব্ব হইতেই যখন আত্মা ও মনের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বসিল, তখন সমগ্র দেশ পরাধীনতার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিল না। পরে যখন সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা লাভের ফলে বিষময় কণ্টকরাশির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া দেশবাসীগণ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সেই মাতৃদেবীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেই শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজ সুপ্তোত্থিত সিংহের মহাবল লইয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই উপধর্ম্মের কণ্টকপূর্ণ গুল্মরাজি ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠিত, অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া দিল, তাই সেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিবসে আমাদের মিলনোৎসব। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে স্বাধীনতা আমাদের মাতার প্রদত্ত স্বাভাবিক অধিকার। ব্রাহ্মসমাজই বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে মাতার নিকটে যাইবার পথপ্রদর্শনের জন্য শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতি সহায় হইতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রহরী স্বরূপে দাঁড়াইয়া সন্তানের মাতার নিকটে যাইবার পথে বাধা দিতে পারে না—মাতার নিকটে সন্তানের যাইবার জন্য তাহাদের অনুমতি লওয়া আবশ্যক নহে। সন্তান ইচ্ছা করিলেই মাতার নিকটে সোজা চলিয়া যাইতে পারে, সোজা মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—মায়ের নিকটে সন্তানের যাইবার পথ অব্যাহত ভাবে উন্মুক্ত পড়িয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে, এই মহাসত্য ব্রাহ্মসমাজ আমাদের প্রতিজনের নিতান্ত নিকটে আনিয়া দিয়াছে, তাই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিবসে সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আজ সেই পরমমাতার চরণতলে মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিয়া আমাদের এই

উৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। কেবল মৌখিক কতকগুলি বাক্যের দ্বারা বা দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তিতর্কের দ্বারা নামেমাত্র তাঁহার পূজা করিলে চলিবে না। আজ আমাদের মাকে মা বলিয়া জানিয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া, তাঁহার চরণে আপনাকে বলি দিয়া পূজা করিলে তবেই এই উৎসবের সার্থকতা।

ব্রাহ্মসমাজ যে মাতৃদেবতার 'মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, তাঁহার পূজার জন্য বাহির হইতে ধূপ ধুনা পুষ্পাদি সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, জীবজন্তু বলি দিবারও প্রয়োজন নাই, অথবা প্রতিমা-গঠনও আবশ্যক নহে। যখনই ব্রাহ্মসমাজ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিরাট ব্রহ্মচক্রের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃদেবতাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করাইয়াছে, সেই সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার পূজার উপকরণেরও বিধান দিয়াছে। তাঁহার পূজার উপকরণ তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। ব্রাহ্মসমাজের যে কয়জন পুরোহিতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেই একপ্রাণে আমাদিগকে এই দুইটী উপকরণের দ্বারাই মাতৃপূজা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সমালোচনার কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হইয়া ঐ দুইটী উপকরণ স্বীয় অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে। এই দুইটী উপকরণ আবার এমনি আশ্চর্য্য বন্ধনে সম্বদ্ধ যে একটীকে ছাড়িলে অপরটী ম্লান ও পরিশুষ্ক হইয়া যায়। মাতাকে অন্তরের সহিত যদি প্রীতি করি, যদি সত্য সত্য তাঁহাকে ভালবাসি, তবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করিয়া কি প্রকারে নীরব থাকিতে পারি? আর যদি আমাদের জীবনযাত্রার সমুদয় কার্য্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পন্ন করি, তবে তাঁহার প্রতি প্রীতি আপনিই সরস হইয়া উঠিবে এবং তাহা প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় স্বীয় সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিবে।

মাতাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে হইবে, সমুদয় "তন-মন-ধন" দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার চরণে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সম্পূর্ণ বলি দিতে হইবে, এই সত্যটী খুবই স্বাভাবিক এবং অতি পুরাতন। সংসারের অনেক বিষয় খুব স্বাভাবিক ও পুরাতন হইলেও আমাদের তাহা নূতন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, নানা উপায়ে আত্মগত উপলব্ধির বস্তু করিয়া লইতে হয়। সেইরূপ, মাতার প্রতি প্রীতি খুব স্বাভাবিক ও অতি পুরাতন সত্য হইলেও যাহাতে চর্চ্চার দ্বারা, তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা তাহাকে আত্মগত উপলব্ধির বস্তু করিয়া লইতে পারি, সেই অনন্ত-মহিমার ছায়াকে যাহাতে অনন্ত বলিয়া ভ্রমে পতিত না হই, ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেয়, এবং সেই শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম।

ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতের ঋষিমুনিগণের অমূল্য উপদেশরাজির ভিতর দিয়া আমরা এই এক মহাবাণী লাভ করিয়াছি যে সেই বিশ্ববিধাতা অখিলমাতা আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছেন। কেবল নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন না, তিনি আমাদের প্রত্যেকেরই পরম করুণাময়ী প্রত্যক্ষ মাতৃদেবতারূপে অবস্থিতি করিয়া আমাদের প্রত্যেককেই মঙ্গলের পথে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি নিমেষে পরিচালিত করিতেছেন।

সেই করুণাময়ী মাতাকে আমাদের সমুদয় হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে পাইতে চাহিলে আমাদের নিজের বলিয়া এতটুকুও রাখিলে চলিবে না। সরল ভাষায়, তাঁহার জন্য আমাদের পাগল হইতে হইবে। মায়ের প্রকৃতিরাজ্যে এমনই বিধিব্যবস্থা যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে যতটুকু পাগল হয়, সে সেই বিষয়ে ততটুকুই লাভ করে। নূতন দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য কলম্বস পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জর্জ্জ ওয়াসিংটন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তিনি নূতন মহাদেশে স্বাধীনতার এক অত্যুচ্চ আদর্শ সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যে জন্মভূমি সেই মাতৃদেবতার ছায়ামাত্র, সেই জন্মভূমির অধিবাসীদিগের বিগত মহাসম্মিলনও এই সত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আমাদের

জাতীয় মহাসম্মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আমরা যে পরিমাণে পাগল হইয়া গিয়াছিলাম, আমরা সেই পরিমাণে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিয়াছি নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মপ্রধান এই পুণ্যভূমিতে মাতৃদেবতার ছায়া লইয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। জন্মভূমি যাঁহার ছায়া, মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই যাঁহার ছায়া, সেই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ মাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের পাগল হইতে হইবে। সিদ্ধপুরুষ রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় আহারে বিহারে স্বপনে জাগরণে, সকল অবস্থায় মাকে দেখিবার জন্য, সকল কর্ম্মে তাঁহার স্নেহহস্ত দেখিবার জন্য আমাদিগকে পাগল হইতে হইবে। সংসারে বিচরণ করিতে হয় করিব, কিন্তু তাহার মধ্যে মাকে দেখিবার জন্য পাগল হইতে হইবে। প্রত্যেক নিমেষের প্রত্যেক ঘটনায় মায়ের সঙ্গে আমরা আছি, এবং আমাদের সঙ্গে মা নিয়তই সাথের সাথী হইয়া আছেন, তাঁহার ক্রোড় বিস্তৃত রহিয়াছে, সুখের আনন্দে অথবা দুঃখের কশাঘাতে সেই ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই তিনি আলিঙ্গন করিয়া কত আদর করিবেন, এই সত্যটি প্রাণ দিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে। মাকে অন্তরে পাইবার জন্য পাগল হইলেই আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিব যে মাতার নিকটে সন্তানের যাইবার পথ অব্যাহতভাবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া আছে—সেই সরল প্রেমের পথে কোন প্রকার বাধা নাই, কোনই অর্গল নাই।

সেই মাতাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ পাইবার জন্য পাগল হইলে সহস্র উপহাসের অট্টহাসি আমাকে আকুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে জানি; শতসহস্র শোকসন্তাপ বিপদআপদ তাহাদের বিকট হাসিতে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আমাকে মায়ের সন্ধান হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে জানি। কিন্তু এই সত্য যদি আমার উপলব্ধি হইয়া থাকে যে মা আমার নিয়তই সঙ্গে আছেন এবং আমি তাঁহার অপরাজিত পতাকার নিম্নে আশ্রয় লাভ করিয়াছি, তবে লক্ষ উপহাসের অট্টহাসি এবং কোটী কোটী বিপদ আপদের বিকট হাসি আমাকে আকুল করিতে পারিবে না। উপহাস, বিপদ-আপদ, এ সকলের ভয় প্রদর্শনের অবসর কোথায়? মায়ের ভক্ত সন্তানের কেশাগ্রও তাহারা স্পর্শ করিতে সাহস করে না। মৃত্যু বল, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদ বল, সকলই সেই পরমমাতার নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলনিয়মে নিয়মিত হইতেছে। মায়ের এই মঙ্গলরাজ্যে মৃত্যু বলিয়া যে সত্য সত্য কিছুই নাই। তাঁহার রাজ্য প্রাণের রাজ্য। আমরা সাধারণত যাহাকে মৃত্যু বলি, এ রাজ্যে সে মৃত্যু, সে ধ্বংস, সে বিনাশের স্থান নাই। মৃত্যু—তাহা মায়ের রাজ্যের এক বিভাগ হইতে বিভাগান্তরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র। যখন এখানে মৃত্যুরই অধিকার নাই, তখন দুঃখেরই বা সত্যসত্য অধিকার কোথায়? সুখের বেলায় আমরা মাতার দান বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, দুঃখের বেলায় কি আমরা তাহা ভুলিয়া যাইব? আমরা আমাদের দিক হইতে দেখিয়াই সংসারের কোন বিষয়কে সুখের কারণ এবং কোন বিষয়কে দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু একবার মায়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই বুঝিতে পারিব যে সংসারের যাহা কিছু আমরা ভোগ করি, সে সমুদয়ই মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মায়ের রক্ষিত গচ্ছিত ধন। সেই গচ্ছিত ধনের সদ্ব্যবহারে মাত্র আমাদের অধিকার। সেগুলি যাঁহার ধন, তিনি যেভাবেই ইচ্ছা আমাদের দ্বারা সেগুলির ব্যবহার করাইয়া লইতে পারেন। সেই সকল তিনি আমার হস্তেই রাখুন, বা অপরের হস্তেই ন্যস্ত করুন, অথবা সেগুলি তিনি নিজ হস্তেই গ্রহণ করুন, আমাদের তাহাতে দুঃখবিমূঢ় অথবা সুখে বিহ্বল হইবার কোনই কথা নাই। সংসারের সুখদুঃখকে তুচ্ছ করিয়া, সংসারের উপহাসকে গ্রাহ্য না করিয়া যদি আমরা আমাদের মাকে ভাল বাসিতে পারি, তাঁহার জন্য পাগল হইতে পারি, তবেই আজিকার এই উৎসব সার্থক।

মাতাকে প্রাণ দিয়া প্রীতি করিলে, মায়ের চরণে আত্মবলি প্রদান করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনও যে অত্যন্ত সহজ হইবে, সে কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন দেখি না। মাকে ভালবাসিব অথচ মায়ের অপ্রিয় কার্য্য করিব, ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ ও মিথ্যা কথা। মাকে ভালবাসিলে আমরা কখনই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে বিরত হইতে

পারি না। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আমাদের মাতৃপ্রেম জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে সম্যক পরিপুষ্ট হইলেই তাহা বাহিরে প্রকাশ হইতে চাহে, এবং তখনই তাহা মাতার প্রিয়কার্য্যসাধনে পরিণত হইয়া বাহিরে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। মাতার প্রতি কেবলমাত্র মুখে প্রীতি দেখাইলে তাঁহার প্রিয়-কার্য্যসাধনের প্রতি আমাদের অনুরাগ আসিতে পারে না। বরঞ্চ তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিবার সম্ভাবনা বেশী—এইরূপ কপটপ্রীতির ফলে যে কি বিষময় ফল, কি গরল প্রসূত হয়, একদিকে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের মহাভারতীয় মহাসমর, অপরদিকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বর্ত্তমান মহাসমর, উভয়ই অঙ্গারলিখিত অক্ষরে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মাকে যথার্থ ভালবাসিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যেমন স্বতই অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মিবে, সেইরূপ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রিয় এবং কোন্‌টী তাঁহার অপ্রিয়, তাহাও অনায়াসে আমাদের বোধগম্য হইবে। একবার যখন বুঝিব যে এই কাজটী আমার মায়ের প্রিয়, তখন আমাকে কে তাহা হইতে বিচলিত করিতে পারে? তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য তো আমি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিব না। সুতরাং যদি আমার সকল কার্য্যই আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি, তবে কে আমাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে? মানুষের কথায় আমি তাঁহার কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইব? লোকে উপহাস করিবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবে চিরবিচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন করিবে বলিয়া আমি আমার সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে মায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পশ্চাৎ-পদ হইব? কখনই নহে। যে মানুষের পরিমাণ সার্দ্ধ ত্রিহস্ত মাত্র, যে লোক নিজেই নিজের ভয়ে শঙ্কিত, সেই মানুষের ভয়ে, সেই লোকের ভয়ে, আমার যে মায়ের এক এক ইঙ্গিতে নিমেষে নিমেষে ব্রহ্মাচক্রের ছোটবড় সকলই স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমার হৃদয়ের চিরশান্তিদাত্রী মাতার চরণপূজায় বিরত হইব? সমুদয় ভয়ভাবনা দূর করিয়া মায়ের অভয় নামটী সম্বল করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হও, পরাজয়ের কথা আর শুনিতে পাইবে না; মায়ের শক্তি সন্তানের উপর নীরব সংহত বলে নামিয়া আসিবে, দুঃখ, দৈন্য ও দুর্ব্বলতা মায়ের পায়ের তলে মরিয়া থাকিবে।

আজ আমরা এই উৎসবের দিনে যখন মিলিত হইয়াছি, তখন মায়ের নামে যদি আমরা এই উৎ-সবকে সার্থক করিতে চাহি, তবে আমাদের প্রত্যে-ককে তাঁহার প্রতি প্রীতির এবং তাঁহা হইতে প্রাপ্ত মহাশক্তির এক একটী অগ্নিময় কেন্দ্র হইতে হইবে। সেই এক একটী কেন্দ্র হইতে যখন সেই প্রীতি ও শক্তি ছড়াইয়া পড়িয়া এই ভারতের ত্রিশকোটী সন্তানের আত্মাকে অগ্নিময় করিয়া তুলিবে, এই উৎসবের দিনে যবে এই ত্রিশকোটী সন্তানের কণ্ঠ ভেদ করিয়া মায়ের নাম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, তখন দেবমনুষ্যের মধ্যে কি এক মহান্ ভাবতরঙ্গ উঠিবে, তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না।

হে পরমাত্মন্, হে বিশ্বজননী, তুমি আজ এই উৎসবে যখন আসিয়াছ, তখন আমাদের হৃদয় হইতে সকল প্রকার হিংসাদ্বন্দ্ব সকল প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান অভিমান উৎপাটিত করিয়া আমাদিগকে তোমার দিকে টানিয়া লও। আমাদিগকে বুঝা-ইয়া দাও, আমাদের প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে দাও যে তুমিই আমাদের একই মাতা, আমরা সকলেই পরস্পরের ভ্রাতা। তোমার সঙ্গে যোগের পথে যাহা কিছু বাধাবিঘ্ন, তাহা দূর করিয়া দাও। আমাদের সকল কার্য্য সকল অনুষ্ঠানে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর। আমাদের হৃদয়ে এই বল দাও যে সংসারের ভয়ে, উপহাসের ভয়ে যেন তোমার কার্য্য অনুষ্ঠানে পশ্চাৎপদ না হই। আমাদের আজিকার মাতৃপূজা সার্থক হউক।

গান।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

ওগো নিঠুর!
তুমি হাস্‌বে নীরব হাসিতে—
আমায় নিত্য দিবে সকাল সাঁঝে
অশ্রুজলে ভাসিতে।
ওগো তুমি আমায় ছাড়্‌বে না যে
মার্‌বে আঘাত টান্‌বে কাছে
আমায় বিনা নাই যে গতি
তোমায় হবেই হবে আসিতে॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রোন্মোচন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি (২০ মাঘ) বেলা ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ রামমোহন লাইব্রেরীতে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের সভাপতিত্বে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের চিত্র উন্মোচিত হইয়াছিল। মহর্ষিদেব যৌবনাবস্থায় যখন বেদী হইতে অগ্নিময় ব্যাখ্যান বিবৃত করিতেন, সেই অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রকর গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্রখানি রামমোহন লাইব্রেরীকে উপহার দিয়াছেন। অঙ্কনগুণে চিত্রখানিকে মহর্ষিদেবের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। চিত্রোন্মোচন সভায় সভাপতি মহাশয় মহর্ষিদেবের জীবনী সম্বন্ধে কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি কথা ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হইল না, কিন্তু সেগুলি এত লোকবিদিত যে তাহা লইয়া এস্থলে বাদানুবাদ করা সঙ্গত হইবে না। সার নারায়ণ চন্দাবরকর দু চারটী অতি সুন্দর কথা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মহর্ষির জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই দুইটী প্রবন্ধ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।*

(বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যময় স্মৃতিরক্ষা উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরির পরিচালকগণ তৎপ্রতি শ্রদ্ধার্পণের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন; সেই অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেই অবকাশের সমুচিত ব্যবহারে আমার শক্তি নাই। আমার শারীরিক অবস্থা এ কর্ম্মে আমার অনুকূল নহে; মহর্ষিদেবকে পূর্ণভাবে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মহনীয় চরিতের স্পর্শ লাভ কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, এইজন্য এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অধিকারও নাই। একদিন আমি বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মহর্ষিচরিতের আলোচনা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা যাহা নিকট হইতে দেখিয়াছেন, আমাকে দূর হইতে তাহা দেখিতে হইয়াছে; তাঁহারা তাঁহাদের আচার্য্যের সম্মুখে উপনীত হইয়া যাহা লাভ করিয়াছেন, আমি তাহাতে বঞ্চিত। তথাপি সেই প্রকাণ্ড মনুষ্যত্বকে কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিলে চলিবে না; বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁহার যে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রতি অবিচার হইবে। ভারতবর্ষের এই বৃহত্তর সমাজ হইতে তিনি আপনাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করেন নাই, বৃহত্তর হিন্দু সমাজও কখনও তাঁহাকে আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারিবে না।

মহর্ষিপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোড়নে আমাদের হিন্দুসমাজের স্থিরসমুদ্রে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই চাঞ্চল্যের নিবারণ হয় নাই—বহু মনস্বী ব্যক্তি সেই বাত্যাপ্রবাহের কেন্দ্রাতিগ বলে কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিলেন। এ সকল সত্য ঘটনা। কিন্তু এই সত্য ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইবার আমি কোন হেতু দেখি না। বরং একটা আত্যন্তিক সমাজবিপ্লবের অবসরে সমাজের রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহাকে অবতীর্ণ দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করি। বাহির হইতে যখন একটা প্রবল আক্রমণ আসিয়া জীবের উপর আপতিত হয়, তখন জীবের প্রাণশক্তি অভ্যন্তর হইতে তাহার প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করে। যে সেই প্রতিঘাতের ব্যবস্থা করিতে পারে, সেই বাঁচিয়া যায়। সেই প্রতিঘাতের শক্তিই প্রাণশক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। আমাদের ভারতীয় সমাজে সেই প্রাণশক্তি এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়াই যথাসময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমাদের সমাজে শত বৎসর পূর্ব্বে যে সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার

* মহর্ষিদেবের চিত্রোন্মোচন উপলক্ষে গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত।

জন্যই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাই আমার ধারণা। সদ্যপ্রকাশিত মহর্ষির জীবনচরিত পড়িয়া আমার সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম দেশের হাওয়া প্রবলবেগে আমাদের দেশে বহিয়াছিল। সেই হাওয়ার সহিত ভাল মন্দ নানা নূতন পদার্থ বহিয়া আসিয়াছিল। সেই হাওয়াকে সর্ব্বতোভাবে মরুভূমির প্রাণঘাতী শিরোক্কো হাওয়ার সহিত তুলিত না করিলেও চলিতে পারে। সেই বায়ুবেগে পশ্চিম হইতে যে সকল বীজ আসিয়াছিল, তাহাতে রোগের বীজও ছিল, আবার সঞ্জীবনী শক্তি অর্পণের বীজেরও অভাব ছিল না। যাহাই হউক, উহা অজানা হাওয়া, উহা বাহিরের হাওয়া এবং অতি প্রবল হাওয়া। উহা প্রাণরক্ষার অনুকূল হইবে কি না, তাহা এখনও বিচার্য্য হইয়া আছে। সে সময়ে অন্ততঃ উহা একটা মোহ আনিয়াছিল, প্রাণকে অভিভব করিয়াছিল। উহা যে চাঞ্চল্য আনিয়াছিল, তাহা হয়ত ব্যাধির চাঞ্চল্য, হয়ত ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ। তাহা প্রাণশক্তিকে অভিভূত করিবার আশঙ্কা জন্মাইয়াছিল। ভারতের প্রাণশক্তি এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়কে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উৎপাদন করিয়া সেই ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপের প্রতিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

আপনারা জানেন, বেদবিদ্যারূপিণী সনাতনী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আজি পর্য্যন্ত এই সমাজে স্মৃতি ও অনুস্মৃতি সহকারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রবণে তাহার প্রতিধ্বনি লাগিয়াছিল এবং সেই বাণীর প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তিনি বীরের মত সমাজরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই পুরাতনী ব্রহ্মবাণী রক্ষার ভার যে শ্রেণীর উপর রক্ষিত আছে, সমাজে তাঁহাদের নাম ব্রাহ্মণ; এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আমি বর্ত্তমানযুগের ব্রাহ্মণোত্তম বলিয়াই জানিয়া আসিতেছি। এই ব্রাহ্মণের কয়েকটা লক্ষণ আছে। ব্রাহ্মণ একদিকে অন্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিয়া থাকেন; জড়জগৎকে ও মানব জগৎকে যে সত্য, যে ঋত, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, সেই সত্যের প্রতি ও ঋতের প্রতি শীর্ষ অবনত করিয়া তিনি স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। সেই ঋতের মহিমা দেখিয়া অন্তরে তাঁহার ভাবাবেশ হয়, কিন্তু সেই ভাবাবেশে তিনি অধীর হন না; কঠোর কর্ম্মপথে পদক্ষেপে তিনি সঙ্কুচিত হন না; বা ভাবোন্মাদে পথভ্রষ্ট হন না। তাঁহার চরিত্রের একটা দিক শান্ত, মধুর, অন্যদিক কঠোর ও দীপ্তিময়। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি দৃঢ়, তিনি সংযত, তিনি আচারনিষ্ঠ। মহর্ষিচরিতে এই ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণসমূহ অত্যন্ত পরিস্ফুট দেখিতে পাই। এইজন্য আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণোত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট করিতে চাই। তাঁহার জীবনচরিতকারে তাঁহার যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহাতে আমি এই ছবিটিই অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন কালে তিনি বিদেশের আশ্রয় আবশ্যক বোধ করেন নাই। যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ঢক্কানাদ এই দেশকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি সেই ঢক্কানাদে বধির হন নাই; বরং তাহার প্রতিকূলে বেদবাণীর বিজয়দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদবাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই, কিন্তু তিনি বেদবাক্যের উপরেই তাঁহার ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বেদবাক্য আমার নিকট নিত্য ও ভ্রমরহিত; কিন্তু আমি ব্রাহ্মণসন্তান; সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে আমার অধিকার আছে। আমার ধর্ম্মশাস্ত্র এ বিষয়ে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের অধিকার সঙ্কীর্ণ করিতে কেহ কখনও পারিবেন না। ব্রাহ্মণোত্তম দেবেন্দ্রনাথ স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় বেদবাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল। তিনি সবলে সেই অধিকার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; এ বিষয়ে বেদপন্থী কোন ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হইবার কোন হেতু নাই।

ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশে তিনি পরধর্ম্মের প্রতি কতকটা সন্দিহান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। হয়ত তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি তেমন সুবিচার করেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কার এ বিষয়ে

হয়ত অন্তরায় ছিল। পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, এই ভাবটা বোধ করি তাঁহার সমস্ত জীবনকে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছিল। বিদেশীয় পরিচ্ছদ তিনি কখনও পরিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমি জানি না—বিদেশী আচার হইতেও তিনি যথাসম্ভব দূরে রহিয়াছিলেন। বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় তিনি বোধ করি কখনও লন নাই। তিনি যে সময়ে সমাজমধ্যে একজন প্রধান পুরুষ, সে সময়ে ইংরেজিতে রচনা, ইংরেজি বাগ্মিতা প্রকাশ, ইংরেজিতে ধর্ম্মপ্রচার এদেশের প্রধান পুরুষদেরও কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তিনি কখনও এই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করেন নাই। ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট প্রতিপত্তি ও সম্মানলাভের প্রলোভন কখনও তাঁহাকে প্রলোভিত করে নাই। তিনি বড় ইংরেজের স্পর্শ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতেন। ইহাতেও আমি তাঁহার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিচয় পাই। এই যে একটা আত্মাভিমান, এই যে একটা দর্প, এই যে পরাশ্রয়ের ও পরমুখাপেক্ষিতার প্রতি উৎকট অবজ্ঞা, ইহা আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ইহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার মহনীয় চরিতের সম্মুখে প্রণত হই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে স্বাজাত্যবোধ ও সার্ব্বজাতিকতার সামঞ্জস্য।

(শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ)

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে গৃহ স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে যে মহাত্মার চিত্র উদ্‌ঘাটন ও চিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আজ আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর চিত্তের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় তাঁর স্বাজাত্য-বোধকে সার্ব্বজাতিকতার উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুসভ্যতার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সকল বিভাগেই যে সকল মূলগত আদর্শ (fundamental principles) বিরাজিত দেখিয়াছিলেন, সে আদর্শগুলি সর্ব্ব মানবের আদর্শ—কোন সংকীর্ণ দৈশিক আদর্শ মাত্র নয়—ইহাই সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দেশাভিমান পরজাতিবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেয় তাহাও যেমন তাঁর ছিল না, যে বিশ্বপ্রীতি স্বজাতিবিদ্বেষকে লালন করে, তাহাও তেমনিই তাঁর ছিল না। যুগগুরু রামমোহনের এই মন্ত্রে যাঁর পুণ্যজীবন দীক্ষিত হইয়াছিল, আজ তাঁরই শারীর চিত্র উদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনচিত্র যদি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর হয়, তবেই এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নব্যবঙ্গ তার দেশাত্মবোধের যথার্থ উদ্বোধক যাঁরা, তাঁদের কথাই ভুলিয়া বসিয়াছে। রামমোহনকে সে নামে মাত্র জানে, তাঁর স্বরূপ জানে না এবং দেবেন্দ্রনাথকে সে সম্প্রদায়বিশেষের 'মহর্ষি'তুল্য ব্যক্তি বলিয়াই জানে, সমস্ত দেশকে তিনি কি দিয়াছেন তাহা জানে না। যে সময়ে ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মনে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতার প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগ্রত হইয়াছিল, যে সময়ে সেই বিপ্লবের উন্মত্ত হাওয়ায় রামমোহন রায়ের হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রজ্বালিত জ্ঞান ও কীর্ত্তির দীপগুলিও নিভ-নিভপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করিয়া, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ফিরাইয়া আনিয়া, এবং রামমোহন রায়ের বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া যিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের মনের গতিকে দেশের দিকে ফিরাইলেন, এবং শিশু বঙ্গসাহিত্যকে নানাদেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনার পুষ্টিতে মাতার মত একান্ত যত্নে লালন করিয়া তুলিলেন, তাঁর কথাই যদি আজ দেশ বিস্মৃত হয়, তবে সেটা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যে সকল মনীষী বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন, সেই সকল মনীষীর মনীষাকে দেবেন্দ্রনাথ আপনার ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্বপ্রভাবে একটি মহৎ অনুষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট করিয়া পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই—ইহার জন্য আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে।

তারপর শুধু হিন্দুকলেজের বিপ্লব নয়—এক সময়ে যখন খৃষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষায় দলে দলে হাজার হাজার লোক হিন্দুসমাজের ক্রোড়চ্যুত হইয়া খৃষ্টান হইয়া যাইতেছিলেন, তখন খৃষ্টান-পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছেলেরা না পড়িয়া যাহাতে হিন্দুপরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে, সেইজন্য 'হিন্দুহিতার্থী-বিদ্যালয়' স্থাপনে যিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সত্যের প্রতি এদেশীয় লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাঁর যে সে সকল চেষ্টার কথাও ভুলিবার নয়। বড় বড় সঙ্কটের সময়ে তিনি হাল শক্ত করিয়া ধরিয়াছেন—দেশকে বিজাতীয়তার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেন নাই। দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের সঙ্গীত, দেশের শিল্প, দেশের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, দেশের শাস্ত্র—সমস্তই যাহাতে উন্নত হয়, কুসংস্কারমুক্ত হয় ও সকলের কল্যাণপ্রদ হয়, এইজন্য তিনি আপনার সকল শক্তি সকল মনীষা সকল তপস্যাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁর পরিবারই যে সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পের উৎসস্বরূপ হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে তাঁর সাধনাই কাজ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আপনারা সকলেই জানেন যে, তাঁর জীবনের প্রধান্ কীর্ত্তি, ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন রায় ব্রহ্মমন্দির মাত্র স্থাপন করেন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। অথচ এই সমাজ যে হিন্দুসমাজ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, ইহা কল্পনা করাও তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল। ধর্ম্মে ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালোপযোগী সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ ছিল সংরক্ষণ করিয়া সংস্কার। যাহা আছে তাহাকে যতটা পারা যায় রক্ষা করিয়া তবে উন্নতির পথে তাহাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিতে হইবে—এই conservative reform এর আদর্শই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দ্বারাই ঘোষিত হয়। ভূদেব ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি এ আদর্শ পরে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁর একটি উক্তি আমার কানে সর্ব্বদাই বাজে—সেটি এই—"স্বজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়ো না।"

উপনিষদ্ তাঁর ধর্ম্মজীবনের আশ্রয় ছিল; উপনিষদের কালের তাপস গৃহস্থ অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শেই তিনি নিজের জীবন গঠিত করেন। রাজর্ষি জনকের মত বিষয়বিভবের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মুক্ত ছিলেন। অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও সত্যের অনুরোধে ধর্ম্মরক্ষার জন্য এক সময়ে তিনি হেলায় সব হারাইয়াছিলেন—সে কাহিনী আপনারা সকলেই অবগত আছেন। যতদিন কর্ম্ম করিবার বয়স ছিল, ততদিন দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে তিনি আপনার শক্তিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ভোগজীবন উত্তীর্ণ হইল, তখন হইতে প্রব্রজ্যার জীবন গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজকের মত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধ্যানরত হইয়া তিনি কাল কাটাইয়াছেন এবং অবশেষে যতি হইয়া ব্রহ্মসমাহিত অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনই সবচেয়ে বড় দান—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ, প্রাচীন কালের চতুরাশ্রমের আদর্শ যে তিনি নিজ জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া আমাদিগকে দিয়া গেলেন, ইহার চেয়ে বড় দান আর কিছুই নাই।

নদীর সঙ্গে তাঁর জীবনের তুলনা দিতে পারি। প্রথম জীবনে একদা অনুতাপের 'অগ্নিতাপে বিলাসের পাষাণস্তূপ ভেদ করিয়া যখন তাঁর চিত্তগুহায় অমৃতপ্রস্রবণধারা নামিয়াছিল, তখন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সেই ধারা ধ্যানের গহ্বরে গহ্বরেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তার পর একদা হিমালয়ে নদী দর্শনে যখন তিনি দিব্যবাণী শুনিলেন যে, এই নদীর মত লোকালয়ে গমন কর, কর্দ্দমাক্ত ও আবিল হইতে ভয় পাইয়ো না তখন হইতে তিনি লোকালয়ে নামিলেন এবং কত বিচিত্র শুভ অনুষ্ঠানের কূলে উপকূলে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়া সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে সফল-সজল-শ্যামল করিয়া তুলিলেন। তার পর একসময়ে দেখি যে, লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নাই, তাঁর গতিবেগ ক্ষীণতর, কারণ তাঁর জীবন গভীরতর ও প্রসরতর হইয়াছে। তখন হইতে তিনি সেই মহাসমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছেন, যেখানে আপনার সমস্ত জীবনকে অঞ্জলিরূপে নিঃশেষে অর্পণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন।

আজ সেই মহাতীর্থ, সেই সাগরসঙ্গমে যদি

ক্ষণকালের মত স্তব্ধ হইয়া তাঁর পুণ্যচরিতের উদ্দেশে মস্তক অবনত করি, তবেই এই অনুষ্ঠান সার্থক হইবে।

ভাষার উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব, এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্তি)

ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের কথা :—"Our first parents received language by immediate inspiration," ভাষাকে যদি মানবের অযত্নলব্ধ ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিয়া মানিয়া লইতে হয় তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মানবের মন ফনোগ্রাফের চুঙ্গি (cylindar) কিম্বা ডিস্কের ন্যায় যন্ত্রবিশেষ; ঈশ্বর শব্দ সকল ইহাতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন প্রয়োজনানুসারে মানবের ইচ্ছানুরূপ স্প্রিং সঙ্কোচিত হইলেই ঐ যন্ত্র হইতে কথা সকল আপনা আপনি বাহির হইয়া থাকে। মানবের চেষ্টাতে কিছুই হয় নাই। জীবসৃষ্টিতে কোন কার্য্যেই প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের হস্ত সঞ্চালন ব্যাপার (direct intervention of God) অনুভূত হয় নাই; ভাষার সৃষ্টিতে কি তাহা হইয়াছে? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে তাহা দেখা যা'ক।

আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি, যে বধির সেই মূক হয়। বধির ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ণপটাহে শব্দ ধারণ করিবার জন্য যে সূক্ষ্ম ঝিল্লীর প্রয়োজন, অল্পাধিক পরিমাণে তাহার অভাব থাকে। কর্ণপটাহে বায়ু সংযোগে পরিচালিত শব্দের প্রতিধ্বনি হয় না বলিয়াই সে শুনিতে পায় না।

কিন্তু বাক্য উচ্চারণ করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন অধিকাংশ স্থলে তাহার কোনটির অভাব দেখা যায় না। মূক ও বধির ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তিহীন একথা বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা "Deaf & Dumb" স্কুলের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে মূক ও বধিরদিগকে শিক্ষাপ্রদানের জন্য যে অভিনব শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার ফলে অনেক মূক ও বধির শিশু অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি আমাদের অন্তঃকরণ ফনোগ্রাফ সদৃশ যন্ত্র হয় এবং শব্দ ও বাক্য সকল তাহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতে লিপিবদ্ধ থাকা ঠিক হয়, তবে এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বধির ব্যক্তি মূক থাকিবে কেন? ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তই কি ঠিক হইবে না যে ভাষা আমাদের শিক্ষালব্ধ জিনিষ? এই শিক্ষা উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অতি সহজলভ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা এক কথা, আর আমরা ভাষা "by direct inspiration from God" লাভ করিয়াছি তাহা আর এক কথা। Archbishop Trenchও তাঁহার উক্তির অযৌক্তিকতা অনুভব করিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি নিজেই ইহার সঙ্গে একথাও যোগ করিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে আমাদের অভিধান ও ব্যাকরণ বর্ত্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভেই আমরা ঈশ্বরের হস্ত হইতে সেই পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট অবস্থায় ইহাদিগকে লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর স্বয়ং পদার্থ সকলের নামকরণ করিয়া দেন নাই, তিনি আমাদিগকে নামকরণের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তিনি আরো বলিতেছেন "God did not teach man words as one teaches a parrot but gave him a capacity, and then evoked the capacity which he gave." পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত হইবে না যে আমরা ভাষাসম্পদ "by direct inspiration from God" প্রাপ্ত হই নাই।

এখন দেখা যাউক ভাষার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করাই ভাষার উদ্দেশ্য এবং এই কার্য্য সাধনার্থ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। যে ক্রমোন্নতি বিধানবলে সামান্য বীজাণু হইতে মানব উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূলমন্ত্র আত্মরক্ষা; এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে অবিরাম চেষ্টা ও সমর চলিতেছে তাহাতে যোগ্যতমেরই একমাত্র জীবন রক্ষার সম্ভাবনা। ক্রমোন্নতি ব্যাপারে এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থাতে যৌথ পারিবারিক (principle of co-operation) বিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মান-

বের পরস্পরের সাহায্যশক্তি বর্দ্ধনার্থ বিভিন্ন পরিবার ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বেই দলবদ্ধাবস্থায় মাঠে ও অরণ্যে বিচরণ করা পশুদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। মৃগ সকল দলবদ্ধাবস্থায় বিচরণ করে, শত সহস্র বানর একত্র হইয়া সেনাদলের ন্যায় এক সঙ্গে একত্র অবস্থান করে, পক্ষিগণ একই বৃক্ষে ঝাঁকে ঝাঁকে কুলায় নির্ম্মাণ করে; মধুমক্ষিকার দল পুষ্পমধু আহরণার্থ অরণ্য পথে যেখানেই ভ্রমণ করুক না কেন একই চক্রে তাহাদের কষ্টলব্ধ মধু সংস্থাপন করে। লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা একই যৌথ পরিবাররূপে একসঙ্গে ধরাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে সৃষ্টির এই ক্রমোন্নতি ব্যাপারে আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধনের পক্ষে এইরূপ দলবদ্ধাবস্থায় বাস করা বিশেষ অনুকূল। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও বুঝিতে পারা যায় যে এই সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত শত্রুর হস্ত হইতে ইহাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা অধিক। এই একত্র অবস্থান হেতু যে নৈতিক বলের উদ্ভব হয় তাহার উপকারিতা এই সংখ্যাধিক্যজনিত বলবৃদ্ধি অপেক্ষাও বেশী। আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে বর্ণন করিতেছি; সাহাবাদ জিলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ভাবুয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাহাড়ে ও মাঠে অসংখ্য কৃষ্ণসার মৃগ দলে দলে বিচরণ করে। পাশবিক বৃত্তির প্ররোচনায় কথন কথনও মৃগশিকারে প্রবৃত্তও যে না হইয়াছি তাহা নহে। দেখিয়াছি যে যূথচারী মৃগগণ কচিৎ মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ সূত্রাকারে বিচরণ করিতেছে।

কালিদাসপ্রমুখ ভারতের প্রাচীন কবিদিগের কবিত্বগৌরব অনেক সময়ে এই কাননবিহারিণী হরিণীর স্বভাব পর্য্যালোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। রমণীর কমনীয় কান্তি, সুদীর্ঘ নয়ন, নিরীহ নির্ম্মল স্বভাবের পরিচয় দিবার জন্য উপমাস্বরূপ এই বনচারিণী হরিণীর টান পড়িয়াছে। যদি "survival of the tittest" যোগ্যতমের জীবনাধিকারই সৃষ্টিরাজ্যের মূলতত্ব হয় তবে ভীমদর্শন খলপ্রকৃতি স্বভাবনিষ্ঠুর সিংহব্যাঘ্রপ্রমুখ হিংস্র জন্তুর সহিত এক বনে বাস করিয়াও এই বলহীন ভীরুস্বভাব মৃগসকল কিরূপে আজ পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে—এরূপ প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মের কি এখানে কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে? তাহা নহে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ দিবারাত্রি অবিরাম যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত হীনবল পশুদিগের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা আপাততঃ বিরল বলিয়া মনে হইলেও, যূথবদ্ধ হইয়া বিচরণজনিত যে নৈতিক বলের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সিংহ ব্যাঘ্র এমন কি "Long range rifle" ধারী নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মানবের শক্তিকেও পরাভব করিয়াছে। এই যে অর্দ্ধ মাইলব্যাপী মৃগদল পর্ব্বতের পাদদেশে বিচরণ করিতেছে, দুইটি চক্ষুর পরিবর্ত্তে দুই শত কিম্বা ততোধিক চক্ষু তাহাদের প্রত্যেককে বিপদের সম্ভাবনা হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে। দর্শন শক্তির ন্যায় তাহাদের সমবেত আঘ্রাণ এবং শ্রবণ শক্তিও শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অর্দ্ধমাইলের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে বিপদ আগমন করুক না কেন, মৃগশ্রেণীর সমবেত শক্তি তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। এই দলের শত শত চক্ষু চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে, কোথাও কোন বিপদের চিহ্ন কাহারও চক্ষুকে আকর্ষণ করিলে অমনি সেই মৃগ মস্তক উত্তোলন, কর্ণ উত্তোলন, ক্ষুরের আঘাত কিম্বা অপর কোনরূপ সঙ্কেত শব্দ উচ্চারণ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বিপদের আগমনবার্ত্তা এরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রচারিত করে যে সকলেই সময় থাকিতে সাবধান হয় ও শত্রুর শত সহস্র উপায়কে ব্যর্থ করিয়া তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়।

বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিৎ (Lord Avebury Sir Jhon Lubbock) আজীবন পিপীলিকার স্বভাব ও ধর্ম্ম পর্য্যালোচনার পর এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে এক সঙ্গে বাস ও একত্র বিচরণ হইতে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটেরও আত্মরক্ষার এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যে কোন কোন বিষয়ে তাহা মানবেরও অনুকরণীয়। অনন্ত পিপীলিকার দল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মাঠ হইতে মাঠান্তরে গমন করিতে দেখা

যায়। তাহাদের সমাজ বন্ধন প্রণালী এমন সুন্দর ও পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন যে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের অনুক্ষণ ভাবের বিনিময় চলিতেছে।

দেখা যায় যে অগ্রগামী দলের কোন কোন পিপীলিকা বিপরীত দিকবাহী হইয়া পশ্চাদগামী পিপালিকাদলের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে এবং ক্ষণকাল তাহাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার তৎপরবর্ত্তী দলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কিপ্রকার ভাবের বিনিময় হইতেছে জানিবার উপায় নাই কিন্তু ইহা দেখা যায় যে পশ্চাৎবর্ত্তী পিপীলিকাদল পন্থান্তর অবলম্বন করিতেছে। পিপীলিকা কিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে বর্ত্তমান সময়ে তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, ইহা আশা করা যায় যে অচিরে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে যাহার সাহায্যে মানবের কর্ণের অনধিগম্য এই পিপীলিকার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরও আমাদের কর্ণপটাহে প্রতিধ্বনিত হইবে। পিপীলিকা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারা কোন্‌টি সোজা পথ, কোন্ দিকে শত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনা, কোথায় বিঘ্ন বাধা পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, কোন্ স্থানে খাদ্যসম্ভার তাহাদের আগমন অপেক্ষা করিতেছে, এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় পরবর্ত্তী দলভুক্ত পিপীলিকাদিগকে জানাইতেছে এবং এই কার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত হইতেছে যে বর্ত্তমান সভ্যজাতি নিচয়ের "intelligence department" কেও ইহার নিকট হার মানিতে হয়।

কুক্কুর, ঘোড়া, গাধা, মেষ, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এবং বানরগণ তাহাদের উচ্চারিত শব্দের তারতম্য দ্বারা যে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে ইহা সকলই অবগত আছেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দেশীয় পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গিবন বহুকাল আফ্রিকার মধ্যদেশবাসী বানরদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া দেখিয়াছেন যে বানরগণ উচ্চারিত স্বরের ছয় প্রকার তারতম্য দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কুকুর যখন শিকারের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয় রাগান্ধ হইয়া কাহাকেও আক্রমণ করে কিম্বা শৃঙ্খলাবস্থায় নিরাশার ভাবব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনিতে মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে থাকে অথবা রাত্রি যোগে পাহারার সময় অপরিচিত ব্যক্তির আগমন জ্ঞাপন করিতে থাকে কিম্বা ভ্রমণ সময় উপস্থিত হইলে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতে করিতে প্রভুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করে, ইহার প্রত্যেকটির স্বর কি বিভিন্ন প্রকারের নহে? এবং ঝড় বৃষ্টি প্রপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য যে সকরুণ আর্ত্তনাদ—তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবব্যঞ্জক নহে কি? এই উচ্চারিত স্বরের তারতম্য হইতেই আমরা পরিষ্কাররূপে কুক্কুরের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ হই। পূর্ব্বে দলবদ্ধ হইয়া মৃগসকলের বিচরণের কথা বলা হইয়াছে। সত্যসত্যই যখন শত্রু অতর্কিতভাবে আসিয়া দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না; সকলই পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার পথ দেখিতে থাকে। এই সমবেতভাবে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণের শক্তি আক্রমণের সময় প্রকাশ পায় না সত্য, কিন্তু যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পারে তদ্বিষয়ে ইহা কিরূপ কার্য্যকরী তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি যতই প্রখর থাকুক না কেন ইহারা যে প্রকার অসংখ্য মাংসলোলুপ শত্রুমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে পরস্পরের সাহায্য না পাইলে কিছুতেই ইহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই শক্তির কার্য্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে একে অন্যের নিকট ইহাদের মনোভাব জ্ঞাপন দ্বারা। যুদ্ধকালে একই পক্ষভুক্ত সেনানিচয় মধ্যে এক দলের সহিত অপর দলের মনোভাব জ্ঞাপনসূচক সংকেতিক চিহ্নের ব্যবস্থা না থাকিলে দলগুলি যেরূপ হীনবল হয় তদ্রূপ যূথপরিবারভুক্ত এই শত শত মৃগের মধ্যে যদি মনোভাব ব্যক্ত করিতে না পারা যাইত তবে তাহাদের ঐ সমবেত শক্তিও ব্যর্থ হইয়া যাইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই মৃগগণ যে মস্তক উত্তোলন, কর্ণ উৎকীরণ ক্ষুরাঘাত প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে তাহা কি ভাষা নহে? আমরা সুসংস্কৃত সম্মার্জিত ব্যাকরণানুমোদিত অভিধানান্তর্গত শব্দ যোজনা দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি পশুদিগের এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও উচ্চারিত শব্দের তারতম্য কি ঠিক সেই কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছে না? এই উভয়েতেই ভাষা আখ্যা প্রযোজ্য। পূর্ব্বে যে

সকল দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্তত তিন প্রকারের ভাষার মূল বীজ নিহিত রহিয়াছে। একটি, হরিণ যেই মস্তক উত্তোলন করিল অমনি হরিণের দল সকলই ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান, ইহা একটি সঙ্কেত, অর্থ, শ্রবণ কর। যে পদার্থ প্রথমোল্লিখিত হরিণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইতে যদি কোনও প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে তবে মৃগ অনুচ্চ অথচ গভীর ভাবপূর্ণ একটী শব্দ উচ্চারণ করিবে; ইহাকে এক শব্দ বলা যাইতে পারে, এই শব্দের অর্থ সাবধান হও। তদনন্তর মৃগ যদি বুঝিতে পারে যে ঐ পদার্থ হইতে প্রাণনাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎক্ষণাৎ সে অত্যুচ্চ ও কর্কশ আর একটি শব্দ উচ্চারণ করিবে যাহা শ্রবণ মাত্র মৃগের দল বায়ুবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবে। ইহার অর্থ নিজ প্রাণরক্ষার পথ দেখ। এই কর্কশ ও অত্যুচ্চ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা একটী বিশেষ অর্থ জ্ঞাপক বাক্যের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

ইহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক যে বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন দেশে মানব জাতির মধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেক ভাষার মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ভাষার এই তিন অঙ্গ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বাক্যবিনিময় কালে অনেক সময় এই হস্তসঞ্চালন আমাদেরও মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই হস্তসঞ্চালন ও মুখবিকৃতি, যাহা মুদ্রাদোষ নামে অভিহিত, বড় বড় বক্তার বক্তৃতা ও গায়কের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। মনোভাব জ্ঞাপন কার্য্য কোন সময়ে মানব সমাজেও যে এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন হইত তাহার সাক্ষ্য অদ্যাপিও নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ১ম, মূক ও বধির;—মূক ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায় তাহার দুই হস্তস্থিত দশটি অঙ্গুলী ও মুখের মাংসপেশী। এই কয়টি অঙ্গুলীর প্রসারণ এবং মুখমণ্ডলস্থ মাংসপেশীর নানাপ্রকার বিকৃতভাব দ্বারা সে অতি সহজে ও পরিষ্কাররূপে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি আমরা মুখোচ্চারিত ভাষা দ্বারাও অনেক সময় তদপেক্ষা অধিক বিশদরূপে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। ২য়, অসভ্য মানব। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ও ডাঃ লিভিংষ্টোন প্রভৃতি দেশভ্রমণকারীদিগের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর নানাদেশীয় অসভ্যদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা ভাবের বিনিময় কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয় তৎসম্বন্ধে Drummond যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থানে প্রদত্ত হইল। "No one who has witnessed a conversation—one says "witnessed," for it is more seeing than hearing—between two different tribes of Indians can have any doubt of the working efficiency of this method of speech. After ten minuites of almost pure pantomime each will have told the other everything that it is needful to say. Indians of different tribes, indeed, are able to communicate most perfectly on all ordinary subjects .with no more use of the voice than that required for the emission of a few different kinds of grunts." অবশ্য ইহা হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে এই সকল অসভ্যদিগের নিজেদের কোন প্রকার বাক্য ভাষা নাই—বরং ইহাই বলা সমীচীন হইবে যে এই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন তাহাদের বাক্য ও ভাষার পুষ্টিসাধক মাত্র। এই সকল চিহ্ন শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া বাক্যের পূর্ণতা সাধন করিতেছে মাত্র।

৩য়, শিশু সন্তান:—নবপ্রসূত শিশু প্রথম কয়েক মাস পর্য্যন্ত কেবল সঙ্কেত ও নানারূপ স্বর উচ্চারণ দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। বুলি ফুটিবার বহুপূর্ব্বে শব্দের (word) সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল ক্রন্দন ও মুখাকৃতির বিভিন্নাবস্থা অবলম্বন দ্বারা শিশু এমনভাবে তাহার অভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় যে তাহা বুঝিবার জন্য বিন্দুমাত্রও আয়াসের প্রয়োজন হয় না। শিশু বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্নের সহিত তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ সম্বন্ধে Malbery তাহার First annual report of the Buruau of Ethnologyতে লিখিতেছেন—"The wishes and motions of very young children are conveyed in a small number of sounds but in

a great variety of gestures and facial expressions. A child's gestures are intelligent, long in advance of speech ; althrough very early persistent attempts are made to give it instructions in the latter but not in the former." ইহাও এই স্থলে ব্যক্তব্য যে ঘোর উন্মাদ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন এতদূর জ্ঞানহারা হইয়াছে যে কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিবার আর শক্তি থাকে না তখনও তাহারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল অনুভব করিতে সমর্থ হয়। বড় বড় বক্তাদেরও বক্তৃতার সময় তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার ও শব্দ উচ্চারণের তারতম্য হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে এই সকলই মানবের আদি ভাষা ছিল। এই ভাষার প্রকৃতিতে প্রস্তর বক্ষে খোদিত লিপির ন্যায় অদ্যাপি মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া রহিয়াছে। গুরুপরম্পরাগত মন্ত্রের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ এই ভাষা অস্থি মজ্জার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। কাল সহকারে মানব যতই উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইতেছে ততই তাহার অন্তরে উচ্চতর ভাব সকল বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা বিশেষ অনুধাবনার বিষয় যে বক্তা যখন সাধারণ ভাবনিচয় অতিক্রম করতঃ উন্নততর ক্ষেত্রে উপনীত হন এবং স্থিরবুদ্ধি, গভীর চিন্তাশক্তি ও গবেষণার পরিচায়ক আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন তখন আর সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার থাকে না। আপনা হইতেই উচ্চারিত স্বরের তারতম্য অপসারিত হইয়া যায়। স্রোতস্বিনীর জলরাশির ন্যায় একই ভাবে একই গতিতে চিন্তার গভীরতাব্যঞ্জক স্বরেতে প্রাণের অভ্যন্তর স্থান হইতে বাক্যস্রোত প্রধাবিত হইতে থাকে। এ সময় বক্তা তাহার পুরুষপরম্পরাগত অধিকারিত্ব সূত্রে প্রাপ্ত স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া স্বোপার্জ্জিত যে উচ্চতরতম ভূমি, তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা বস্তুতই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি তাহারই আলোচনাতে নিমগ্ন থাকেন ? রসনায় তাহার স্বরচিত যে ভাষা তাহার ব্যবহারই স্বাভাবিক। (ক্রমশঃ)

উন্নতি প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব।—মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গনে প্রতি বৎসর ১১ই মাঘের সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদিব্রাহ্মসমাজের উৎসব বিশেষভাবে প্রাতঃকালে সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রাতঃকালের উৎসব আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু বাটী বহুদিনের পুরাতন বলিয়া ইঞ্জিনিয়রগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিলেও সেখানে সমাজের কর্তৃপক্ষগণ উৎসবাদি করাইতে সাহস করেন না। তাই আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মহর্ষিদেবের বাটীতেই প্রাতঃকালের এবং সন্ধ্যাকালের, উভয়কালীন উৎসবই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। কেবল ব্রাহ্মদের নহে, কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে ইহা লজ্জার কথা যে, যে আদিব্রাহ্মসমাজের পত্তনস্থান হইতে সমগ্র ভারতবাসী সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের পথ দেখিতে পাইয়াছে, সেই পত্তনস্থানে পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতির উপযুক্ত একটী সুপ্রশস্ত অট্টালিকা আজি পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল না। হইতে পারে যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে ছোট খাটো অনেক বিষয়ে, সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকিলে, সেই বেদান্তপ্রচারিত ব্রহ্মনাম প্রচারের প্রতি যথার্থ প্রীতি থাকিলে অন্যান্য বিষয়ের মতভেদ কোথায় ভাসিয়া যাইত।

উৎসব যেখানেই হোক না কেন, উৎসব মাত্রই সমাজের উন্নতির অনুকূল তাহা বলা বাহুল্য। ধর্ম্মসমাজের যে উৎসবে উৎসবযাত্রীগণের হৃদয়ে যত অধিক পরিমাণে পবিত্রভাব, যত পরমাত্মার সহিত একাত্মযোগের ভাব নামিয়া আসিবে, সেই উৎসব সেই পরিমাণে সার্থক নিঃসন্দেহ। মহর্ষিদেবের বাটীতে এবৎসর যে দ্বৈকালীন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারকার উৎসবও সার্থক হইয়াছিল। সম্ভবত এবৎসর যুদ্ধোপলক্ষে হাহাকারের কারণে, সকলেরই মনে ভগবানের মাতৃভাব যেন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল. সকলেই যেন মায়ের কোলে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এবারকার উৎসবে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতঃকালীন উৎসবে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উদ্বোধনে সেই ভাবেরই যেন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং সান্ধ্য উৎসবে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার মাতৃপূজাসূচক উপদেশে তাহাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতগুলিও অধ্যাত্মযোগের অনুকূলরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বলবৎশিক্ষা—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি যে ভারতের সকল অংশ হইতেই ইচ্ছা-শিক্ষার পরিবর্তে বলবৎ শিক্ষার পক্ষে অনুকূল মত পাওয়া যাইতেছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটি প্রথমে বলবৎ শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন—অর্থাভাবই অবশ্য তাহার অন্যতর কারণ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মিউনিসিপালিটি তাহার অনুকূলে মত দিয়াছেন। একবার বলবৎশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে অর্থের জন্য চিন্তা করিতে হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। গবর্ণমেণ্টও ক্রমশ এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রদানে বাধ্য হইবেন নিঃসন্দেহ। এই সূত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেক দেশহিতৈষীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে বলি যে শিক্ষার কোন্ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। আমরা অনেকবার বলিয়া আসিয়াছি যে মূলত মনুসংহিতা-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্যপ্রধান পন্থা অবলম্বন করিলেই দেশের মঙ্গল। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রগণের চরিত্রের উপর অল্পই প্রভাব বিস্তার করে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণের চরিত্র সুগঠিত না হয়, সে প্রণালীতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ না হয়, সে প্রণালীতে জ্ঞানার্জ্জনের সহস্র পথ উন্মুক্ত থাকিলেও পরিণামে তাহা পতনের কারণ হয়—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান ইয়োরোপ। আমরা আর একটী বিষয়ের সূচনা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি। সম্প্রতি বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন ভারতে ব্যারিষ্টার প্রস্তুত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা ইহাই তো চাই যে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার দ্বার ভারতে উন্মুক্ত হইয়া যাক। একদিকে বলবৎ-শিক্ষার প্রবর্ত্তন, অপরদিকে ভারতে সকলপ্রকার শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়া, উভয়ের মিলনে আমাদের প্রিয়তম জন্মভূমির যে কি কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা কল্পনাতীত।

একলিপি ও ভাষাবিস্তার। সমস্ত ভারতবর্ষে যে একই প্রকার বর্ণলিপি এবং এক ভাষা স্থির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুলক্ষণ। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল আমরা এই বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আলোচনা করিয়া সমগ্র ভারতের জন্য একই বর্ণমালা ও একই ভাষা প্রবর্ত্তনের উপকারিতার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমরা সেই আলোচনাসূত্রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে অগ্রণীদিগকে লইয়া একটী সভা আহ্বানের প্রস্তাব ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। গত কংগ্রেসের সময় একলিপি বিস্তারিণী সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালীতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। গুটীকয়েক হিন্দি ভাষার পক্ষপাতী হিন্দুস্থানী লোক লইয়া সভা করিয়া হিন্দীভাষাকে ভারতের সাধারণ-ভাষা করিবার ঔচিত্য স্বীকার করিলে যে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। সেই সভায় দুচার জন বঙ্গসাহিত্যের অগ্রণীকে সভ্যরূপে লইলেও বিশেষ কোন লাভ নাই। আমাদের মতে ভারতীয় সকল প্রধান ভাষায় সাহিত্যের অগ্রণীদিগকে লইয়া একটী সভা করিয়া তাহাতেই এবিষয়ের আলোচনা হওয়া দরকার।

গত ২৬শে জানুয়ারি হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজে এবিষয়ে একটী সুন্দর আলোচনা প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লেখক বলিতে গেলে আমাদেরই কথা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের যে ভাষা যত শক্তিমত্তা দেখাইতে পারিবে, সেই ভাষাই সাধারণ ভাষা হওয়া সম্ভব বেশী। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, যেভাবে ফরাসি ভাষাকে সমগ্র ইউরোপের সাধারণ ভাষা বলা যায়, সেই ভাবে উক্ত ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ বজায় রাখিয়া সাধারণ ভাষায় দাঁড়াইবে। কথাটার ভিতর সত্য আছে। আমরাও হিন্দুপেট্রিয়টের কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতে চাহি যে, ভারতে যে সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে, যে ভাষা শক্তিতে, প্রাণেতে, মানবের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ভাবের মধ্য দিয়া সেই জাগরণের সহায়তা করিতে পারিবে, সেই ভাষারই সাধারণ ভাষায় দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এমন সময় আসিবে, যখন ভারতের একটী ভাষা এবং একটী বর্ণমালা না হইয়া যাইতে পারিবে না।

স্বায়ত্তশাসন। কংগ্রেসের সময়ে "ভারত প্রেমিকদিগের প্রতি আন্তরিক নিবেদন" নামক একখানি চটী (পুস্তিকা) হস্তগত হইয়াছিল। তাহাতে জাতি বর্ণনির্ব্বিশেষে যাহাতে প্রতি পরিবারকে মূল ধরিয়া দেশের শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবে অনেকগুলি বিবেচনার আলোচনার কথা আছে। এই যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রতি পরিবার ধরিয়া শাসন প্রণালী গঠন করিবার ভাব আমাদের দেশের লোকের মনে উঠিয়াছে, ইহাতেই আমরা ভগবানের মঙ্গলহস্তের স্পষ্ট পরিচয় পাইতেছি। তবে একথা আমরা বলিব যে এই প্রস্তাবকারীগণ এই প্রণালীতে শাসন নির্ব্বাহ করা যত সহজ মনে করিতেছেন, তত সহজ নহে। এইরূপ শাসনপ্রণালীর যোগ্য হইবার জন্য আমাদের এখন অবধি বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তবেই এরূপ শাসন প্রণালীর উপযুক্ত হইব।

ভারতের শিল্প সম্মিলন—কংগ্রেসের ন্যায়

ভারতের শিল্পসম্মিলনও যে বিশেষ মঙ্গলপ্রসূ, ইহা এখনও সাধারণ ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। একটী প্রধান কারণ এই যে, শিল্পসম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ ইহার বিষয় সকলকে বুঝাইয়া ইহাকে popularise করিতে পারেন নাই। ভারতের সমাজ সম্মিলনে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় কি বলিলেন, তাহা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। তাহার কারণ এই যে, ডাক্তার রায়ের বক্তব্য বিষয় লইয়া দেশবাসীগণ বহু পূর্ব্বাবধি আলোচনা করিয়াছে কাজেই সে বিষয়ের ভালমন্দ আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে কিছু না কিছু বুঝিতে পারি এবং সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচনা আন্দোলনের অধিকার রাখি। কিন্তু শিল্পসম্মিলনের বক্তব্য সম্বন্ধে সম্মিলনের দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশবাসী সাধারণের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা হয় কি না সন্দেহ। এবারকার শিল্পসম্মিলন যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য কথা বলিতে কি তন্মধ্যে অনেক প্রস্তাবের ভালমন্দ দূরে থাক, সেই প্রস্তাবগুলিই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অথচ বলা বাহুল্য যে শিল্পসম্মিলনের উপস্থিত প্রস্তাবগুলি শত সমাজসম্মিলনের প্রস্তাব অপেক্ষা আমাদের জীবনরক্ষার উপযোগী। আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট এই অনুরোধ করি যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক প্রস্তাবের বক্তব্য বিষয়, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রে আন্দোলন আলোচনা প্রভৃতির সাহায্যে দেশবাসীকে সম্বৎসর ধরিয়া বুঝাইয়া দিতে থাকুন, তাহা হইলে সম্মিলনের দিনে সকলের উপস্থিত থাকিবার আগ্রহ জন্মিবে এবং উপস্থিত সকলে বক্তৃতাদিতে বুঝিয়া যোগ দিতে পারিবেন। শিল্পসম্মিলনের যে সকল প্রস্তাব আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাদেরই দুএকটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব।

শিল্পকারখানার বিলোপ। শিল্পসম্মিলন বড় কঠিন স্থানে হাত দিয়াছেন। সম্মিলনের তৃতীয় প্রস্তাব এই যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়া বিলুপ্ত হয় কেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এবিষয়ে তাঁহারা কতটা কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলা যায় না। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, কিন্তু এই বঙ্গদেশে ইহা একটী প্রকাশ্য গুপ্ত সত্য (open secret) যে, অনেক কারখানা, অনেক কারবারের কর্তৃপক্ষগণের অনবধানতা, জুয়াচুরী প্রভৃতি কারণে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি কি সেই সকল টানিয়া বাহির করিতে পারিবেন এবং বাহির করিলে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিবেন? এই সকল বিষয় প্রকাশ করিলে আমাদের বিশ্বাস যে দেশের বিশেষ উপকার হয়। এই যে কত কত অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল ও হইতেছে, সেগুলির সম্বন্ধেও কি অনুসন্ধান হওয়া উচিত নহে? আমরা দোষপ্রকাশের জন্য অনুসন্ধানের কথা বলিতেছি না, কিন্তু দেখা উচিত যে সেই সকল অর্থভাণ্ডারে কতটা সঞ্চিত আছে এবং দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া স্থির করা উচিত যে সেই সঞ্চিত অর্থের দ্বারা দেশের কোন্ মঙ্গলসাধন তাঁহাদের অভিপ্রেত। এই বিষয়ে প্রথমেই যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পসম্মিলনের সভাপতি ও সদস্যরূপে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে যে নির্ভীকতা আবশ্যক, যে সহিষ্ণুতা আবশ্যক, জানি না তাহা কয়জনের আছে।

ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন। সম্মিলনের চতুর্থ প্রস্তাব সমস্ত ভারতের ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন। যখন দেশে ভাষা ও বর্ণমালা এক করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, তখন ওজন ও মাপের ঐক্যসাধন যে সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য। যে কোন উপায়ে দেশবাসীগণ ঐক্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিব।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার। সম্মিলনের অন্যতর প্রস্তাব হইতেছে স্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা গুণে মন্দ ও মূল্যে উচ্চ হইলেও আমাদের তাহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কথাটা মতবাদ হিসাবে ঠিক, কিন্তু কার্য্যে তাহা কি দাঁড়াইতে পারিবে? আমাদের রুচি এমনই বিকৃত হইয়াছে যে আমরা গুণে ভাল অথচ মূল্যে কম হইলেও অনেক সময়েই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করি না, কারণ তাহা বিদেশীয় দ্রব্যের নিকট চাকচিক্যে হার মানে। আমাদের আশা কোথায়? আবার অনেক সময়ে ইচ্ছা করিলেও যে প্রয়োজনীয় দেশীয় দ্রব্য পাই না। সম্মিলনের অনুসন্ধান কমিটি এইসূত্রে অন্তত বঙ্গদেশের কাপড়ের কারখানা প্রভৃতির অকৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে এবং যথাযথ ব্যবস্থা প্রয়োগে সেই কারণ সমূহ বিদূরিত করিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব. করা ভাল ইত্যাদি মুখস্থ কথা বলিলে চলিবে না—কার্য্যে তাহা করিতে হইবে, তবেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দস্যুগিরি হ্রাস হইবে, দেশ নিরাপদ হইবে। স্বদেশী মোটা জিনিসের ব্যবহারেও আত্মগৌরব অনুভব করা শিক্ষা করিতে হইবে এবং শিক্ষা দিতে হইবে।

এই সূত্রে শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয় সংস্থাপনের কথা উঠিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে বোধ হয় যে গভর্ণমেণ্ট এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে বাধ্য হইবেন—

নহিলে ভারতবাসীর মরণ নিশ্চিত। কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। মহানুভব কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের ন্যায় আমাদের শিল্পশিক্ষা অগ্রসর করিয়া দিতে সাধ্যমত সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

সুখদুঃখবিবেক।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মনুষ্য কাণে শোনে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন করে, ও নাকের দ্বারা আঘ্রাণ করে, এবং ইন্দ্রিয়দিগের এই ব্যাপার স্বাভাবিক বৃত্তির যেরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল হয়, সেই অনুসারে মনুষ্যের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে—এইরূপ সুখদুঃখের বস্তু-স্বরূপের লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুখ-দুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিভৌতিক সুখদুঃখ উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্যপদার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও, সুখদুঃখের অনুভব মনুষ্যের নিকট পরে কিপ্রকারে আসিয়া থাকে, ইহার বিচার করিলে এইরূপ উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-নিষ্পন্ন এই সুখদুঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ উপলব্ধি করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। "চক্ষু-পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা"—দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না, তাহাতে মনের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক হয় (সভা, শা, ৩১১। ১৭), এবং সেই মন যদি ব্যাকুল হয় তবে চোখে দেখিয়াও, না-দেখিবার মতো হইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে কথিত হইয়াছে; বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও "আমার মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি দেখিতে পাই নাই (অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শম্), আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়া আমি শুনিতে পাই নাই (অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্)", এইরূপ বর্ণনা আছে (বৃ, ১, ৫, ৩)। অতএব আধিভৌতিক সুখদুঃখের অনুভব ঘটিবার পক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়গণই কারণ নহে, তাহার পরে মনের সাহায্য দরকার হয়—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখ মানসিকও হইয়া থাকে। এই সমস্ত হইতে দেখা যায়,—সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখানুভূতি শেষে মনকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে মনোনিগ্রহের দ্বারা সুখ দুঃখানুভূতিরও নিগ্রহ অসাধ্য নহে, এইরূপ পরে স্বতই উপলব্ধি হয়। এই অভিপ্রায় মনেই আনিয়া মনু সুখদুঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

> সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
> এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

অর্থাৎ যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আপনার আয়ত্ত তাহাই সুখ—ইহাই সুখদুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ (মনু ৪। ১৬০)। নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণের অন্তর্ভূত 'বেদনা' শব্দের মধ্যে, শারীরিক ও মানসিক এইরূপ দুই বেদনারই সমাবেশ হওয়ায় সুখদুঃখের বাহ্য বস্তুস্বরূপও উহার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং মনু সুখদুঃখের কেবল আভ্যন্তরিক অনুভূতির উপরেই কটাক্ষপাত করিয়াছেন—এই-টুকুর প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুখদুঃখের এই দুই লক্ষণের মধ্যে বিরোধ থাকে না। সুখদুঃখানুভূতির ইন্দ্রিয়াবলম্বিতা এইরূপে বিলুপ্ত হইলে পর—

> "ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ।"

অর্থাৎ—দুঃখের চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ (সভা, শা, ২০৫।২); এবং এই নীতি অনুসারে, ইতিহাসে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য অথবা ধর্ম্মের জন্য আহ্লাদের সহিত অগ্নিকাষ্ঠভক্ষণের অনেক উদাহরণ আছে। অতএব যাহা কিছু করিবে, মনোনিগ্রহের দ্বারা তদন্তর্ভূত ফলাশা ছাড়িয়া ও সুখদুঃখ সম্বন্ধে সমবুদ্ধি রাখিয়া আমরা কর্ম্ম করিতে থাকিলে অর্থাৎ কর্ম্ম না ছাড়িলেও সেই কর্ম্মে আমাদের দুঃখরূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে। ফলের আশা ত্যাগ করা অর্থাৎ ফল লাভ হইলে তাহা ত্যাগ করা, কিংবা সেই ফল কাহারো কখনও পাইবার বাসনা না রাখা, এরূপ অর্থ নহে। সেইরূপ ফলাশা এবং কর্ম্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু,

কিংবা ফল লাভার্থ কোন বিষয়ের যোজনা করা, ইহাতেও অনেক ভেদ আছে। হাত পা নাড়ানোর নিছক্ ইচ্ছা হওয়া, আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা অমুককে লাথি মারিবার জন্য হাত বা পা নাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, ইহার মধ্যে ভেদ আছে। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল কর্ম্মমাত্রের ইচ্ছা, উহাতে অন্য কোন হেতু থাকে না; এই ইচ্ছা চলিয়া গেলে সমস্ত কর্ম্মই বন্ধ হয়। এই ইচ্ছা ব্যতীত প্রত্যেক কর্ম্মের কোন প্রকার পরিণাম কিংবা ফল ঘটিবার এই জ্ঞানও প্রত্যেক মনুষ্যের থাকা চাই; এবং জ্ঞান শুধু থাকা চাই নহে, অমুক ফলের জন্য এইরূপ অমুক যোজনা করিয়াও কোন-না-কোন কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হওয়া চাই। নতুবা তাহার সমস্ত ক্রিয়া পাগলের মতো নিরর্থক হইবে। এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু, কিংবা যোজনা পরিণামে দুঃখজনক হয় না; এবং তাহা ছাড়িতে হইবে একথা গীতাও বলেন নাই। কিন্তু ইহাকে আরও ছাড়াইয়া গিয়া "আমি যে কর্ম্ম করিতেছি আমার সেই কর্ম্মের অমুক ফল অবশ্যই মিলিবে এই জন্যই করিতেছি" এইরূপ যে কর্ম্মফলের প্রতি কর্ত্তাপুরুষের বুদ্ধির মমত্বের আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান, অভিনিবেশ কিংবা আগ্রহ, তাহার দ্বারা মন অধিকৃত হইলে, এবং বাঞ্ছিত ফল মিলিবার পক্ষে বাধা উপস্থিত হইলে দুঃখপরম্পরা আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বাধা অনিবার্য্য ও দৈবকৃত হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, এবং মনুষ্যকৃত হইলে, পরে ক্রোধ কিংবা দ্বেষও উৎপন্ন হইয়া সেই দ্বেষের দ্বারা কুকর্ম্ম ঘটে এবং কুকর্ম্মের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত হয়। কর্ম্মপরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্ত আসক্তি ইহারও 'ফলাশা', 'সঙ্গ', 'অহঙ্কার বুদ্ধি' ও 'কাম' এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; এবং এখান হইতেই সাংসারিক দুঃখপরম্পরার প্রকৃত আরম্ভ, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষসঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ ও পরিশেষে মনুষ্যের নাশও হইয়া থাকে এইরূপ কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬২।৬৩)। জড় জগতের অচেতন কর্ম্ম স্বতঃ দুঃখের মূল নহে, মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশা, কাম বা আসক্তি স্থাপন করে, তাহাই প্রকৃত দুঃখের মূল, এইরূপ নিশ্চিত হইবার পর, এই দুঃখনিবারণ করিবার জন্য, বিষয়ান্তর্গত আসক্তি, কাম, কিংবা ফলাশা ইহাই মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিলেই হইল; সন্ন্যাসমার্গে যাহা বলা হয় তদনুসারে সমস্ত বিষয়, কর্ম্ম, বা সর্ব্বপ্রকারের ইচ্ছা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ পরে ন্যায়তই নিষ্পন্ন হয়। অতএব ফলাশা ছাড়িয়া নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে সে প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ, ইহা পরে গীতাতে কথিত হইয়াছে (গী, ২।৬৪)। জগতে কর্ম্মের ব্যবহার কখনই বন্ধ হয় না। মনুষ্য এই জগতে না থাকিলেও প্রকৃতি নিজ গুণধর্ম্মানুসারে সততই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। জড় প্রকৃতির সুখও নাই দুঃখও নাই। মনুষ্য নিজের অপ্রকৃত মহত্ত্ব গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রযুক্ত সুখদুঃখভাগী হইয়া থাকে। কিন্তু এই আসক্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে"—প্রকৃতির গুণধর্ম্মানুসারে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে (গী, ৩।২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যবহার করিলে পর, পরে অসন্তোষের কোন দুঃখই অবশিষ্ট থাকে না। এইজন্য সংসার দুঃখপ্রধান বলিয়া কাঁদিতে না বসিয়া কিংবা তাহা ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা না করিয়া, প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছে এইরূপ বুঝিয়া—

> সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ম্।
> প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥

অর্থাৎ—সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যখন যাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবে—(সভা, শা, ২৫, ২৬) এইরূপ ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছেন। সংসারের কোন কর্ত্তব্য দুঃখ সহিয়াও অবশ্য করিতে হইবে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, এই উপদেশের মহত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইবে। ভগবদ্গীতাতেও "যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্" (২।৫৭) শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অনাসক্ত থাকিয়া তাহার অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সেই স্থিতপ্রজ্ঞ—এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞার লক্ষণ বলিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎপ্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" (৫।২০) সুখ পাইয়া উল্লসিত হইবে না, এবং দুঃখে মুহ্যমানও

হইবে না,—এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সুখদুঃখ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভোগ করা আবশ্যক (২।১৪, ১৫) এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং অন্য স্থানে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ৫।৯; ১৩।৯)। বেদান্তশাস্ত্রের পরিভাষায় "কর্ম্মে ব্রহ্মার্পণ করা" ইহার এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; ভক্তি-মার্গে 'ব্রহ্মার্পণের' স্থলে কৃষ্ণার্পণ' এই শব্দ সংযোজিত হইয়া থাকে; এবং ইহাই সমস্ত গীতার সারতত্ত্ব।

কর্ম্ম যে প্রকারেরই হউক না, উহা করিবার ইচ্ছা ও নিজের উদ্যোগ না ছাড়িয়া এবং আমার যাহা করিতে হইবে তাহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, পরিণামে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিয়া সেই কর্ম্ম করিয়া গেলে, তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষের অনিবারণে যে দুষ্পরিণাম ঘটে, সেই দুষ্পরিণাম শুধু যে নিবারিত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণার সহিত কর্ম্মেরও নাশ করিলে জগৎ ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাও হয় না এবং মনোবৃত্তি শুদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বভূতহিতপ্রদ হইয়া থাকে। ফলাশা এইরূপ ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বারা পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়,—ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে বশে রাখিয়া, স্বার্থের বদলে বৈরাগ্যকে ও নিষ্কাম বুদ্ধিকে লোক-সংগ্রহার্থ আপন আপন কর্ম্ম করিতে দেওয়া এবং সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে তৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সমূলে নাশ করা—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গীতায় যে বৈরাগ্য ও যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম-প্রকারের, দ্বিতীয়-প্রকারের নহে; এবং সেই অনুসারেই অনুগীতাতে জনক-ব্রাহ্মণ সংবাদে (সভা, অশ্ব, ৩২। ১৭-২৩) জনক রাজা ব্রাহ্মণের রূপধারী ধর্ম্মকে এইরূপ বলিয়াছেন যে—

> শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্ব্বত্র বিষয়ো মম।
> নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্ ঘ্রাণগতানপি॥
>
> * * * * *
>
> নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোন্তরে।
> মনো মে নির্জ্জিতং তস্মাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥

অর্থাৎ—যে (বৈরাগ্য) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিয়া থাকি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শুন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আঘ্রাণ করি না (চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ আপন লাভের জন্য ব্যবহার করি না; অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি) ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাহারা আমার বশে আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া মনের দ্বারা যে বিষয় চিন্তা করে, সে ভণ্ড, এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ এইরূপ গীতাতে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যই এই। বাহ্যজগৎ কিংবা ইন্দ্রিয়ব্যাপার আমরা উৎপন্ন করি নাই, তাহারা স্বভাবসিদ্ধ; এবং কোন সন্ন্যাসী যতই নিগ্রহী হউক না কেন, ক্ষুধা অনিবার্য্য হইলে, সে ভিক্ষা মাগিতে বাহির হয় (গী, ৩।৩৩); কিংবা অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে, কখন বা উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নিগ্রহ যতই হউক না কেন ইন্দ্রিয়ের এই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার রহিত হয় না যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম্ম এবং সর্ব্ব প্রকারের ইচ্ছা বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার দুরাগ্রহে না পড়িয়া (গী, ২। ৪৭; ১৮। ৫৯), মনোনি-গ্রহের দ্বারা ফলাশা ছাড়িয়া ও সমস্ত সুখদুঃখ সমান জানিয়া (গী, ২। ৩৮) নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোক-ব্যবহারার্থ সর্ব্বকর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিতে থাকা—ইহাই বিজ্ঞতার মার্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। তাই—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

এই শ্লোকে (গী, ২।৪৭) ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন যে, তুমি যেহেতু এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার "কর্ম্ম করিবার অধিকার আছে," ইহা সত্য; কিন্তু তোমার এই অধিকার কেবল সম্যক্‌রূপে (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম সাধন করিবারই অধিকার, ইহা মনে রাখিবে। 'এব' অর্থাৎ 'কেবল' এই পদটির দ্বারা—কর্ম্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে—অর্থাৎ কর্ম্মফলে—মনুষ্যের অধিকার নাই—এইরূপ সহজভাবে নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু

এই গুরুতর বিষয় কেবল অনুমানের অবলম্বে না রাখিয়া, দ্বিতীয় চরণে "কর্ম্মফলে কখনই তোমার অধিকার নাই", কারণ কর্ম্মের ফল পাওয়া, কি না-পাওয়া, ইহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে, উহা নিয়তই পরমেশ্বরের অধীন কিংবা উহা সমস্ত সৃষ্টির কর্ম্মবিপাককে অবলম্বন করিয়া আছে—এইরূপ ভগবান সুস্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে বিষয়ে আমার অধিকার নাই, তাহা অমুক প্রকারে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, এইরূপ আশা করা মূঢ়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীয় বিষয়টিকেও অনুমানের উপর না রাখিয়া "অতএব তুমি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা মনেতে রাখিয়া কর্ম্ম করিবে না" সমস্ত কর্ম্মবিপাক অনুসারে তোমার কর্ম্মের যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছায় তাহা কম কিংবা বেশী অথবা শীঘ্র কিংবা বিলম্বে হওয়া অসম্ভব; এইরূপ আকাঙ্ক্ষাতিশয্যে কেবল তোমার দুঃখ ও কষ্ট হইবে মাত্র—এইরূপ তৃতীয় চরণে বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম করা ও ফলের আশা ছাড়া, এই প্রকারের বৃথা চেষ্টা করা অপেক্ষা, একেবারেই কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল নহে কি,—এইরূপ এই স্থলে কোন ব্যক্তি—বিশেষতঃ সন্ন্যাসমার্গী—প্রশ্ন করিতে পারেন। এই জন্য শেষে "কর্ম্ম না করিবার (অকর্ম্মের) আগ্রহ রাখিবে না" তোমার যে অধিকার আছে তদনুসারে—কিন্তু ফলাশা ছাড়িয়া—কর্ম্মই করিতে থাক, এইরূপ ভগবান শেষে নিশ্চিত বিধান করিয়াছেন। কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এতটা গুরুতর যে উপরি-উক্ত শ্লোকের চারি চরণ, কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের কিংবা গীতা-ধর্ম্মের চতুঃসূত্র বলিলেও চলে।

সংসারে সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুখ অপেক্ষা দুঃখের মোট পরিমাণ অধিক—ইহা সিদ্ধ হইলেও যদি সাংসারিক কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইয়া অত্যন্ত সুখ-প্রাপ্তির প্রযত্ন মনুষ্যের ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া সম্ভব; এবং কেবল আধি-ভৌতিক—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগ রূপ—সুখের দিকে দৃষ্টি করিলেও তাঁহাদের ধারণা অসঙ্গত এরূপ বলা যায় না। চাঁদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে মুষ্টির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপই আত্যন্তিক সুখের আশায় কেবল আধিভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও, অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি দুর্ঘট হয়। কিন্তু আধিভৌতিক সুখ এই সুখেরই একটা প্রকারভেদ মাত্র না হওয়ায় এই বাধাপ্রযুক্তই অত্যন্ত ও নিত্য সুখপ্রাপ্তির একটা পথ বাহির করা যাইতে পারে। শারীরিক ও মানসিক সুখের এই দুই ভাগ করিলে পর, শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে ইহা উপরে বলা হইয়াছে। শারীরিক (অর্থাৎ আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, এইরূপ যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, তাহা আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশত করেন না, পরন্তু তাহাতেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের প্রকৃত মহত্ত্ব অর্থাৎ সার্থকতা আছে, এইরূপ আধিভৌতিক-বাদী "মিল্" আপন উপযোগবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন*। বিষয়োপভোগেই এই জগতে প্রকৃত সুখ, এইরূপ যদি মনুষ্যের ধারণা হইত তাহা হইলে মনুষ্য পশু হইতেও রাজি হইত। কিন্তু পশুর সমস্ত বিষয়-সুখ যদি নিত্য পাওয়া যাইত তথাপি যেহেতু পশু হইতে কেহ রাজি হয় না, অতএব পশু হইতে মনুষ্যের মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই বিশেষত্বটি কি তাহা দেখিতে গেলে অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির দ্বারা আত্ম ও বাহ্যজগতের যাহার জ্ঞান হয়, তাহার আত্মস্বরূপের বিচার করা আবশ্যক হয়; এবং একবার এই বিচার সুরু হইলে পর, পশু ও মনুষ্য এই উভয়ের একইরূপ সাধ্য যে বিষয়োপভোগসুখ তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শুদ্ধাবস্থাতে যে সুখ, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কিংবা অত্যন্ত সুখ—ইহা ঐ বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই উপলব্ধি হয়। এই সুখ সমস্ত আত্মবশ অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা না

* "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question."—Utilitarianism, P, 14 (Longmans 1907.)

রাখিয়া কিংবা অন্যের সুখের লাঘব না করিয়া, আপন প্রযত্নে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যেমন যেমন উর্দ্ধে আরোহণ করে, সেই অনুসারে এই সুখের স্বরূপ অধিকাধিক শুদ্ধ ও অবিমিশ্র হইয়া থাকে। "মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ"—মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবান্ই বা কে, দু-ই সমান—এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন; প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ত্ববেত্তাও শারীরিক (অর্থাৎ বাহ্য কিংবা আধিভৌতিক) সুখাপেক্ষা মনের সুখ শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধি-গ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক) সুখ শ্রেষ্ঠ এই-রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।† তাই যদিও মোক্ষের বিচার আপাতত এক পাশে সরাইয়া রাখা গিয়াছে তথাপি আত্মবিচারনিমগ্ন বুদ্ধি পরম সুখ লাভ করিতে পারে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে; এবং সেই দরুণ ভগবদ্গীতাতে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এইরূপ তিন ভেদ করিবার পর, তন্মধ্যে "তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্" আত্মনিষ্ঠ (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই আত্মা এইরূপ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে চিনিয়া তাহাতেই রত থাকা) বুদ্ধির প্রযত্নে যে আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায় তাহাই সাত্ত্বিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—প্রথমে এইরূপ বলিয়া (গী, ১৮।৩৭), তাহার পর ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়প্রসূত আধিভৌতিক সুখের পদবী ইহার নীচে অর্থাৎ রাজসিক (গী, ১৮।৩৮), এবং চিত্তমোহ ও নিদ্রা কিংবা আলস্য হইতে উৎপন্ন সুখের যোগ্যতা তামসিক অর্থাৎ কনিষ্ঠ, এই-রূপ পরে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভে গীতার যে শ্লোক প্রদত্ত হই-য়াছে, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য; এই পরম সুখের উপলব্ধি একবার হইলে, পরে যতই বড় দুঃখ আসুক না কেন, তাহাতেও স্থৈর্য্য বিচলিত হয় না, এইরূপ গীতাও বলিয়াছেন (গী, ৬।২২)। এই অত্যন্ত সুখ স্বর্গের বিষয়সুখেও নাই; তাহা লাভ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধি প্রথমে প্রসন্ন হওয়া চাই। ইহাকে কেমন করিয়া প্রসন্ন রাখিবে তাহা না দেখিয়া, যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপভোগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক বা অনিত্য। কারণ যে ইন্দ্রিয়সুখ আজ আছে তাহা কাল নাই শুধু নহে, যে বিষয় আপন ইন্দ্রিয়ের নিকট সুখকর বলিয়া মনে হয় তাহাও কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য দুঃখজনক হইতে পারে। উদাহরণ যথা—গ্রীষ্মকালে যে ঠাণ্ডা জল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা যায় না। ভাল; এত করিয়াও তাহা হইতে সুখে-চ্ছার পূর্ণতৃপ্তি হয় তাহাও নহে,—ইহা উপরে বলা হইয়াছে। তাই, 'সুখ' এই শব্দ ব্যাপকভাবে সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধেই যদি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সুখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে সুখ ইন্দ্রিয় সুখই বুঝায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত ও নিছক্ আত্মনিষ্ঠবুদ্ধির উপলব্ধ সুখ হইতে বিষয়োপভোগরূপ সুখের ভেদ প্রদর্শন করায় যখন ইষ্ট আছে, তখন বিষয়োপভোগের আধি-ভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র সুখ কিংবা প্রেয় এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সুখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, আনন্দ কিংবা শান্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্ব্ব প্রকরণের শেষে প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেয় ও শ্রেয় এই দুয়ের মধ্যে নচিকেতা যে ভেদ করিয়াছেন তাহা এই মর্ম্মেই করা হইয়াছে। মৃত্যু তাঁহাকে অগ্নির রহস্য প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রাপ্ত হইলে পর নচিকেতা পরে, আমাকে আত্মজ্ঞান বলো এইরূপ যখন বর চাহিলেন তখন তাহার বদলে মৃত্যু অন্য অনেক ঐহিক সুখের লোভ তাঁহাকে দেখাইলেন। পরে এই প্রকারের যে অনিত্য আধিভৌতিক সুখ কিংবা আপাতমনোরম বস্তু—তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া, আরো দূরদৃষ্টি দিয়া যাহাতে আপন আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকে নচিকেতা আগ্রহের সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সার কথা—আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগম্য সুখকেই কিংবা আধ্যাত্মিক আনন্দ-কেই আমাদের শাস্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মানেন; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত সকলেরই প্রাপ্তব্য এবং সকলেই তাহা সম্পাদন করিবার প্রযত্ন করেন, ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়। পশুধর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের যাহা কিছু বিশিষ্ট সুখ তাহা ইহাই; এবং এই আত্মানন্দ কেবল বাহ্য

† Republic Book IX.

উপাধিকেই কখন অবলম্বন করিয়া থাকে না; সমস্ত সুখের মধ্যে উহাই নিত্য, স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"নির্ব্বাণের শান্তি" (গী, ৬।১৫); স্থিতপ্রজ্ঞার ব্রাহ্মী অবস্থায় যে চরম সুখ অনুভূত হয়, তাহা ইহাই (গী, ২।৭১; ৬।২৮; ১২।১২; ১৮।৬২ দেখ)।

আত্মার শান্তি কিংবা সুখই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সুখ; উহা আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত উহা লাভ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু সকল ধাতুর মধ্যে সোনাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিলেও অন্য ধাতুর গরজ যেমন চলিয়া যায় না, কিংবা চিনি অত্যন্ত মিষ্ট হইলেও লবণ বিনা যেমন কাজ চলে না, আত্মসুখ কিংবা শান্তির কথাও সেইরূপ। অন্তত শরীর-ধারণার্থও এই শান্তির সহিত ঐহিক পদার্থসমূহকে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, এ কথা নির্ব্বিবাদ; এবং এই অভিপ্রায়েই আশীর্ব্বাদের সঙ্কল্পের মধ্যে কেবল 'শান্তিরস্তু' এইরূপ না বলিয়া "শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু" অর্থাৎ শান্তির সহিত পুষ্টি তুষ্টিও চাই—এইরূপ বলিবার রীতি আছে। কেবল শান্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া আবশ্যক এরূপ যদি শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে এই সঙ্কল্পের মধ্যে 'পুষ্টি' এই পদার্থটি সন্নিবেশ করিবার কোন হেতু থাকিত না। তথাপি পুষ্টির অর্থাৎ ঐহিক সুখবৃদ্ধির অসংযত আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নহে। তাই শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি (সন্তোষ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, কিংবা তিনই তোমার পাওয়া চাই, এইরূপ এই সঙ্কল্পের ভাবার্থ। কঠোপনিষদের তাৎপর্য্যও এইরূপ। নচিকেতা যম-লোকে গমন করিলে পর যম তাহাকে তিন বর চাহিতে বলিয়া, তদনুসারে প্রার্থিত বর তাহাকে দিলেন, এই কথাই এই উপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু বর চাহিতে বলিলে পর, নচিকেতা একেবারে প্রথম হইতেই আমাকে "ব্রহ্মজ্ঞান দান কর" এইরূপ বর না চাহিয়া "আমার পিতা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন আমার উপর প্রসন্ন হন" এইরূপ প্রথমে, এবং পরে, "অগ্নি অর্থাৎ ঐহিক সমৃদ্ধি উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর"—এইরূপ দ্বিতীয় বর চাহিয়াছেন; এবং এই বর প্রাপ্ত হইলে পর, শেষে "আমাকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দেও" এইরূপ যমের নিকট তৃতীয় বর চাহিয়াছেন। কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অন্য সম্পদ দিতেছি—এইরূপ যখন যম বলিতে লাগিলেন তখন—অর্থাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক সেই সব যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞান লাভ হইলে পর, তাহাতে অধিক আশা না রাখিয়া—"এক্ষণে, যাহাতে শ্রেয় লাভ হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আমাকে বল,"—এইরূপ নচিকেতা জেদ ধরিলেন। সারকথা—এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রাদিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'যোগবিধি' অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি—এই দুই-ই লাভ করিয়া নচিকেতা মুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬।১৮)। ইহা হইতে,—জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুয়ের সমুচ্চয় উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্র সম্বন্ধে এই প্রকারের একটা কথা আছে। ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃ পূর্ণ হইয়াছিল শুধু নহে, প্রতর্দনাস তাঁহাকে আত্মবিদ্যার উপদেশও দিয়াছিলেন—এইরূপ কৌশীতকি-উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্যে গিয়া প্রহ্লাদ ত্রৈলোক্যাধিপতি হইলে পর,—ইন্দ্র, দেবতার গুরু যে বৃহস্পতি তাঁহার নিকট গিয়া "শ্রেয় কিসে হয় তাহা আমাকে বল" এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। তখন বৃহস্পতি রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া "ইহাই শ্রেয়" (এতাবচ্ছ্রেয় ইতি) এইরূপ উত্তর দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া "আরও বেশী কিছু আছে কি" (কো বিশেষো ভবেৎ?) এইরূপ পুনঃ প্রশ্ন করিলে পর, বৃহস্পতি তাঁহাকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও ঐরূপ হইলে পর, শুক্র "উহা প্রহ্লাদের ভাল জানা আছে" এইরূপ বলিলেন। তখন শেষে ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া ইন্দ্র প্রহ্লাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল তাঁহার সেবা করিয়া, শীলই (সত্য ও ধর্ম্মানুসারে আচরণ করিবার স্বভাব) স্বর্গরাজ্য লাভের নিগূঢ়-তত্ত্ব এবং তাহাই শ্রেয়—এইরূপ প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন। তাহার পর, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যে বর চাহিবে তাহা আমি তোমাকে দিব,—এইরূপ প্রহ্লাদ যখন বলিলেন,

তখন "তোমার 'শীল' আমাকে দেও।—এইরূপ ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্র বর চাহিলেন। তাহাকে প্রহ্লাদ 'তথাস্তু' বলিবার পর 'শীল' ও তাহার পশ্চাতে ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত ও পরিশেষে শ্রী কিংবা ঐশ্বর্য্য এই সব দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিল এবং তাহার দরুণ পরে ইন্দ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন. এইরূপ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (শা, ১২৪) ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এক প্রাচীন কথা বিবৃত করিয়াছেন। নিছক্ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা, নিছক্ আত্মজ্ঞান যদি যোগ্যতর হয়, তথাপি এ জগতে যাহার থাকিতে হইবে তাহাকে জনসাধারণের মতেই ঐহিক সমৃদ্ধিও আপনার জন্য কিংবা আপনার দেশের জন্য লাভ করিবার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকার থাকা প্রযুক্ত এই জগতে মনুষ্যের পরম সাধ্য কি ?—এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শান্তি ও পুষ্টি, শ্রেয় ও প্রেয় কিংবা জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য—এই দুয়ের সমুচ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রের চরম উত্তর, এইরূপ উক্ত সুন্দর ইন্দ্র-প্রহ্লাদের কথা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়। যে ভগবান অপেক্ষা এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাঁহার পথ ধরিয়া অন্য লোকে গমন করিয়া থাকে (গী, ৩।২৩) সেই ভগবান ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন কি ?—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় বিষয়কে ভগ বলে—এইরূপ ভগ শব্দের ব্যাখ্যা পুরাণাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে (বিষ্ণু, ৬।৫।৭৪ দেখ)। এই শ্লোকে ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ 'যোগৈশ্বর্য্য' এইরূপ করা হয় ; কারণ, শ্রী অর্থাৎ সম্পদ এই শব্দ পরে আসিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারে ঐশ্বর্য্য শব্দে সত্তা, যশ ও সম্পদ এবং জ্ঞানেও বৈরাগ্য ও ধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উপরি উক্ত শ্লোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য এই দুই পদেই লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে ; এবং যেহেতু জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য এই দুয়ের সংযোগ ভগবানও স্বীকার করিয়াছেন, অতএব উহাই প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ করা আবশ্যক (গী, ৩।২১ ; মভা, শাং, ৩৪১।২৫)। আত্মজ্ঞানই এই জগতের সাধ্য এই সিদ্ধান্ত, সংসার দুঃখময় বলিয়া উহা হঠাৎ ছাড়িয়া দিতে হইবে এই কথা সন্ন্যাসমার্গের কথা, কর্ম্মযোগের নহে ; এবং ভিন্ন ভিন্ন মার্গের এই সিদ্ধান্ত একত্র করিয়া গীতার অর্থ বিপর্য্যয় করা উচিত নহে। তথাপি জ্ঞান বিনা কেবল ঐশ্বর্য্য আসুরী সম্পদ—ইহা গীতাও বলিয়াছেন। তাই, ঐশ্বর্য্যের সহিত জ্ঞান ও জ্ঞানের সহিত ঐশ্বর্য্য কিংবা শান্তি ও পুষ্টি এই দুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানের সহিত হৌক বা না হৌক, ঐশ্বর্য্যও চাই, এইরূপ বলিবার পর, "কর্ম্ম করা" উহারই সঙ্গে স্বতই আসিয়া পড়ে। কারণ, "কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে" (মনু, ৯।৩০০) কর্ম্মকারী ব্যক্তিও এই জগতে শ্রী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করে—এইরূপ মনু বলিয়াছেন ; প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয় ; এবং গীতাতে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই আছে (গী. ৩।৮)। মোক্ষদৃষ্টিতে কর্ম্মের আবশ্যকতা না থাকাপ্রযুক্ত শেষে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপাতত কেবল সুখদুঃখেরই বিচার করা কর্ত্তব্য, তাছাড়া মোক্ষ ও কর্ম্মের স্বরূপ পরীক্ষা এখনও করা হয় নাই বলিয়া এই আপত্তির উত্তর এখানে বলা যাইতে পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার আলোচনা করিয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে শূন্যগর্ভ তাহা দেখান যাইবে।

সুখ ও দুঃখ এই দুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা ; সুখেচ্ছা কেবল সুখোপভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে দুঃখ অধিক অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু এই দুঃখ নিবারণের তৃষ্ণা কিংবা অসন্তোষকে ও তাহার সহিত কর্ম্মকে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত না হওয়ায়, কেবল ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকাই শ্রেয়স্কর। কেবল বিষয়োপভোগসুখ কখনই পূর্ণ হয় না, উহা অনিত্য ও পশুধর্ম্ম ; বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়বান মনুষ্যের প্রকৃত ধ্যেয় উহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শের হওয়া চাই ; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে

পাওয়া যায় যে শান্তিসুখ, তাহাই প্রকৃত ধ্যেয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক সুখ এইরূপ শ্রেষ্ঠ হইলেও নিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্ম করাও আবশ্যক ;—এই-টুকু কর্ম্মযোগশাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইলে পর, সুখ-দৃষ্টিতে বিচার করিলেও কেবল আধিভৌতিক সুখ-কেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কর্ম্মের কেবল সুখ-দুঃখাত্মক বাহ্য পরিণামের তারতম্যের দ্বারাই নীতিমত্তার নির্ণয় করা উচিত নহে, ইহা পৃথকরূপে বলা আবশ্যক নাই। কারণ, যে বস্তু পরিপূর্ণাবস্থায় কখনও স্বতঃ আসিতে পারে না, তাহাকে পরমসাধ্য মনে করা অর্থাৎ 'পরম' শব্দের অপব্যবহার করিয়া মৃগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই অসঙ্গত। পরম সাধ্যও যদি অনিত্য ও অপূর্ণ হয় তবে তাহার আশায় থাকিলে অনিত্য বস্তু ছাড়া আর কি পাইবে? "ধর্ম্মো নিত্যঃ সুখ-দুঃখেত্বনিত্যো" এই বচনের মর্ম্মও ইহাই। "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই বাক্যের মধ্যে সুখ শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী-দিগের মধ্যেও খুব মতভেদ আছে। মনুষ্য অনেক সময় সমস্ত বিষয়সুখকে পদাঘাত করিয়া কেবল সত্যের জন্য কিংবা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়; আধিভৌতিক সুখপ্রাপ্তির জন্যই তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে, একথা ঠিক নহে,—উহাদের মধ্যে কতকগুলি পণ্ডিতের এইরূপ মত, এবং তাই সুখশব্দের বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্দ জুড়িয়া দিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই সূত্রের "অধিক লোকের অধিক হিত বা কল্যাণ" এইরূপ রূপান্তর করিতে হইবে, ইহা তাঁহারা প্রতি-পাদন করিয়াছেন। কিন্তু এত করিয়াও কর্তৃবুদ্ধির কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এইমতে থাকিয়া যায়। ভাল, বিষয়সুখের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইবে যদি বলা হয়, তাহা হইলে কোন কর্ম্মের নীতিমত্তা কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির করা আবশ্যক, ইহা প্রথম প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ হওয়ায় অধ্যাত্মপক্ষ একরকম অংশত স্বীকার করাই হইল। কিন্তু এই প্রকারে শেষে যদি অধ্যাত্মপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তবে আধাআধি স্বীকার করিয়া লাভ কি? অতএব সর্ব্বভূতহিত, অধিক লোকের অধিক সুখ, মনুষ্য-ত্বের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতি নির্ণয়ের সমস্ত বাহ্য সাধন কিংবা আধিভৌতিক মার্গ গৌণ স্থির করিয়া আত্মপ্রসাদরূপ অত্যন্ত সুখ এবং তাহার সহিত সংযুক্ত কর্ত্তার শুদ্ধ বুদ্ধি, এই আধ্যাত্মিক কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করা আবশ্যক, এইরূপ আমাদের কর্ম্মযোগশাস্ত্রের চরমসিদ্ধান্ত। যাহাই হোক্ না কেন, দৃশ্য জগতের অতীত যে তত্ত্বজ্ঞান সে তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতেও নাই, এইরূপ যাঁহারা শপথ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা আলাদা। নচেৎ, মন ও বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্ম্মযোগশাস্ত্রেতেও মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ইহা যুক্তিতেও পাওয়া যায়। বেদান্তে প্রবেশ করিলে সমস্তই ব্রহ্মময় হওয়ায় ব্যবহারের যুক্তি খাটে না এইরূপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, তাহা ভ্রান্ত ধারণা। বেদান্ত সম্বন্ধে অধুনা সাধাণতঃ পাঠ্য গ্রন্থ সন্ন্যাসমার্গ অনুযায়ী লিখিত হওয়ায় এবং তৃষ্ণারূপী সংসার সমস্তই অসার মনে করা হয় বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কর্ম্মযোগের উপ-পত্তি ঠিক্ দেওয়া হয় নাই সত্য। অধিক কি, এই পরসম্প্রদায়াসহিষ্ণু গ্রন্থকারেরা সন্ন্যাসমার্গের যুক্তিক্রম কর্ম্মযোগের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গ নহে, সন্ন্যাসই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত মোক্ষমার্গ, এইরূপ ধারণা জন্মাইবার প্রযত্ন করিয়াছেন, কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। সন্ন্যাসমার্গ অনুসারে কর্ম্মযোগমার্গও বৈদিক ধর্ম্মে অনাদি কাল হইতে স্বতন্ত্ররূপে চলিয়া আসিতেছে; এবং এই মার্গের প্রবর্ত্তকেরা বেদান্তের তত্ত্ব ছাড়িয়া না দিয়া কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপপত্তি ঠিক্ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ এই পন্থারই গ্রন্থ। তথাপি গীতাকে ছাড়িয়া দিলেও কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বিচার আলো-চনা করিবার পদ্ধতি কেবল ইংলণ্ডেই গ্রীণের ন্যায় গ্রন্থকারেরা সুরু করিয়াছেন; * এবং জর্ম্মানীতে গ্রীণের আগেই উহা সুরু হইয়াছিল। দৃশ্য জগতের যতই বিচার আলোচনা করা হোক্ না কেন, এই জগতের সাক্ষী ও কর্ম্মকর্ত্তা কে ইহা

* Prolegomena to Ethics, Book I; and Kant's Metaphysics of Moral. (trans. by. Abbot in Kant's theory of Ethics.)

যে পর্য্যন্ত ঠিক্ অবগত না হওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত, এই জগতে মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য কি তাহার বিচার তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অপূর্ণই থাকিবে। তাই, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই যে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ তাহাই উপস্থিত প্রকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। দৃশ্য জগৎ পরীক্ষা করিয়া যদি পরোপকাররূপ তত্ত্বও পরিশেষে নিষ্পন্ন হয়, তবে অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য উহার দ্বারা লাঘব না হইয়া উল্টা সর্ব্বভূতে একই আত্মা থাকিবার ইহাই এক প্রমাণ বলিলেও চলে। আধিভৌতিকবাদী আপনারাই যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ও-দিকে তাঁহারা যাইতে পারেন না, তাহার উপায়ও নাই। আমাদের শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি এই সীমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও কর্ম্মযোগশাস্ত্রের পূর্ণ উপপত্তি তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু এই উপপত্তি বলিবার পূর্ব্বে, কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষা-সম্বন্ধে অন্য এক পূর্ব্বপক্ষেরও একটু আলোচনা করা আবশ্যক হওয়ায়, এক্ষণে সেই পন্থা সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত।

শোক সংবাদ।

সার চন্দ্রমাধব ঘোষ বিগত ৬ই মাঘ পরলোকগত হইয়াছেন। স্বদেশ একটি রত্ন হারাইল। বাল্যাবধি তিনি যে হৃদয়ের স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে স্বাধীনতা হারান নাই; এমন কি, বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও কোন কারণেই তিনি সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি ধীর সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। কায়স্থগণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিগত জাতীয় মহাসম্মিলনের দলাদলি মিটাইবার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত লোকের মৃত্যুতে কেবল তাঁহার পরিবার নহে, সমস্ত বঙ্গবাসী একটি আপনার লোক হারাইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী। আমরা তাঁহাদিগকে কি আর সান্ত্বনা দিব? প্রার্থনা করি, ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে লইয়া শান্তি প্রদান করুন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে এই দুঃসহ ব্যথা সহ্য করিবার বল বিধান করুন।

দানপ্রাপ্তি।

মহর্ষিদেবের প্রিয় শিষ্য আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী অধ্যক্ষসভার জনৈক সভ্য তিনি আদিসমাজের উন্নতিকল্পে ৫০০৲ শত টাকার বার্ষিক শতকরা ৩½ টাকা সুদের এক খণ্ড কোম্পানির কাগজ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মত আদিব্রাহ্মসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু বিরল।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাদের পুত্রগণের উপনয়ন উপলক্ষে ১৪০৲ টাকা আদিসমাজের অর্থভাণ্ডারে দান করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে দুইখণ্ড শতকরা ৩½ টাকা বার্ষিক সুদের কোম্পানির কাগজ কেনা হইয়াছে।

হাইকোর্টের খ্যাতনামা এটর্ণি শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সমাজে ২৫৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাজে ২৲ টাকা দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

স্থানাভাব বশত এবারে উৎসবের দান প্রকাশিত হইতে পারিল না—চৈত্র সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

গীতারহস্য—২৫২ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় স্তম্ভ—১২ পংক্তি—"আধিভৌতিক"এর স্থানে "আধিদৈবিক" হইবে।

ঊনবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
চৈত্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

৮৯৬ সংখ্যা

১৮৩৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

কেবল তুমি।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বি-এ)

মিশ্র বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
মাঝ-বসন্ত আন্‌তে শীতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
শুষ্ক হৃদে ফুটাতে ফুল
কেবল তুমি কেবল তুমি।
জীর্ণ বীণায় তুলিতে সুর
কেবল তুমি কেবল তুমি।
সাপ খেলাবার মন্ত্র জান
কেবল তুমি কেবল তুমি।
নিমেষে মন ভুলিয়ে নিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
বহিয়ে দিতে দখিন হাওয়া
কেবল তুমি কেবল তুমি।
জ্যোৎস্না-ধারায় ধুইয়ে দিতে
কেবল তুমি কেবল তুমি।
প্রভাত-রবি নিশীথ-শশী
কেবল তুমি কেবল তুমি।
দীপ্তিবিহীন ঘরের জ্যোতি
কেবল তুমি কেবল তুমি।
আর রেখো না ফেলে প্রিয়,
এসো তুমি এসো তুমি
শুকিয়ে এলো রসের ধারা—
কবে বল আসবে তুমি!
যদিই বা না পাইগো তোমায়,
করব কেবল তুমি তুমি;
পলে পলে মরণ স'য়ে
বল্‌ব "তুমি—তুমি—তুমি॥"

কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসমাজে আগমনের পূর্ব্বে।
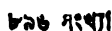
কেশবচন্দ্র যে বৈদ্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই বৈদ্যকুলের আদিম বাসস্থান হুগলীর পরপারস্থ গৌরিভা (গরফে) গ্রাম। যে পরিবারে কেশব জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরবিবারের খ্যাতিপ্রতি-পত্তির মূল কেশবের পিতামহ রামকমল সেন। রামকমল তাঁহার পিতা গোকুলচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র। প্রায় অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রামকমল ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে এদেশে ইংরাজী ব্যাকরণ বা অভিধান কিছুই পাওয়া যাইত না এবং একটীও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। রামকমল সেন নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েন। তাঁহার এই অধ্যব-সায়ের ফলে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের সামান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে

এসিয়াটিক সোসাইটীর কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি উক্ত সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং আরও কিছু পরে উহার কাউন্সিলের সভ্যপদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সময়ক্রমে তিনি টাকশাল ও বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতা নানা দিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দু-কলেজের স্থাপন অবধি তিনি উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যছিলেন। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সভ্য হইয়া তিনি উহার পুস্তক সংগ্রহ এবং গ্রন্থানুবাদ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। তিনি শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভারও সভ্য ছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধান নামক বঙ্গভাষার একখানি সুবৃহৎ অভিধান তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি নানা জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন—দিনান্তে প্রতিদিন স্বহস্তে সিদ্ধপক্ক হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। অনেক সময়ে পেয়ারা সিদ্ধ তাঁহার আহারের উপকরণ হইত। প্রতি বৎসর তিনি সহস্রাধিক বৈদ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রী ভোজন করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কেশবচন্দ্রের ছয় বৎসর বয়সের সময় রামকমল সেন পরলোক গমন করেন।

কেশবের পিতা প্যারীমোহন রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র। প্যারীমোহন টাকশালের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। কেশবের এগার বৎসর বয়সে প্যারীমোহনের দেহান্তর ঘটে। কেশবজননী সারদাসুন্দরী পরম ভক্তিমতী ও দয়াবতী সতী ছিলেন। সারদাসুন্দরী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পূজাআহ্নিক, ব্রত উপবাস, তীর্থদর্শন, সাধুসঙ্গম, দরিদ্রসেবা, সন্তানগণের লালন পালন এবং সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য লইয়াই দিনযাপন করিতেন। তিনি কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, অথচ সকলের সেবা করিতে অগ্রসর ছিলেন। তাঁহার হৃদয় খুব উন্নত ও প্রশস্ত ছিল। ব্রহ্মোপাসনা প্রচারে কেশব তাঁহার নিকটে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন।

কেশব প্যারীমোহনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর (১৭৬০ শকের ৫ই অগ্রহায়ণ) সোমবার শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের নিকট কিছু অতিরিক্ত আদর পাইয়া কেশব একটু অতিরিক্ত আবদারপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে কেশবের এগার বৎসর বয়সে তাঁহার জননী বিধবা হয়েন। সেন বংশ একে বৈষ্ণব বংশ, তাহার উপর বৈধব্যের কারণে সারদাসুন্দরীকে নিরামিষ আহার প্রভৃতি কঠোর ব্রতধারণে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র জননীর প্রসাদ খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহাকেও নিরামিষ আহারে অনেকটা অভ্যস্ত হইতে হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কেশবের বসন্তরোগ হইয়াছিল। যে গৃহে বসন্তশ্রেণীর রোগ দেখা দেয়, সে গৃহে হিন্দুরা মৎস্যাদি কোনপ্রকার আমিষ আহার্য্য আনিতে দেন না। রোগের উপলক্ষে কেশব তো অনেক দিন আমিষ আহার করিতে পারেন নাই; সম্ভবত জননীর রন্ধন নৈপুণ্যবশত আরোগ্যলাভের পরেও নিরামিষ আহার পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা কেশবের মনে জাগ্রত হইবার অবসরই পায় নাই।

সেকালের সাধারণ ধনীসন্তানের ন্যায় কেশবচন্দ্রেরও বাল্যকাল তাসখেলা, যাত্রা শোনা, দিবারাত্রি পানসুপারি চর্ব্বণ, বেহালাবাদ্য প্রভৃতি নানাবিধ আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল। ক্রীড়াদিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রসর হইতেন। স্বপ্রবর্ত্তিত ক্রীড়াদিতে সঙ্গীদিগকে আকর্ষণ করিলেও তিনি কাহারও নিকটে হৃদয় খুলিয়া দিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার চরিতলেখক বলেন যে "তিনি সহজে কাহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন না।" * "তিনি কোন বালকের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না"। †

বর্ত্তমানে পটলডাঙ্গায় যেস্থানে আলবার্ট হল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট হাতে খড়ি হইবার পর কেশব সাত বৎসর বয়সে হিন্দু

* কেশব-চরিত। † আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

কলেজে ভর্ত্তি হয়েন এবং তথায় উচ্চশ্রেণী (senior class) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। নিম্নশ্রেণী (junior class) পর্য্যন্ত কেশব প্রতি বৎসরেই পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন।

এই কলেজে পড়িবার কালে কেশবের অনুকরণ-শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। হিন্দু-কলেজ থিয়েটারে বালকগণের আমোদ উৎপাদন করিবার জন্য গিলবার্ট নামক এক ফিরিঙ্গি ম্যাজিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। কেশব সেগুলি শীঘ্রই আয়ত্ত করিয়া নিজেই সেই সকল ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।* মাঝে মাঝে বাজার হইতে সাহেবদের পুরাতন পোষাক কিনিয়া পরিয়া এমন সুন্দর বাজীকর সাহেব সাজিতেন যে, অনেক সময়ে দর্শক ইংরাজগণ তাঁহাকে ইতালীয় বাজীকর বলিয়া ভ্রম করিতেন।

কেশবের হৃদয়ে অনুকরণপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে রসবোধেরও অভাব ছিল না। "একবার তিনি বিজয়া দশমীর দিন বয়স্যদিগকে লইয়া এক নগর-কীর্ত্তন বাহির করেন। কলার খোলা যোড়া দিয়া তাহাতে কয়েকখানি খোল, বাতাবি লেবুর খোসায় খরতাল প্রস্তুত হইল; পরে যজ্ঞডুমুরের মালা গাঁথিয়া গলায় দিয়া, ছেঁড়া ন্যাকড়া দ্বারা এক একটী টিকি রচনা করিয়া একদল বালক কেশবের সঙ্গে ঐরূপ খোল খরতাল বাজাইতে বাজাইতে পথে বাহির হইল। গানটী এই—বাবাজী মজা নিচ্ছে, হাতে হরিনামের মালা ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরছে, মাথায় চৈতন্য চুটকি ফুর ফুর ফুর উড়ছে।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দুকলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই সময় হিন্দুকলেজের সভ্য ও পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে বিবাদের ফলে মেট্রপলিটান কলেজ নামক এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের অনুরোধে কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের মতানুসারে কেশব শেষোক্ত বিদ্যালয়েই পড়িবার জন্য প্রেরিত হয়েন। বৎসর দুই একের মধ্যেই কিন্তু এই বিদ্যালয় অর্থাভাবে উঠিয়া গেল। তখন তিনি আবার ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। এখানে উচ্চ শ্রেণীর গণিত তিনি কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই গণিতসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিবসে কেশব পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্রের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া দু'একটী প্রশ্নের উত্তর না পাওয়াতে পুস্তক দেখিয়া উত্তর লিখিতেছিলেন। এই কারণে সেই বৎসরের পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল।

কেশবের বাল্যজীবন আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে তিনি বাল্যাবধি একটু বিশেষভাবে প্রশংসা-প্রিয় ছিলেন এবং ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সম্ভবত এই প্রশংসাপ্রিয়তার কারণেই "ধর্ম্মবিষয়ে বাহ্য বেশভূষার প্রতি কেশবের অনুরাগ বাল্যকালে যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। বয়স্য-গণের সহিত কার্ত্তিকপূজা এবং রথযাত্রায় অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। (এই দুইটীই সেকালে বাবুদিগের মহোৎসব ছিল) গঙ্গাস্নান, গরদের যোড় পরিধান, শুভ্র উপবীত গুচ্ছধারণ, কপালে গণ্ডস্থলে হরিনামের ছাপ অঙ্কিত করা, এ সকলের প্রতি বড় অনুরাগ ছিল।"

বিধাতার সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রসূ। যদি কেশ-বের নাম পরীক্ষার্থীদিগের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া না হইত, তাহা হইলে আমরা কেশবকে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মানন্দরূপে পাইতাম কিনা সন্দেহ। উক্ত ঘটনার পর তিনি গণিতশিক্ষা করিবার এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পরি-ত্যাগ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে তিনি বাইবেল গ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই সময় অবধি তিনি প্রার্থনার উপকারিতা বুঝিয়া প্রার্থনার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই প্রার্থনার প্রতি অনুরাগ এবং বাল্যজীবনের ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি অনুরাগ সম্ভবত মিলিত আকারে অভিব্যক্ত হইতে হইতে পরিণামে নববিধানের জন্মদান করিয়াছিল।

বাইবেল প্রভৃতি পড়িয়া যখন তিনি তদবলম্বিত প্রার্থনা প্রভৃতির অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও কেশবচরিত দেখ। লিওনার্ড সাহেব বলেন যে কেশব গিলবার্ট নামক এক ইংরাজ গ্রন্থকারের নাটক অভিনয় করিতেন।

সময়ে কেশব স্বীয় নেতৃত্বে স্বগৃহে এক নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে অনেক বিখ্যাত ইংরাজকে আহ্বান করা হইত। এক বৎসর তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমসন কর্ত্তৃক পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছিল। তিন বৎসর চলিবার পর অর্থাভাবে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল কেশবচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহ সম্ভবত তাঁহার মনের মত হয় নাই। হয়তো তিনি তখন ইয়ং বেঙ্গলের উপযুক্ত বিবাহের একটা আদর্শ মনোমধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহকালে গুরুজনদিগের কথামত পল্লীগ্রামের এক অশিক্ষিতা নবম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। ইহাতে হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিবার এবং মনটা একটু খিঁচড়াইয়া যাইবার কথা। বিবাহের পরই সংসারের উপর তাঁহার বিরক্তি আসিল। "কেশবচন্দ্র দশজন সংসারীর ন্যায় পত্নীসম্ভাষণ করিতেন না। কথিত আছে, তিনি কখন অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। যদিও কখন অনুরুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে যাইতেন, পত্নীসম্ভাষণ করিতেন না। মহিলাগণের মনে এই সংস্কার হইয়াছিল যে কেশবচন্দ্রের মনের মত পত্নী না হওয়াতে তাঁহার ঈদৃশ ঔদাসীন্য উপস্থিত।" এই বিরক্তির ফলে তিনি সেক্ষপীয়র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। কেবল অধ্যয়ন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সেক্ষপীয়রের হ্যামলেট প্রভৃতি নাটক অভিনয় পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তদানীন্তন বাঙ্গালা নাটকও নানাস্থানে অভিনয় করিতেন। অভিনয় করিবার ভাব তাঁহার হৃদয়ে আমরা সহজাতরূপে দেখিতে পাই।

বিবাহের পর বৎসর খানেকের মধ্যেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি Goodwill Fraternity (গুড উইল ফ্রেটানিটি) নামক একটী উপাসনা সভাও স্থাপন করেন। এই সভাতে কেশব ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন। এই সভায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতেও মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ পঠিত হইত। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। যতদূর জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথেরই নিকটে দেবেন্দ্রনাথ কেশবপ্রতিষ্ঠিত সভার বিবরণ শুনিয়া সন্তোষলাভ করিতেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথ নিজ সঙ্গীসহ সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু-প্রোক্ত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার একখণ্ড কেশবের হস্তগত হওয়াতে, তন্মধ্যে "ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ" বিষয়ক এক বক্তৃতায় কেশব স্বীয় মনোভাবের ছায়া দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। তিনি স্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলুটোলাস্থ পণ্ডিত রাজবল্লভের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইয়া গোপনে হিমালয়াঞ্চলে দেবেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

বিশ্বকোষ বলেন—"রেভারেণ্ড ডল সাহেব সেই সময় রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎপ্রণীত যীশুর নীতি (Precepts of Jesus) নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ একেশ্বরবাদী খৃষ্টান বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। গোপালচন্দ্র মল্লিক নামক এক ব্রাহ্মণকুমার * তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন রায়কে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কেশবকে রামমোহনের মত বুঝাইয়া দিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তখনকার সম্পাদক নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। নবীন বাবুর অনুরোধে কেশব রাজা রামমোহনের বহুতর পুস্তক, কাগজপত্র ও তোফতুল মোহদিন নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে স্বর্গীয় রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তখন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কেশবের শ্রদ্ধা জন্মে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে মুদ্রিত ব্রাহ্ম পত্রিকা পাঠ করাইয়া

* সম্ভবত বিশ্বকোষ এখানে ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, সিন্দুরিয়াপটীর সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক বংশের গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ই সে সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক এবং রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করিতেন।

দীক্ষিত করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের রেজিষ্টরী বহিতে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ হইল।"

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হয়েন। এদিকে স্বগৃহে কেশবের মূর্ত্তি-পূজাবলম্বিত মন্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে হইতে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন। যে দিন মন্ত্র দেওয়া স্থির হইল, সে দিন তিনি আর গৃহে ফিরিলেন না। "দ্রব্যসামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া জননী অপেক্ষা করিতেছেন, লোকজন খাইবে তাহারও আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহার উপলক্ষে এই সমস্ত আয়োজন, তিনিই উপস্থিত নাই। সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রাত্রি দশটার সময় কেশব বাড়ী ফিরিলেন। তজ্জন্য গুরুঠাকুর নিরাশ এবং মাতাঠাকুরাণী অতিমাত্র দুঃখিতা হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ আর কিছু বলিলেন না। অতঃপর মন্ত্রদানের চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।" কেশব তাঁহার মাতাকে ব্রাহ্মসমাজের কয়েক খণ্ড পুস্তক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করেন নাই। এই পরীক্ষায় কেশবচন্দ্র যথেষ্ট স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় মন্ত্র গ্রহণে নিষেধ না করিলেও তাঁহার মন্ত্র গ্রহণের অস্বীকারে যে নানা উপায়ে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত অভিনন্দন করিলেন।

থাক্ পাছে।

(কীর্ত্তনী ঢপের সুর)

সুখদুখকথা মরমের ব্যথা
পড়ে থাক যত সবি পাছে।
বাসনা কামনা সকলি ছলনা—
প্রাণপ্রিয় তোমা মন যাচে॥

জীবনের পরে সুধার নিঝরে
তোমা বিনা কেবা দিতে পারে।
বিনা প্রাণধন কে আছে এমন
প্রাণ খুলি কথা বলি যারে॥

ধন রাশি রাশি আশারি বা হাসি
বৃথা কেন প্রাণে আসি লাগে।
তারে মন মম ঝাড়ি ধূলি-সম
চলে চল প্রাণ যেথা জাগে॥

কেন গো বসিয়া দুখবিষ পিয়া
আঁখি তুলি' মলিন বয়ানে।
বিধানে যাঁহার জনম সবার
তাঁরি আছ তুমিও নয়ানে॥

সংশয় মলিন জমে দিন দিন
নাহি যদি প্রাণে ডাক তাঁরে।
সকলি ছাড়িয়া পড় আছাড়িয়া
সঁপি' তাঁরি পদে চিতভারে॥

আঁধার আসিছে মরণ শাসিছে
চল আগে নাহি ডরি' কারে।
তাঁরি নাম লয়ে চল নিরভয়ে
মৃত্যু রাখি' মরতের পারে॥

শান্তি শান্তি করি' ঘুরে ফিরে মরি—
লভি শুধু শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ।
দেখা পাব কবে আঁধার এ ভবে
বলিতে চাহে না মোরে কেহ॥

তব প্রেম জাগে নয়নের আগে
ধ্রুবতারা আকুল পরাণে।
তুমি প্রাণবঁধু মধু হতে মধু—
গেয়ে যাব তাই কলতানে॥

তব প্রেমে ফুল ফুটে দুল দুল
জাগে শত গ্রহ চন্দ্র রবি।
(তব) প্রেম লাগি কাঁদে খেলে নানা ছাঁদে
গাহে গান শত শত কবি॥

অতি দীন আমি, তুমি ধনী স্বামী
নাহি যদি দাও প্রেম, তবে
প্রাণের আগুন জ্বলুক দ্বিগুণ—
নিবাইবে কেবা তাহা ভবে॥

করিয়া প্রণতি করিহে মিনতি
প্রেম দিয়া জুড়াও হে প্রাণ।
সারা দিবানিশি আঁখি অনিমিষি
তব মধু দেখিব বয়ান॥

আর্য্য-বিবাহের অভিব্যক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল, বার-এট-ল।)

আধুনিক হিন্দুবিবাহ জটিল Science বা শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে এবং অত্যন্ত rigidity বা 'কড়াকড়' স্বভাব ধারণ করিয়াছে। Caste system বা বর্ণভেদের rigidity বা কড়াক্কড়ির ইতিহাসের সহিত হিন্দুবিবাহেরও rigidity বা কড়াক্কড়ির ইতিহাসের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। বর্ণভেদের সঙ্গে আর্য্য বিবাহের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; একের ইতিহাস অন্যের ইতিহাসের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। হিন্দুবিবাহের কড়াক্কড়ি নিয়মের কারণ—আর্য্য ও অনার্য্যের ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্যরক্ত ও আর্য্যভাষা কলুষিত হইতেছিল। আর্য্যরক্ত যাহাতে অকলুষিত থাকে, তজ্জন্য বিবাহের নিয়ম কড়াক্কড় করিয়া অনার্য্য-কন্যা গ্রহণ বন্ধ করা হইল ও আর্য্যভাষা যাহাতে অনার্য্য শব্দ দ্বারা অকলুষিত থাকে, তজ্জন্য পাণিনি ভাষ্য, ব্যাকরণ, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি দ্বারা অনার্য্য শব্দ প্রবেশের দ্বারও বন্ধ করা হইল।

"The Wars of Roses"এ ইংলণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ইংলণ্ডের সামরিক শক্তিরও লাঘব হইয়াছিল। মহাভারতের ভারতব্যাপী বিবাদযুদ্ধেও ভারতের রাজন্য অভিজাতগণের ক্ষয় হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই বোধ হয় বৈদেশিক জাতিরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্জ্জুন অনার্য্য ম্লেচ্ছ জাতির সংস্পর্শে যাহা ঘটিবার ভয় পাইয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—আর্য্যদিগের মধ্যে সঙ্কর জাতির আবির্ভাব হইল। কাজেই বিবাহে ও ভাষায় কড়াক্কড়ি না করিলে আর্য্যজাতি ও আর্য্যভাষা রক্ষা পাইত না—এতদিনে বোধ হয় "গঙ্গাপ্রাপ্ত" হইত। আবার আর্য্যধর্ম্মেরও শত্রু ভারতবর্ষে উদয় হইল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম আর্য্য ধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল, সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হইল। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য ideals of life বা আর্য্যোচিত আদর্শ ছারখার করিয়া আপনিই ছারখার হইয়া গেল।

বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্য আদর্শ ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে বৌদ্ধ আদর্শ সংস্থাপন করিতে অপারক হইলে পর আর্য্যগণ পুরাতন ছাড়িয়া নূতন ধরিতে সাহস করিলেন না, বরঞ্চ শাস্ত্ররূপ বাসুকির শত ফেরে সমাজকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইলেন। আর্য্যগণ কঠোর বর্ণভেদ (Caste-system) ও তৎসঙ্গে সঙ্গে কঠোর বৈবাহিক নিয়ম করিয়া অনার্য্য ম্লেচ্ছ কন্যা বিবাহ বন্ধ করিল এবং তদ্দ্বারা আর্য্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। এই একই কারণে সনাতন আর্য্যধর্ম্মও রক্ষা পাইল।

মনুতে ধর্ম্মের চারিটি "মূল" (Sources) উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে "আত্মপ্রসাদ"রূপ ব্যক্তিগত "মূল"গুলি এই কাল হইতে রহিত হইল। "আত্মপ্রসাদ" শত্রুসঙ্কুল সমাজের পক্ষে শুভকর নহে।

আর্য্য বর্ণভেদ আর্য্য বিবাহের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। এইখানে বর্ণভেদের উল্লেখ না করিলে, শকুন্তলাকে বাদ দিয়া শকুন্তলা নাটক অভিনয়স্বরূপ হইবে।

পুরাকালে আর্য্যগণ শীতপ্রধান মধ্য এসিয়া হইতে হিন্দুকুষ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যদেবতা যিনি হউন না কেন, গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে শীতপ্রধান দেশবাসীরা কখন উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও (বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে) কেহ পারিবে কি না সন্দেহ।

আর্য্যগণ শীতপ্রধানদেশবাসী হইয়া তবে কিরূপে এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ?

ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একেবারেই ভারতবর্ষে আসেন নাই। মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া নাতিউষ্ণ নাতিশীত প্রদেশেই প্রথমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য দেশবাসী দিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—ইঁহারাই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। "খাঁটি" আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই।

তৎকালে আর্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদ বা

বর্ণভেদ ছিল না—("বর্ণ"-ভেদই জাতিভেদের মূল)—অতএব বিবাহে "কড়াকড়ি"ও ছিল না।

প্রথম যখন ভারতীয় আর্য্যগণ এদেশে আগমন করেন তৎকালে কৃষ্ণকায় ও যাগযজ্ঞরহিত অসভ্য জাতিসমূহ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। আর্য্যগণ সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ও যাগযজ্ঞপরায়ণ ছিলেন। স্বভাবত আর্য্যগণ এই অনার্য্য জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং "দস্যু" "রাক্ষস" প্রভৃতি ঘৃণাসূচক বাক্য তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এই বিভাগটী ছিল, "আর্য্য" ও "দস্যু" (ঋগ্বেদ ৬।২২।১০)।

আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই ক-খ-গ বা প্রথম স্তর। জেতাওজিতদিগের বর্ণভেদে আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ বা caste systemএর সূত্রপাত হইল। কোন কোন আর্য্য অনার্য্যকন্যা বিবাহ করিলেন ও তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইল—ইহারা আর্য্যদিগের একটী ঘৃণিত শাখারূপে পরিণত হইল। ইহা বর্ণভেদ বা caste system এর দ্বিতীয় স্তর।

আর্য্য-অনার্য্যে অনবরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। (ঋগ্বেদ ১।১৩১৫—১।১৭৪।৫, ১।১৭৬।২, ১।১৮০।২) "ক্ষত্রিয়" (ঋগ্বেদ ৭।৬৪।১—৭।৮৯।১) অর্থাৎ "বলবান" আর্য্যেরা অনার্য্য রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, "ব্রাহ্মণ" আর্য্যেরা (ঋগ্বেদ ৬।৭৫।২ ও ৬—৭।১০৩।১ ও ৩—৮।১১১।১) অর্থাৎ "স্তোতারা"—সম্ভবতঃ ইহারা দুর্ব্বল আর্য্য ছিলেন—যুদ্ধের প্রাককালে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে শত্রুনাশের জন্য "Hymn of Hate" স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন।

"হে ইন্দ্র ও সোম! তোমরা রাক্ষসগণকে সন্তাপ প্রদান কর ও হিংসা কর। হে কামবর্ষীদ্বয়। তোমরা অন্ধকার দ্বারা বর্দ্ধমান রাক্ষসদিগকে নীচ করিয়া দেও। জ্ঞানরহিত রাক্ষসদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়া হিংসা কর, দগ্ধ কর, মারিয়া ফেল, দূর করিয়া দেও। ভক্ষক রাক্ষসগণকে কৃশ করিয়া ফেল"। (ঋগ্বেদ ৭।১০৪।১)।

"হে শূর ইন্দ্র! আমাদের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রুসংহারকারী! তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসজাতিকে হিংসা কর" (ঋগ্বেদ ৭।৭।১০।৮)।

যুদ্ধ-স্তোত্র করিলেও চলিবে না, শস্যোৎপাদনেরও ব্যবস্থা চাই। তাই "বৈশ্য" বা 'সাধারণ' আর্য্যেরা শস্যোৎপাদনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই কারণে এই তিন class বা দলের আর্য্যদিগের মধ্যে symbolic বা রূপক বর্ণভেদের সূত্রপাত হইল—"ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ স্তোত্রকারীরা শ্বেতবর্ণ (শ্বেতবর্ণ পবিত্র সূচক), "ক্ষত্রিয়" বা বলশালী আর্য্যেরা (লোহিত বর্ণ রক্ত সূচক) এবং "বৈশ্যরা" পীতবর্ণ (পীতবর্ণ "সোনার ধান" বা শস্য-সূচক)। *

পূর্ব্বে "ব্রাহ্মণ" "ক্ষত্রিয়" ও "বৈশ্য"দিগের "কর্ম্মভেদে" "বর্ণভেদ" ছিল না। উদাহরণ—ঋগ্বেদে (৬।২০।১) ভরদ্বাজ ঋষির ইন্দ্রদেবতাদের প্রতি স্তোত্র :—

"হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রু নিহন্তা একটী পুত্র প্রদান কর। সূর্য্য যেরূপ নিজ দীপ্তি দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, তদ্রূপ সেই পুত্ররূপ ধন সংগ্রামে বল দ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে।"

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুল হইতে, প্রস্কন্ব বৈশ্য বংশ হইতে এবং শূদ্রক শূদ্রজাতি হইতে ঋষি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও "ব্রাহ্মণ" মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বর্ণের যে ইতরবিশেষ ছিল না, মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অঃ) তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥"

ক্রমে ক্রমে আর্য্যরা ভাগ করিয়া যুদ্ধস্তোত্রাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং করিতে করিতে স্ব স্ব কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিলেন বা expert হইলেন। কথায় বলে—"Birds of the same feather

---

* আর্য্যজাতি তিন। শূদ্র বলিয়া তৃতীয় জাতি ছিল না। শৌচপরিভ্রষ্ট অসংস্কৃত আর্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া গণ্য ছিল—যথা মহাভারতে (শান্তিঃ ১৮৯ অঃ)—"শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ।" কথায় বলে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।" বেদের কোন কোন স্তক "শূদ্র" ঋষি লিখিয়াছেন। শূদ্রেরাও ব্রহ্মার পুত্র। শূদ্রেরা অনার্য্যজাতি হইলে আর্য্যজাতির জনক দেবতা ব্রহ্মাকে শূদ্র জাতিরও জনক বলা হইত না।

flock together ।" সজাতীয় পক্ষীগণ একত্র দলবদ্ধ হয়। এই সকল আর্য্যদিগের মধ্যে কর্ম্মভেদে উচ্চনীচতার সৃষ্টি হইল। এই কালে আর্য্য Hypergamy অর্থাৎ উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন পাত্রে পাত্রীদান প্রথা অবলম্বন করিলেন। উদাহরণ—

"ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারেন ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা। ক্ষত্রিয় বিবাহ করিতে পারেন ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা। বৈশ্য বিবাহ করিতে পারে বৈশ্যকন্যা।" * Hypergamyকে 'অনুলোম' বিবাহ বলিতে পারা যায়। "যযাতি—দেবযানী" আদর্শের বিবাহ প্রতিলোমবাচ্য। প্রতিলোম বিবাহের উদাহরণ বিরল।

'অনুলোম' অর্থে "লোমের সহিত" অর্থাৎ সামাজিক স্রোতানুকূলমুখে চলন। 'প্রতিলোমের অর্থে "লোমের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ সামাজিক স্রোতের বিরুদ্ধে গমন।

আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই গেল তৃতীয় স্তর। এই কাল হইতে বিবাহের "কড়াকড়ি" বিধান হইল। বিবাহ কড়াকড়ি করিবার প্রধান উদ্দেশ্য—অনার্য্য রমণীদিগের সহিত আর্য্যদিগের বিবাহ প্রতিরোধ করা। আর্য্যেরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, অনার্য্যেরা সংখ্যায় অগণিত ছিল। এইরূপে বিবাহের নিয়ম শক্ত না করিলে আর্য্যগণ অনার্য্য জাতির মধ্যে কোন্ কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেন।

এই কঠোর নিয়মাবলী আর্য্যরমণীগণের আর্য্যপতি পাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল—আর্য্যজাতি, আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম একাধারে রক্ষা পাইল। Aryanized আর্য্যীভূত অনার্য্য ও আর্য্য নারীদিগের মধ্যে আর্য্যপতিপ্রাপ্তির জন্য অন্যোন্যপ্রতিদ্বন্দ্বিতার হ্রাস হইয়া গেল। বৈদেশিক মালের উপর অধিক শুল্ক চাপাইলে উহার আমদানি রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। দেশের মালের কাটতি হয়। তদ্রূপ অনার্য্যকন্যা বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম করাতে আর্য্য রমণীদিগের বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক হইল। Exogamy বা বহির্বিবাহিক প্রথা থাকায় "ক্ষত্রির" আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগের স্ত্রী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সম্ভবতঃ আর্য্যপুরুষদিগের সংখ্যায় আর্য্যরমণী কম হইয়াছিল। আর্য্যরমণীর সংখ্যা কম না হইলে অনার্য্যরমণীকে আর্য্যেরা কখন বিবাহ করিতেন না। স্বজাতীয় কন্যাই সকলে বিবাহ করিয়া থাকে। আর্য্যরমণীর সংখ্যা কম হইবার নানা কারণও ছিল। যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন তৎকালে তাঁহাদের সঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা রমণী কম ছিল। পূর্ব্বে আর্য্যগণ 'বীর বা hero (একই কথা) ছিলেন, এই বীরপুরুষদিগের সঙ্গে কম আর্য্য রমণী থাকা সম্ভব। একটী প্রবাদ আছে,—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" মধ্য এসিয়া পরিত্যাগ কালে আর্য্যগণ বহুসংখ্যক রমণী লইয়া যান নাই, Women are a hindrance rather than a help to an army on the march—যুদ্ধযাত্রায় স্ত্রীলোক একটী বাধা, সহায় নহে। স্বদেশে থাকিলে ক্ষমতানুসারে যত ইচ্ছা গৃহিণী গৃহেতে আনিতে বাধা ছিল না, কিন্তু সমরযাত্রাকালে সে নিয়ম খাটে না। একেত বীর পুরুষ বা যোদ্ধাদিগের জন্য তৎকালে খাদ্যসঞ্চয় অত্যন্ত limited বা পরিমিত ছিল, দেশদেশান্তর হইতে খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা ছিল না। অতএব স্ত্রীরূপ luxury এই আর্য্য বীরগণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। যুদ্ধযাত্রাকালে বীরপালনই প্রয়োজন, নারীপালন নিষ্প্রয়োজন—এই কারণে কম আর্য্য নারী ভারতে আসিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ—On the march অর্থাৎ during the migration বা যাত্রাকালে অতিরিক্ত কন্যা জন্মাইলে আর্য্যেরা তাহাদিগকে expose বা পথে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেও বহুকাল যাবৎ এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক সময়ে পূর্ব্ব কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও force of habit এর দ্বারা অভ্যাস বশত সে কুপ্রথা কিছুদিন চলিয়াছিল। যজুর্ব্বেদে একটী ঋষি তাই দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে "কন্যা দুঃখের কারণ"।

কন্যাহত্যা প্রথা আর্য্যবিবাহে ক্রম বিকাশের ইতিহাসের এক প্রধান stage বা অংশ। এই প্রথা থাকাতে পরোক্ষভাবে 'বাক্‌দান' প্রথার প্রচলন হইল। 'বাক্‌দান' প্রথা কন্যাহত্যা রহিতকরিল ও পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে মঙ্গলজনক হইল। একবার 'বাক্‌দান' হইয়া গেলে পাত্রীর অর্থাৎ আর্য্যকন্যার আর্য্য পতি পাইবার ব্যাঘাত

* শূদ্র স্ত্রী কামস্ত্রী—স্ত্রীর মধ্যে গণ্য নয়।

বা প্রতিবন্ধক আর রহিল না। এই জন্যই বোধ হয় পুরাকালে "বাকদান" কন্যাদানের তুল্য ছিল। বাকদানের পর "বাকদত্ত পতি" মরিলে, তদ্‌কনিষ্ঠ ভ্রাতারই নিয়োগ বা পাণিগ্রহণসূত্রে সেই কন্যা প্রাপ্য।

বাক্‌দান প্রথায় আরও তিনটী সুফল দেখা যায়—

(১) দুটী অপরিচিত প্রাণী যাবজ্জীবন বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পরকে দেখিবার শুনিবার অবসর পায়।

(২) বিবাহে সুখী কি অসুখী হইবার কোন কারণ আছে কি না—বিবাহ উচিত কি অনুচিত ইত্যাদি ভাবিবার চিন্তিবারও অবসর পাওয়া যায়।

(৩) বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পারে সংযম শিক্ষার অবসর পায়। এইরূপ সংযম পাত্রপাত্রীর চরিত্র সংগঠনে সহায়তা করে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নাই।

কন্যাহত্যা কারণেও আর্য্য রমণীর সংখ্যা কম হইয়াছিল।

আর্য্য পুরুষ অপেক্ষা আর্য্য রমণী কম হইবার তৃতীয় কারণ—"ব্রাত্যস্তোম" যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া বিজাতীয় লোকদিগকে আর্য্যজাতি ভুক্ত করিবার প্রথাও তৎকালে ছিল। এ কারণেও আর্য্যপুরুষদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছিল এবং সেই পরিমাণে আর্য্য রমণীর সংখ্যাও কমিয়াছিল। তদ্‌ব্যতীত কখন কখন আর্য্য নৃপতিগণ অনার্য্যদিগকে আর্য্য পদবী প্রদান করিতেন। আর্য্য ঋষিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই উভয়বিধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন—উদাহরণ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দিতা। বিশ্বামিত্র cultural conquestএর পক্ষপাতী ছিলেন, অনার্য্যদিগকে আর্য্যসমাজের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। বশিষ্ঠ অনার্য্যদিগকে আর্য্য সম্প্রদায়ে স্থান দিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ত্রিশঙ্কু যাগ-যজ্ঞ করিয়া আর্য্যসমাজে আসিবার বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বশিষ্ঠ তাঁহাকে চণ্ডাল করিলেন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে আর্য্যপদ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু ত্রিশঙ্কু আর্য্যানার্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান পাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কারণ ত্রিশঙ্কুপ্রমুখ অনার্য্যদিগের আর্য্যপদ প্রাপ্তির অভিলাষ।*

এইরূপ নানা কারণে আর্য্য রমণীগণ "আর্য্য" পুরুষ (অর্থাৎ মিশ্রিতামিশ্রিত আর্য্য পুরুষ) অপেক্ষা সংখ্যায় কম ছিল। আর্য্য রমণী কম না হইলে ক্ষত্রিয়েরা কেন রাক্ষস প্রথা দ্বারা অনার্য্য রমণী বিবাহ করিবে?† আর্য্য রমণী কম থাকায় ব্রাহ্ম দৈব ইত্যাদি আটফেরা বৈবাহিক জালে আর্য্যগণ আর্য্য ও অনার্য্য সকল প্রকার কন্যা টানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাক্ষস বিবাহ wife-hunting বা কন্যা-শীকার ছাড়া আর কিছুই নহে। পৈশাচ "বিবাহ" অভিমর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে, অথচ মনুর মতে ইহা অভিমর্ষণ নহে। আর্য্যরমণীর স্বল্পতাবশতই মনু ইহাকেও বিবাহ মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন।‡

বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা অনার্য্য কন্যাগ্রহণ সূচিত করিতেছে। আর্য্য রমণী কম হওয়াতে আর্য্যগণ অনার্য্যরমণী গ্রহণ করিতেন। অনার্য্যরমণীরা বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে, এইভয়ে যাহাতে pre-marital chastity বা কুমারীত্ব নষ্ট না হয়, তাই অল্প বয়সেই আর্য্যেরা অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিতেন। ভারতবর্ষে climate forces premature puberty অর্থাৎ অল্প বয়সেই যৌবনোদ্গম হয়। সতীদাহ প্রথারও উৎপত্তি ইহাই অনুমান হয়। পাছে স্বামীর মৃত্যুর পর আর্য্যদিগের অনার্য্য স্ত্রী পিতৃমাতৃকুলে ফিরিয়া গিয়া ব্যভিচারিণী হয়, অর্থাৎ অনার্য্যদিগের কু-আচার অবলম্বন করে তাই সহমরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সতীদাহ প্রথার কথা অথর্ব্ববেদে (১৮।৩।১) পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে সতীদাহকে "পুরাতন ধর্ম্ম" § বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। ||

* ত্রিশঙ্কুর অনার্য্যত্ব লেখক কোথায় পাইলেন? ডঃ বোঃ সং।

† রাক্ষসদিগের কাম বা রাজসিক ভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। ডঃ বোঃ সং।

‡ আর্য্যরমণীর অল্পতা হোক বা না হৌক, মানবপ্রকৃতিকে সূক্ষ্ম ভাবে দর্শন করিয়া লোকরক্ষার মানসে মনু এরূপ করিয়াছেন ইহা স্থির। ডঃ বোঃ সং।

§ "পুরাতন ধর্ম্ম" বলাতে কি ইহা ভারতবর্ষে আনিবার পূর্ব্বে আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা বলিয়া বোধ হয় না? ডঃ বোঃ সং।

|| অনার্য্যদিগের মধ্যে কোন chief বা দলপতি মরিলে তাহার তীরধনুক ও স্ত্রী দাস অশ্ব প্রভৃতি সহদাহন

সাপ্তপদী মৈত্রতাসূত্রে বা পদে পদে সাতবার বর কন্যাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধন করান হইত। আবার অরুন্ধতী ও ধ্রুব নক্ষত্রও কন্যাকে দর্শন করান হইত। অরুন্ধতী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্বীয় পতির সহিত অবিচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন। ধ্রুবও শতবজ্রবাধাবিঘ্ন সত্বেও স্বধর্ম্মে অটল ছিলেন বলিয়া ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া আকাশে বিরাজ করিতেছেন। বরকন্যাকে এই পৌরাণিক অখ্যানদ্বয় বিবৃত করিয়া অরুন্ধতীর ন্যায় পাতিব্রত্য ধর্ম্মে ও ধ্রুবের ন্যায় স্বধর্ম্মে অটল থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইত। সামবেদের ধ্রুবসম্বন্ধীয় কুশণ্ডিকা মন্ত্রটী এই—

"ধ্রুবাদ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবাস্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্॥"

আর্য্যবিবাহের এইরূপ কড়াকড়ি দেখিয়া মনে হয় আর্য্য রমণীর স্বল্পতা বশতই এক সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্যকন্যা বিবাহ করিতেন। অনার্য্য কন্যারা promiscuity বা বহুপুরুষসহবাস প্রথা অবলম্বন করিত। যাহাতে কুমারী অবস্থা হইতেই আমরণ সচ্চরিত্রা ও পতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হয়, বাল্যবিবাহ, সহমরণ ও অরুন্ধতী-ধ্রুব নক্ষত্র প্রদর্শন প্রথার তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনুমান হয়। চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, বহু বৎসর পর্য্যন্ত আর্য্যরা গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতেন, তৎপরে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন। এই কারণেই মনু বারো বৎসরের পাত্রীর সহিত ত্রিশ বৎসরের পাত্রের বিবাহ প্রশস্ত বলিয়াছেন।* (বেদাধ্যয়নের শেষে সুলক্ষণা কন্যার অন্বেষণার্থে মিত্রদের পাঠাইতেন—"বরণ" কন্যানির্ব্বাচনকেই বলে)। ভারতবর্ষে দ্বাদশ বর্ষে স্ত্রীলোকদিগের যৌবন আরম্ভ।

'ব্রাহ্মণ-সূত্র' যুগে priestly caste বা পুরোহিত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মণ ছাড়া যাগযজ্ঞ করিবার কাহারও ক্ষমতা রহিল না। ঐতেরয় ব্রাহ্মণে (৮।৫।২৪।২৬) লেখা আছে, ব্রাহ্মণ দিয়া যাগযজ্ঞ না করিলে দেবতাগণ যজ্ঞান্ন গ্রহণ করেন না। পুরোহিতের প্রাধান্য বাড়িল। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে হনন করেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রদ্বেষী হইয়া একটী সোমযজ্ঞ করেন, কিন্তু পুত্রহন্তারক ইন্দ্রকে যজ্ঞে আহ্বান করিলেন না। ইন্দ্র আহূত না হইলেও তথায় আসিয়া সোম পান করিয়া যান। তাহাতে ত্বষ্টা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া "ইন্দ্রঘাতক" এক পুত্র পাইবার জন্য যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। ক্রোধান্ধ হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করাতে উচ্চারণে দোষ হইল। "ইন্দ্র" শব্দের উপরে জোর না পড়িয়া "ঘাতক" শব্দের উপর জোর পড়িল—ইন্দ্র-ঘাতক শব্দ ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাসে গৃহীত না হইয়া বহুব্রীহি সমাসে গৃহীত হইল। বৃত্র নামে ত্বষ্টার দ্বিতীয় পুত্র হইল, মন্ত্রোচ্চারণ দোষে, সেই বৃত্র ইন্দ্রের ঘাতক না হইয়া, ইন্দ্র তাহার ঘাতক হইলেন।

এই পৌরহিত্যের প্রাধান্য কালেই রাজকুমারীরা ঋষি ও ঋত্বিকদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে লাগিলেন। এই যুগই Theocracy বা পুরোহিত-তন্ত্র যুগ। এই যুগেই ব্রাহ্ম ও দৈব বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত হইল এইরূপ অনুমান হয়। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যাজক বা পুরোহিতকে যজ্ঞ প্রারম্ভের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত সালঙ্কারা কন্যাদানের নাম দৈব বিবাহ। আর্ষ বিবাহ আরও পুরাতন বিবাহ। পাণিগ্রহণ সংস্কার সবর্ণাবিবাহেরই প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় কন্যা গ্রহণকালে, কন্যা বরের ধৃত ধনুকের প্রান্ত গ্রহণ করিতে অধিকারিণী ছিল। বৈশ্যকন্যা বিবাহ কালে ব্রাহ্মণের ধৃত গো-তাড়ন দণ্ডের একদেশ স্পর্শ করিত (মনু ৪০।৪১)। পাণি পীড়ন বা পাণিগ্রহণ একমাত্র সবর্ণারই অধিকার। আর্য্যদিগের বর্ণভেদের এই চতুর্থ স্তর।

কালক্রমে বৈদিক "পিতৃ যজ্ঞ" বিরাট শ্রাদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এক একটী ভিন্ন শাখা-জাতিতে পরিণত হইল ও বংশবৃদ্ধি হেতু স্ব স্ব বর্ণেই বিবাহ সংবদ্ধ করিল। দত্তক ও ঔরস পুত্র এবং ব্রাহ্ম ও আসুর বা ব্রাহ্মাসুর মিশ্রিত বিবাহ আদৃত হইল। সপিণ্ড theory এই কালেই উদ্ভূত

কি সহপ্রোথনের বিধি দেখা যায়। উদ্দেশ্য—পরকালে অর্থাৎ "স্বর্গেও" ঢেঁকিকে ধান ভাঙ্গিতে হইবে। অধুনাতন কালেও শ্রদ্ধেয় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত চিতানলে তাঁহার প্রিয় সেতার তবলা প্রভৃতি পোড়ান হইয়াছিল।

* মনু বারো বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করা যে প্রশস্ত বলিয়াছেন, তাহা দেখি নাই। তঃ বোঃ সং

হইল। শ্রাদ্ধকর্তা বা পুত্র তদূর্দ্ধতম ছয় পুরুষ—বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এই তিন জন লেপভাজ; এবং পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ পিণ্ডভোগী এই ছয় জন—এই সাতটী পুরুষ এবং ইহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাহাই সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ। পাত্রপাত্রীর উভয় কুলের গোত্রের বা প্রবরের ঐক্য না থাকে, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধুদিগের সহিত রক্তসংশ্রবে পঞ্চম পুরুষের সীমা অতিক্রান্ত হইলে সেই কুলের সুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণ প্রশস্ত (মনু ৫)। সপিণ্ড সপিণ্ডাকে বিবাহ করিতে পারেন না। Ancestor-worship বা পিতৃযজ্ঞ ওরফে শ্রাদ্ধই ধর্ম্মবিবাহের প্রবর্ত্তক। কন্যাদানে ধর্ম্মফল প্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা কন্যাদান করিলে শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ Metempsychosis বা পুনর্জ্জন্ম ভাল হয়। এই কারণে অন্যান্য উপবিবাহ তিরোহিত হইয়াছে। সবর্ণা স্ত্রীর পুত্রই ধর্ম্মজ পুত্র, অসবর্ণ স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র কামজ পুত্র। বিবাহের পূর্ব্বে ancestorworship হওয়া চাই,তাই "নান্দীমুখ" অর্থাৎ "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের" প্রয়োজন। 'পিতৃন'-দিগের বরকন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদের জন্য এই 'নান্দীমুখ'। তারপর কন্যাসম্প্রদান অর্থাৎ tutelage over the daughter হস্তান্তর হয়। এইরূপ কন্যার হস্তান্তরকে রোমকেরা manus "হস্ত" বা ক্ষমতা বলিত। গরুদানের মত কন্যাদান। কন্যার মতামতের উপর কন্যাদান নির্ভর করে না। কালো গোরা—যে রকম বর হউক না কেন—পিতা যাহাকে দান করিবে কন্যা তাঁহারই হইবে, কন্যার অমতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না। দত্তক পুত্রেরও একই দশা। পিতা যাহাকে দান করিবে সেই তাহার বাপ হইবে। ধনী হউক বা নির্দ্ধনী হউক যায় আসে না। পুত্রের মতামতের উপর পুত্রদান নির্ভর করে না। পিতৃদত্ত পুত্রের ও পিতৃদত্ত কন্যার গোত্রাদির পরিবর্ত্তন হয়। কন্যাদান ও দত্তক পুত্রদানের মন্ত্র একই। মন্ত্রের দ্বারা গোত্রান্তর হয় অতএব "দায়ভাগ"-শাসিত পাত্রী "মিতাক্ষর"-শাসিত সবর্ণের পাত্রকে বিবাহ করিলে পাত্রীর গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গে "শাস্ত্রান্তর"ও হইবে—অর্থাৎ মিতাক্ষরা শাস্ত্র দ্বারাই স্ত্রীধনাদি স্বত্বাস্বত্ব নির্ণীত হইবে। ভর্ত্তৃকুলের গোত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়া পাত্রী ভর্ত্তৃকুলের অধীন। ভর্ত্তৃ গোত্রপ্রধান বলিয়া পুরুষের দিক দিয়াই উত্তরাধিকারিতা নির্ণীত হয়।

বেদমন্ত্রদ্বারা 'পাণিগ্রহণ' দ্বিজাতির বিবাহের এক প্রধান অঙ্গ। বিবাহ একটী যজ্ঞ। অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না—অগ্নি না জ্বলিলে দেবগণ যজ্ঞে আসেন না, (ঋগ্বেদ—১।১।১-২) অতএব প্রাচীন আর্য্য-ধর্ম্মমূলক বিবাহে (বিশেষত দ্বিজাতির বিবাহে) হোমাগ্নির প্রচলন।

'পাণিগ্রহণ' সপ্তপদীর দ্বারা সিদ্ধ হয়। সপ্তপদী কি? Lochinavarএর ন্যায় একপা একপা করিয়া কন্যাকে গৃহের অভ্যন্তর হইতে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার স্মৃতি নয় ত? সপ্তপদীকে বিষ্ণুর সপ্তপদ বলে, কেননা প্রতিপদে কন্যা বিষ্ণুর নাম লইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সপ্তপদীর উৎপত্তি যাহা হউক সপ্তপদীর উদ্দেশ্য deliberately বা ভেবে চিন্তে বিবাহ করা। বরকনে এক পা ফেলিল যেমন, তাহাদিগকে বলা হইল—এখনো দেখ, বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় কর, না ইচ্ছা হয় না কর। দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি প্রতিপদে এইরূপ বরকন্যা সাবধান হইবার অবসর পায়। সপ্তম পদ ফেলিলে আর বিবাহের নড়চড় হইবার যো নাই—the matrimonial Rubicon is crossed।

সপ্তপদী ও 'সাত পাক' এক নহে। বরকন্যা যে সাত পাক ঘোরে অর্থাৎ পরি- ক্রমণ করে তাহা ও সপ্তপদী এক নয়। Folktale বা উপকথায় 'সাড়ে তিন পাক' বিবাহ করিয়া কখন কখন বর পলায়ন করে, কখন বা এক পাক বাকি রাখিয়া যায়।* বাণিজ্যাদি বা বীরত্বের কার্য্য করিতে গিয়া মরিলে কন্যা আবার বিবাহ করিতে পারিবে—গল্পের এই সাড়ে তিন পাক বা ছয় পাকের অর্থ। বর কার্য্যসিদ্ধি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাকি এক বা সাড়ে তিন পাক শেষ করিয়া কন্যা লইয়া গৃহে গমন করে। অনুমান হয় পূর্ব্বে বিবাহের প্রধান অঙ্গ "সাত পাক" ছিল।

* শ্রীশোভনা দেবীর "The Orient Pearls" দ্রষ্টব্য।

"কুমার সম্ভবে" হরপার্ব্বতীর বিবাহে ত্রিপদী দৃষ্ট হয়।

বিবাহান্তে পতিগৃহে বধূ আনীত হইলে বধূকে কোলে করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া প্রথা আছে। ইহা এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রার ন্যায় বিবাহ করিতে যাওয়া বোধ হয় রাক্ষস বিবাহেরই স্মৃতি। রাক্ষস বিবাহে বরপক্ষীয়েরা কন্যার আত্মীয় সকলকে আক্রমণ করিয়া কন্যা হরণ করিত। রাজপুতানায় বর আসিলে কন্যার আত্মীয়েরা একটা তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া নকল কেল্লা করিয়া বরযাত্রীর আগমনে বাধা দেয়। বরযাত্রীরা এই তোরণ ভাঙ্গিয়া কন্যার গ্রামে যাত্রা করে। বঙ্গদেশের পাড়াগাঁয়ে "ঢেলা" ফেলা রীতি আছে। নব বধূর পতিগৃহে আগমন আর্য্য বিবাহের শেষ অঙ্গ।

এইরূপে ভর্ত্তৃ গৃহ গমনকে রোমকেরা বলিত "deductio domum", (domum গৃহ, দম্পতীর অর্থও গৃহপতি)। নববধূকে কোলে করিয়া দরজা পার করাইবার ইহাও কারণ হইতে পারে যে, দরজা পার হইতে গিয়া চৌকাটে হোঁচট না খায় বা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া না যায়। এইরূপ হোঁচট খাওয়া বা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়াটা অলক্ষণের চিহ্ন। পুরাকালে রোমক দেশেও এই প্রথা ছিল—Holwell এর "The Marriage Feast" শীর্ষক কবিতাতে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে—

> Raise her now with omens meet,
> Bear her tiny, gleaming feet
> O'er the threshold's polished floor,
> Singing, (as we sang before)
> Hymen Hymenaes. অর্থাৎ—

"As the procession nears the bridegroom's door in order to avoid the evil omen of a chance stumble at the threshold, the regular ceremonial is gone through of carrying the bride over the step while still the chant rings high to the double name of the Roman god of Marriage."

আর্য্যবিবাহের কাল সচরাচর harvest gathering বা শস্য কর্ত্তনের পরই হইয়া থাকে। শস্য কাটা হইলে আর্য্যগণের চিন্তা দূর হইলে, বিবাহাদি উৎসবে মত্ত হইতেন।

আজকাল বিবাহ সবর্ণের ভিতর অর্থাৎ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় wider choice of brides and bridegrooms একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে—পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন ব্যাপার artificially limited সংকীর্ণ করা হইয়াছে। অশ্বাদির লক্ষণের ন্যায় পাত্রপাত্রীরও লক্ষণাদির নির্ণয়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে—নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্। নালোমিকাং নাতিলোমাং ক্ষয়গ্রস্তাং ইত্যাদি। (৩ মনু ৮)। আর্য্যবিবাহ শাস্ত্রোক্তি দ্বারা Eugenics বা সুপ্রজনন বিজ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। মনু বলেন স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আদৃত করিবে; বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইলে স্ত্রী স্বামীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিলে স্ত্রীর পুত্রবতী হইবার সম্ভাবনা—প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥ (মনু ৯।২৬) "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এই শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের প্রচার করা হইয়াছে। যত শীঘ্র বিবাহ হয়, পুন্নামক নরক হইতে মুক্তি হইবার সম্ভাবনা তত বেশী থাকে। কারণ—"অনিত্যং খলু জীবিতং। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" তাছাড়া স্ত্রী যদি পুত্রসন্তান প্রসব না করে, পতি যৌবন থাকিতে থাকিতে অন্য বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন। এই কারণেই প্রত্যেক ঋতুতে স্ত্রী-সংসর্গ শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে—তা না হইলে ভ্রূণ হত্যার পাপ। পুত্রের জন্য স্ত্রীর স্ত্রীত্ব ও আদর, স্ত্রীলোকের পৃথক শ্রাদ্ধাদি পাইবার অধিকার নাই।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। অতএব উপনয়ন বিবাহের পূর্ব্বেই হওয়া চাই। আর্য্যদিগের উপনয়ন রোমকদিগের taga virilis বা "যৌবন তাগা বা সূত্র"—বিবাহকালে বরকন্যার হস্তে যে সূত্র বন্ধন করা হয়, তাহাকে "কৌতুকসূত্র বলে। ইহার তাৎপর্য্য "hands off" অর্থাৎ এখন হইতে "এ বর, এ কন্যা" অন্য কেহ যেন ইহাদিগকে বিবাহ করিবার প্রয়াস না পান। "কৌতুকসূত্র" দ্বারা বরকন্যাকে অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ হইতে পৃথক করা হয়। আমার বোধ হয় "en-

gagement ring" এই "কৌতুকসূত্রের" রূপান্তর মাত্র। আর্য্য বিবাহের মন্ত্রে তুকতাকও আছে অর্থাৎ একটু আধটু যাদুও আছে। অথর্ব্ববেদে যাদুমন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"আর্য্য বিবাহ (কন্যার দিক হইতে বলিতে গেলে) এক মহা যজ্ঞ, স্বার্থই ইহার আহুতি, নিষ্কাম ধর্ম্মলাভ এই যজ্ঞের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই আর্য্যবিবাহের একমাত্র পদ্ধতি, যজ্ঞের অনল এই বিবাহের আরম্ভ কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহবন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না"। (বিশ্বকোষ)

সারস্বত গীত। *

(শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ)

হৃদয় আসন পরে তুমি এস মাত
বাজাও বীণা তব বাণী-বিধায়িনি।
তোমায় কাতরে ডাকি, কৃপা তব দাও,
তনয়ে দীন মাগো জ্ঞান প্রদায়িনি॥
ভকতিকুসুম ও মা! রেখেছি সাজায়ে
বাসনা পূজিতে ঐ পবিত্র চরণ।
আঁকিয়া রেখেছি প্রাণে তোমারি মুরতি,
তুমি মা একই মম পূজন সাধন॥
অজ্ঞান তামসে মাতঃ মানস জড়িত—
নাশ মা কৃপা করি তিমির সে রাশি।
সত্যেতে পূরিয়া দাও ভকতের চিত,
জ্ঞানের আলোক তা' উঠুক বিকাশি॥
এনেছি এনেছি মাতঃ চরণে তোমারি
আপন চিত্তখানি দিতে বিসর্জ্জন।
তোমারে প্রণমি মোরা দয়ার ভিখারী,
রাখ মা চিরদিন তব পদে মন॥

আলোক ও অন্ধকার। †

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আলোক ও অন্ধকার চিত্রাঙ্কনের প্রাণ। যিনি আলোক ও অন্ধকার সুনিপুণভাবে অঙ্কন করিতে পারেন, তিনিই ছবি আঁকিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া আলোচনা বা উহার অনুভূতি কেবলমাত্র যে চিত্রকরের অনন্য-সাধারণ অধিকার তাহা নহে; ধর্ম্ম ও সাধনাক্ষেত্রে এই আলোক ও অন্ধকার লইয়া উপলব্ধিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। মানুষ যখন অন্ধকারের ভিতরে অবস্থান করে, তখন সে আলোক লাভের জন্য আপনা হইতেই ব্যাকুল হইয়া উঠে; সংশয়ের ভিতরে পড়িয়া যখন মানুষ আর পথ খুঁজিয়া পায় না, দায়িত্বপূর্ণ জীবনের ছায়া তাহার অন্তরে প্রতিভাত হয়; যখন এই অন্ধকার মানুষকে পীড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন সে আলোক লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। বালক জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার জন্য যখন ভিতর হইতে প্রপীড়িত হয়, তখন সে গুরুর নিকট, শিক্ষকের নিকট যাইবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়। হয়ত তাহার অভিভাবক তাহাকে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগদান করিতে অসম্মত, কিন্তু যুবক তাহার পিতামাতার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আলোক লাভ করিবার সুবিধা নিজেই করিয়া লয়। সাধুযুবা অনেক সময়ে ধর্ম্মের আলোক লাভ করিবার জন্য এই কারণে সাধুসঙ্গ লাভ করিতে চায়, প্রচলিতভাবে অনাস্থাবান হয়, কখন বা সে পাঠে বা গার্হস্থ্যে অবহেলা করিয়া ধর্ম্মের আলোচনায় হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়ে। মানুষ অন্ধকারের ভিতরে আলোক আনিতে চায়, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতরে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের বিমল জ্যোৎস্না আনিবার প্রয়াসী হইয়া পড়ে।

মনুষ্যের প্রকৃত সাধনা, অকৃত্রিম পূজা, তাহার সাধু কর্ম্মচেষ্টা জীবনে তখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে, যখন হইতে অন্ধকার তাহাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করে। সকল শুভ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথমে কোথা হইতে আরম্ভ হয়? আমরা বলিব, অভাব-বোধের বেদনা হইতে। হেমচন্দ্র, মাইকেল, রঙ্গলাল ও ঈশানের তিরোভাব যখন এইস্থানে অন্ধকারের নিবিড় মেঘ রচনা করিয়া তুলিয়াছিল, এখানকার কৃতবিদ্য অধিবাসিগণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, সাহিত্য আলোচনায় আলোক লাভ

---

* কুমার রাধাপ্রসাদ ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গীত।
† খিদিরপুর সারস্বত-সম্মিলন উপলক্ষে লিখিত।

করিবার জন্য তাঁহারা বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তাই এখানে এই সারস্বত সম্মিলনের উৎপত্তি।

বহুযুগ পূর্ব্বে ভারতে দেবী সরস্বতীর পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যে সময়ে এই পূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, সেই সময়ে জ্ঞানের আলোকে চারিদিক ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি আরও আলোক লাভ করিবার জন্য মনুষ্যের পিপাসা বিদূরিত হয় নাই। সেই সময়ের পূজার মুখ্য উপকরণ কৃতজ্ঞতার বিকসিত কুসুম। বর্ত্তমানে আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাই আজ আমাদের পূজার মুখ্য উপকরণ জ্ঞানলাভের জন্য কাতরতা, ভিক্ষা এবং প্রার্থনা। আমরা চাই আলোক, আমরা চাই অন্ধকার হইতে মুক্তি।

এই আলোক লাভের জন্য চেষ্টা এবং এই অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম লইয়াই মনুষ্যের জীবন। এ সংগ্রাম যুগযুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতেও এই সংগ্রামের বিরাম হইবে না। মানুষ ধর্ম্মজগতে, অন্তরে বাহিরে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে চায়, জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত হইতে চায়; ইন্দ্রিয়দল আমাদের অন্তরে যে মোহের অন্ধকারজাল বিস্তার করে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়।

দেবমন্দির গবাক্ষবিহীন কেন? কেনই বা তাহার ভিতরে আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিতে পায় না? তাহার অন্য উদ্দেশ্য যাহাই কেন থাকুক না, আমরা আজ তাহার আলোচনা করিব না। আমরা বলি আমাদের জীবনের প্রতিদিনের চিত্র ঐ অন্ধকারগর্ভ মন্দিরে প্রতিফলিত। আমাদিগকে মন্দিরের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিকে দেখিতে হইবে. দেবতার শুভ্র আলোক নিরীক্ষণ করিতে হইবে, ব্যাকুলতাভরে অন্তশ্চক্ষুকে প্রসারিত করিয়া সেই জ্ঞান-চক্ষে তাঁহার সেই অরূপ রূপ সন্দর্শন করিতে হইবে। অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিলে সেই দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি সন্দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অসম্ভব।

যাহা সত্য, তাহাই আলোক। আলস্য, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা, অন্ধকারের নামান্তর মাত্র। যাহা সত্য তাহাই আবার সুন্দর। সত্য যদি সুন্দর না হইত, তাহা হইলে সত্য লাভের জন্য মানুষ ব্যাকুল হইত না। সুন্দর বলিয়া সত্যের প্রতি মনুষ্যের দুর্নিবার্য্য টান। মানুষ সত্যকে সুন্দর বলিয়া পাইতে চায়, উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়।

গৌরাঙ্গদেব প্রীতিভক্তির বিকাশকল্পে সত্য প্রচার করিলেন, তাই ভক্তের নিকট তিনি গৌরাঙ্গসুন্দর। তন্ত্রের সাধনা মৃত্যুর ভিতরে সৌন্দর্য্য দেখিতে চায়, তাই কালিকার প্রলয়ঙ্করী ভীষণমূর্ত্তির ভিতরে সাধক তাঁহার বরাভয় হস্ত প্রসারিত কল্পনা করে। সত্যবাণীর কৌমুদীধবল সরস্বতী মূর্ত্তিতে কেবলই আলোক, কেবলই সৌন্দর্য্য কল্পিত হইয়াছে।

দেবাসুর যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য তন্ত্রের দেবীর নিকট এক সময়ে প্রার্থনা উদ্গীরিত হইয়াছিল। কিন্তু সরস্বতীর আবাহন বাহিরের শক্তিলাভের জন্য নহে, অন্তরের শক্তি লাভ করিবার জন্য; অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার জন্য, বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাধনা। যখন চিরশান্তি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, মনুষ্য যখন কাব্য-সাহিত্য আলোচনার জন্য অবসর লাভ করে, যখন বিবাদ কোলাহল নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তির রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই সঙ্গীতে, বীণায়, মৃদঙ্গে, সুতানে, নৃত্যে, কলাবিদ্যার শতদল চতুঃষষ্টিদলে আলোকে এবং সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠে।

আমরা মোহতিমিরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। চাই আমরা আলোক, চাই আমরা শান্তি, চাই আমরা অন্তরের সৌন্দর্য্য। ঋষিরা কোন সুদূর অতীতে তারস্বরে গাহিয়া গিয়াছেন "তমসোমা জ্যোতির্গময়"; আমরা তাঁহাদের কণ্ঠে আমাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাই, অন্ধকার হইতে আলোকে, দ্বন্দ্ব হইতে মিলনে, সংশয় হইতে সত্যে, দুরাচার হইতে পবিত্রতায়, ঔদাস্য হইতে সাধনে, বিভিন্নতা হইতে ঐক্যে, অন্তরের মলিনতা হইতে জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে, প্রকৃত মনুষ্যত্বে লইয়া যাও। অন্ধকারের বেদনা আমাদিগকে প্রপীড়িত করিয়া তুলুক, যে আলোক লাভ করিয়া আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

শাস্ত্রযোনিত্ব নামক তৃতীয় অধিকরণ।

(শ্রীরামচন্দ্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

মূলসূত্র। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়াধিকরণস্য প্রথমং বর্ণকমারচয়তি—

অধিকরণ শ্লোক।

ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য কিংবা কর্ত্তৃ ন কর্ত্তৃতৎ।
বিরূপ নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ ॥১৫॥
কর্ত্তৃনিঃশ্বসিতাদ্ যুক্তে নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ ভবেৎ ॥১৬

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ [বৃহৎ ২।৪।১০] ইতি বাক্যং বিষয়ঃ। যদৃগ্বেদাদিকমস্তি তদেতস্য নিত্যসিদ্ধস্য ব্রহ্মণো নিঃশ্বাস ইবাযত্নেন সিদ্ধং ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম বেদং করোতি ন করোতি বা ইতি সন্দেহঃ। ন করোতি বেদস্য নিত্যত্বাৎ। বাচা বিরূপ নিত্যয়া ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে বিরূপ ইতি দেবতাং সম্বোধ্য নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয় ইত্যেবং প্রার্থ্যতে। নিত্যা বাক্ বেদ এব।

অনাদিনিধনা নিত্যা বাক্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তয়ঃ ॥

ইতি স্মৃতেঃ। অতঃ ন বেদকর্ত্তৃ ব্রহ্ম। ইতি প্রাপ্তে—

ব্রূমঃ ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ভবিতুমর্হতি। কুতঃ নিঃশ্বসিতন্যায়েনাপ্রযত্নোৎপত্ত্যবগমাৎ। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইতি সর্ব্বৈর্হূয়মানাৎ যজ্ঞশব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণো বিস্পষ্টমেব বেদোৎপত্তিশ্রবণাচ্চ। অপ্রযত্নোৎপত্ত্যৈবার্থেষু বুদ্ধ্যা রচিতৈঃ কালিদাসাদিবাক্যৈর্বৈলক্ষণ্যাদপৌরুষেয়ত্বং। প্রতিসর্গং পূর্ব্বসাম্যেনোৎপন্নৈঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যতা। সর্ব্বজগদ্ব্যবস্থাবভাসিবেদকর্ত্তৃত্ব নিরূপণেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং নিরূপিতং ভবতি ॥

সূত্রের অনুবাদ। শাস্ত্রযোনিত্ব হেতু।

তৃতীয় অধিকরণের প্রথম বর্ণক (রূপ) সংরচিত হইতেছে—

শ্লোকানুবাদ। ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহেন অথবা কর্ত্তা? তিনি কর্ত্তা নহেন। কারণ, "বিরূপ নিত্যয়া বাচা" এইরূপে (বেদের) নিত্যত্ব বর্ণিত আছে। নিঃশ্বসিত যুক্তি অবলম্বনে (ব্রহ্ম) কর্ত্তা। পূর্ব্বের সহিত সাম্য হেতু (বেদের) নিত্যত্ব। সর্ব্বপ্রকাশক বেদের কর্ত্তৃত্ব হেতু (ব্রহ্ম) সর্ব্বজ্ঞ।

টীকার অনুবাদ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" [বৃহ ২।৪।১০] এই বাক্যটী (বর্ত্তমান অধিকরণের) বিষয়। ঋগ্বেদাদি যাহা আছে, তাহা এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাসের ন্যায় অযত্নসিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম বেদ করিয়াছেন অথবা করেন নাই, ইহাই হইল সন্দেহ। করেন নাই, কারণ বেদ নিত্য। "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" এই মন্ত্রে দেবতাকে বিরূপ নামে সম্বোধন করিয়া নিত্য বাক্যের দ্বারা স্তুতি প্রেরণ কর, এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। নিত্য বাক্য বেদই। কারণ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বাগ্রে স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক আদি ও বিনাশরহিত, নিত্য, বেদময় দিব্য বাক্য প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা হইতে সকল প্রবৃত্তি আসিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা নহেন। ইহা প্রাপ্ত হইলে পর—

আমরা বলিতেছি যে ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা হইতে পারেন। কারণ, "নিঃশ্বসিত" যুক্তি অবলম্বনে (বেদের) অপ্রযত্নে উৎপত্তি হওয়া উপলব্ধ হয়; বিশেষতঃ, যখন "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" এই মন্ত্রে সকল যজ্ঞ কর্ত্তৃক হূয়মান যজ্ঞশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই বেদোৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। অপ্রযত্নে উৎপত্তির কারণেই বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত কালিদাসাদির বাক্যের সহিত অর্থবিষয়ে বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত (বেদের) অপৌরুষেয়ত্ব। প্রত্যেক সৃষ্টিতেই পূর্ব্বের সাম্যসূত্রে উৎপন্ন বেদসমূহের সহিত প্রবাহভাবে (বেদের) নিত্যতা। জগতের সকল ব্যবস্থাদ্যোতক বেদের কর্ত্তৃত্ব নিরূপিত হইবার কারণে (ব্রহ্মের) সর্ব্বজ্ঞত্বও নিরূপিত হইতেছে।

তাৎপর্য্য। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রসূত্রে জ্ঞানের কথা আসিল। জ্ঞানের কথা আসাতেই জ্ঞানের আধার শাস্ত্রের কথা আসিল। কাজেই তখন শাস্ত্রের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ আলোচনার অবকাশ হইল। তাই বলা হইল যে ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রযোনি,—যে শাস্ত্র হইতে সকলে জ্ঞান

মাত্র করিতেছে।—তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অধিকরণে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইতেছে বলিয়া ইহার নাম হইল শাস্ত্রযোনিত্ব অধিকরণ।

টীকাকার এইখানে শাস্ত্রযোনি শব্দকে দুইপ্রকার সমাসের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুই ভাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন—(১) শাস্ত্রের যোনি বা উৎপত্তিকারণ এবং (২) শাস্ত্র যোনি বা কারণ যাহার। প্রথম বর্গকে প্রথম অর্থের বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রের কারণ বা মূল, এই বিষয়ে বলা হইয়াছে।

এখন, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই মানিয়া লইতেছেন যে শাস্ত্র বলিতে বেদকেই বুঝায়, কারণ বেদই সকল শাস্ত্রের আদিশাস্ত্র। তবেই আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে ব্রহ্ম বেদের মূল কারণ কি না। যে মন্ত্র অবলম্বনে এই বিষয় আলোচিত হইবে তাহাই হইবে বর্ত্তমান অধিকরণের "বিষয়"। সেই মন্ত্রটী হইতেছে বৃহদারণ্যকীয় শ্রুতিবাক্য—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ", অর্থাৎ এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, এইগুলি মহান্ ভূত বা সৎস্বরূপের নিঃশ্বসিত বা নিঃশ্বাস রূপে আগত। টীকাকার বলেন যে ঋগ্বেদাদি যাহা আছে সেগুলি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের, আমাদের নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনা যত্নে বিনা প্রয়াসে সিদ্ধ, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ঋগ্বেদাদি অতি সহজে আবির্ভূত হইয়াছে, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ ইহাতে সন্দেহ উঠাইলেন যে ব্রহ্ম বেদ করিয়াছেন অথবা করেন নাই। তদুত্তরে তিনিই আবার বলিলেন যে তোমরা বল যে বেদ নিত্য, সুতরাং নিত্যবস্তু বেদের কেহই, এমন কি, ব্রহ্মও কর্ত্তা হইতে পারেন না। পূর্ব্বপক্ষ বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতির প্রমাণ দিতেছেন—শ্রুতি-প্রমাণ এই যে "বাচা বিরূপ নিত্যয়া" এই মন্ত্রে দেবতাকে বিরূপ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক "নিত্য বাক্য" দ্বারা স্তুতি প্রেরণ কর এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আর, এই নিত্য বাক্য বেদই, কারণ স্মৃতি বলিতেছেন—

যে বাক্যের আদি নাই ও বিনাশ নাই, সেই বেদরূপ "নিত্য" দিব্য বাক্য স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক আদিকালে ব্যক্ত হইয়াছিল এবং এই বেদরূপ বাক্য হইতেই লোকসকলের যাবতীয় প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম-চেষ্টা।

পূর্ব্বপক্ষের এই যুক্তির উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে বেদ নিত্য হইলেও ব্রহ্মের বেদ-কর্ত্তা হওয়া কিছু অযৌক্তিক নহে। বর্ত্তমান অধিকরণের বিষয়ীভূত শ্রুতি মন্ত্রেই তো রহিয়াছে যে ঋগ্বেদাদি ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বসিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন বিনা যত্নেই সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিনা আয়াসেই তাঁহা হইতে ঋগ্বেদাদির উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্ম যে বসিয়া বসিয়া মানুষের মত ঋগ্বেদাদি রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, সেগুলি ব্রহ্ম হইতে সহজে স্বভাবত বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থির, কারণ শ্রুতিতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে "সেই সর্ব্বহু যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম সকল জন্মগ্রহণ করিল।" সিদ্ধান্তপক্ষ হইয়া টীকাকার বলেন যে এই সর্ব্বহু যজ্ঞ শব্দের অর্থে সকল যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে হবিপ্রদান করা হয় সেই যজ্ঞপুরুষ বা ব্রহ্ম। এই অর্থ পূর্ব্বপক্ষেরও স্বীকৃত দেখা যাইতেছে। সিদ্ধান্তপক্ষ এই সূত্রে আরও বলিতে চাহেন যে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাতে মানুষের কোনই হস্ত নাই, কারণ উহা ব্রহ্ম হইতে বিনা যত্নে স্বভাবত ও সহজে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি মানব-রচিত গ্রন্থসমূহে এরূপ সহজ ভাব দৃষ্ট হয় না—সেই সকল গ্রন্থে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে যে অর্থে যে বাক্য বসানো উচিত, সেই অর্থে সেই বাক্য খুব বিবেচনার সহিত বসানো হইয়াছে।

এখন, বেদের নিত্যত্ব কারণে ব্রহ্ম বেদকর্ত্তা হইতে পারেন না, পূর্ব্বপক্ষ এই যে একটা আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে এই নিত্যতা ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হিসাবে নহে, কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রবাহরূপে আসার হিসাবেই উহার নিত্যতা। এই টীকা হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে যথাসময়ে এক একটী মহাপ্রলয় হয়, যে সময়ে সমুদয় সৃষ্টি ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই

প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি পুনর্জাগ্রত হইবার সময়ে ব্রহ্ম হইতে বেদ সকল পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রকাশিত বেদেরই অবিকল অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়, এই মতবাদটী পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষেরই সম্মত—বলিতে কি, সে কালে এই মত সর্ব্ববাদসম্মত ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই মত স্বীকৃত হওয়াতেই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতে পারিতেছেন যে বেদ এই হিসাবেই নিত্য যে প্রত্যেক মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদসকল একই আকারে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সকল জগতসংসারের ব্যবস্থা বা নিয়ম বেদে যে প্রকাশিত আছে, তাহাও উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়াই সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতেই যখন সেই সর্ব্বজগতের ব্যবস্থাপ্রকাশক বেদের উৎপত্তি, তখন কাজেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বর্ণকমাহ—

অধিকরণ শ্লোক।

অস্ত্যন্যমেয়তাঽপ্যস্য কিম্বা বৈদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে ॥ ১৭ ॥
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মান্তরযোগ্যতা।
তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বৈদৈকমেয়তা ॥১৮॥

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি [বৃহ. ৩।৯।২৬] ইতি শাকল্যং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যোনোক্তবাক্যে পরব্রহ্মরূপস্য পুরুষস্যোপনিষদ্বেদ্যত্বং প্রতীয়তে। তদ্বাক্যং বিষয়ঃ। তত্র ব্রহ্মণঃ প্রত্যক্ষাদিগম্যত্বমস্তি, ন বা ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষস্তু বিস্পষ্টঃ।

রূপরসাদ্যভাবান্নেন্দ্রিয়যোগ্যতা। লিঙ্গসাদৃশ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদিযোগ্যতা। উপনিষৎস্বেবাধিগতঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং ইত্যন্যনিষেধশ্রুত্যা চ বৈদৈকমেয়ত্বং। ভাষ্যকারৈঃ জন্মাদিসূত্রে শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং ইত্যন্যমেয়ত্বমঙ্গীকৃতং ইতি চেৎ। বাঢ়ং। প্রথমতঃ শ্রুত্যৈব প্রমিতে ব্রহ্মণি পশ্চাদনুবাদরূপেণানুমানানুভবয়োরঙ্গীকারাৎ। অতো বৈদৈকমেয়ং ব্রহ্ম ॥

দ্বিতীয় বর্ণক বলা যাইতেছে—

অধিকরণ শ্লোকানুবাদ। ইনি (ব্রহ্ম) অন্য প্রমাণের দ্বারা নির্ণেয় অথবা কেবল বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়। ঘটের ন্যায় প্রসিদ্ধ বস্তু হইবার কারণে ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের দ্বারাও নির্ণেয় হন। রূপ, লিঙ্গ প্রভৃতির অভাব হেতু ইনি অন্য প্রমাণের বিষয় নহেন। তং ত্বৌপনিষদং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহাঁকে কেবল বেদের দ্বারাই নির্ণেয় বলিয়া বলা হইয়াছে।

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি [বৃহং ৩।৯।২৬] শাকল্যের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত এই বাক্যে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ উপনিষদ অবলম্বনে বেদ্য বলিয়াই প্রতীত হয়। সেই বাক্য বিষয়। উক্ত বাক্যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগম্য কি না, ইহাই সংশয়। পূর্ব্বপক্ষের কথা সুস্পষ্ট।

রূপরসাদির অভাব হেতু (ব্রহ্ম) ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না। লিঙ্গ, সাদৃশ্য প্রভৃতির অভাব হেতু তিনি অনুমান, উপমান প্রভৃতিরও বিষয় নহেন। উপনিষৎসমূহেই অধিগম্য (ঔপনিষদ শব্দের) এই ব্যুৎপত্তির কারণে এবং বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই বৃহৎ (পুরুষকে) মনন করিতে পারেন না, এই প্রকার অন্যপ্রমাণের নিষেধবাচক শ্রুতিবাক্য থাকাতে (ব্রহ্ম) একমাত্র বেদের দ্বারাই নির্ণেয় স্থির হইতেছে। যদি বল যে, ভাষ্যকারগণ কর্ত্তৃক জন্মাদি সূত্রে শ্রুত্যাদি এবং অনুভবাদি যথাসম্ভব ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া বেদাতিরিক্ত অন্য প্রমাণের দ্বারাও ব্রহ্ম নির্ণেয় হয়েন, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে—ভাল, তাহাই স্বীকার করিলাম। ব্রহ্মবিষয় প্রথমত শ্রুতি দ্বারা নির্ণীত হইলে, পশ্চাৎ অনুবাদরূপে অনুমান ও অনুভবের স্বীকার করা যায়। অতএব ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়।

তাৎপর্য্য। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে টীকাকার শাস্ত্রযোনি শব্দকে দুই প্রকার সমাসের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া দুইভাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন—(১) শাস্ত্রের যোনি বা উৎপত্তিকারণ এবং (২) শাস্ত্র যাহার যোনি বা কারণ। প্রথম বর্ণকে প্রথম অর্থের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এইবারে দ্বিতীয় বর্ণকে দ্বিতীয় অর্থ আলোচিত হইবে।

বহুব্রীহি সমাস অবলম্বনে দ্বিতীয় অর্থ আসে। শাস্ত্র যোনি বা কারণ যাহার, ইহা শাস্ত্র যে ব্রহ্মের উৎপত্তির কারণ, সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; শাস্ত্র যাঁহাকে ব্যক্ত করাতে যিনি আমাদের বুদ্ধিগোচর

হয়েন, যাঁহাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—শাস্ত্র যাঁহাকে না বুঝাইলে যিনি অব্যক্ত থাকিতেন, এই অর্থে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র ব্রহ্মের যোনি বা কারণ অর্থাৎ শাস্ত্র যাঁহাকে নির্ণয় করিয়া দেয়। এখন প্রথম বর্ণকে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র শব্দের অর্থে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয় পক্ষই বেদকেই ধরেন। তাই অধিকরণ শ্লোকে এই প্রশ্ন করা হইল যে বেদই ব্রহ্মের একমাত্র নির্ণায়ক অথবা বেদাতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাও তাঁহাকে নির্ণয় করা যাইতে পারে? বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা বাক্যে আছে যে সেই ঔপনিষদ বা উপনিষৎসিদ্ধ পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি [বৃহঃ ৩।৯।২৬]। এই বাক্যে ঐ ঔপনিষদ কথাটী থাকাতেই উক্ত বাক্যকেই এই শাস্ত্রযোনিত্ব অধিকরণের বর্ত্তমান বর্ণকের বিষয় বলিয়া ধরা হইল।

এখানে সংশয় হইল এই যে, যখন ব্রহ্মকে শ্রুতিবাক্যে উপনিষৎবেদ্য বলা হইল, তখন ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ প্রভৃতি বেদাতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারেন কি না। পূর্ব্বপক্ষের এই সংশয় উঠাইবার কারণ এই যে ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কোন অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াদির অপেক্ষা রাখেন না। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সম্পূর্ণরূপেই বেদ অবলম্বনেই অধিগম্য, কারণ সেগুলি বেদবিহিত—সেগুলির অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বা প্রণালী বেদ ব্যতীত অন্য কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই সকল যাগযজ্ঞাদি সিদ্ধ বা সম্পন্ন বস্তু নহে, সেগুলি কতকগুলি অনুষ্ঠানের সাহায্যে সম্পাদ্য। কিন্তু ব্রহ্ম যখন সিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মকে প্রস্তুত করা যায় না, তখন ব্রহ্মকে বেদের সাহায্যেও যদি বা জানা যায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাও জানা না যাইবে কেন? দৃষ্টান্ত—একটী ঘট রহিয়াছে; সেই ঘটকে যেমন ঘটশব্দের দ্বারাও বুদ্ধিগত করা যাইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারাও তাহাকে জানা যাইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষের মতে ব্রহ্মকে যেমন বেদ অবলম্বনে, তেমনি অন্যান্য প্রমাণেরও সাহায্যে জানা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে 'তুমি যে বলিতেছ যে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? ব্রহ্মের সহিত যখন রূপরসাদির কোনই সম্পর্ক নাই, তখন তিনি কিছুতেই ইন্দ্রিয়গোচর নহেন এবং ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেই প্রত্যক্ষগ্রাহ্যও হইতে পারে না।' সিদ্ধান্তপক্ষ আরও বলিতেছেন যে ব্রহ্ম অনুমান বা উপমান প্রমাণেরও গ্রাহ্য নহেন, কারণ ব্রহ্মকে অনুমান করিয়া লইবার কোন কারণ নাই; ধূম দেখিয়া অনুমান হইল যে অগ্নি আছে—কিন্তু সেই অনুমানও হইল প্রত্যক্ষমূলক—ধূম ও অগ্নির পরস্পরের অত্যন্তসংযোগ যাহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, সে-ই ধূম দেখিয়া অনুমান করিতে পারে যে অগ্নি আছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ প্রত্যক্ষমূলক অনুমান করিবার কোন উপায় নাই।

ব্রহ্ম উপমান প্রমাণেরও বিষয় হইতে পারেন না। কারণ তাহাও প্রত্যক্ষমূলক। একটী গরুকে আমি দেখিয়াছি, তুমিও দেখিয়াছ। তখন আমি একটী মহিষকে দেখিয়া তোমার পূর্ব্বদৃষ্ট গরুর সহিত উপমা দিয়া, অর্থাৎ শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গরুর সহিত সাদৃশ্য বুঝাইয়া তোমাকে মহিষের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি, এবং তুমিও মহিষের বিষয় কতক পরিমাণে বুঝিতে পার। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত উপমা দিব কাহার, কাহার সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া তাঁহার বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি? নতৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—শ্রুতি বলিতেছেন যে তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না। তবেই দাঁড়াইল যে ব্রহ্ম যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান বা উপমান, এই তিনটীর মধ্যে কোনটীরই গম্য নহেন, তখন তিনি প্রমাণচতুষ্টয়ের শেষ প্রমাণ একমাত্র শব্দপ্রমাণ-গম্য। শব্দ বলিতে আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদরহিত বাক্য বুঝায়। উভয়পক্ষেরই স্বীকৃত যে শ্রুতিবাক্যই এইরূপ আপ্তবাক্য।

ইহার উপর, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যে ঔপনিষদ বলিয়া বলা হইয়াছে, সিদ্ধান্তপক্ষ উপনিষদ্ সমূহেই অধিগত বা প্রাপ্ত এই অর্থে ঔপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। তদুপরি, নাবেদবিন্মনুতে তংবৃহন্তং অর্থাৎ বেদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহান পুরুষকে জানিতে পারে না, এইরূপ একটী নিষেধবাচী শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। সিদ্ধান্তপক্ষ একদিকে

দেখাইলেন যে ব্রহ্ম একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য, অপরদিকে দেখাইলেন যে সেই শব্দপ্রমাণ বা শ্রুতিবাক্যই তাঁহাকে যেমন উপনিষদ্‌বেদ্য বলিতেছেন, সেইরূপ তাঁহাকে জানিবার পক্ষে বেদে অনভিজ্ঞ পুরুষের অনধিকারও ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার মতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে বেদই একমাত্র ব্রহ্মের নির্ণায়ক। তবে যে ভাষ্যকার আচার্য্য শঙ্কর জন্মাদ্যস্য যতঃ এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি প্রভৃতির ন্যায় অনুভব প্রভৃতিকেও প্রমাণস্বরূপে ধরিয়া শ্রুতির অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়কেও ব্রহ্মনির্ণায়ক বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা কি ঠিক নহে? সিদ্ধান্তপক্ষ ভাষ্যকারের কথা অসঙ্গত বলিতে পারেন না। তিনি শঙ্করভাষ্যকে বজায় রাখিয়া বলিলেন যে সর্ব্বপ্রথমে শ্রুতি অবলম্বনে ব্রহ্ম নির্ণীত হইবার পর সেই সকল শ্রুতিবাক্যের সমর্থক অনুমান প্রমাণ ও অনুভবরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভাষ্যকার যে অনুভব প্রভৃতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা শ্রুতিবাক্যের বিপরীত বা শ্রুতিনির্ণীত স্বরূপ হইতে পৃথক স্বরূপবোধক হইলে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না; যখন তাহা শ্রুতিবাক্যে নির্ণীত স্বরূপের সমর্থক হইবে, তখনই তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে ব্রহ্ম একমাত্র বেদ অবলম্বনেই নির্ণেয়।

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত—

গীতা-রহস্য।

৬ষ্ঠ প্রকরণ।

আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সত্যপূতাং ভবেদ্‌বাচম্ মনঃপূতং সমাচরেৎ। *

মনু, ৬, ৪৬।

আধিভৌতিক মার্গ ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষণের আর এক মার্গ আছে, তাহা আধিদৈবতবাদীদিগের মার্গ। এই মার্গের লোকেরা এইরূপ বলেন যে, যে সময়ে মনুষ্য কর্ম্মাকর্ম্মের কিংবা কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করে সেই সময়ে, কোন্ কর্ম্ম হইতে কাহার কত সুখ বা দুঃখ হইবে এবং তন্মধ্যে সমস্ত সুখের মোট সংখ্যা অধিক, না দুঃখের মোট সংখ্যা অধিক, এইরূপ গোলযোগের মধ্যে কিংবা আত্মানাত্মবিচারের মধ্যেও সে কখনই পড়ে না; এবং অনেকে এই গোলযোগের বিষয়টা পর্য্যন্ত জানে না। অধিক কি প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কর্ম্ম কেবল নিজের সুখের জন্য করে এরূপ নহে। আধিভৌতিকবাদী যে কোন যুক্তিবাদই বলুন না কেন, ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয় করিবার সময় মানব-মনের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা ক্ষণমাত্র বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারুণ্য, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি মানব-মনের স্বাভাবিক ও উচ্চ মনোবৃত্তি কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করে। উদাহরণ যথা—কোন ভিখারীকে দেখিয়া তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিলে জগতের কিংবা নিজের আত্মার কতটা কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মনুষ্যের মনে আসিবার পূর্ব্বে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত হওয়ায় মনুষ্য আপন শক্তি অনুসারে ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়াই খালাস হয়; এবং ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে দুধ দিবার সময়, কত লোকের কতটা হিত হইবে ইহার কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, তাহার মা তাহাকে দুধ দেয়। সুতরাং কর্ম্মযোগশাস্ত্রে এই উচ্চ মনোবৃত্তির প্রকৃত ভিত্তি আছে। এই মনোবৃত্তি আমাদিগকে কেহ দেয় নাই. উহা নিসর্গসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিক কিংবা এক ভাবে দেখিলে উহা স্বয়ংভূ দেবতা। বিচারপতি আপন বিচার আসনে বসিলে, তাঁহার বুদ্ধির অন্তর্ভূত ন্যায়দেবতার স্ফুরণ হওয়ায় তিনি ন্যায় বিচার করেন; এবং যখন কোন বিচারপতি এই স্ফুরণকে গ্রাহ্য না করেন, তখনই তাঁহার হাত দিয়া অন্যায় বিচার বাহির হয়। ন্যায়দেবতার মতোই কারুণ্য, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কর্ত্তব্যানুরাগ, ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্‌গুণাদির যে সকল স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাহারাই দেবতা। এই দেবতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ কি তাহা প্রত্যেকেরই স্বভাবত জানা আছে। কিন্তু লোভ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য বশতঃ কিংবা এইরূপ অন্য কোন কারণবশত দেবতাদিগের এই স্ফুরণ গৃহীত হয় না, তাহাতে দেবতারা

---

* "সত্যের দ্বারা যাহা পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বাক্য বলিবেক এবং মন যাহা শুদ্ধ মনে করিবে তদনুসারে আচরণ করিবেক।"

কি করিবেন? এক্ষণে ইহা সত্য যে, কখন কখন এই দেবতাদিগের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যাওয়ায় কোন কার্য্য করিবার সময় কোন্ দেবতার স্ফুর্ত্তি বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করা যাইবে এই বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়; এবং তাহার পর এই সংশয়ের নির্ণয়ার্থ ন্যায় কারুণ্যাদি দেবতা ব্যতীত অন্য কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এই সময়েও অধ্যাত্মবিচারের কিংবা সুখদুঃখের তারতম্যের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোদেবতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, উক্ত দেবতাদ্বয়ের মধ্যে কোন্ মার্গ শ্রেয়স্কর, শীঘ্রই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইয়া যায়; এবং সেই জন্য, উপরি-উক্ত সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যেও মনোদেবতা শ্রেষ্ঠ। 'মনোদেবতা' এই শব্দের মধ্যে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত বিকারের সমাবেশ না করিয়া, কেবল ভাল কিংবা মন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদত্ত কিংবা স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে তাহাই উপস্থিত প্রকরণে বিবক্ষিত বলিয়া ধর্ত্তব্য। এই শক্তির 'সদসদ্‌বিবেকবুদ্ধি' * এই বড় নাম প্রদত্ত হইয়াছে; কোন সংশয় প্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শান্তভাবে যদি ক্ষণমাত্র বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে এই সদসদ্‌বিবেচনদেবতা কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। অধিক কি এইরূপ প্রসঙ্গে "তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর্" এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। কোন সদ্‌গুণের কোন্ সময়ে কতটা গুরুত্ব হইবে তৎসম্বন্ধে এই বড় দেবতার নিকট একটা স্মারক লিপি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে, সেই লিপি অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা আপন নিষ্পত্তি তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করেন। ইহা মনে করিও, কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, দুর্ভিক্ষ-প্রসঙ্গে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কিংবা করিবে না, এইরূপ আমাদের যখন সন্দেহ উপস্থিত হয় তখন শান্তচিত্তে এই মনোদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিলে তখনি "অভক্ষ্য ভক্ষণ কর" এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপ স্বার্থ কিংবা পরোপকার ইহার মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চ্চনার দ্বারা করিতে হইবে। মনোদেবতার নিকটস্থ এই ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যের স্মারকলিপি শান্তভাবে বিচার করিয়া এক গ্রন্থকারের তাহা উপলব্ধি হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন *। এই স্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে প্রথম আসন অর্থাৎ অত্যুচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; তাহার নীচে কারুণ্য ও তাহার নীচে কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য্য, বাৎসল্য প্রভৃতি নীচের ধাপগুলি ক্রমশ প্রদর্শিত হইয়াছে। নীচের ও উপরের ধাপের সদ্‌গুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবামাত্র অপেক্ষাকৃত উপর ধাপের দেবতাদিগকেই অধিকাধিক মান দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ এই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার মতে, ইহা অপেক্ষা যোগ্য মার্গ আর নাই; কারণ, আমাদের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিয়া "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় তাহা সুনিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত করিলেও, অধিক লোকের যাহাতে হিত হয় তুমি তাহা কর এইরূপ বলিবার অধিকার তারতম্যবুদ্ধির মধ্যে না থাকায় শেষে "অধিক লোকের অধিক হিত" আমি কেন করিব ইহার নিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং সমস্ত প্রশ্ন পূর্ব্বেকার মতোই অনিষ্পন্ন থাকিয়া যায়। কোন বিচারপতি রাজার নিকট অধিকার না পাইয়া কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে, সেই নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, সুখদুঃখের দূর দৃষ্টিতে বিচার করিয়া যে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয় হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে। তুমি এইরূপ কর, এই কাজটা তোমায় করিতেই হইবে, একথা কেবল দূর দৃষ্টি কাহাকেও বলিতে পারে না। কারণ, দূর দৃষ্টি হইলেও উহা মনুষ্যকৃত বলিয়া মনুষ্যের উপরে উহার প্রভুত্ব চলিতে পারে না। এইরূপ প্রসঙ্গে, আমাদের অপেক্ষা মহৎ অধিকারবিশিষ্ট অন্য

* এই সদসদ্‌বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজিতে Conscience বলে, এবং আধিদৈবতবাদ অর্থে Intuitionist School।

* এই গ্রন্থকারের নাম James Martineau (জেমস্ মার্টিনো), ইনি এই স্মারকলিপি নিজের Types of Ethical Theory (Vol II. P. 266. 3d Ed.) নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। মার্টিনো আপন গ্রন্থে Idio-psychological এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আধিদৈবতবাদের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিতেছি।

কাহারো নিকট হইতে আদেশ পাওয়া আবশ্যক, এবং ঐ কার্য্য, মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং মনুষ্যের উপর হুকুম জারি করিতে সমর্থ এইরূপ ঈশ্বরদত্ত সদসদ্‌বিবেক-দেবতাই করিতে পারেন। এই দেবতা স্বয়ম্ভূ হওয়াপ্রযুক্ত, প্রচলিত ব্যবহারেও আমার মনোদেবতা আমাকে অমুক অমুক প্রকারের সাক্ষ্য দেন নাই এইরূপ বলিবার রীতি আছে। কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, পরে তাহার জন্য তাহার লজ্জা বোধ হয় কিংবা তাহার মনে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ইহাও এই মনোদেবতার শাস্তির ফল; এবং তাহাতে করিয়া এই স্বতন্ত্র মনোদেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আপনার মন আপনাকে আপনি কেন কষ্ট দেয়, ইহার আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না—এইরূপ এই মার্গের মত।

পাশ্চাত্য আধিদৈবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য দেশের এই মতবাদ প্রায় খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশকেরাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা ঈশ্বরদত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহ্য। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের এইরূপ স্বতন্ত্র পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন গ্রন্থাদির অনেক স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে মহাভারতের অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যায়। ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, শীল, শ্রী প্রভৃতি দেবতা প্রহ্লাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রবেশের বর্ণনাও পরে প্রদত্ত হইয়াছে। কার্য্যাকার্য্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়কারী দেবতার নাম 'ধর্ম্ম' দেওয়া হইয়াছে; শিবি রাজার আত্মবলের পরীক্ষা করিবার জন্য শ্যেনের রূপ ধরিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা করিবার জন্য যক্ষের রূপ ধরিয়া ও শেষে কুকুরের রূপ ধরিয়া ধর্ম্ম প্রকট হইয়াছিলেন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি ভগবদ্‌গীতাতেও (১০।৩৪) কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা ইহারা মনের ধর্ম্ম। মনও এক দেবতা হওয়ায় পরব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া তাহার উপাসনাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে (তৈ, ৩।৪; ছা, ৩।১৮)। "মনঃপূতং সমাচরেৎ",—মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে—এইরূপ যখন মনু বলিতেছেন (৬।৪৬), তখন 'মন' এই শব্দে মনোদেবতাই মনুর অভিপ্রেত, এইরূপ অবাধে বলা যাইতে পারে। প্রচলিত ব্যবহারে ইহার বদলে "মনোদেবতার যাহা ভাল লাগে তাহাই করিবে" এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি।

'মনঃপূত' এই শব্দের অর্থ মরাঠীতে উল্টা হইয়া গিয়াছে; এবং অনেক সময়, যাহা মনে হয় তাহাই যদৃচ্ছাক্রমে করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা 'মনঃপূত' আচরণ এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ "মনেতে যাহা পবিত্র কিংবা শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হইবে তাহাই করিবে"—এইরূপ। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে—

> যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
> তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ—"যে কর্ম্ম করিলে আমার অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট হয় তাহা সযত্নে করিবেক, এবং তাহার বিপরীত হইলে ত্যাগ করিবেক" এইরূপ মনু আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন (মনু, ৪।১৬১) সেইরূপ আবার, চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মাদির ব্যবহারিক নীতির মূলতত্ত্ব বলিবার সময় মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিগ্রন্থকারও

> বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
> এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ—"বেদ, স্মৃতি, শিষ্টাচার, এবং আপনার আত্মার ভাল লাগা, ধর্ম্মের এই চারি মূলতত্ত্ব" (মনু, ২।১২) এইরূপ বলিয়াছেন। "নিজের আত্মায় যাহা ভাল লাগে তাহা" অর্থাৎ মনে যাহা শুদ্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা—এইরূপ অর্থ; এবং শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্যের ধর্ম্মাধর্ম্মত্ব নির্ণয় না হইতে পারিলে, উহা নির্ণয় করিবার চতুর্থ সাধন —'মনঃপূততা' বুঝিতে হইবে, ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মহাভারতে প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র ইঁহাদের কথা পূর্ব্ব প্রকরণে বিবৃত করিবার পর "শীলের" লক্ষণ দিবার সময় ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিয়াছেন—

> যদন্যেষাং হিতং ন স্যাৎ আত্মনঃ কর্ম্ম পৌরুষম্।
> অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন॥

অর্থাৎ—আপনার যে কর্ম্ম লোকের হিতকর নহে কিংবা যাহার জন্য আপনাদেরই লজ্জা হয়, সে কর্ম্ম কখনই করা উচিত নহে। (সভা, শাং, ১২৪।৬৬)। "লোকের হিতকর নহে" ও "লজ্জা হয়" এই দুই পদে, 'অধিক লোকের অধিক হিত' ও 'মনোদেবতা'—এই দুই পক্ষেরই উল্লেখ এই শ্লোকে করা হইয়াছে,—ইহার প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন। মনুস্মৃতিতেও, যে কর্ম্ম করিলে কিংবা করিবার সময় লজ্জা বোধ হয় তাহা তামসিক এবং যে কর্ম্ম করিবার সময় লজ্জা বোধ হয় না ও অন্তরাত্মা সন্তুষ্ট থাকে তাহা সাত্ত্বিক এইরূপ কথিত হইয়াছে (মনু, ১২।৩৫।৩৭) ; এবং ধর্ম্মপদ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই বিচারআলোচনা আছে (ধর্ম্মপদ ৬৭ ও ৬৮ দেখ)। কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে—

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

অর্থাৎ সৎব্যক্তি আপনার অন্তঃকরণের সাক্ষ্যই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন—এইরূপ কালিদাসও বলিয়াছেন (শকু, ১।২০)। চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া একই বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখা পাতঞ্জল যোগের কার্য্য ; এবং এই যোগশাস্ত্র আমাদের নিকট খুব প্রচীন কাল হইতে প্রচলিত থাকা প্রযুক্ত কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণকে স্বস্থ ও শান্ত করিয়া যা উচিত মনে হয় তাহা করিবে—এই মার্গ আমাদের দেশের কাহাকে শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের আরম্ভে স্মৃতিকার ঋষি মনকে একাগ্র করিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবৃত করিয়া থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে (মনু ১।১) ; এবং যে কোন কর্ম্মে এইরূপ মনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা—এই মার্গ প্রথমদৃষ্টিতেও অত্যন্ত সুলভ মনে হয়। কিন্তু শুদ্ধ মন কাহাকে বলে তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার সূক্ষ্ম বিচার করিলে এই সহজ মতটি শেষ পর্য্যন্ত না টেঁকায় আমাদের শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের ইমারৎ এই ভিত্তির উপর খাড়া করেন নাই।

এই তত্ত্বজ্ঞানটি কি, এক্ষণে ইহার বিচার করিতে হইবে ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা এই আধিদৈবত মতবাদের খণ্ডন কিরূপ করিয়াছেন, তাহার অল্প বৃত্তান্ত এইখানে দিতেছি। কারণ এই বিষয়সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই দুই পন্থার যুক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও শেষে সিদ্ধান্ত একই প্রকার ; অতএব প্রথমে আধিভৌতিক যুক্তিগুলি বলিলে পরে আধ্যাত্মিক যুক্তিসমূহের গুরুত্ব ও সযুক্ততা পাঠকদিগের শীঘ্র উপলব্ধি হইবে। আধিদৈবিক পন্থায়, উপরিকথিত অনুসারে শুদ্ধ মনোদেবতাকেই অগ্রস্থান দেওয়া প্রযুক্ত, "অধিক লোকের অধিক সুখ" এই আধিভৌতিক নীতিপন্থায় কর্ত্তার বুদ্ধির কোন বিচার হয় না. এইরূপ পূর্ব্বে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই আধিদৈবত মত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু সদসদ্‌বিবেককে শুদ্ধ মনোদেবতা কেন বলা হইবে ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অপরিহার্য্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন বিষয় ধরনা কেন, তাহার সমস্ত দিক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি যোগ্য নহে, অথবা লভ্যজনক বা সুখজনক, ইহা নির্দ্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখ এই ইন্দ্রিয়দের কাজ নহে ; সুতরাং মন এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়, ইহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। সুতরাং কার্য্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় মনই করিয়া থাকে ;—তাকে তুমি ইন্দ্রিয়ই বল বা দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের উক্তি যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে তৎবিরুদ্ধে তর্ক করিবার কিছুই নাই।

কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা একপদ আরও অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ভাল কিংবা মন্দ (সৎ কিংবা অসৎ) ন্যায্য কিংবা অন্যায্য, ধর্ম্ম্য কিংবা অধর্ম্ম্য ইহার নির্ণয় করা এবং কোন পদার্থ ভারী কি হাল্কা, সাদা কি কালো, কিংবা হিসাবে ঠিক কি ভুল, ইহার নিষ্পত্তি করা—এই দুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। দ্বিতীয় প্রকারের নির্ণয় মন ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে ; কিন্তু প্রথম বর্গস্থ বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ,—সেই কার্য্য সদসদ্‌বিবেচনরূপ যে দেবতা মনেতে আছেন কেবল তিনিই করিয়া থাকেন। ইহার কারণ তাঁহারা এইরূপ দেখান যে, কোনও হিসাব ঠিক কিংবা ভুল ইহা স্থির করিবার সময় আমরা সেই হিসাবের তেরিজ কিংবা গুণফল পরীক্ষা

করিয়া তাহার পর আমাদের মত স্থির করিয়া থাকি ; অর্থাৎ এই বিষয়ের নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন ক্রিয়া বা ব্যাপার মনে করা দরকার। কিন্তু ভাল মন্দের নির্ণয় সেরূপ নহে। কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে এইরূপ অবগত হইবামাত্র তখনি "ছি! সে মন্দ কাজ করিয়াছে" এই রূপ উচ্ছ্বাসোক্তি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিচার করিতে হয় না। সুতরাং কিছু বিচার না-করিয়া আমরা যাহা নির্ণয় করি তাহা এবং বিচার করিয়া যাহা নির্ণয় করি তাহা—এই দু-ই একই মনোবৃত্তির ব্যাপার, এরূপ বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং সদসদ্‌বিবেচনশক্তি এক স্বতন্ত্র মানসিক দেবতা, এইরূপ মানিতে হয়। সকল মনুষ্যেরই অন্তঃকরণে এই শক্তি কিংবা দেবতা সমানরূপেই জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাণ্ডকে অপরাধ মনে করে এবং সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু শিখাইতে হয় না।

আধিভৌতিক পন্থার লোকেরা এই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এইরূপ উত্তর দেয় যে, কোন বিষয়ের নির্ণয় তৎক্ষণাৎ আমরা করিতে পারি—এই ব্যাপার, এবং যে বিষয়ের নির্ণয় আমরা বিচার করিয়া করি—এই ব্যাপার, এই দুইটি ভিন্ন হইতেই হইবে একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কোন বিষয় দ্রুত করা কিংবা রহিয়া বসিয়া করা ইহা অভ্যাসের কাজ। ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মণের হিসাবে সেরের দর চট্ করিয়া মুখে মুখে বলিতে পারে, তাই বলিয়া উত্তম গণিতবেত্তা হইতে গুণন করিবার দেবতা তাঁহার আলাদা নহে। সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে কিছু বিচার না করিয়াও মনুষ্য তাহা সহজে করিয়া যায়। উত্তম লক্ষ্যসন্ধানকারী মনুষ্য উড়োপাখী বন্দুকে সহজে মারিয়া থাকে, তাই বলিয়া লক্ষ্যসন্ধানের দেবতা স্বতন্ত্র এরূপ কেহ বলে না—শুধু বলে না তাহা নহে,—কিরূপে 'তাক্' করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা করিতে হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও সেই জন্য কেহ ত্যাজ্য বলিয়া মনে করে না। সম্রাট নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা শুনা যায় যে, রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একবার চারিদিকে তাকাইয়া শত্রুর ছিদ্র কোথায়, একেবারেই তাঁহার নজরে পড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া যুদ্ধকলার এক স্বতন্ত্র দেবতা আছে, অন্য মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাবত বেশী, কাহারও কম, ইহা সত্য ; কিন্তু তাহাতে করিয়া উভয়ের বুদ্ধি বস্তুত ভিন্ন এরূপ আমরা বলি না ; তাছাড়া কার্য্যা-কার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় সর্ব্বদাই শীঘ্র হইয়া থাকে, এরূপও নহে। কারণ, পরে "অমুক করিবে কিংবা অমুক করিবে না" এইরূপ সংশয় কখন উপস্থিত না হইলেও, অর্জ্জুনের ন্যায় প্রসঙ্গ-বিশেষে সকলেরই এই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। শুধু তাহা নহে, কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের কোন বিষয়ে বিভিন্ন পুরুষের অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সদাসদ্‌বিবেচনশক্তিরূপ স্বয়ম্ভু দেবতা যদি একই হন তবে এই ভেদ কেন? অবশ্য, মনুষ্যের বুদ্ধি যে পরিমাণে সুশিক্ষিত কিংবা সুসংস্কৃত হয় সেই পরিমাণে কোন বিষয়ের সে নির্ণয় করে, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে যাহারা মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া হত মনুষ্যের মাংসও আনন্দে আহার করে! কিন্তু অসভ্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশাচার অনুসারে এক দেশে যাহা গর্হিত বলিয়া মনে করে, অন্য দেশে তাহাই সর্ব্বমান্য হইয়া থাকে। এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়া গণ্য ; কিন্তু হিন্দু-স্থানে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বিধিনিষেধ নাই। ভরপুর সভার মধ্যে মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া বসিতে হিন্দু লোকের লজ্জা বোধ হয় ; কিন্তু ইংরেজ লোক মাথা হইতে টুপি খোলাই সভ্যতার লক্ষণ মনে করে। ঈশ্বরদত্ত কিংবা স্বাভাবিক সদসদ্‌বিবেচনশক্তি প্রযুক্তই যদি ভাল মন্দ সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করা সত্য হয়, তাহা হইলে, সকলেই একই কার্য্যে একই রকম লজ্জা বোধ করে না কেন? দস্যুও যাহার অন্ন একবার গ্রহণ করি-য়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা নিন্দনীয় মনে করে ; কিন্তু বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের লোকদিগকে যুদ্ধে বধ করা স্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্‌বিবেচন-

শক্তিরূপ দেবতা যদি একই হয় তাহা হইলে এই পার্থক্য কেন? এবং সদসদ্‌বিবেচনশক্তিরও যদি শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার-অনুসারে ভেদ মানিতে হয় তাহা হইলে তাহার স্বয়ম্ভূ নিত্যত্ব বাধিত হয়। অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়া মনুষ্য যেমন-যেমন সভ্য হইতে থাকে সেই অনুসারে তাহার মন ও বুদ্ধি বিকশিত হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারে বুদ্ধির অভিবৃদ্ধি হইলে পর পূর্ব্বে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে সে যে বিচার করিতে পারিত না, সভ্য অবস্থায় তাহা চট্ করিয়া করিতে পারে। অধিক কি, এই প্রকারে বুদ্ধির উন্নতি হওয়াই সভ্যতার লক্ষণ। সুসভ্য কিংবা সুশিক্ষিত মনুষ্য কোন বস্তু দেখিবামাত্র চাহিয়া বসে না। ইহা যেরূপ তাহার প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের পরিণাম, সেইরূপ ভালমন্দ বাছিয়া লইবার মনের শক্তিও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইয়া কোন কোন বিষয় মনের এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, কিছুমাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত আমরা ব্যক্ত করি। চক্ষুর দ্বারা নিকটের কিংবা দূরের বস্তু দেখিতে হইলে শিরা ও স্নায়ু ন্যূনাধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং এই সব ক্রিয়া এত দ্রুত হইয়া থাকে যে আমরা তাহা জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ এই বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা মনুষ্যের মন কিংবা বুদ্ধি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বকাজে একই। কালো সাদা এক প্রকারের বুদ্ধিতে এবং ভালমন্দ অন্যপ্রকারের বুদ্ধিতে নির্ব্বাচন করা যায় এরূপ বাস্তবিক প্রকার-ভেদ নাই। কাহারও বুদ্ধি কম হইতে পারে, কাহারও অশিক্ষিত কিংবা অপরিণত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে পারে, এইটুকুই যা' প্রভেদ। এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং যে-কোন ক্রিয়া দ্রুত করিতে পারা অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপ-লব্ধির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহার ওদিকে সদসদ্‌বিচারশক্তি বলিয়া কোন আলাদা, স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই এইরূপ পাশ্চাত্য আধিভৌতিকবাদীরা স্থির করিয়াছেন।

রাণাডের-স্মৃতি কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

পণ্ডিতা রমা বাইয়ের পুণায় আগমন ও আর্য্যমহিলা-সমাজের স্থাপনা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পণ্ডিতা রমা-বাই নামে কোঙ্কনস্থ কোন এক মহিলা সংস্কৃতজ্ঞ ও খুব বিদ্বান; সমস্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ। তিনি কাশীর বড় বড় পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করিয়া জিতিয়াছেন। এইরূপ বিদ্বান মহিলা পুণায় আসিয়া অবস্থিতি করিবেন, এই কথা শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং এই মহিলা না জানি কিরূপ, তাঁকে কখন্ দেখিতে পাইব, ইহাই আমার সর্ব্বদা মনে হইতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন শনিবার ছিল বলিয়া আমি নিত্যানুরূপ সভায় গেলাম। সকল মহিলারই মুখে পণ্ডিতা বাইর কথা। আমারই মতো সকলেই তাঁকে দেখিবার জন্য উৎসুক। তিনি না জানি কি রকম, কোথায় আসিয়া উঠিবেন, আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন কি না, তিনি নিকটেই আসিয়া উঠেন যদি ত বেশ হয়, যদি দূরে কোথায় গিয়া উঠেন তাহলে কি হইবে? এইরূপ নানা বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ হইবার পর, আমি পাকা খবর জানিবার জন্য ভিড়ে ও মোডক যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া, পণ্ডিতা মহিলা সম্বন্ধে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "পণ্ডিতা-বাই কি কোন পর-দেশী—তিনি আমাদেরই কোঙ্কনস্থ মহিলা। আমরা সবাই তাঁকে আহ্বান করিয়াছি। তিনি এই বাড়ীতেই আসিয়া উঠিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন। তিনি একজন দুর্দ্দশাগ্রস্ত মহিলা, তোমরা আসিয়া তাঁহার সমাচার লইলে ভাল হয়। তিনি নিকটেই আসিয়া উঠি-বেন শুনিয়া আমাদের আনন্দ হইল এবং আমরা তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলাম। তদনুসারে চার পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি অভ্যঙ্কারের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পাতানো-ভাই এক গরীব বাঙ্গালী বাবু ছিলেন ও তাঁহার ছয় বৎসরের মনোরমা নামে এক মেয়ে ছিল। তিনি আসিলে পর, এক এক সময়ে আমরা সকল মহিলাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

প্রায় সেই সময়েই, জেল্‌া-ভ্রমণের পর আমার স্বামী পুণায় আসিলেন এবং পণ্ডিতা বাইর পুরাণপাঠ প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই হইল। সেখান হইতে, প্রতি সপ্তাহে এক এক বাড়ীতে পুরাণ পাঠ হইবে এইরূপ স্থির হওয়ায় যেখানেই পুরাণ পাঠ হইত সেইখানেই আমি যাইতে লাগিলাম। পণ্ডিতা রমা-বাইর উপর আমাদের

বাড়ীর মেয়েদের রাগ হইবার প্রথমে ইহাই কারণ হইল। আমাদের বাড়ীতে অনেক রমণী থাকায়, দুপর বেলায় আমাদের বাড়ীতে সুতা বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের লক্ষ পল্‌তে তৈরি করা হইত আমাদের বাড়ীতে একটা কারখানা কিম্বা তুলার কল চলিত বলিলেও হয়। সেইজন্য পাড়ার পরিচিত রমণীরা আপনাদের কাপড় লইয়া কিংবা শুধু বসিয়া গল্প করিতেও আসিত। এবং ভিন্ন ভিন্ন রমণীদের নিকট হইতে সহরের সত্য ও মিথ্যা বিবিধ সংবাদ আমাদের মেয়েদের কাণে আসায়, তাহাদের খুবই আমোদ হইত। আজকাল পণ্ডিতা রমা-বাইর আগমন খুব একটা চর্চ্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যেকে সত্য মিথ্যা ভাল মন্দ যাহা মনে হইত সেইরূপ গল্পগুজব ও মিথ্যা রটনা করিত। এবং এই সব গল্প দুই-চারদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের নিকট আসিয়া পৌছিল। তাহার পর, আন্দোলন ও চর্চ্চার আর সীমা রহিল না। তাহাতে আবার আমাদের উভয়ের টান সেইদিকে থাকায়, তাঁহার নাম করিয়া আমাদের নামেও খোঁট করিবার ও যা খুসি বলিবার আমাদের বাড়ীর মেয়েদের বেশ সুযোগ হইল, তাঁহারা এমন সুযোগ ছাড়িলেন না। পণ্ডিতা-বাই সম্বন্ধে দিনকে-দিন তাঁহারা বেশী বেশী টিট্‌কারী সুরু করিয়া দিলেন—'সে অপবিত্র, সে আমাদের বাড়ী আসিলে, তাকে ছুঁইয়া আমাদের ছুঁইও না, তোমার ভাল লাগে তুমি তাকে গলায় বেঁধে রাখো; কিন্তু আমাদের নিকট এই ভ্রষ্টাচার চলিবে না। মৃত পিতা, সুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিলেও, সে বাঙ্গালী বাবুকে আবার বিবাহ করিয়া দেহকে কলুষিত করিয়াছে। ভাল, আবার সংসার করিল কেন? শুধু তা না। সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এখন সে জগৎকে কলুষিত করিতে আসিয়াছে!' ইত্যাদি খুব টিট্‌কারী দিয়া বলিত।

আমার স্বামীর কথা-অনুসারে আমি পণ্ডিতা-বাইর নিকট এক একদিন স্বেরা করিবার জন্য যাইতে লাগিলাম। সহজভাবে তিনি বলিলেন যে, "আমি সম্প্রতি হাওয়ার্ডের দ্বিতীয় ভাগ শিখিতেছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি শিক্ষার সুবিধা হয় নাই।" আমি বলিলাম, "আমিও কিছু কিছু শিখিতেছি। আজ পর্য্যন্ত আমার স্বামীই শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি জেলা ভ্রমণে তাঁহার যাইতে হইতেছে এবং আমার শিক্ষা বন্ধ না হয় সেইজন্য মিশনের এক মেমকে আমার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাকে শিখাইতে আসেন। তোমার ইচ্ছা হইলে তুমিও তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য এখানে আসিতে পার।" এই কথা তাঁর মনোমত হইল এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের বাড়ী শিক্ষার জন্য আসিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের মেয়েরা এই-মহিলা সম্বন্ধে টিটকারী সুরু করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় তিনি আমাদের বাড়ী আসিতে লাগিলেন। তিনি আমার সহিত হাস্যালাপ করিতেন এবং আমাকে বন্ধুভাবে ভাল বাসিতেন; বাড়ীর মেয়েদের ইহা ভাল লাগিল না। পরে, আমাদের যে সভা ছিল তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া পণ্ডিতা-বাই আর এক নূতন সভা স্থাপন করিলেন, এবং তাহার "আর্য্য-মহিলা সভা" নাম দিলেন। পূর্ব্বে আমাদের সভা শুধু দশ বারো মহিলার সভা ছিল বলিয়া উহার কোন নাম ছিল না, নামডাকও ছিল না, সেইজন্য আমাদের বাড়ীর মধ্যেও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এখনকার সভায় অনেক মহিলা ও পুরুষের সহানুভূতি থাকায় প্রতি শনিবারে অনেক লোক জমা হইতে লাগিল। তাহাতে মুখ্যরূপে পণ্ডিতা-বাই-ই বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতা বাইর বাণী যেমন অস্খলিত ও মধুর, তাঁর বিষয় প্রতিপাদনের রীতিও তেমনি উত্তম। বলিবার সময়, শ্রোতাদিগের মনকে আপন ভাষার দিকে আকর্ষণ করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। এই চার গুণই তাঁহাতে থাকায় সহরের সমস্ত প্রাচীন ও নবীন স্ত্রীশিক্ষণেচ্ছু বিদ্বানদিগের পণ্ডিতা বাই সম্বন্ধে কৌতুক ও শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল এবং প্রতি শনিবারের সভায় নিজের বাড়ীর মহিলা ও মেয়েদিগকে তাঁহারা নিয়মিতরূপে পাঠাইতে লাগিলেন। তাছাড়া, পণ্ডিতাবাইর কথকতা সহরে সুরু হইয়াছিল।

কথকতা হইলে আমি প্রত্যেক কথকতাতেই প্রায় যাইতাম। তাছাড়া প্রতি শনিবারে প্রকাশ্যভাবে পণ্ডিতা-বাইর সভায় যাইতে লাগিলাম। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা এবং যারা গল্প করিতে আসিত; সেই মেয়েরা রোজ নূতন নূতন গল্পগুজব করিতেন। পণ্ডিতা রমা-বাই সভা করিয়াছেন, পুরুষদের উপর তাঁর কটাক্ষ আছে, মেয়েরা পুরুষদের অধীনে কেন চলিবে? পুরুষেরা স্ত্রীলোকের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করে, তাদের পরোয়া করে না; চব্বিশ ঘণ্টা স্ত্রীলোকেরা গরুর মতো খাটে; পুরুষ বাড়ী আসিবামাত্র তাদের স্নানের জন্য জল ঢালিয়া দিবে; তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিবে। খাটিয়া খুটিয়া আমাদের দম বাহির হইয়া গেলেও তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন স্বামীর হাত পা টিপিয়া দিবে। এত করিয়াও একটু কিছু ত্রুটি হলেই অমনি লাথি কিল! এমন যে অত্যাচারী পুরুষ তাদের অধীনে তোমরা না থাকিয়া স্বাধীন হও—ইত্যাদি আপন ধারণা অনুসারে ও বুদ্ধি অনুসারে, নানা

খবর সেই মেয়েরা আমার শাশুড়ীর নিকট, ননদের নিকট আসিয়া বলিত। আমাদের বাড়ীর সব মেয়েদের মধ্যে আমার ননদ বোঝদার ছিলেন, শিক্ষার মূল্য তিনি জানিতেন; তবু কিন্তু একবার যে পক্ষ নিতেন তাহা ছাড়িতেন না এইরূপ তাঁহার স্বভাব হওয়ায় এবং যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল এইরূপ একবার তাঁহার মনে ধারণা হইলে, তিনি সেই অভিমানের বশীভূত হইয়া পড়িতেন। নিজের মতের সঙ্গে যতক্ষণ না কোন কথা মেলে, ততক্ষণ তিনি নিজের কথাই ধরিয়া থাকেন, কিছুতেই ছাড়েন না; তার পর, সেই বিষয় সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রীর যতই কষ্ট হোক্ না কেন, সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাই, এইরূপ তাঁর স্বভাব ছিল। এই কথা আমি নিত্য শুনিতাম যে,—"আমার সভায় যাওয়া উচিত নয়, পণ্ডিতাবাই আমাদের বাড়ী আসিলে তাঁকে ছুঁইতে নাই, পুরুষরা বলিলেও তাঁদের কথা শুনিতে নাই,; মুখে "না" বলিবে না, কিন্তু কাজে না করিলেই হইল; তাহারা আপনারাই শেষে বিরক্ত হইয়া তাহাদের জেদ ছাড়িয়া দিবে; তোর বাপের বাড়ীর লোকেরা বনিয়াদি ও উচ্চ-বংশের, তোর এ ঢং তাঁদের কি ভাল লাগিবে? তোর মা ও বাপ কত বড় চালের লোক। তাঁদের দেখিলেও মনে সন্তোষ হয়। তাঁহাদের বাড়ীতে মারাঠী শিক্ষা দিবারই রীতি নাই ত ইংরেজি শিক্ষা। কিন্তু তোর সেই মেমের উপর টান!" এই ধরণে আমার ননদ ও শাশুড়ী স্নেহের ভাবে আমাকে কাছে বসাইয়া নানারকম শিক্ষা দিবার প্রযত্ন করিতেন। তাঁরা যখন বলিতেন তখন তাঁহাদের সমস্ত কথা ঠিক বলিয়া আমার মনে হইত; এবং তাঁরা যেরূপ বলিতেছেন সেই অনুসারেই আমি চলিব, এইরূপ মনে মনে বিচারও করিতাম; এবং তাঁরা জিজ্ঞাসা করিলে তার উত্তরে, মুখে আমি "হাঁ, হাঁ" করিতাম, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কাজে তাহা করিতাম না। কারণ আমার স্বামীর যাহা মনোমত, তাহা যাহাই হউক না, আমার করিতে হইবে; নৈলে তিনি রাগ করিবেন,—এই কথা আমি ঠিক জানিতাম বলিয়া, আমার স্বামী যাহা করা উচিত মনে করিতেন তাহা আমি করিতে ভুলিতাম না। যিনি আমার সুখ ও শান্তির একমাত্র স্থান তাঁহা হইতে দূরে যাওয়া উচিত নয় এবং এই এক শান্তির দিক বজবৎ থাকিলে অন্য কোন লোকের নিকট হইতে কষ্ট যন্ত্রণা পাইলে তাহা সহ্য করিবার অধিক বল পাইব, এইরূপ আমার দৃঢ় ধারণা ছিল। যেরূপ আট মাসের গ্রীষ্মকাল ও এক দিবসের বর্ষা—সেইরূপ বাড়ীর অন্য আত্মীয় হইতে আমার স্বামীর ব্যবহার পৃথক ছিল। সেইজন্য বাড়ীর মেয়েদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া এবং আর কাহা-কেও ভালমন্দ কিছু না বলিয়া আমার স্বামী যাহা ভাল বাসিতেন, নীরবে তাহা করিবার দিকে আমার সমস্ত মনের গতি ছিল।

"উনি" বাড়ীর কোন বিষয়েরই খোঁজখবর রাখিতেন না এবং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতেনও না। 'অমুক প্রকারের আচরণ আমার পছন্দসই, আমাদের মেয়েরা কিংবা তুমি অমুক প্রকারে চলিবে, এ বিষয় আমার মনোমত নহে, তুমি তাহা করিও না' প্রভৃতি প্রভুর ধরণে অহমিকাসূচক শব্দ কখনও তিনি মুখে আনিতেন না, এইরূপ তাঁর নিয়ম ছিল। কিন্তু, আমার নিজের লোককে (আমাকে) কোন কথা বলিব না, সে তাহার নিজের যাহা মত সেই অনুসারেই সে চলিবে, এইরূপ আমার স্বামীর মনের ভাব ছিল। তাহা জানিয়া আমি সেই অনুসারে চলিতাম বলিয়া আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েরা আমার উপর খুব রাগ করিতেন, চটিয়া যাইতেন। তাঁহারা ও বিশেষতঃ আমার ননদ বলিতেন যে, "সভায় যাইয়া বেহায়ামি করা ওরই কাজ। দাদার (আমার স্বামী) ওতে তেমন আগ্রহ নাই; "ইহা কর, উহা কর" এইরূপ পুরুষদের তো বলিবার রীতিই আছে, কিন্তু মেয়েরা তাহার কতটা শুনিবে তাহার কি কোন তারতম্য নাই? পুরুষেরা একশো কথা বলিলে বড় জোর তারা দশটা শুনিতে পারে। ব্যবহারের ছোটখাটো সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে পুরুষেরা কি বুঝিবে? মেয়েদের শিক্ষা দিতে দাদা খুব ভাল বাসেন তা আমারও জানা আছে। ছুটির সময় কোহ্লাপুরে আসিয়া দাদা আমাকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। পুঁথি পুস্তক পড়িতে পারিলেই হইল, তাহার বেশী কিছু শিক্ষা করায় মেয়েদের কি প্রয়োজন? দাদার এই একটা বাতিক, আমার প্রথম বৌদিদির শিক্ষার সম্বন্ধেও তাঁর কত আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল; কিন্তু বৌদিদি বড় ভাল মানুষ ছিলেন। আমরা যতই রাগ করি না কেন, তিনি সব সহ্য করিতেন। কিন্তু সে ভাল মানুষ এমন বেহায়াপনা কখনও করে নি ও পুরোনো রীতিও ছাড়ে নি। তাই আমরা ২৫ জন লোক মানে মানে দিন কাটিয়েছি। আমি ঘরের কর্ত্রী এরূপ অভিমান তার শরীরে একটুও প্রবেশ করে নি। জাগিরদারের মেয়ে না হলেও, তিনি কিছু আর ভিখারিণীও ছিলেন না; ভাল বংশেরই লোক ছিলেন; স্বভাবও শান্ত ছিল। এখন যা দেখি সবই অন্য রকম! দাদা যদি একটা করতে বলেন ইনি তিনটে করতে বসেন। এইরূপ স্থলে আমাদের মান থাক্‌বে কি করে? আমরা টিক্‌বই বা কেমন করে? এদিকে, আমরা রাগ করে যতই বলি না কেন, সে রাগ করে না। গোঁড়ার মতন চুপটি করে শুনে যায়। কিন্তু

কাজের বেলায় করতে ভোলে না। আমাদের কথা সহ্য করে' কল হল কি" ? এইরূপ ধরণের কথা নিত্যই বলিতেন।

এই প্রকারে ৭।৮ মাস কাটিয়া গেল। তার পর "উনি" দুই জেলা ভ্রমণের কাজ শেষ করিয়া আফিস-সমেত বাড়ী আসিলেন। এখন বর্ষাকালে পুণা-তেই থাকিতে হইবে, উপরের তলায় আফিস্‌ও করিব। বাহিরে যাইবার কোন কাজও নাই; এইরূপ উঁহাকে বলিতে শুনিয়া আমার খুবই আনন্দ হইল। উনি একলাই উপরের তলায় বসিতেন। কাজের জন্য সেই খানেই শিরস্তেদার কিংবা কোন কেরাণী যাওয়া-আসা করিত। এক সিপাহি মাত্র এই উপর-তলার পাহারা দিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ও তিন প্রহরের সময় টাট্‌কা ফল, বাদাম পেস্তা খাওয়া ওঁর অভ্যাস ছিল; এবং তাহা ঐ সময়ে তাঁহার নিকট আমারই লইয়া যাইতে হইত। যে দিন শনিবার পড়িত সেই দিন দুইটা হইতে উনি আমাকে তাগিদ দিয়া বলিতেন;—"দেখ, তোমার সভায় যেতে হবে; আজ শনিবার; সেটা তোমার মনে নাই কি ? সময়টা ভুলো না; কিংবা নীচে কোন কাজ করতে বলেছে, এরকম কোন কারণ বল্লে আমার কাছে চল্‌বে না; কোন নিয়মিত কাজে অমনোযোগী হবে না। তার জন্য প্রথমে একটু কষ্ট হবেই; তা সহ্য করতে হবে। এই প্রকার ওঁর বলিবার পর, আমি তৎক্ষণাৎ নীচে গিয়া, পাছে সময়ের ভুল হয়, সময় হইবামাত্রই আমি যাইবার সময় মুঠোর ভিতর প্রাণটা ধরিয়া, ভয়ে ভয়ে ননদকে "এখনি আস্‌ছি" বলিয়া, ননদ কি বলিবেন তাহার অপেক্ষা না করিয়াই, একেবারে বাহির হইয়া পড়িতাম। সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসিলে, আমার কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ইহা আমার সততই মনে জাগিতে থাকায়, সেই চিন্তা করিতে করিতে, সভার বাড়ীতে পৌঁছোনো পর্য্যন্ত, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন থাকিত। কিন্তু চিরপরিচিত মহি-লাদের মধ্যে যাইবামাত্র তাঁহাদের সহিত হাস্যালাপ করিয়া, এবং আমার উপর যে কাজের ভার ছিল সেই কাজের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া, সে সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম; কিন্তু আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, সভার আনন্দ ও সেই প্রগল্‌ভতা বিলুপ্ত হইয়া যাইত; আমি ভীরুর ন্যায় মাঝ-ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কারণ সন্ধ্যা-কালে, দিদিশাশুড়ী ও ননদ ইঁহাদের এই মাঝ-ঘরের বারণ্ডাতেই বসিবার আড্ডা ছিল। সেই জন্য আমি বাড়ী আসিলে প্রথমেই তাঁহাদের নজরে পড়িতাম। আমার দিদিশাশুড়ী ও ননদ একবার বকিতে আরম্ভ করিলে আর কাহারও তকা রাখিতেন না। তাহাতে আবার, এই সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে পুরুষ কেহই থাকিত না, সেই জন্য তাঁহাদের আরও সুবিধা হইত। "উনি" আসিলেই সব বন্ধ হইয়া যাইত। কেবল আমাকে এই কড়া তাগিদ হইত যে, "তুমি সভা থেকে এসেছ কাপড় ছেড়েছ, তাহলেও আমাদের বাড়ী রান্নাঘরে অন্ন পরিবেশন করতে পারবে না। চাট্‌নী কোশিম্বির, কিংবা রান্নার মশলা পর্য্যন্ত ছুঁতে পারবে না। সভার যাওয়া মেয়েদের এ-রকম ছোট কাজ করা উচিতই না। উপরে গিয়ে পুরুষের (স্বামীর) সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে বস্‌লেই বেশ শোভা হবে!" সকাল দুপর ও সন্ধ্যা-কালে যখনই সুযোগ হইত, এই রকম কিংবা ইহারও বেশী বোল-চাল চলিত। বাড়ীর অন্য আত্মীয় মেয়ে ছাড়া, বাদরায়ণ রীতি-অনুসারে আরও ৫।৭ জন মেয়ে থাকিত। তাহারা আমাদের বাড়ীর বড় মেয়েদের কথার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে "হুঁ দিয়া সাহায্য করিত। তবু আমি তাহাদের কথার কোন উত্তর দিতাম না। কারণ, সেই অর্থের অনর্থ করিয়া ও মিথ্যা করিয়া বলিয়া আমা-দের বাড়ীর মেয়েদের মন যোগাইতে পারিলে উহাদের প্রতিপত্তি বাড়িবে। তাই আমি কাহাকে কিছুই বলিব না, এইরূপ নিশ্চয় করিলাম। বড় জোর নীচে গিয়া আপন মনে চোখের জল ফেলিয়া মনের অসহ্য ভার হাল্‌কা করিব, এই উপায়ই আমার জানা ছিল। এইরূপ শনিবারের রাত্রি হইতে ২।৪ দিন পর্য্যন্ত এই মেয়েদের সহিত আমি কথা কহিতাম না। তবু টিট্‌কারির বোল্‌-চাল মধ্যে মধ্যে আমার কানে আসিত। এইরূপ ভাবে চলিলে, বৃহস্পতিবারে "কোথায় আমার কাপড় ? ঝোল তৈরি কর, রান্নার মসলা বের কর, অন্ন পরিবেশন কর" প্রভৃতি কাজ ননদ আবার বলিতে আরম্ভ করায়, আপন দল হইতে বহিষ্কৃত লোককে পুনরায় আপন দলে গ্রহণ করিবার মতো আমার আনন্দ হইত এবং যাহা তাঁহারা বলিতেন তখনি আমি তাহা উল্লাস ও তৎপরতার সহিত করিতাম। এইরূপ আনন্দে দিন যাইতে না যাইতে, সেই শনিবার মহাশয় আবার আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ মিশ্র সুখে এক বৎসর কাটিল। সেই সময়ে আমার ইংরেজি শিক্ষাটা বেশ এগাইয়া গিয়াছিল। মিস্ হরফর্ডের সহবাসে দুই চারিটা ইংরেজি কথা চলিত-ব্যবহারের মতো যখন বলিতে শিখিলাম, তখন হরফর্ডকে বিদায় দিলাম। (ক্রমশঃ)

ভাষার উৎপত্তি।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বিদ্যার্ণব, এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশের অনুবৃত্তি)

প্রথমত সাঙ্কেতিক চিহ্ন, তদনন্তর সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও স্বরের সংমিশ্রণ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করার

অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর বিশেষ বিশেষ স্বরের সহিত বিশেষ পদার্থ ও কার্য্যের অর্থ সংবদ্ধ করিয়া শব্দ সকলের সৃষ্টি করা তেমন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। আত্মরক্ষার আদি সংগ্রাম অবস্থায় নির্য্যাতনই মানবকে এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মাঠ কিম্বা প্রান্তর, যেথানে দৃষ্টিশক্তিকে বাধা দিবার কিছু থাকে না, তথায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাববিনিময় চলিতে পারে, কিন্তু নিবিড় কাননে অবস্থান কালে সাধারণতঃ এরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা বিশেষ কোন কার্য্যে লাগিতে পারে না। মনে করুন, তাৎকালিক অসভ্য পুরুষ বনের এক প্রান্তে ও তাহার স্ত্রী অপর প্রান্তে কার্য্যব্যপদেশে গমন করিয়াছে। তাহার স্ত্রীকে কোন বিষয় জানাইতে হইলে সঙ্কেতে চলিবে না, চীৎকার করিয়া উচ্চৈস্বরে তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। তেমনি রাত্রি যখন গভীর তমসাচ্ছন্ন, তখন একস্থানে অবস্থান করিলেও সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ফিস্ ফিস্ শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্বরের তারতম্য দ্বারা এইরূপ গর্জ্জন ও ফিস্ ফিস্ শব্দের মধ্যেই বিভিন্ন অর্থসূচক বিভিন্নভাব সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এই অরণ্যবাসী স্ত্রীপুরুষ যে সকল অবস্থা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিল তাহার মধ্যে যে পদার্থ যে শব্দের উৎপত্তির হেতু, সেই শব্দ কর্ণবিবরে প্রবেশ মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সেই পদার্থেরও অবয়ব মানসপটে অঙ্কিত হওয়া অনিবার্য্য। অরণ্যভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে সিংহ গর্জ্জন করিতেছে ইহা তাহার শ্রুতিগোচর হইল, কিম্বা রজনীতে গিরিকন্দরে শুষ্কপত্র বিস্তার করিয়া সে বিশ্রাম সম্ভোগ করিতে ছিল তখন অদূরে সর্পের ফিস্ ফিস্ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। সিংহের গর্জ্জনের অনুকরণদ্বারা সে তাহার স্ত্রীর নিকট সিংহের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে। তদ্রূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা নিকটে সর্প রহিয়াছে তাহাও জানাইবে। এই প্রকারে স্রোতস্বিনীর কলকল, পাখীর কূজন প্রভৃতি বিভিন্ন স্বর, যাহা তাহাদের ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের চতুর্দ্দিকে তাহাদের কর্ণপথে পতিত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি শব্দেরই নামকরণ কার্য্য সাধিত হইয়া বিভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হইবে।

এইরূপ নামকরণ ক্রিয়া যে স্বাভাবিক, শিশুর নামকরণ তাহার বিশেষ প্রমাণ। শিশু শ্রবণশক্তির সাহায্যে পদার্থের নাম সকল শিক্ষা করিয়া থাকে। এরূপ শিক্ষা অবশ্য আয়াসসাধ্য ব্যাপার; কিন্তু যে স্থলে প্রত্যক্ষভাবে পদার্থ হইতে ইহার নামকরণের সুবিধা হয় সে স্থলে জনকজননী ঐ পদার্থকে যে নামে অভিহিত করিবার শিক্ষা প্রদান করেন তাহা উপেক্ষা করিয়া সে স্বরচিত নামেই তাহাকে ডাকিতে থাকে। দৃষ্টান্ত—শিশু বিড়ালকে বিড়াল না বলিয়া মিউ মিউ বলে, ঘড়িকে ঘড়ি না বলিয়া টিক টিক বলে, কুক্কুরকে বলে ঘেউ ঘেউ, Engineকে পফ্ পফ্ বলে ইত্যাদি।

এইরূপ স্বরসংসৃষ্ট শব্দের দ্বারা প্রত্যেক ভাষারই কলেবর কতকটা পরিপুষ্ট তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ (Philologists) পরিজ্ঞাত আছেন। অবশ্য স্বরের অনুকরণে শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে প্রত্যেক শব্দেই একথা প্রযোজ্য তাহা নহে। পৃথিবীতে যত স্বর আছে তাহা অপেক্ষা শব্দের সংখ্যা অনেক বেশী, এমন কি অনেক স্থলে স্বরের সাহায্যে পদার্থের নামকরণ সম্ভবপর থাকিলেও গভীর জ্ঞানগর্ভ অর্থবাচক স্বরসম্পর্কবিহীন শব্দ দ্বারা ঐ সকল পদার্থ অভিহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত—যেমন ঘড়ি, ইহাকে বাঙ্গালাতে ঘটিকা যন্ত্রই বলি কিম্বা ইংরাজিতে watchই বলি এই দুইয়ের কোনটি শব্দেরই টিক টিক স্বরের সহিত সম্পর্ক নাই। watch শব্দ watchman (পাহারাওয়ালা) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক পাহারাওয়ালাকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং watchman শব্দ সময়ার্থসূচক। ঘটিকা যন্ত্র নাম হইতেই ইহা যে সময়ের পরিচায়ক তাহা বেশ বুঝা যায়। তদ্রূপ Engine শব্দ Latin Inginium শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থ ইহার genius অর্থাৎ প্রতিভার সৃষ্টি। মানবমনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি যতই গভীরতা লাভ করিয়াছে ততই নূতন নূতন নামকরণগুলির গতি অন্তর্মুখী হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সৃষ্ট প্রায় সমুদয় নূতন শব্দই এইরূপ গভীর অর্থব্যঞ্জক। স্বরের সঙ্গে ইহাদিগের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। শব্দসৃষ্টির

রহস্য যে এখানেই ভেদ হইল একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ স্বরের সহিত কোন যোগ নাই অথচ অতি প্রাচীনকালে ভাষায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এ প্রকার শব্দের সংখ্যাও ত নিতান্ত কম নহে।

কিরূপে এই সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে ভাষা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিতেছেন না।

মানব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে পর যে সকল পদার্থ অহর্নিশি তাহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছিল তাহার তুলনায় তাহার পরিচিত স্বরের সংখ্যা অতি অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে কোন কোন শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ইহাতেও যখন কুলাইয়া উঠিল না তখন এমন সব নাম দ্বারা কার্য্য কিম্বা পদার্থকে নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল যাহার সঙ্গে শব্দের কোন সাদৃশ্য নাই। শিশু সমাজ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই নূতন নূতন অবস্থায় পরিবেষ্টিত হইয়া নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি ও তদ্দ্বারা নব নব ভাব ও পদার্থের নামকরণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ এই সকল কারণ বশতঃই ভাষাতত্ত্ববিদদিগের এত চেষ্টা ও প্রযত্ন-সত্ত্বেও এই সকল শব্দের কুল ও শীলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

বিশেষ অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে অনেক শব্দের নামকরণ হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়েও শিশু এবং অসভ্য জীবনে বিরল নহে। উভয়ই মানবজীবনের প্রথম অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শিশুরা অনেক সময় পদার্থের কি প্রকার আজগুবি নাম দিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা মধ্য আফ্রিকার পূর্ব্ব-প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পথপ্রদর্শক, তাঁহাদিগের অন্যতর Mr. John Muir এ সম্বন্ধে একটি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ দেশবাসী অসভ্যগণ জলের মধ্যে প্রতিবিম্বকে Mandala নামে অভিহিত করিয়া থাকে; Muir সাহেব চশমা ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকেও তাহারা Mandala আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ক্রমে শুধু Muir সাহেবের চশমারও ঐ নামকরণ হইল। অবশেষে সভ্যতার অনেক বৃদ্ধি সহকারে কাচের গ্লাস ঐ প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলে তাহাও ঐ নামে অভিহিত হইতে লাগিল। বালকদিগের হাড়ুডুডু খেলায় কিম্বা ক্রীড়াচ্ছলে দস্যুবৃত্তির অনুকরণ কার্য্যে সর্ব্বদাই ত সাঙ্কেতিক শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। ডাকাইতদিগের মধ্যে এ প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা প্রচলিত আছে। এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজকার্য্য শাসন প্রণালীর মধ্যেও এই স্বেচ্ছাধীন অর্থ সংযুক্ত শব্দনিচয়, cypher code নামে কি নিয়তই ব্যবহৃত হইতেছে না?

যখন কি অসভ্য কি সভ্য প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বালকেরই নূতন শব্দ সৃষ্টির অধিকার ও ক্ষমতা রহিয়াছে তখন কিরূপে আশা করিতে পারা যায় যে প্রত্যেক শব্দেরই ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রহিয়াছে এবং তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার মূল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক দেশের অধিবাসী পরস্পর নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অসভ্য জাতির ভাষার মধ্যে একই পদার্থের অর্থজ্ঞাপক এমন সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যাহার মধ্যে স্বর কিম্বা উচ্চারণগত অথবা অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই।

Dr. Whitney উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগের ভাষাগত এই প্রকার অসদৃশ শব্দসকলের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে বরঞ্চ ইংরেজী ও হংগেরী ভাষার মধ্যে সমন্বয় সংস্থাপন সম্ভবপর, এই লোহিতবর্ণ অসভ্য-দিগের ভাষা সম্বন্ধে তদ্রূপ চেষ্টার ফল সুদূর-পরাহত। এতদ্ সম্বন্ধে Dr. Hale একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই রহস্যপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছে এ কথা বলিতে না পারিলেও ইহার মধ্যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত থাকা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মনে করেন, সম্ভবত কোন অসভ্য যুদ্ধকালে দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সপরিবারে নিবিড় অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় শত্রুর তীক্ষ্ণ শরাঘাত পিতার প্রাণ হরণ করে, মাতা বন্দিনী অবস্থায় শত্রুশিবিরে প্রেরিত হন, অপরিণতবয়স্ক শিশুসন্তানদিগকে জীবনধারণের জন্য বাধ্য হইয়া একমাত্র কন্দমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায়

জনকজননী ভাইভগিনী গৃহ গো মহিষ জল অগ্নি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি শব্দ কেবল তাহাই ইহাদের জানা সম্ভব। কালসহকারে শিশুগণ বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সমাগমে বংশবৃদ্ধি হইয়া একটি ক্ষুদ্র জাতির tribe সৃষ্টি হইলে অবস্থার প্রেরণায় তাহাদিগকে অনেক নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যে ভাষার উৎপত্তি হইবে, তাহার অধিকাংশ শব্দের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী জাতিনিচয়ের ভাষার সৌসাদৃশ্য না থাকারই কথা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল স্থানে জীবনধারণ কার্য্য অনায়াসলব্ধ সেই সকল প্রদেশে এই প্রকার জাতির সংখ্যা অধিক। Dr. Hale এইরূপে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেনঃ—'শিকারীজীবনের অনিশ্চয়তা নিবন্ধন যদি কোনও কারণে অকস্মাৎ পিতামাতার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে অসহায় শিশুদিগের জীবনধারণ স্বভাবতই বৎসরব্যাপী আহার্য্যের সহজলভ্যতা ও জল বায়ুর শীতোষ্ণতার উপর নির্ভর করে। এরূপ অসহায় অবস্থায় পড়িলে প্রাচীন য়ুরোপে দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে শীতঋতুর করাল কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল, সুতরাং য়ুরোপে ৪ কিম্বা ৫টি মাত্র মূল ভাষা লক্ষিত হওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। উত্তর আমেরিকার রকিপর্ব্বতের পূর্ব্ব ও উত্তরায়নান্ত বৃত্তের উত্তরস্থ প্রদেশ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ফলতঃ তথায়ও মূল ভাষার সংখ্যা নিতান্ত কম। কিন্তু কালিফর্ণিয়া দেশ বস্তুতই প্রকৃতির স্নিগ্ধমধুরভাবের লীলাক্ষেত্র—তথায় বরফ কিম্বা তুষারপাতের উপদ্রব নাই, আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বৎসরের মধ্যে সাত মাস কাল বৃষ্টির সঙ্গে দেখা থাকে না অথচ শস্যের উৎপাদনোপযোগী বারিবর্ষণেরও ত্রুটী নাই। প্রকৃতিসুন্দরী বারমাসই শ্যামল বসন-পরিহিতা ও ফলপুষ্পে পরিশোভিতা থাকিয়া যেন প্রকৃতপক্ষেই জননীর ন্যায় অসহায় শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্নেহহস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। দেখা গিয়াছে ঐ প্রদেশে অন্যূন ১৯টি মূল ভাষা বিদ্যমান রহিয়াছে।' *

অবশ্য Dr. Hale এর এই উক্তি অনুমান-মূলক মাত্র, সত্যরূপে ইহাকে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। তথাপি এই প্রকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে ভাষারূপ বৃক্ষ যে অঙ্কুরিত ও ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করিয়াছে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না। কালসহকারে আদি মানবের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে

---

* "If, under such circumstances, disease, or the casualties of a hunter's life should carry off the parents, the survival of the children would, it is evident, depend mainly upon the nature of the climate and the ease with which food could be procured at all seasons of the year. In ancient Europe, after the present climatic conditions were established, it is doubtful if a family of children, under ten years of age, could have lived through a single winter. We are not therefore, surprised to find that no more than 4 or 5 linguistic stocks are represented in Europe. Of North America, East of the Rocky mountains and North of the tropics, the same may be said. The climate and the scarcity of food in winter forbid us to suppose that a brood of orphan children could have survived except possibly by a fortunate chance of some favoured spot on the shore of the Mexican gulf where shell fish, berries and edible roots are abundant and easy of access. But there is one region where Nature seems to offer herself as the willing nurse and beautiful stepmother of the feeble and unprotected. Of countries on the globe there is probably not one in which a little flock of very young children would find the means of sustaining existence more readily than in California. Its wonderful climate, mild and equable, beyond example, is well known. Half the months are rainless, snow and ice are almost strangers. There are fully 200 cloudless days in every year. Roses bloom in the open air through all seasons. Berries of many sorts are indigenous and abundant. Large fruits and edible nuts are low and pendent, bows may be said, in Milton's phrase, to "hang amiable." Need we wonder that in such a mild and fruitful region, a great number of separate tribes were found speaking languages which careful investigation has classed in 19 district linguistic stocks ?"

যেমন তাহার জীবন প্রসারতা লাভ করিতে থাকিবে ও নব নব ভাবের উদ্দীপনাতে তাহার হৃদয়ক্ষেত্র সুসজ্জিত হইয়া উঠিবে, অপরদিকে ঐ সকল ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। নবাবিস্কৃত প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন যে নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে ইহা কি এই উক্তির সমর্থন করিতেছে না? দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত অভিধান গ্রন্থে যে সকল শব্দের চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই এরূপ কত শত শত শব্দ আজ তাহার বক্ষে স্থান লাভ করিয়াছে।

মানুষ চিরকালই ঘটনার দাস। আমরা এ পর্য্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কিপ্রকারে ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আমাদের আদিম পিতৃপুরুষগণ শব্দসৃষ্টির মূলভিত্তি স্থাপন করেন এবং কি প্রকারে এই শব্দসৃষ্টি কার্য্য অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য এতদ্দ্বারা আমি এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করিতেছি না যে ভাষাসৃষ্টির সহিত বিশেষ দৈবী শক্তির কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে মানবের যখন শব্দরচনার শক্তি রহিয়াছে তখন কোরাণ শরিফ প্রদানের ন্যায় অভিধান গ্রন্থকেও প্রদান করিবার জন্য স্বর্গস্থ কোন দূতের মর্ত্ত্যে আগমনের প্রয়োজন ছিল না।

শারীর তত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন কি বিশেষ কারণে মানব বাক্‌শক্তি লাভের অধিকারি হইয়াছে। মানবের জিহ্বা তুলনায় অন্যান্য প্রাণীর জিহ্বা হইতে দৈর্ঘ্যে খর্ব্ব ও প্রসারে বিস্তৃত। এই জিহ্বাকে ধারণ করিবার জন্য এবং সমতল ভাবে ইহার সহজ পরিচালনার জন্য মূর্দ্ধা ও তালু উভয়ই তদ্রূপ হ্রস্বতা ও বিস্তৃতি লাভ পূর্ব্বক মুখগহ্বরকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। শব্দের পরিস্ফুটতা এই পরিচালনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং এই পরিবর্ত্তনের অধিকতর প্রসারের দ্বারাই উচ্চারণের সমধিক সূক্ষ্মতা সাধিত হয়। *

Prof. Macalistar says :—

এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের তারতম্য প্রযুক্ত সিংহের নিনাদ, ব্যাঘ্রের গর্জ্জন, স্রোতস্বিনীর কলকল স্বর, ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের চিত্তোন্মাদী কুহু কুহু রব মানবের পক্ষে অনুকরণ করা সহজসাধ্য হইলেও গো মহিষাদি পশুদিগের পক্ষে ইহা শক্তির অতীত ব্যাপার। এ বিষয়ে মানবের সঙ্গে বরং পক্ষীদিগের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শুক প্রভৃতি অনেক পাখী নানাপ্রকার স্বর অনুকরণ করিতে ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতে সমর্থ। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে—তবে পক্ষিদিগের মধ্যেও ভাষার অভিব্যক্তি হইতেছে না কেন? মাংসপেশীর সমাবেশ ও অস্থির গঠনে পক্ষীগণ অনেকটা মানুষের নিকটবর্ত্তী। পালকবিবর্জ্জিত পক্ষীর ডানা ও মানবের হস্তের মধ্যে বিভিন্নতা বড়ই সামান্য। এই সব পর্য্যালোচনা করিলে মনে হইতে পারে যে, কোন না কোন সময়ে হয়ত একই ক্ষেত্র হইতে উভয়ের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে দিবস পক্ষী উষার শুভ্র বিমল কিরণস্নাত অসংখ্য হীরকরজতখচিত নয়নাভিরাম পালকরূপী অমূল্য পোষাকে বিভূষিত হইয়া অনন্ত আকাশমার্গের পানে ছুটিল আর আদি মানব আত্মরক্ষা কিম্বা শত্রুপরাজয়কল্পে নিজের বদ্ধ মুষ্টি ও অঙ্গুলীর নখ রাজি ভিন্ন অপর কোন সম্বলবিহীন হইয়া হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ গভীর অরণ্য মধ্যে নিজের জীবন ধারণের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইল, সেই দিন হইতে একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এক জন বিমান পথে স্বর্গের দিকে প্রধাবিত হইবার শক্তি লাভ করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতে লাগিল এবং "উচ্চ বৃক্ষচূড়ে" আপনার "নীড় বাঁধিয়া" সুখে কালযাপন করিতে লাগিল; আর একজন ম্লান মুখে আপনার অদৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন হইল। তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে; সত্য বটে অদূরে পর্ব্বতদুহিতা ক্ষীণাঙ্গী স্রোতস্বিনী গুহার অভ্যন্তরে অবিরাম গতিতে চলিয়াছে, কিন্তু তীরভূমি ঘন নিবিড় উপলখণ্ড পরিবেষ্টিত কণ্টকাকীর্ণ তরুরাজিত অলঙ্ঘ্য প্রাচীর রূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে ঐ জল স্পর্শ করিতে দিতেছে না। অনাহারে দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া কতই না যাতনা দিতেছে; অভ্রভেদী দ্রুমরাজি সুমিষ্ট রসাল ফলভাণ্ডার তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দণ্ডায়মান। পক্ষীর পক্ষে তাহা অনায়াসলভ্য; সে ঐ ফলের আস্বাদ গ্রহণে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া আনন্দস্রোতে নিজের মনকে ঢালিয়া দিয়া কণ্ঠ হইতে অবিরল ধারায় অমৃতরস বর্ষণ করিতেছে, আর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ঐ মানবের অন্তরে লুব্ধশ্বাসের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার মনপীড়া শতগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

* "The acquisition of articulate speech became possible to man only when the aloecolar arch and palative area become shortened and widened and when his tongue, by its accommodation to the modified mouth, became shorter and more horizontally flattened, and the higher refinements of pronunciation depend for their production upon the more extensive modifications in the same direction."

মানব পক্ষীর সৌভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ঈর্ষ্যা কষায়িত লোচনে ঊর্দ্ধে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে আর নিজের মন্দভাগ্যকে পুনঃ পুনঃ অভিসম্পাত দিতেছে ও মুহুর্মুহুঃ নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস দ্বারা আপন বক্ষদেশকে নিপীড়িত করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ কালান্তকরূরী ভীম দর্শন সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দিকে প্রধাবিত হইল। ঐ যে বৃক্ষশিখরস্থ পক্ষীর প্রতি দ্বেষপরিপূরিত লোচনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় মস্তকোপরি দোদুল্যমান বৃক্ষশাখাটি দেখিয়াছিল, অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে ঐ শাখাটি তাহার হস্তগত হইল এবং আকর্ষণ মাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। কি করিয়া যে কি হইল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার সময়ও ছিল না। তথাপি দেখিতে পাইল ঐ শাখার আঘাতে সর্প পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কি ঘটনা! শত্রুকে বিনাশ কিম্বা পরাজয় করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীর কয়েকটি নখই একমাত্র সম্বল বলিয়া তাহার জানা ছিল, এই সামান্য বৃক্ষশাখাটির সাহায্যে আজ এই মহাশত্রু এত সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এক অভিনব রাজ্যের দ্বার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আত্মশক্তি এতকাল ঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, অদ্য তাহা জাগ্রত হইয়া মানবের অন্তরে নিজের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিল। মানব জীবনের এই ঘটনা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সামান্য বৃক্ষশাখাটি হস্তের যষ্টিতে পরিণত হইয়া যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের সমরবিপ্লব, যাহার উপর প্রকৃত প্রস্তাবেই "Staggering humanity" আখ্যা প্রযোজ্য হইতে পারে, সিন্ধুতে বিন্দু অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

হস্ত শিক্ষা করিয়াছে কিরূপে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কার্য্যে নিয়োজিত করা যায়। যে বৃক্ষশাখা সর্পের প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহার জীবনকে রক্ষা করিয়াছে সেই শাখার সাহায্যেই সে ঐ বৃক্ষের উচ্চতর শিখরদেশে অবস্থিত ফলগুলিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক করায়ত্ত করিতেছে ও তদ্দ্বারা নিজের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে। আবার হস্তস্থিত ঐ শাখারই আঘাতে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলকে বিদীর্ণ করতঃ নদীর গর্ভদেশে গমনের রাস্তা বাহির করিয়া লইতেছে এবং তাহার জল দ্বারা নিজের পিপাসা দূর করিতেছে। মোহের আবরণ উন্মোচিত হইল। দেখিতে পাইল পক্ষীর হস্তকে পালক রাশিতে পরিশোভিত করিয়া ইহাকে কেবল আকাশপথে উড্ডীয়নন হইবার শক্তি প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু তাহার নিজের হস্ত মধ্যে যে সকল শক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহার তুলনায় ঐ পক্ষীই কৃপার পাত্র। উপলখণ্ড ও বংশদণ্ডের সাহায্যে সে আজ ভীমদর্শন অসংখ্য হিংস্র-জন্তুসমাকীর্ণ অরণ্যভূমির একচ্ছত্র রাজা। উপলখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা সে কত শত্রুকেই না বিনাশ করিতেছে। এই উপলখণ্ডই বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাণান্তকারী কামানগোলার আদিপুরুষ। যে ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখাটি ঊর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া ফলকে বৃন্তচ্যুত করত সে নিজের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং যাহার আঘাতে সে সর্পের দংশন হইতে নিজের জীবনকে রক্ষা করিয়াছিল সেই সামান্য শাখাটিই বর্ত্তমান সময়ের অগণ্য অসভ্যজাতির বর্শা শরফলক এবং সভ্যজাতির প্রাণনাশক অস্ত্র Rifle প্রভৃতি বন্দুকের পিতৃপুরুষ।

পক্ষী ও মানব যদ্যপি একই ক্ষেত্রে হইতে উভয়ের উদ্ভূত হইয়া থাকে তথাপি একজন যে পালকরাশি লাভ করিয়া নিজকে অতুল সম্পদের অধিকারী মনে করিয়াছিল সেই পালকই তাহার উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আর মানব জীবনরক্ষার নিমিত্ত অবিরাম চেষ্টার দ্বারা উন্নতির উচ্চতম শিখরদেশে উপস্থিত হইয়াছে। সৃষ্টির এই রহস্য পূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এবং আত্মহারা হইয়া বক্তব্য বিষয় হইতে কতকটা দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

বর্ষ শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র শনিবার বর্ষ শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃসেষিত হইবে। জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ রবিবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপান উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
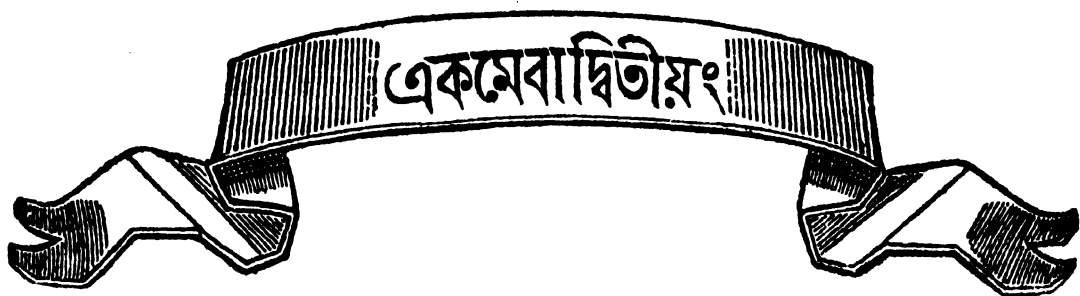
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঊনবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৩৯ শক

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

সাল ১৩২৪। খৃঃ ১৯১৮। সম্বৎ ১৯৭৪। কলিগতাব্দ ৫০১৯।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

ঊনবিংশ কল্প, তৃতীয় ভাগ।

১৮৩৯ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৮৮।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।